Reg. No C. 534

২২ বর্ষ । ...খ ১ম সংখ্যা ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা ।)



সম্পাদক
বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল্
সহকারি সম্পাদক
স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী ।

যশোহর
হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইং—২৭শে এপ্রিল ১৯১৫ ।
বাং—১৪ই বৈশাখ ১৩২২ ।
শকাব্দাঃ ১৮৩৭ ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাক মাশুল ২৲ মাত্র এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা

সূচী।

বর্ত্তমান সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীমতী লীলাবতী সরকার, শ্রী— —, শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ, শ্রীকেদারনাথ ভারতী, শ্রীদুর্গাচরণ দাসগুপ্ত, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মোহন বসু, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী, শ্রী—গুপ্ত, শ্রীবেদনাথ ন্যায়তীর্থ এম এ, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, সম্পাদক সহসম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২২ বর্ষ, ২২ শ খণ্ড বৈশাখ। ১৩২২ সাল।
১ম সংখ্যা। ১৮৩৭ শকাব্দাঃ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

ওঁ স্বস্তি মিত্রবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি,
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনো অদিতে কৃধি।

হে মিত্রদেব, হে বরুণদেব, আপনারা আমাদের মঙ্গল করুন। হে পথ্যদেবি রেবতি! আপনি আমাদের মঙ্গল করুন। ইন্দ্র এবং অগ্নি আমাদের মঙ্গল করুন। হে অদিতি দেবি! আপনি আমাদের মঙ্গল করুন। শুভ নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা সমষ্টিতে সর্ব্বদেবময় পরাৎপর পরমাত্মার নিকট ও ব্যষ্টিভাবে তাঁহার বিচিত্র বিকাশস্বরূপ দেবশক্তির নিকট অবনতমস্তকে কৃপাভিক্ষা করিতেছি। সেই বিভূতিময় বিভুর কাছে হিন্দুপত্রিকার কল্যাণকল্পে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাইতেছি। জানি, তিনি অরূপ হইয়াও বিশ্বরূপ; আবার সকল রূপের তিনিই উৎস। তাই তাঁহার জীবরূপবিকাশ গ্রাহক অনুগ্রাহক লেখক উপদেশক সহায়ক পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতির কৃপাও পূর্ব্ববৎ কামনা করিতেছি। হিন্দুপত্রিকা ধর্ম্মশাস্ত্র-সেবাকেই মুখ্যলক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কর্ত্তব্য কঠোর, বিচ্যুতির শঙ্কা প্রচুর, তবে ভরসার আশ্বাসও অসীম। কারণ, আমরা জানি, "যদসাঙ্গং কৃতং বাপি জানতাবাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতি তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্ণামানুকীর্ত্তনাৎ," ভগবানের নামানুকীর্ত্তন জ্ঞানে অজ্ঞানে সর্ব্বাবস্থায় অপূর্ণাঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মের ত্রুটী বিচ্যুতি দূর করিতে সমর্থ। শাস্ত্রের এই আশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাস করি, তাই আমরা ভগবৎস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি। জানি, কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, কর্ম্মেই আমাদের পরিনিষ্ঠা। কর্ম্মক্ষেত্রে ভগবৎ-কৃপাই আমাদের অবলম্বন। তাহা হইতে যেন দূরবর্ত্তী না হই। ওঁ শান্তিঃ

পিতৃ-নারায়ণের প্রতি।

হে আর্য্য !
বিধাতার কোন আশীষ বলে পেয়েছি তোমা হেন
দেবতায় পিতার আসনে। উদার ললাটে যেন
ভাসে শুভ্র শোভারেখা। ওঠে আজি অনন্ত অম্বরে
তোমার কীর্ত্তি-গাথা। শুনালে তুমি মেঘমন্দ্র স্বরে
আর্য উদাত্ত বাণী-সঞ্জীবনী "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" শুনিয়া তোমার অমৃত-
বাণী, জাগিয়া উঠিল দ্রুত এ জাতির সুপ্ত প্রাণ
তব তোমার্পিত পুষ্প ও চন্দনে করিতে জীবন-দান।
আসিল ছুটিয়া ত্যাগী সন্ন্যাসী গাহিল তোমা' সাথে
(তব) বঙ্গভূমে প্রাণময়ী কর্ম্ম গাথা। উঠিল জগতে
সুমঙ্গল মন্ত্র, ফুটিল হৃদয়ে সুকমীবরতা,
সেথা নারায়ণ-রূপে ফুটে আছে তব স্বপ্ন-পন্থা।
ডুবিল বিশ্ব ডুবিল প্রপঞ্চ, থাকিল সার্থকতা
স্তব্ধ মৌন বর্ণ-বিহীন চিরস্থিতি চির পূর্ণতা।

তব দীনা কন্যা—
শ্রীমতী লীলাবতী।

সাহিত্য-সম্মিলন।

সাহিত্যের প্রতি যে বঙ্গবাসীর অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সংবাদপত্র, মাসিক-পত্রিকা, স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষৎ ও সাহিত্য-সম্মিলন সকলেই সমস্বরে বাঙ্গালীর সাহিত্যানুরাগ ঘোষণা করিতেছে। কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি সকল বিষয়েই বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট হইতেছে। আরও আনন্দের বিষয় এই, বঙ্গসাহিত্য পাঠ করা দূরের কথা—যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তাঁহারাও আ'জ কা'ল বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী হইয়াছেন। এ দেশের সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল সংস্কৃতভাষার শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ দর্শন কাব্য প্রভৃতির দিকে। পড়িতে হইলে সংস্কৃত পড়িতেন, লিখিতে হইলে সংস্কৃত লিখিতেন। কোনও সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইলে সংস্কৃত কবিতা-প্রণয়ন দ্বারাই তাঁহারা পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেন। এখনও বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণপত্রে সংস্কৃত কবিতার প্রচলনই রহিয়াছে।

এদেশে মুসলমানগণের আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। যে কয়েক খানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ছিল, তাহাও অর্দ্ধশিক্ষিত বা স্ত্রীলোকের জন্য। বৈষ্ণব মহাজনেরাই বঙ্গসাহিত্যের আদর করেন। বুদ্ধদেব এবং তাঁহার

শিষ্যেরা যেমন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃতের বা পালির আশ্রয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব মহাজনেরাও তদ্রূপ বঙ্গভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যখন মুসলমানেরা দেশাধিপতি হইলেন, তখন পারস্য ভাষার চর্চ্চা আরব্ধ হইল। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়া রাজদ্বারে ও সাধারণ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। তখনও বঙ্গভাষার আদর আরম্ভ হয় নাই। এখন যেমন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইংরেজী না জানিলে, কেবল বাঙ্গালা জানিলে, কতকটা মূর্খ বলিয়া গণ্য হন, তদ্রূপ তৎকালে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ পারস্য ভাষা না জানিলে অনেকাংশে মূর্খ বলিয়া গণ্য হইতেন।

এদেশে ইংরাজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গভাষার সমধিক চর্চ্চা আরব্ধ হয়। ইংরেজেরা পারস্যভাষাকে অল্প অল্পে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং রাজকার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার প্রচলিত করেন। মুসলমানেরা স্বীয়ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু খৃষ্টীয়-ধর্ম্মযাজকগণ স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বঙ্গভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সেই হইতেই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির সূত্রপাত হয়। ইংরাজসাহিত্যিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গসন্তান বুঝিতে পারিলেন যে, বৈদেশিক সাহিত্যে কখনও প্রতিভাপ্রদর্শনের সম্ভাবনা নাই। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি, ইংরেজীসাহিত্যিকদিগের উপদেশেই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। তথাপি কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বেও ইংরেজীশিক্ষিত যুবকেরা বঙ্গসাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সম্যক্‌ভাবেই ঔদাসীন্য-প্রদর্শন পরিত্যাগ করেন নাই। এখন কিন্তু সুর অনেকটা ফিরিয়াছে। কি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কি ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, কি রাজা মহারাজা প্রভৃতি গণ্য-মান্য ভূস্বামীগণ, কেহই বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভে উদাসীন নহেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও বঙ্গসাহিত্য মধ্যমশ্রেণীর বাঙ্গালীর হস্তেই ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বা ধনশালী ভূম্যধিকারীরা কখন কখন করুণ-নেত্রে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন বটে, কিন্তু মধ্যমশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সহিত সমবেত ভাবে বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণ-কামে কখনও অগ্রসর হন নাই। বর্ত্তমান রাজশক্তিও বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে অনত্কূল নহে, বরঞ্চ অনুকূল, তবে আশানুযায়ী সহানুভূতি-প্রদর্শন এখনও সময়সাপেক্ষ।

দেশে বঙ্গসাহিত্যের পাঠক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সহিত ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের অভ্যর্থনা অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা একরূপ অশিক্ষিতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের সহিত বঙ্গসাহিত্যেরও প্রসর অনিবার্য্য। জনসংখ্যা গণনা করিলে বঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সমান, সুতরাং স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার বৃদ্ধি পাইলে বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতেই হইবে।

আ'জকা'ল সাহিত্যিক বর্গের মধ্যে দুটী দল হইয়াছে। একদল বলেন যে, বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অনুগামিনী হইবে। অপর দল সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার সংস্রব রাখিতে চাহেন না। আমরা বলি যে, বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখাও সঙ্গত নয়, আবার সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার সংস্রব-চ্ছেদনও সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের যখনই কোনও নূতন ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই আমরা সংস্কৃত ধাতুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। সংস্কৃতভাষা এতই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যে, উহার নিকট আমাদের প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে সমুদয় বৈদেশিক শব্দ বঙ্গভাষার বহুকাল হইতে গৃহীত ও প্রচলিত আছে, সে সমুদায় বঙ্গভাষা হইতে বহিষ্কৃত করা সঙ্গত ও সম্ভব নহে। সংস্কৃতভাষায়ও নূতন শব্দ গ্রহণের কোনও বাধা নাই। প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষায় যে বহু বৈদেশিক শব্দ গৃহীত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বৈদেশিক ভাষা হইতে যখন শব্দ-সংগ্রহ করিতে হইবে, তখন তাহা স্বীয় ভাষানুযায়ী করিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃতভাষা হইতে বঙ্গভাষাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলে, বঙ্গভাষার সহিত গুজরাটি, হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয় গুরুমুখী পর্ব্বতীয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে একজন বঙ্গভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালী, অতি সহজেই ভারতের বঙ্গেতর প্রদেশের সাহিত্য বুঝিতে পারেন, ইহার প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষাই সংস্কৃতের অনুগত।

বঙ্গভাষায় যে সমস্ত কথা আমরা ব্যবহার করি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। মনে করুন, আমি লিখিলাম, "রাম দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলেন।" এ স্থানে ভাষা সংস্কৃতানুযায়ী হইল, কিন্তু ইহাতে কোনও দোষ পরিলক্ষিত হয় না। 'গমন করিয়া ছিলেন' এর পরিবর্ত্তে "গিয়াছিলেন" ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার স্থান ও অবস্থা-বিশেষে 'গমন করিয়াছিলেন' এবং "গিয়াছিলেন" উভয়বিধ প্রয়োগই শিষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু 'গিয়াছিলেন' এর স্থানে কেহ লিখিলেন 'গিছিলেন' কেহ লিখিলেন 'গেছিলেন' কেহ লিখিলেন 'গেছ্‌লেন' ইহা ভাল নয়। এক 'গিয়াছিলেন' যদি এইরূপ বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে, তাহা হইলে পাঠক লেখক এবং শিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। ইংরেজেরা একই শব্দ স্থান-ভেদে বহুবিধ ভাবে উচ্চারণ করেন, কিন্তু লিখিবার সময় সকলেই একরূপ লেখেন। বঙ্গভাষায়ও সেইরূপ হওয়া উচিত। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ বরিশাল, প্রভৃতি প্রত্যেক জেলায় বিভিন্নরূপে একই শব্দ উচ্চারিত হয়। তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু লিখিবার সময় সকল জেলার লোকেরই একরূপ লেখা উচিত। তাহা না হইলে বঙ্গভাষায় বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে। বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট

হয়। যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ বর্ণবিন্যাস করিতেছেন। সত্য, বঙ্গভাষায় মূর্দ্ধণ্য ণ ও দন্ত্য ন এর উচ্চারণের প্রভেদ নাই। অন্তস্থ ব ও বর্গীয় ব উভয়ের মধ্যে আকারগত ও উচ্চারণগত পার্থক্য নাই। তালব্য শ মূর্দ্ধণ্য ষ ও দন্ত্য স ইহাদের প্রায়শঃ উচ্চারণের পার্থক্য নাই। কিন্তু এই প্রভেদ নাই বলিয়াও আমরা শ-ষ-স-কে এক করিতে পারি না, দুটী ব-কে এবং ন-ণ-কেও এক করিতে পারি না। কারণ তাহা হইলে শব্দের মূল ধাতুগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। আজকাল বাঙ্গালা লিখিতে কেহ কেহ 'বাংলা' কেহ 'বাঙলা' ইত্যাদি লেখেন। কিন্তু 'বাঙ্গালা' কথাটী বঙ্গ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং 'বাঙ্গালা'কে 'বাংলা' বা 'বাঙলা' লিখিলে আমরা ক্রমে মূল "বঙ্গ" শব্দের সহিত ইহার সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইব।

বঙ্গভাষার এখন একটী স্বতন্ত্র রচনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জোর করিয়া ইহার পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নয়। সর্ব্বত্রই ভাষার ক্রমবিকাশ হয়। বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশের বিঘ্ন করা কাহারও উচিত নহে। আজকাল অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি, বাঙ্গালা বলিবার সময় বহুতর ইংরেজী শব্দের ব্যবহার করেন; ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের তাহা বুঝাও কঠিন। স্থল-বিশেষ যে ইংরাজী শব্দ বঙ্গভাষায় আনিতে হইবে না এমন নহে, কিন্তু এরূপ বহুলব্যবহার বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে অন্তরায়।

সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে হইলে অনুবাদ-কার্য্য কিছু তই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। কোনও মৌলিক গ্রন্থ কাহারও হুকুমে হয় না। জাপান দেশে এই অনুবাদ কার্য্য দ্বারা জাপানী ভাষা, অল্পকালেই বিশেষ সম্পৎশালিনী হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্য সর্ব্বতোমুখ হওয়া চাই। ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব ও কবিতা লইয়া থাকিলেই সাহিত্যের উন্নতি হয় না। একজন ইংরেজীভাষায় অভিজ্ঞ হইলে তিনি ঐ ভাষার সাহায্যে মানবের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারেন। বঙ্গভাষাকেও ক্রমে ক্রমে ঐরূপ সর্ব্বতোমুখী করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কেবল এক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিলে বাঙ্গালী, সর্ব্বদেশের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবেন। স্কুল কলেজেও ক্রমে বঙ্গভাষার গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। রাজা যখন ইংরাজ, তখন ইংরাজীসাহিত্যের সহিত আমাদের সংস্রব রাখিতে হইবে, (রাখাও শ্রেয়স্কর, কারণ ইংরাজীভাষার সাহায্যেই আমরা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি) কিন্তু দর্শন বিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা বঙ্গভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে না। বর্ত্তমানে পাঠ্যপুস্তকের অভাব আছে সত্য, কিন্তু এই অভাব পূরণকরা কি একেবারে অসাধ্য? বি, এ, এম, এ, বি এস্ সি, এম্ এস্ সি তে যে সকল পাঠ্যগ্রন্থ আছে, তাহার অনুবাদ কি বঙ্গভাষায় হইতে পারে

না? অধ্যাপনায় যে সমস্ত কৃতী বঙ্গসন্তান নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই ঐ সমুদয় গ্রন্থের অনুবাদ করিতে পারেন। কিন্তু অনুবাদ কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান আবশ্যক। সেই সাহায্য কোথা হইতে আসিবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত। প্রতিবৎসর সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত হইলেই এটি বেশ প্রতীয়মান হয় যে, দেশের রাজশক্তি, ধনশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ও বিদ্যাশক্তি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কায়মনোবাক্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কলিকাতায় সাহিত্যসম্মিলনে রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন; দেশের সমস্ত গণ্যমান্য লোকই উপস্থিত ছিলেন। এবৎসরও বর্দ্ধমানের অধিবাসিবর্গের এবং তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ মুখপাত্র মহারাজাধিরাজের আগ্রহ উৎসাহ ও বিনয়ে সাহিত্যসেবীরা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রতি এই যে অনুরাগাতিশয্য—ইহা বঙ্গের ভাবি শুভসূচক।

প্রত্যেক জাতিরই এক একটি নিজস্ব সামগ্রী আছে। আমি বলিতে চাহিনা যে বাঙ্গালী ধনউপার্জ্জনে কিংবা ধনব্যয়ে, শারীরিক বলে কিংবা উদারতায় সদ্ব্যবহারে ভারতীয় অন্যজাতি হইতে অনুন্নত, কিন্তু ইহা স্পর্দ্ধার সহিত বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যচর্চ্চায় বাঙ্গালী ভারতীয় কিংবা পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহেন। সাহিত্য যেমন জাতীয়শক্তির বিকাশক, তদ্রূপ ইহা জাতীয়শক্তির দ্বারা বিকাশিতও, ইহারা পরস্পরাপেক্ষ। যে শক্তি আমাদের নাই, তাহা সাহিত্য দ্বারা আমরা স্বীয়জাতির মধ্যে আনিতে পারিব। কোনও একটী শক্তি, যাহা জাতিগত নহে, তাহাও তজ্জাতীয় ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন হইতে পারে, এবং তৎশক্তিসম্পন্ন পুরুষ, স্বীয় শক্তির দ্বারা সমস্ত জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিলে, সাহিত্যই তাঁহার একমাত্র সম্বল। যাঁহারা পৃথিবীর ইতিহাস ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, জাতীয় অভ্যুদয় ও অধঃপতন তদ্দেশস্থ সাহিত্যের উপরেই নির্ভর করিয়াছে।

টপ্পাগান কি দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবে? না, তাহা বলিনা। টপ্পাগানেরও স্থান আছে। কিন্তু ধ্রুপদও দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গেলে, তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বঙ্গসাহিত্যে আজকাল টপ্পারই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; ধ্রুপদ প্রায় লোকে ভুলিতে চলিল। এখন চিন্তার ও ভাষার তরলতা প্রজ্বল্যমান। প্রত্যেক লেখকেরই একটি মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া "কলম" ধরিতে হইবে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? জগতের

(১) পাঠক অপ্রাসঙ্গিক উক্তির দোষ মার্জ্জনা করিবেন। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, কলম কথাটি পার্শী, কিন্তু উহা সংস্কৃত এবং উণাদি সূত্র ৪।৮৪ তে উহা পাওয়া যায়। উহার অর্থ লেখনী। কলতে কলয়তি বা অক্ষরং প্রকাশয়তি জনয়তি বা কলমঃ। কল্+অম=কলমঃ। সম্পাদক।

সর্ব্ববিষয়ক হিতসাধন; যিনি যেভাবে পারেন। কেহ ধর্ম্মের চিত্রদ্বারা ধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বর্দ্ধিত করেন, কেহ অধর্ম্মের চিত্রদ্বারা অধর্ম্মের প্রতি বিরাগ বৃদ্ধি করেন; কেহ সৌন্দর্য্যের চিত্রের দ্বারা জনমন আনন্দিত করেন, কেহবা কদর্য্যতার চিত্রের দ্বারা কদর্য্যতাপরিহারের উপায় করিয়া দেন ইত্যাদি। এককথায় মনুষ্যের মনুষ্যত্ববৃদ্ধি করাই সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্বের চরম উদ্দেশ্য অনন্তের অনুভূতি। উহা দেশকাল-পাত্রের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। কখনও কোনও লেখকেরই মুখ্য লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে।

বর্ত্তমানে সাহিত্যসম্মিলন কেবল বঙ্গভাষা লইয়াই রহিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃতভাষাও ত আমাদেরই ভাষা। সংস্কৃতভাষার জন্যই বা কেন আমরা উদ্‌যোগী না হই! অনেকে মনে করেন যে, এখন আর সংস্কৃত মৌলিকগ্রন্থ হইতে পারেনা। একথা আমি মানিতে প্রস্তুত নহি। বিগত কতিপয় বৎসর মধ্যেও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পাঠক বোধহয় ৺রামনাথ কৃত "বাসুদেববিজয়" পাঠ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্তের কাব্য, নাটক, স্মৃতি ও দর্শনাদি-বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোধহয় অনেকেই দেখিয়াছেন। এই যশোহরের আঠারখাদানিবাসী মুর্শিদাবাদপ্রবাসী প্রথিতযশাঃ বৈদ্যকুলগৌরব ৺গঙ্গাধর কবিরাজের সংস্কৃত গ্রন্থাদি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর প্রতিভার দীপ এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যসেবি-প্রতিপালক মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান, মহারাজ কাশীমবাজার, মহারাজ নাটোর, মহারাজ সুষঙ্গ, এবং বঙ্গের অন্যান্য ধনী কৃতী সন্তান, যাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থাদি-সংগ্রহে এবং সাহিত্যসেবিগণের উৎসাহদানার্থ মুক্তহস্তে অর্থদান করিতেছেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় স্থির থাকিলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গভূমি, কেবল ভারতের মধ্যে কেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে "সাহিত্যভূমি" বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে।

পরিশেষ আমাদের প্রার্থনা এই যে, যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

১। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক দার্শনিক গ্রন্থাদির অনুবাদের ব্যবস্থা। (ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম্ এ, এম্ এস্ সি, এম্ ডি বি ই পর্য্যন্ত) একার্য্য একদিনে বা এক বৎসরে হইবার নহে। তবে একার্য্য কোনও না কোন সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে। আরম্ভ করিলেই আশা করা যায় যে, ৮।১০ বর্ষ মধ্যে রসায়ন, প্রকৃতিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, খনিবিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যবহারতত্ত্ববিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, পূর্ত্তবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ সমুদয়ের অনুবাদ বহুসাধ্য হইলেও অসাধ্য হইবে না। জাপানে এই সমুদয় গ্রন্থ, জাপানী ভাষায়

অনুদিত হইয়াছে ও হইতেছে সুতরাং বঙ্গভাষায় নাহইবার কারণ নাই। পাঠ্যগ্রন্থ রচিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন অগ্রাহ্য হইবার কারণ নাই। বিদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করা যে কি কষ্টসাধ্য, প্রত্যেক বাঙ্গালী বিজ্ঞানাধ্যাপকই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। এই সব গ্রন্থের অনুবাদের জন্য অর্থব্যয় আবশ্যক, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যদি এই অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে সে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে। যাঁহারা অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় না দিলে ইহা সুসিদ্ধ হইবে না।

২। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ব্যবস্থা। যে সমুদয় গ্রন্থের উপযুক্ত অনুবাদ আছে, তাহা বাদ দিয়া অপর গুলির এবং অনুদিত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইবে। শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ পিত্র, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য, একায়ন, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, গারুড়-বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদের দরকার। বিভিন্ন পরিষৎ স্থাপন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে কালে সমস্ত গ্রন্থই বাঙ্গালী পাঠকের আয়ত্তাধীন হইবে। বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের কর্তৃপক্ষগণ, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গের সমবেত চেষ্টা হইলে যে সমধিক ফললাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। বেদাদি শাস্ত্রের সম্বন্ধে ইউরোপ এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের পণ্ডিত-বর্গ যে সমালোচনা করিয়াছেন, সেই সকল সমালোচনা-গ্রন্থের অনুবাদের ব্যবস্থা।

৪। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় উপাদেয় গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ-ব্যবস্থা।

৫। পালি গ্রন্থাদির অনুবাদ-ব্যবস্থা।

৬। চীন, জাপান, তিব্বত, আরব, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ ব্যবস্থা।

৭। গ্রীক্ ল্যাটিন্ প্রভৃতি প্রাচীন ও ফরাসী জার্ম্মান্ ইংরাজী প্রভৃতি নব্য ইউ-রোপীয় ভাষার প্রধান প্রধান গ্রন্থের অনুবাদ ব্যবস্থা।

৮। সর্ব্ববিষয়ক মৌলিক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থরচয়িতাদিগের পুরস্কার ব্যবস্থা।

অনেকে মনে করিবেন যে, হুকুম প্রচুর হইল, কিন্তু আঞ্জাম করিবে কে? কথাটা খাঁটী। আমরা বলি এই যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী জাতির নিকট ইহা আদৌ কঠিন নহে। বাঙ্গালী না পারে এমন কার্য্য অল্পই আছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত সমবেত জাতীয় চেষ্টা হইলে আগামী ৫০ বৎসরের পরে বঙ্গসাহিত্য স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিলে সমগ্র পৃথিবীর দর্শনীয় হইবে।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক দ্বিতীয় সূক্ত)

ইদং হবির্যাতুধানান্ নদীফেনমিবাবহৎ।
য ইদং স্ত্রীপুমানকরিহ স স্তুবতাং জনঃ॥ ১

পদবোধিনীব্যাখ্যা। ইদং (দীয়মানং) হবিঃ যাতুধানান্ আবহৎ (আগমস্থানাদ্গময়তু, অস্মাৎ স্থানাৎ প্রচ্যাবয়তু ইত্যর্থঃ) তত্র-দৃষ্টান্তমাহ, নদী ফেনমিব, (নদী যথা প্রবাহেণ ফেনং দেশান্তরং প্রাপয়তি তদ্বৎ) ইদং (কর্ম্ম) যঃ (জনঃ) স্ত্রী পুমান্ বা অকঃ (অকার্ষীৎ) স জনঃ ইহ (অস্মিন্ দেশে মৎসমীপে স্থিত্বা) স্তুবতাম্ (স্তুতিং করোতু) (অভিচার-কর্ম্মণো নিষ্ফলত্বেন অনাপ্তকামঃ স মামেব শরণং প্রাপ্য সেবতাম্ ইত্যর্থঃ। অথবা যঃ স্ত্রীপুমান্ বা জনঃ ইদং হবিঃ পরকৃতোপদ্রব-নিবৃত্তয়ে অকার্ষীৎ স জনঃ নিবৃত্তোপদ্রবঃ সন্ স্তুবতাং স্বাং স্তুত্যাদিনা পরিচরতু ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। নদী যেমন ফেনকে স্থানান্তরিত করে, সেইরূপ এই হবিও রাক্ষসগণকে অপসারিত করুক। যে পুরুষ বা যে স্ত্রী (পরকৃত উপদ্রব-নিবারণার্থে) এই কর্ম্ম (হবিঃ প্রদান) করিয়াছেন, তিনি (নিরুপদ্রব হইয়া) (অভীষ্ট দেবতার) স্তুতি করুন। (অথবা যে স্ত্রী বা পুরুষ অভিচার কর্ম্মদ্বারা আমাদিগের উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছে, এই হবির সামর্থ্যে উপদ্রব দূরীভূত হওয়ায় সে নিষ্ফল-মনোরথ হইয়া আমাদিগের শরণাগত হউক্ এবং আমাদিগের স্তুতি করুক।)

॥ এ মন্ত্রে উপদ্রবনাশক হবির কথা বলা হইতেছে। এই উপদ্রবনাশক হবির এমনই মাহাত্ম্য যে, ইহা দ্বারা অনিষ্টকারক যাতুধানগণ নদীস্রোতে বাহিত ফেনের ন্যায় দূরে চালিত হয়। যে ব্যক্তি এই উপদ্রবনাশক হবির্যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তিনি নিরুপদ্রব হইয়া দেবতার স্তুতি করেন। এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে মনে হয়, যে হবি ইন্দ্রাদি দেবতার প্রীতিকর, সেই হবিঃ-প্রদানই এখানকার কর্ম্ম। হবিঃপ্রীণনার্থে আগত ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃকই রাক্ষসগণ তাড়িত হয়। যজ্ঞকারী দ্বারা রাক্ষসতাড়নাকারী ইন্দ্রাদিই স্তুত হন। ইন্দ্রাদির রাক্ষসবিতাড়নই হবির দ্বারা রাক্ষসবিতাড়ন। পক্ষান্তরে অভিচারাত্মক কর্ম্মদ্বারা যে রাক্ষসাদিরূপ নির্ঋতির আবির্ভাব হয়, তাহার প্রতীকারার্থে প্রত্যভিচাররূপ হবির্যজ্ঞের অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। অভিচারের প্রত্যভিচারই হউক্, আর নৈসর্গিক রাক্ষসগণের বিনাশার্থ দেবযজ্ঞীয় হবিঃ-প্রদানই হউক্—ইহার ফল রাক্ষসবিতাড়ন। যজ্ঞকারী দেবতার স্তুতি করুন বা অভিচারকারী প্রত্যভিচারকারীর স্তুতি করুন, উপদ্রবের নিরাস উভয়ত্র সমান।

অয়ং স্তবান আগমদিমং স্ম প্রতি হর্যত।
বৃহস্পতে বশে লব্ধাগ্নীষোমা বি বিধ্যতম্॥ ২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। অয়ং (রাক্ষসপীড়িতজনঃ) স্তবানঃ (স্তুতিং কুর্ব্বাণঃ) আগমৎ (আগতবান্) (অতোহেতোঃ) ইমং (যুষ্মৎসমীপং প্রাপ্তং স্তাবকং জনং) বশে (কৃত্বা) তিষ্ঠ ইত্যধ্যাহৃতেন সম্বন্ধঃ। হে অগ্নিসোমা (অগ্নিসোমৌ (যুবাম্) বিবিধ্যতম্ (তান্ উপদ্রবকারিণঃ বিবিধং

তাড়য়তম্ মারয়তম্) (অথবা অয়ং যাতুধানঃ যুষ্মতঃ অত্যর্থং ভীতঃ সন্ স্তবানঃ স্তুবন্ আগমৎ যুষ্মৎসমীপং প্রাপ্তবান্। ইমম্ আগতং যূয়ং প্রতিহর্যত স্ম অস্মাকং প্রতিকূলমবগচ্ছত, হে বৃহস্পতে! ইমং বশেনয়। তিষ্ঠ, হে অগ্নিষোমৌ ইমং বিবিধ্যতম্ ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। এই রাক্ষসপীড়িত জন স্তুতি করিতে২ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে দেবগণ! আপনারা ইহাকে স্বকীয়রূপে গ্রহণ করুন। হে বৃহস্পতে! আপনি এই ব্যক্তির প্রতি উপদ্রবকারিগণকে বশীভূত করিয়া অবস্থান করুন। হে অগ্নিষোম! আপনারা উপদ্রবকারিগণকে বিবিধপ্রকারে তাড়না করুন। (অথবা হে দেবগণ! এই রাক্ষস, ভয়ে আপনাদিগের স্তুতি করিতে ২ আপনাদের নিকট আসিয়াছে। আপনারা ইহাকে আমাদের 'প্রতিকূল' বলিয়া অবগত হউন্। হে বৃহস্পতে! আপনি ইহাকে বশীভূত করুন, হে অগ্নিষোম! আপনারা ইহাকে বিনষ্ট করুন।)

টিপ্পনী। এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ সংস্কৃত-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য সায়নের শৈলী অনুসরণ করিয়াই দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। 'অয়ং' এবং "প্রতিহর্যত" পদদ্বয়ের দ্বিবিধ অর্থ হইতেই দ্বিবিধ ব্যাখ্যার উদ্ভব। 'অয়ং' পদে রাক্ষস কর্তৃক নিপীড়িত লোক, অন্যপক্ষে রাক্ষস। 'প্রতিহর্যত' পদে একপক্ষে "আপন বলিয়া গ্রহণ করুন" অন্যপক্ষে "প্রতিকূল বলিয়া অবগত হউন"। 'অয়ং' শব্দের রাক্ষস অর্থই সমধিক সঙ্গত। 'অয়ং' ও 'ইমং' অবশ্য একব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত। পূর্ব্বার্দ্ধের এই পদদ্বয়ের দ্বারা যদি রাক্ষসকে না বুঝা হয়, তবে পরার্দ্ধের সহিত ইহার সুন্দর সম্বন্ধ ঘটে না। পরার্দ্ধে বশীভূত করা, ও বিবিধপ্রকারে তাড়না করার কথা থাকায়, সেই সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম অবশ্য রাক্ষসই হওয়া সঙ্গত। পূর্ব্বার্দ্ধের 'অয়ং' 'ইমং' যদি রাক্ষসপীড়িত হয়, তবে 'রাক্ষসান্' পদের অধ্যাহার কল্পনাপ্রাবল্য হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। 'অয়ং ইমং' রাক্ষস হইলে অধ্যাহার নিষ্প্রয়োজন। এ পক্ষ আমরা সুতরাংই শ্রেয়ান্ মনে করি।

যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাং নয়স্ব চ
নি স্তুবানস্য পাতয় পরমক্ষ্যুতাবরম্ ॥৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে সোমপ! (সোমরসপাতঃ! অগ্নে) যাতুধানস্য (রাক্ষসস্য) প্রজাং (সন্ততিং জহি) (নাশয়) (অস্মৎপ্রজাং) নয়স্ব (অভিমতফলং প্রাপয়স্ব) চ (অপিচ) স্তুবানস্য (ভীত্যা স্তুবতঃ রাক্ষসস্য) পরং (দক্ষিণং) অবরং (বামঞ্চ) অক্ষি উত (অপি) নিপাতয় [স্বস্থানাৎ প্রচ্যাবয় বিনাশয় ইত্যর্থঃ।]

বঙ্গানুবাদ। হে সোমপ! রাক্ষসের সন্ততি বিনাশ করুন। [আমাদিগের সন্ততিকে] অভিমত ফল প্রদান করুন। যে রাক্ষস [আপনার ভয়ে ভীত হইয়া] আপনার স্তুতি করিতেছে, তাহার দক্ষিণ ও বামচক্ষু উৎপাটিত করুন।

টিপ্পনী। সায়ন আচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারেই সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। চিন্তাকরিলে প্রতীত হয়, 'নয়স্ব' পদের সহিত অন্বয় করিবার জন্য 'অস্মৎপ্রজাং'

অধ্যাহার করিতে হইয়াছে, কিন্তু নিকটে 'স্তবানস্য' পদটী বিদ্যমান, তাহার সহিত অন্বয় করিলেই অর্থসঙ্গতি হয়। রাক্ষসগণ দেবতার শত্রু। দেবতারা রাক্ষসগণের সন্ততিবর্গের বিনাশ করিবেন, আর 'স্তবান' বা স্তোত্রকারী ব্যক্তিগণের সন্ততিবর্গের অভিমতফল সাধন করিবেন, ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা। শেষাংশে 'হে দেব! অঙ্গী শোভনসেজঃ ত্বং অবরং নিকৃষ্টং পরং শত্রুং নিপাতয়" অর্থাৎ হে শোভনময়ন সোমপানকারী দেব! আপনি নিকৃষ্ট শত্রুগণকে নিপাতিত করুন। এইরূপ অর্থ করিলে কোনই অসঙ্গতি থাকে না। কাজেই আচার্য্যের ব্যাখ্যার যোগ্যতা চিন্তনীয় মনে হয়। 'সোমপ' সম্বোধনে দেবতার পরিচয় নাই, কেবল যোগার্থে সোমপানকারী বুঝা যায়। সায়নের মতে সোমপ এখানে অগ্নি। বোধহয়, চতুর্থ মন্ত্রে লক্ষ করিয়াই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যত্রৈষামগ্নে জনিমানি বেত্থ গুহা সতামত্রিণাং জাতবেদঃ।

তাং স্বং ব্রহ্মণা বাবৃধানো জহ্যেষাং শততর্হমগ্নে॥৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে জাতবেদঃ! গুহাসতাম্ (গুহায়াং নিবসতাম্) অত্রিণাম্ (অদনশীলানাং) এষাং (রক্ষসাম্) যত্র (যস্মিন্ স্থানবিশেষে) (বিদ্যমানানি (জনিমানি) জন্মানি (বেত্থ) জানাসি (অতঃ) হে অগ্নে! ত্বং ব্রহ্মণা (বেদমন্ত্রেণ) বাবৃধানঃ (বর্দ্ধমানঃ) তান্ (তত্স্থানস্থিতান্ রাক্ষসান্) জহি (নাশয়) তথা এষাং (রাক্ষসানাং) শততর্হং (শতপ্রকারং বহুবিধম্ হিংসনং) নিবর্ত্তয়। (যথা ব্রহ্মণা পরিবৃঢ়েন অস্মাভিঃ দত্তেন হবিষা বর্দ্ধমানঃ ত্বং তান্ অত্রিণঃ এষাং রাক্ষসানাং যথা জাতানি পুত্রপৌত্রাদিরূপাণি জন্মানি চ শততর্হং বহুশো হিংসনং ভবতি যথা তথা জহি ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে জাতবেদঃ! গুহাবাসী সর্ব্বভক্ষক রাক্ষসগণের যেস্থানে জন্ম তাহা আপনি জানিতেছেন; অতএব হে অগ্নে! আপনি বেদমন্ত্র দ্বারা বা মন্ত্রপূত হবিঃ দ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া তৎস্থানস্থিত (জন্মভূমিস্থ) রাক্ষসগণকে বিনাশ করুন এবং রাক্ষসগণের (কৃত) শতপ্রকার হিংসন নিবারণ করুন।

টিপ্পনী। সংস্কৃতব্যাখ্যায় আমরা যে রীতির অনুসরণ করিয়াছি, তদনুসারে "হে অগ্নে আপনি রাক্ষসগণকে এবং তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদিকে বহুবিধহিংসনপূর্ব্বক বিনাশ করুন" এরূপ বঙ্গার্থ হইতে পারে। "অগ্নি রাক্ষসগণের জন্মস্থান অবগত আছেন, অতএব অগ্নি তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন" বলিলে, মনে হয়, রাক্ষসগণের জন্মভূমি আক্রমণ করিতে বলা হইতেছে। 'জনিমানি' অর্থ "পুত্রপৌত্রাদিরূপাণি জন্মানি" হইলে রাক্ষসগণের এবং তাহাদের পুত্রপৌত্রাদির বিষয় অবগত থাকা ও তাহাদের বিনাশের কথাই বলা হয়। জনিমানি অর্থ কিন্তু 'গৃহাণি' হয়। অগ্নি রাক্ষসগণের গৃহ অর্থাৎ বাসস্থান অবগত আছেন, সুতরাং অগ্নি তাহাদিগকে বিনাশ করুন, এবং তাহাদের কৃত হিংসন নিবারণ করুন—এ ব্যাখ্যায়ও দোষ নাই। রাক্ষসগণ এখানে 'গুহাসৎ' বলিয়া কথিত, গুহাসৎ অর্থ যাহারা পর্ব্বতগহ্বরে অবস্থান করে। এ রাক্ষসগণের রাবণরাজার লঙ্কাপুরীর মত উন্নতপ্রণালীর পুরাদি ছিলনা। ইহারা পর্ব্বতগহ্বরে, বনে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে

বাস করিত। এখানে ইহাদের সত্তা মনে করিবার অনুকূল বর্ণনা পাওয়া যাইতেছেনা।

প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক দ্বিতীয়সূক্ত সমাপ্ত।



মনোবিজ্ঞান-বিষয়িনী নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮) সমকালীন প্রবৃত্তি-নিচয়ের এই একাধিকত্বকে সমকালীন সম্ভাবনার একাধিকত্বরূপে অনুভব করিতে না পারিলে নৈতিক বিচারের সুযোগ হয় না। আমি এই দুইটী শব্দের প্রত্যেকটীই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিব। (ক) প্রবৃত্তি গুলি "আপনার মধ্যে" সমকালীন হওয়া আবশ্যক; এবং (খ) "আমাদের নিকট" তাহাদের প্রত্যেকটীরই সম্ভাবনা রূপে প্রকট হওয়া প্রয়োজন।

(ক) সেখানে (মনে) যদি উহারা (প্রবৃত্তিদ্বয়) একত্র হইয়া উদিত না হয়, তবে যেটীর প্রথমে উদয় হইবে, সেইটী বেশ মুক্ত অবস্থা পাইবে; সেটী অচিরাৎ ফলোপধায়ক হইয়া উঠিবে। একটী দেশলাই হইতে অগ্ন্যুৎপত্তি বন্ধ হইল; কেননা, অন্য একজন দাবিদার দেশলাইটী হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যতক্ষণ অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া দুইটী দেশলাইয়ের মধ্যে কোন্‌টীতে ভাল ভাবে অগ্নি জ্বালা যাইবে এ মীমাংসা না করিয়া দেন, ততক্ষণ অগ্ন্যুৎপত্তি হয় না। যে বস্তুদ্বয়ের মধ্যে তুলনা করা হয়, সেই বস্তু যদি একই সময়ে মনের মধ্যে উদিত না হয়, তবে তুলনা অসম্ভব হইয়া উঠে। যে বস্তুটী আমাদের মনের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, আমরা সে বস্তুটীকে নির্ব্বাচন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না; কেননা, যখন আমরা নির্ব্বাচন করি, তখন সেই জিনিষটীর কথাই আমরা ভাবিয়া থাকি। এ কথাটী সহজ হইলেও, অধুনা প্রচলিত মনস্তত্ব ইহার মধ্যে একটু সন্দেহ করিয়া বসে। নির্ব্বাচন-প্রণালীর ব্যাখ্যা-কালে এক্ষণকার মনস্তত্ব, পদার্থগুলিকে সমকালীন রীতির পরিবর্ত্তে ক্রমিক রীতিতে বিন্যস্ত করিয়া থাকে। ইহা আমাদিগকে জ্ঞাপন করে যে, সংশয়-স্থলে একটী দ্বিতীয় প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, উহা প্রথমটীর ঔপক্রমিক ধারণাকে রোধ করে এবং অধিকারচ্যুত করিতে চাহে। এই দুইটী প্রবৃত্তির মধ্যে কখন এইটীর; কখন অপরটীর সহকারী ভাবের দল আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে প্রবল দল, দুর্গ আক্রমণ করে এবং দুর্গ বশীভূত হইয়া পড়ে। যদি এই সংগৃহীত দল প্রায় সমান সমান হয়, তবে জয়-পরাজয় অনেকক্ষণ আন্দোলিত হইতে থাকে। তখন দর্শক (জয়-পরাজয় সম্বন্ধে) সন্দেহ-জনিত উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করে। কিন্তু এ টুকু তাঁহারই (দর্শকের) অজ্ঞতা; বাস্তবিক কোন অনিশ্চয়তা নহে। যিনি সূক্ষ্মদর্শী, যিনি ঘটনার যাবতীয় ব্যবহারিক উপাদানগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে সক্ষম

তিনি আবশ্যকীয় ঘটনায় রৈথিক শৃঙ্খল প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন। এইরূপে, আমরা যাহাকে "সমকালসম্ভূত প্রবৃত্তি নিচয়ের তুলনা" বলিয়া বুঝি, তাহা শেষে "ক্রমিক বৃত্তির বিকম্পন" বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উভয় স্থলেই বৃত্তিগুলি স্বতঃই কার্য্যকরী হইত; কিন্তু হইতে পারে না; কেননা, একটীর বর্দ্ধিষ্ণু গতি-জনক পরিবর্ত্তন, অন্যটীর ঐ প্রকার পরি-বর্ত্তনে সবলে বাধা দিয়া থাকে।" (মিঃ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মনস্তত্ত্ব ৪র্থ খণ্ড, ৯ম অঃ দ্রষ্টব্য)। দুইটী বিরোধী মাংস-পেশীর ন্যায় উহারাও (প্রাগুক্ত প্রবৃত্তিচয়) একত্র কার্য্য করিতে পারে না; ইহার ফলে "একটী অচিরস্থায়ী সাম্যাবস্থা" দেখা দেয়। এই সময়ে উপরোক্ত প্রবৃত্তির প্রত্যেকটীর পক্ষের অনুকূল ভাবাদি সমবেত হইতে থাকে। পরে, দুইটী দলের একটীতে সমবেত শক্তির আধিক্য হওয়ায়, ঐ সাম্যাবস্থার বিলোপ ঘটে এবং তখনই কার্য্য আরব্ধ হয়। এই বিশ্লেষণটী ব্যাঘ্র সম্বন্ধে বেশ উপযোগী। একটী ব্যাঘ্র যখন একখানি মাংসগ্রন্থি উপভোগ করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট হইতে উহা বলপূর্ব্বক লইতে চাহিলে, ক্ষুধার স্থানে ধাঁ করিয়া তাহার ক্রোধ আসিয়া দেখা দেয়। তখন মুহূর্ত্তের জন্য সে খাদ্য ভুলিয়া শত্রুর চিন্তা করে। কিন্তু মাংস খানি অপহৃত হইবার আশঙ্কা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেই কিম্বা আর একবার উহার আঘ্রাণ পাইলেই সে পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হয়। আহার করিতে করিতে আবার ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠে। ইতর-জীবের যাবতীয় আত্ম-বিরুদ্ধ স্বতঃ—সম্ভূত প্রবৃত্তিনিচয়ের স্ফুরণে এবম্প্রকার পর্য্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পর্য্যায় উহাদের উত্তেজনার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও প্রত্যাবর্ত্তনের পরক্ষণেই ঘটে। উহার সংঘটন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে; উহার মূলে কোন প্রকার অভিসন্ধি বিদ্যমান থাকে না। তাহারা "অচিরস্থায়ী সাম্যাবস্থার" একটা বিপর্য্যাস অনুভব করে মাত্র এবং (সঙ্গে সঙ্গে) চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু আত্মজ্ঞানী মানবীয় রীতির পক্ষে এবং ন্যায়-বিচার ও প্রলোভনের তুমুল সংঘাতে ঐ (ইতরজীব-সুলভ) প্রকৃতি খাটে না। যদি খাটিত, তাহা হইলে তুলনা, সংশধা-রণা, নির্ব্বাচন, মনন প্রভৃতি শব্দগুলি নিরর্থক হইয়া উঠিত। সংক্ষেপতঃ, এত-দ্বিষয়ে আমাদিগের বেশ সুস্থ, স্বাধীন মনস্তত্ত্বের শৃঙ্খলাযুক্ত নিয়মাদি নাই। এ সম্বন্ধে আমরা যে মনস্তত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহা শারীর-স্থান-বিদ্যা বিষয়ক অনুমানের ক্রীতদাস। এই দাস অর্দ্ধ বিশীর্ণ হইয়া উহারই কবলে (Ergastula) বিদ্যমান আছে এবং প্রচুর আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। অতএব, নৈতিক-বিচার-পক্ষে প্রবৃত্তিনিচয়ের একাধিকতা ও সমকালীনতা একান্ত আবশ্যক।

[খ] উহাদের (প্রবৃত্তিদ্বয়ের) প্রত্যেকটীরই আমাদের নিকট সম্ভব হওয়া চাই; অর্থাৎ, উহাদের কোন্‌টী আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব; তাহা উহাদের উপর নির্ভর না করিয়া আমাদের উপরই

নির্ভর করিবে। কথিত হয় "হাঁ, উহা আমাদিগের উপর নির্ভর করে"; কিন্তু "আমার" শব্দটীতে আমি কি বুঝিয়া থাকি? [উহাতে] মাত্র আমার বর্ত্তমান চরিত্র বুঝি। এই চরিত্র উত্তরাধিকার, স্বভাব, ভূয়োদর্শন, গঠিত অভ্যাস এবং আত্ম-সংযমে প্রস্তুত। আমাদিগের প্রত্যেক মীমাংসাই অতীতের এই সমষ্টির ফল। এই সমষ্টির সহিত বর্ত্তমানারিক্ত বহির্ম্মুখীন উদ্দেশ্যচয়ও সংশ্লিষ্ট থাকে। দ্বিতীয়টীকে যদি আমরা প্রদত্ত বিষয় রূপে মনে করি, তবে প্রথমটীর হস্তে কর্ত্তৃত্ব যাইয়া পড়ে এবং এই প্রথমটীর নামই "চরিত্র" অর্থাৎ "আত্ম", ইহাই মীমাংসা করিয়া থাকে। আমাদিগের "আত্মন্"ই নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। আমি একথা অস্বীকার করিনা যে, আত্মন্ বলিতে অনেকগুলিকে বুঝায় এবং নির্ব্বাচন-কার্য্যে উহাদের প্রত্যেকটীরই প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাতে অন্তর্জ্জনিত প্রবৃত্তি বুঝায়,—পশুগণ ইহাদ্বারা পরিচালিত হয়; ইহাতে আচরণের দৃঢ়তা বুঝায়, সজ্ঞমেচ্ছায় ইহা প্রকাশ পায়; ইহাতে পূর্ব্বগঠিত স্বভাব ও চিন্তা—ধারণাও বুঝায়। আমার এ বিষয়েও সংশয় নাই যে, ঐগুলির একটী সুনিপুণ নিরূপণ দ্বারা আমরা বেশ পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারি যে, কিরূপে আমাদের চরিত্র-প্রতিজ্ঞার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু আমি একথা স্বীকার করিতে পারি না যে, আত্মন্ বলিতে মাত্র ঐগুলিকে বুঝায় এবং ঐ গুলিতেই আত্মনের যাবতীয় প্রকৃত ও সত্বর কার্য্যচয় প্রকাশিত হয়। আমি ঐ সকল ফলের সমষ্টি। উহা ব্যতীতও আমাতে আর একটী বস্তু আছে; সেটী আধ্যাত্মিক সত্তা (personal causality)। যখন আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ঘটনাগুলি আমাদিগকে তাহাদের পরিচয় দেয়, তখনই আমরা উহার (আধ্যাত্মিক সত্তার) অনুভব করিয়া থাকি। এই বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে আমাদিগের ধারণা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া অভিযুক্ত হইবে। যাঁহারা বলেন যে, বাস্তব ও ভাসমান, ক্ষণিক হৃদ্গত বিকার ও ধারণার সমষ্টি ব্যতীত আত্মন্ শব্দে আরও কিছু বুঝিতে হইবে—তিনি তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকেন।"—(op. cit. p. IV. chap. IX) যখন তিনি আমাকে বলেন—"তুমিই তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকর (phenomenon)" আমি উত্তর করি—"না, (উহা আমি নই) উহাই আমার, এবং কার্য্যতঃ আমিই উহা সৃষ্টি করি, উহা আমাকে সৃষ্টি করে না।" এরূপ ক্ষেত্রে,—তিনি কি করিয়া আমার ভ্রম প্রদর্শন করিবেন? আমি পরিবর্ত্তনশীল হৃদ্গত বিচারনিচয়ের মধ্যে সনাতন পুরুষ এবং আমি যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা, আমি ভিন্ন-কার্য্যের ক্ষণিক ফল নহি; তিনি কিরূপে আমার এবম্বিধ আত্ম-জ্ঞানের অপলাপ করিবেন? (মনোবৃত্তির) শক্তিগুলির মধ্যে তুলনা করিবার নিমিত্ত নিয়ম উদ্ধৃত করা বৃথা। মনে করিতে হইবে যেন ঐ কার্য্যানুযায়ী যুক্তির সামঞ্জস্যও বিদ্যমান আছে। ঐরূপ তুলনা করিতে গেলে, একটা বিচার্য্য বিষয়কে অন্যথারূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। সে বিচার্য্য বিষয়—মূল-বিজ্ঞান

ও নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপত্ব। আমি একথা স্বীকার করিতে পারিনা যে, যাহাতে মানব-মনের একটা বিকল্প স্থিরীকৃত হয়, তাহাতেই একটী গতিশীল পদার্থের পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যখন আমি আমার নিজের কার্য্যের বিচার করি, তখন আমি নিশ্চয় করি যে "উহা আমার।" এরূপ নিশ্চয় হইবার সময় ইহা মনে করিনা যে, উহার আবশ্যকীয় পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব আমার চরিত্রগতই ছিল এবং কাজে কাজেই উহার উপায়ান্তর ছিলনা। কিন্তু তখন (নিশ্চয় করিবার সময়) মনে করি যে, উভয়দিকের বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেলে যখন মাত্র [বিবেকের] "রায় প্রকাশ" হইতে বাকী, তখনও সেই গুরুতর মুহূর্ত্তে আমি ভিন্ন প্রকার কার্য্য অবলম্বন করিয়া বসিতে পারি। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জীবিত মনস্তত্ত্ববিদ্ (Sid wick's Methods of Ethics, chap. V, arti 3. p. 64, 3rd ed. See also word's Examination of spencer's psychology. part IV. p. 9) বলিয়াছেন যে,—" সমুদয় কার্য্যেই নানাপ্রকার বিকল্প আছে এবং সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতসারে ঐ বিকল্পের মধ্য হইতে কোনটীকে যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লই। এরূপস্থলে আমি নিশ্চয়ই ধারণা করিতে পারি যে, আমার গত জীবনে অন্যায়পথে চলিবার ইচ্ছা থাকিলেও এবং সে ইচ্ছা তখন খুব ফলবতী হইলেও এখন আমি যথার্থপথে চলিব। অতএব নৈতিক বিচারানুসারে দুইটী সম্ভাবনার মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার—আত্মনেরই প্রাপ্য। এই আত্মনের সহিতই নৈতিক বিচার সংশ্লিষ্ট।

যদি আমরা মনে করি যে, আমরা যেন মল্ল-ভূমি, এই ভূমির উপর ঐ সকল বিসদৃশ ভাব (Suggestion) প্রকটিত হইয়া আপন আপন শক্তি পরীক্ষা করে এবং পরিশেষে একটী অন্যটীকে পরাভূত করিয়া জয়-চিহ্ন স্থাপন করিয়া বসে। যদি আমরা এরূপ মনে করি, তবে ঐ সংঘর্ষের ফলাফলের জন্য আমরা কখনই আমাদিগকে প্রশংসা বা নিন্দার ভাজন মনে করি না। এই সংঘর্ষের পরিণাম দেখিবার নিমিত্ত আমরা অনুরাগ সহকারে সম্ভবতঃ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারি। আমরা ঐ প্রভুদিগের (ভাব গুলির) মধ্যে কোন একজনের সহগামী হইবার ইচ্ছাও করিতে পারি। সহগামী হইলে, হয়তো দেখিতে পাই যে, উহাঁর অধীনেও আমাদিগকে ন্যূনাধিক ইতর-কার্য্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেটীও—গোলামী (Servitude)। তখনও আমরা আপদ্‌গ্রস্ত। তখন আমরা আমাদিগের উপর সহানুভূতি করিয়া থাকি, কিন্তু ভর্ৎসনা বা অত্যন্ত ঘৃণা করি না। যে সকল প্রবৃত্তি দ্বারা আমরা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠি, তাহাদের সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ—তাহার বিপর্য্যয়ই উপরোক্ত স্থলে অপরিহার্য্য। আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, আমরা ঐ সকল প্রবৃত্তির প্রভু, আমরা উহাদের দাস নহি; তাহাদিগকে আমাদিগের স্থানে আনিতে হইবে, আমরা তাহাদিগের নিকটে যাইব না; আমাদিগের আর একটী বিষয় তখন অপরিহার্য্য হয়, অর্থাৎ তখন আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, উহারা (প্রবৃত্তি নিচয়) আমাদিগের

উপর উহাদের বল-বিজ্ঞানানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিবে না, বরং আমরাই উহাদের উপর প্রভুত্ব করিব এবং উহাদিগের যথার্থ আয়ত্তীকরণ দ্বারা আমাদিগের ইচ্ছার অন্তর্বল ও সুক্রমিকতা প্রকাশ করিব। প্রভুত্ব করিবার মূলীভূত কারণত্ব টুকু উহাদিগকে না দিয়া আমরাই গ্রহণ করিব। যখন গবাদি পশুগুলিকে বিক্রয়ার্থ হাটে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন দুই পার্শ্বে দুই ব্যক্তি লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যায়। উহাতে পশুগুলি ঠিক্ পথে যাইতে বাধ্য হয়। আমাদিগের উপরেও বিপরীত প্রবৃত্তি, দক্ষিণ ও বাম দিক্ হইতে [অর্থাৎ বিপরীত ভাবে] মাত্র স্ফুরিত হইয়া আমাদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেই বুঝিতে হইবে না যে, বাধ্যতা-জ্ঞান ঐ স্ফুরণের অন্তর্ভূক্ত। এই স্ফুরণ আত্ম-বিচারের সহিতও সঙ্গত নহে। যে সকল প্রবৃত্তির আকর্ষণনিচয় আমাদিগের উপর আসিয়া পড়ে, আমরা স্পষ্টতঃ উহাদিগকে মাত্র ঘটনাবলী (Phenomena) বলিয়াই অনুভব করি। আর বেশ বুঝিতে পারি যে, উহারা যেন একটা ব্যক্তিত্বের সম্মুখে নীত হয়। এই ব্যক্তিত্ব একটী ঘটনা বা ঘটনাশ্রেণীর অতিরিক্ত বস্তু। ইহা একটী স্বাধীন ও বিচার-ক্ষম আত্মা। আমাদিগের কাছারিতে যে সকল দাবিদার উপস্থিত হয়, এই আত্মা, তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া দিতে এবং উপস্থিত কোন কঠিন বিষয়ের ব্যবহার করিতে সক্ষম।

এই প্রমাণ-হীন ধারণাটী আদৌ সত্য কিনা, কিম্বা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে ইহার বাতিল হইতে পারে কিনা, এক্ষণে আমরা তাহার মীমাংসা করিব না। উহার রহস্যময় পেঁচের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা ও নির্ব্বন্ধ (Liberty and necessity) এতদুভয়ের বিচার অনুসরণ করিবার অভিপ্রায়েও আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে এই বিকল্পিত বিষয়টীর আলোচনা করিব যে,—হয় "স্বাধীন ইচ্ছা" একটী প্রকৃত তথ্য, নয় "নৈতিক বিচার" একটী ভ্রান্তি। কর্ম্ম-কর্ত্তার (agent) প্রভুতা অন্যের উপর আছে—এবম্বিধ বিশ্বাস যদি আমরা না করিতে পারি, তবে আমরা কোন কার্য্য বা চিন্তার ভাবকে কখন নিন্দা করিতে পারি না। কর্ম্ম-কর্ত্তার স্বভাব, শিক্ষা বা অবস্থার আমরা যে পরিমাণে বিশেষ ভাবের তারাধিক্য অনুভব করিব এবং যে পরিমাণে আভ্যন্তর নির্ব্বন্ধের নিকটে আসন্ন উপসর্পণ বুঝিতে পারিব, আমরা তদনুরূপে তাহাকে (কর্ম্ম-কর্ত্তাকে) দায়ী জীব অপেক্ষা বরং প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব এবং তাহার উদ্‌ভ্রান্তিনিচয়কে "পাপ" মনে না করিয়া "পীড়া" বিবেচনা করতঃ তদনুরূপ ব্যবহার করিব। কোন অপরাধের শাস্তি-ব্যবস্থা করিবার সময়ে প্রবল লোভের বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা বিবেচনা করা হয়, ইহাই সাধারণ বিধি। এই বিধিতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেকেরই দমন-শক্তি আছে; ঐ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু কখন কখন অত্যাকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যাহা বিশুদ্ধ

হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিবার চেষ্টায় কিম্বা একটী কল্পনাকে নিখুঁত করিবার সঙ্কল্পে, আমরা যেরূপ সমবায়-বিধির অধীন হইয়া থাকি, আমাদিগের নৈতিক সমস্যায় আমরা যদি উহার ঐরূপ অধীন থাকিতাম, তবে আমরা অবসন্ন স্মৃতি বা অনুর্ব্বরা কল্পনার প্রতি যেরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকি, অন্যায় ইচ্ছার প্রতিও নিশ্চয়ই সেইরূপ করিতাম। যাহারা মনুষ্যকে মাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের কর্তৃত্বাধীনে আনিতে চাহে, তাহাদিগের কর্তৃক ইহা সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাহারা বলে, সূর্য্যোদয়ে হর্ষ প্রকাশ করা কিম্বা বৃষ্টিপাতে ক্রোধান্বিত হওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন, নিন্দাস্তুতি-প্রয়োগও তদ্রূপ অসঙ্গত। তাহারা বলে, প্রভেদ মাত্র এই টুকু যে, মানুষ ভাবীকালের পক্ষে ব্যবহারোপযোগী এবং উহাদিগের সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করি তাহার প্রভাব উহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম। অপর পক্ষে, [প্রাকৃতিক] মূলতত্ত্ব সেরূপ নহে। অতএব যাহা প্রশংসা-যোগ্য নহে তাহার প্রশংসা করিয়া কিম্বা যাহা নিন্দার্হ নহে তাহার নিন্দা করিয়া, একটা অসঙ্গতি ঘটান আমাদিগের পক্ষে ন্যায়-সঙ্গত হইলেও হইতে পারে; কেননা উহা দ্বারা উত্তরকালে উপকার হইবার সম্ভাবনা। নৈতিক মতগুলি আমাদিগের গত জীবনের উপর শাসনবাক্য-স্বরূপ। এরূপ ধারণার পরিবর্ত্তে নৈতিক মতকে যদি ভবিষ্যতের পূর্ব্ববিধানকারী কার্য্য-কৌশলে পরিণত করা যায়, তবে তদ্দ্বারা নৈতিক মতকে স্পষ্টরূপে পরিত্যাগ করাই হয়। এবং উহাতে এই কথাই স্বীকার করা হয় যে, অতিপ্রয়োজনীয় কার্য্য-কারণ-ভাব-বাদ ও নৈতিক মত—এ দুইটীর যুগপৎ বিদ্যমানতা অসম্ভব।

অধ্যাপক সিজ্‌উইক্ যে সকল বাদ-প্রতিবাদ-জনক প্রশ্নের অনুশীলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অভ্যাস-সিদ্ধ ন্যায়-পরতা এবং সম্পূর্ণরূপে পক্ষাশ্রয়ী সিদ্ধান্তের অনধীনতা দেখাইয়াছেন। যদিও আমি তাঁহার ঐ সকল গুণের ভূয়সী প্রশংসা করি, তথাপি আমার ধারণা এই যে, তিনি এই গুণটীকে অসঙ্গত উদার অবস্থায় চালিত করিয়াছেন; কেননা, স্বাধীন ইচ্ছার অনিবার্য্যতা জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি কার্য্য-কারণাত্মক (Determinist) সমস্যার মধ্যে বিচার্য্য বিষয়টীর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সমস্যা, নীতিশাস্ত্র মতের পক্ষে উদাসীন এবং এই শাস্ত্রানুষ্ঠানে উহার প্রভাব কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হয় না। কার্য্য-কারণ-ভাবটী যাবতীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভুতা করিতেছে। যে সকল তলদেশদর্শী কার্য্য-কারণ-ভাববাদী পূর্ণমাত্রায় এতদ্ভাবপ্রস্ত, আমি তাঁহাদিগের মত হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি এবং মনে মনে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাও করি। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, "সার্ব্বভৌম স্বীকার্য্য বিষয়" স্বরূপ উহা মানবীয় জ্ঞানের অদম্য ঘটনাবলীর মধ্যেও পূর্ণবিক্রমে প্রকট হইয়া থাকে। চিন্তাশীল নীতিবিৎ, বিকল্পবিহীন বিধি হইতে তাঁহার অধিকারটুকু মুক্ত করিতে চান; আমি ইহার এই বলবৎ দাবী অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু উহাদের পার্থক্য-গহ্বরটীকে

এমন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা যায় যে, উহা অতিক্রম করা বা পূর্ণ করিয়া ফেলা কার্য্যতঃ আর ফলোপধায়ক হয় না; উহাদের যে মধ্যবর্ত্তী ভাবে এবম্বিধ কল্পনা প্রসূত হইয়া থাকে, আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমি এই কথা স্বীকার করি বটে যে, কার্য্যের নিষেধ ও বিধির ব্যবস্থা-সহ একটা বাহ্যসংহিতা প্রণয়ন করিতে বসিলে দুইটী মতের কলাবৈক্য বড় অধিক দেখায় না; কেননা, এ কার্য্যে আমরা 'সমাজের' বাহ্য সম্বন্ধ ও মঙ্গলনিচয়ই দেখিয়া থাকি, আভ্যন্তর জীবনের প্রতি দৃষ্টি করি না। (সমাজের) যান্ত্রিক রচনার পরিবর্ত্তে যখন তুমি এই যন্ত্রের কার্য্যকরী সজীব শক্তির বিষয় ভাবিয়া থাক, ইহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে যে প্রবর্ত্তক হৃদয়-ভাব ও বিশ্বাস গুলির আবশ্যক—যখন তুমি সেই গুলির চিন্তা কর, তখন দায়িত্ব, বাধ্যতা, সদসৎ 'গুণাগুণ' 'ন্যায়পরতা', যথোচিত 'প্রতিফল', প্রশংসা ও নিন্দা—ইহাদের ভাবগুলিকে দূরীভূত করিয়া দেওয়া বা আমাদিগের জন্য অস্বাভাবিক (Non natural) অর্থযুক্ত করিয়া রাখা কার্য্যটী কি গুরুতর নহে? অধ্যাপক সিজ্‌উইক্‌ও গুরুতর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ পরিবর্ত্তনবশতঃ নৈতিক জীবনের বল-বিন্যাসে কোন পার্থক্য ঘটে না, এমত ধারণা করা যাইতে পারে কি? আমার মনে হয়, ঐরূপ স্থলেও তুমি তোমার সামাজিক নীতিশাস্ত্ররূপ যন্ত্র স্থাপন করিলেও করিতে পার, উহার জন্য পুরিকার পুরিজ্জন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পার। নির্ম্মাণ করিয়া হয়তো আশা করিতেছ যে, এক্ষণে এই যন্ত্রের বিপুল চক্র ঘুরিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু যে স্রোতোবেগে তোমার যন্ত্র পরিচালিত হইবে, তাহা তুমি অন্য দিকে ফিরাইয়া দিয়াছ; বারিরাশি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে এবং তোমার যন্ত্রটী তীরভূমিতে অকর্ম্মণ্য হইয়া নীরবে দণ্ডায়মান আছে!

অতএব, নৈতিকবিচারে নৈতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বাহ্য—সংযোগাভাব বুঝিতে হইবে না। আভ্যন্তর সঙ্কেত ও কার্য্যোৎসগুলি স্বাধীনার হইয়া দাঁড়াইলে তাহাদিগের মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার আবশ্যক হয়। উহাতে ঐ নির্ব্বাচন-ক্ষম ব্যক্তিগত শক্তির বর্ত্তমানতাই বুঝিতে হইবে।

আমাদিগের নৈতিক বিচারের বিষয়ীভূত পদার্থ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা এতদ্‌বিবরণে সম্পূর্ণরূপে বলা হইল। এই পদার্থনিচয় মূলতঃ আমাদিগের আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট কার্য্যের আভ্যন্তর বিধি। আমাদিগের স্বেচ্ছা, ইহাদিগের নির্ব্বাচন বা নিবারণ করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

বধদণ্ড।

শাসনের উদ্দেশ্য শোধন। সংযমের—নীতির—ধর্ম্মের সুখারোহ মার্গ হইতে কর্ম্মদোষে যাহার পদস্খলন হয়, যথোচিত শাসন-সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সেখানে পুনঃস্থাপন করাই হিতৈষী শাসকের অভিপ্রেত। শাসকের ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতেই বড়ই কঠোর, বড়ই অপ্রীতিকর, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করাযায়, উহার প্রাণের ভিতর স্নেহের ফল্গুধারা—প্রেমের মঙ্গল উৎস বিরাজমান। শাসক বিশ্বমঙ্গলের উপাসক। গলিত স্খলিত দূষিত অংশের যথাসাধ্য সংশোধন পরিবর্ত্তন সাধন দ্বারা আরোগ্য-বিধানই শাসকের পরম কর্ত্তব্য। শাসক স্বার্থের দাস নহেন। শাসক কর্ত্তব্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাই শাসনে কর্ত্তব্যপালনের সঙ্গে বিশ্বমঙ্গলেচ্ছা ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত—তাই শাসনের অর্থ দোষসংশোধন-পূর্ব্বক সমুন্নয়ন-সাধন।

শাসনের জন্ত দণ্ডের বিধান সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজে আবহমানকাল প্রচলিত। অবস্থা-বিশেষে প্রয়োগক্ষেত্রের পার্থক্য অনুসারে দণ্ড নানারূপে আবর্ত্তিত হইতে পারে। ধন-দণ্ড, কারাদণ্ড, বধদণ্ড প্রভৃতি বহু দণ্ডই অবস্থাবিশেষে ব্যস্ত বা সমস্তভাবে অপরাধীর উপর আপতিত হয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে যেমন প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহারক্ষেত্রে তদ্রূপ দণ্ড। উভয়েরই উপযোগ একরূপ। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপনাশ হয়, পাপীর মনের ময়লা টুটিয়া যায়, পাপ হইতে বিরতি উপস্থিত হয়। দণ্ড দ্বারাও তদ্রূপ দোষ দূরীভূত হয়, মনোগতির সুপথে পরিবর্ত্তন ঘটে, কুকর্ম্ম হইতে বিরতি আসিয়া জুটে। অবশ্য সকল স্থানেই সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের এমন সুফল সম্ভব নয়, কিংবা সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ দণ্ডদানও সফল হয়না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা ও দণ্ড-বিধানের মূললক্ষ্য ঐখানেই। অনেক বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কিন্তু বাণপ্রয়োগের উদ্দেশ্য যে লক্ষ্যভেদ, একথায় আপত্তি করা চলেনা। প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থাপক, পাপীকে অপাপ বা শুদ্ধ দেখিতে চাহেন, দণ্ডদাতা শাসকও অপরাধীকে নিরপরাধ বা নির্দ্দোষ দেখিতে চাহেন। প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডের প্রয়োগ সেই জন্তই তাঁহারা স্থিরস্থিরভাবে করিয়া থাকেন। পাপের ও দোষের নাশই তাঁহাদের অভিপ্রেত; পাপীর বা দোষীর রক্ষাকেই তাঁহারা মুখ্যকর্ত্তব্য মনে করেন। দোষীর বিনাশ তাঁহাদের মনোগত নয়। এইজন্তই মহামনীষী উশনা বধদণ্ড দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আচার্য্য উশনা বলিয়াছেন—নীচকর্ম্মকরং কুর্য্যাদ্ বন্ধয়িত্বা তু পাপিনং। মাস-মাত্রং ত্রিমাসং বা ষণ্মাসং বাপি বৎসরং। যাবজ্জীবন্ত বা কশ্চিৎ ন কশ্চিদ্‌বধমর্হতি। ননিহন্যাচ্চ ভূতানি ত্বিতি জাগর্ত্তি বৈ শ্রুতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বধদণ্ডং ত্যজেন্নৃপঃ। অর্থাৎ রাজা, বিচারে যে দোষী স্থির হইবে তাহাকে অপরাধের তারতম্য অনুসারে একমাস, তিনমাস, ছয়মাস, একবৎসর অথবা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া নিকৃষ্ট কর্ম্ম করাইবেন, কিন্তু কাহারও প্রাণদণ্ড করিবেন না। শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন

যে, প্রাণিহত্যা অকর্ত্তব্য, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণদণ্ড পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উশনা অন্যস্থানে তিরস্কারদণ্ড, ধনদণ্ড প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। এস্থলে কারাবরোধের কথাও বলিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বথা বধদণ্ডের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিতেছেন। যাবজ্জীবন কারাবাসে রাখ, কিন্তু প্রাণনাশ করিওনা, ইহাই তাঁহার শেষকথা।

আচার্য্যের অভিপ্রায় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, উহার মধ্যে সুগভীর রহস্য নিহিত আছে। দুর্জ্জনকে যদি শাসনপ্রক্রিয়ার দ্বারা সুজন করাযায়, তবে তাহাদ্বারা জগতের নানাবিধ কল্যাণকর ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, পক্ষান্তরে প্রাণনাশ করা কঠোরতার পরাকাষ্ঠা। মানব, মানবস্বভাবসুলভ কোমলহৃদয় লইয়া মানবের মুণ্ডচ্ছেদন করিতে পারেনা। যে যখন নরহত্যা করে, তখন সে নিশ্চয়ই দানবভাবে অনুপ্রাণিত হয়। মানব-হৃদয়ের কোমল ও সুন্দর সদ্বৃত্তিগুলির পোষণ বর্দ্ধন ও সংরক্ষণের বাসনা—এককথায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনা থাকিলে কখনই এরূপ কর্ম্মে ব্রতী হওয়া যায়না। অনেকাংশে একথার সত্যতা প্রত্যক্ষ দ্বারাই প্রতিপাদিত হয়। আর মূলকথা এই যে, যদি দোষীর ভবরঙ্গমঞ্চের অভিনয়ই শেষ করিয়া দেওয়া হইল, তবে সংশোধন হইবে কাহার? যদি সংশোধন অভিপ্রেত না হয়, মাত্র দোষীর হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করাই লক্ষ্য হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সুন্দররূপেই সিদ্ধ হইতে পারে। কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরেই যাহার কর্ম্ম-জীবনের পরিধি পরিসমাপ্ত, সে সমাজের কি অনিষ্ট করিবে? বরংচ সে কুকর্ম্মের বিরুদ্ধে জীবন্ত যন্ত্রণাময় দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া থাকিবে। তাহার ক্লেশময় জীবন যেরূপ কুকর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ, তাহার শান্তিময় মরণ কখনই তদ্রূপ নহে। অবশ্য এই তর্কের বিরুদ্ধে কাহারও অঙ্গুলীউত্তোলনের শক্তি নাই—ইহা বলিতে চাইনা, কিন্তু সভ্যতার সমতুলাদণ্ডে পরিমাপিত হইলে বধদণ্ডের বিপরীত দিকেই ন্যায়ের দিক্ ঝুঁকিয়া পড়িবে, ইহা মনে হয়। এইজন্য আচার্য্যের বধদণ্ডনিষেধব্যবস্থাকে আমরা ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ-বোধক রূপে বলিতে চাই।

আচার্য্য উশনা বধদণ্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু মনু প্রভৃতি আচার্য্যগণ বধদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াগিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবহারাচার্য্যগণ প্রায় সকলেই বধদণ্ডের সমাদর করিয়া গিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি, তাঁহারাও সমাজের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। যে সময়ে দোষী একমাত্র দৃষ্টান্তও নষ্ট করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, সেই সময়েই তাঁহারা বধদণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। মনে হয়, এই বধদণ্ড উচ্ছৃঙ্খল বর্ব্বরসমাজের উপর—প্রধানতঃ শূদ্রনামক অনার্য্য সম্প্রদায়ের উপরই বিশেষভাবে প্রযুক্ত, হইত। ব্রাহ্মণের বধদণ্ড বিহিত নয়। ক্ষত্রিয় রাজশক্তির অবতার—তাহার উপর বধদণ্ড নিষিদ্ধ না হইলেও কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইত না। উশনা বলিয়াছেন, রাজজাতীয়েরা যে প্রচুর সুবিধা ভোগ

করে, অন্যজাতীয় লোকের নিকট তাহা দুর্ল্লভ। সুতরাং বলাযায়, হয়ত ক্ষত্রিয়েরা কার্য্যতঃ এ বিধানের অধীনে বাস করিতে বাধ্য ছিলেননা। বৈশ্যেরা ধনবলের উৎস, সুতরাং তাঁহাদের প্রতিও হয়ত ইহার অবাধ প্রয়োগ চলিত না। কেবল শূদ্র জাতীয়েরাই এই দণ্ডের প্রয়োগস্থল ছিলেন। এখানে আমরা দেখিতেছি, সভ্য ত্রৈবর্ণিক সমাজের জন্য বধদণ্ড নহে। সুতরাং উহাতে ব্যবহার-শাস্ত্রের নৈতিক তথ্য অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, সভ্যমনুষ্যেরাই হয়ত তৎকালে নৈতিক সত্যের প্রয়োগস্থল বিবেচিত হইতেন।

যাহাই হউক্, বধদণ্ডের সমর্থন সঙ্গত বা অসঙ্গত সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মনীষী উশনা যে বধদণ্ডের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা দণ্ডবিধানশাস্ত্রের মূললক্ষ্য সম্মানিত হইয়াছে, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সুরক্ষিত হইয়াছে, এবং বিশ্বমঙ্গল-সাধন ও ধর্ম্মরাজ্যবিস্তারের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। "প্রাণদণ্ড বর্ব্বরোচিত" এরূপ কথা বর্ত্তমানজগতের সভ্যসমাজে আলোচিত হইতেছে। মনে হয়, উশনার চিন্তার প্রতিচিত্র, বর্ত্তমান জগতের মনীষী মানবগণের মনের সম্মুখে অল্পে অল্পে আত্মপ্রকাশ করিয়া বধদণ্ডের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। হয়তঃ সুদূরবর্ত্তী সময়ে জগৎ দেখিবে, উশনার বধদণ্ড-বিষয়ক মহামূল্য স্বপ্ন, সমগ্র সংসারের স্বীকৃত সত্যে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞান-তপসাপূতা মদ্ভাব মাগতাঃ॥১০

অন্বয়। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (বীতাঃ রাগশ্চ ভয়শ্চ ক্রোধশ্চ যেভ্যঃ তে) মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) (ভূত্বা) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (সন্তঃ) জ্ঞানতপসা (আত্মজ্ঞানং তপশ্চ তেন) পূতাঃ (পবিত্রাঃ) বহবঃ মদ্ভাবং (মৎসাযুজ্যং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ)। ১০

বঙ্গানুবাদ। আসক্তিহীন ভয়ক্রোধশূন্য এবং মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানতপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমাতেই যুক্ত হইয়াছেন।১০

আলোচনা। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, আমার অলৌকিক দেহধারণাদির তত্ত্ব জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। তাহা কিরূপে জানিতে পারা যায় তাহাই বলিতেছেন। যিনি বিষয়বাসনা শূন্য, ভয়-ক্রোধ-বর্জ্জিত এবং আমাতেই মন সমর্পণ করিয়া আমারই শরণাগত হইয়া আত্মজ্ঞান-রূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি আমার ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছেন। ১০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥১১

অন্বয়। হে পার্থ! যে যথা (যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা) মাং প্রপদ্যন্তে (ভজন্তে) তান্ অহং তথৈব [তৎফলদানেন] ভজামি [অনুগৃহ্নামি] মনুষ্যাঃ

সর্ব্বশঃ [সর্ব্বপ্রকারৈঃ] মম বর্ত্ম [ভজন-মার্গং] অনুবর্ত্তন্তে। [ইন্দ্রাদি দেব-রূপেণ মমৈব সেব্যত্বাত্] ।১১

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ, যাহারা যেভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্য-গণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পূজার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে—অর্থাৎ মনুষ্য নানা দেবতার পূজা করিলেও আমারই পূজা করিয়া থাকে ।১১

আলোচনা। এযাবৎ শ্রীভগবান্ কেবল নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই বলিয়াছেন। নিষ্কাম-কর্ম্ম—নিষ্কাম উপাসনা—নিষ্কাম ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া সকাম কর্ম্মীর প্রতি যে ভগবান্ সদয় নন্ তাহা নহে। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা যে ভাবে আমার উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি—অর্থাৎ সকাম কি নিষ্কাম কাহাকেও আমি ফলদানে বঞ্চিত করিনা। অতঃপর ৭ম অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে ভগবান্ বলিবেন যে "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার লোকে আমাকে ভজনা করে"। ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার লোক সকাম, এক প্রকার নিষ্কাম। শ্রীভগবান্ ভক্ত-বৎসল ভক্তাশ্রয় ভক্তানুগত, যে ভক্ত তাঁহাকে যে ভাবে ডাকে, তিনি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করেন। তবে "ডাকার মত ডাকা" চাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন "ডাকার মত ডাক দেখি মন কেমন শ্যামা রইতে পারে" এপ্রকার প্রবাদ আছে যে, দস্যু-তস্করেরা অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য কালীপূজা করিয়া চুরি-ডাকাতি করিয়া থাকে, তাহারা তাহাতেই অভীষ্ট ফললাভ করে। এস্থলে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তবে কি ভগবান্ উপাসনা পাইয়া দস্যু-তস্করের প্রশ্রয় দেন? তাহা নহে। তাহারা কালীপূজার ফলে চুরি ডাকাতিতে কৃতকার্য্য হয় এবং চুরি-ডাকাতি জন্য প্রত্যবায় নিমিত্ত ইহ বা পর-কালে রাজদ্বারে বা নরকে দণ্ডভোগ করে। এই পুরস্কার ও দণ্ড উভয়ের দাতাই শ্রীভগবান্।

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বহুদেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারাও তত্তত্ দেবতাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহার একজনের উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য, অপরের উপাসনা গ্রাহ্য নহে, তাহা নহে। শ্রীভগবান্‌কে যে যে নামে যে ভাবে ডাকে, তাঁহার উদ্দেশে ডাকা হইলেই তিনি শুনেন। গুপ্ত কবি গাইয়াছেন

"সকলের পিতা তুমি তুমি সর্ব্বময়
সর্ব্বদেশে পূজ্য তুমি সকল সময়!
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিবা সাধু মহাশয়
কেহবা যিহোবা জোব কেহ প্রভুবর।"

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

যেমন বাড়ীর কর্ত্তা একজন, তাঁহার সহিত সংসারের নানা ব্যক্তির নানা সম্বন্ধ। তিনি কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও খুড়া, কাহারও জেঠা, কাহারও মামা, কাহা-রও পিসা, কাহারও স্বামী কাহারও মুনিব। সংসারের এতগুলি লোক কর্ত্তাকে বিবিধ

সম্বোধনে আহ্বান করে, তিনিও তাহাদের সহিত সম্পর্কানুসারে উত্তর দেন এবং সম্পর্কানুযায়ী ব্যবহার করেন। যাহার যে স্থায্য পাওনা, তাহার পূরণ করেন। শ্রীভগবান্‌ও এই জগৎ সংসারের কর্ত্তা, তাঁহাকে যে যেভাবে ভজনা করে, তিনি তাহাকে তদনুরূপ অনুগ্রহ করেন। একমাত্র তাঁহাকেই মনুষ্য, ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন উপচারে পূজা করিয়া থাকে। তিনি সকলের পূজাই তুল্যভাবে গ্রহণ করেন ।১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২

অন্বয়। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং [ফল-নিষ্পত্তিং] কাঙ্ক্ষন্তঃ [প্রার্থয়ন্তঃ] ইহ মানুষে লোকে দেবতাঃ [ইন্দ্রাদীন্] যজন্তে [নতু সাক্ষাৎ মামেব] হি [যস্মাত্] কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ [কর্ম্মফলং] ক্ষিপ্রং ভবতি ।১২

বঙ্গানুবাদ। এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মফল-প্রার্থীগণ সাক্ষাত্‌ভাবে আমার পূজা না করিয়া যে অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার কারণ কাম্যকর্ম্মের ফল শীঘ্র ফলে। নিষ্কাম জ্ঞানফল শীঘ্র ফলেনা ।১২

আলোচনা। যদি শ্রীভগবান্‌ই সর্ব্বফলদাতা হন, তাহাহইলে মনুষ্য কেবল তাঁহাকেই ভজনা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে কেন? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়না বা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান-ফললাভ অনায়াসে হয়না। পুত্র-পুত্রাদি ফল-কামনায় বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মের দ্বারা শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এইজন্য ইহলোকে সকাম পুরুষেরা যজ্ঞাদি দ্বারা সাক্ষাত্‌ভাবে আমার পূজা না করিয়া অন্যদেবতার পূজা করে। তাহাতেও পরোক্ষে আমারই পূজা করা হয় ।১২

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥১৩

অন্বয়। ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ [গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈঃ] চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং [ইতি সত্যং তথাপি] তস্য কর্ত্তারমপি মাং [ফলতঃ] অব্যয়ং [আসক্তিরাহিত্যেন বিকাররাহিত্যেনবা] অকর্ত্তারং [নিষ্ক্রিয়ং] বিদ্ধি। ১৩

বঙ্গানুবাদ। আমি গুণকর্ম্ম-বিভাগদ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু আমি তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অনাসক্ত অবিকারী অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে।

আলোচনা। চাতুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। ব্রাহ্মণের সত্ত্ব গুণ। ক্ষত্রিয়ের সত্ত্ব-রজঃ, বৈশ্যের রজঃ তম্, শূদ্রের তমঃ গুণ প্রধান। কর্ম্ম—শম (মনঃসংযম) দম [বাহেন্দ্রিয়-সংযম] তপঃ [তপস্যা] শৌচ [অন্তরবাহিরশুদ্ধি] ক্ষান্তি [ক্ষমা] আর্জ্জব [ঋজুতা] জ্ঞান [শাস্ত্রার্থবোধ] বিজ্ঞান [শাস্ত্রার্থ—তত্ত্বনিশ্চয়] আস্তিক্য [ঈশ্বর এবং কর্ম্মফলে বিশ্বাস] এই নয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।

পরাক্রম, বীর্য্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, উদারতা, শাসন—ক্ষমতা এই সকল ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম।

কৃষি গোরক্ষণ বাণিজ্য পশুপালন ইহা বৈশ্যদিগের কর্ম্ম।

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদিগের শুশ্রূষা শূদ্রদিগের কর্ম্ম।

ইহাই হইল চতুর্ব্বর্ণের গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগ। শ্রীভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ে যে শ্লোকে বলিয়াছেন যে "সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ" প্রকৃতিই সকলকে বশ করিয়া পরিচালিত করে। সৃষ্ট মাত্রেই প্রকৃতি-পরিচালিত। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ ইহাও প্রকৃতিপরিচালিত। বস্তুতঃ এতাবৎ প্রকৃতিরই স্ফুরণ মাত্র। ঐশ্বরিক শক্তিই প্রকৃতি। শ্রীভগবান্ কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য, কাহাকে শূদ্র করিয়া নাম লিখিয়া বা সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে ভূষিত করিয়া পাঠান না। প্রকৃতির গুণেই হইয়া আসিতেছে। এই প্রকৃতি অনাদি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বর্ণ—গুণ-কর্ম্ম সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার নিয়ম বিশেষ। অধুনাতন কালের জাতি ও ব্যবসায়-গত পার্থক্য ও গীতোক্ত বর্ণ-গুণ-কর্ম্মবিভাগ এক নহে। শ্রীভগবান্ এই বর্ণ-গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের স্রষ্টা হইয়াও তিনি আপনাকে অব্যয় ও অকর্ত্তা বলিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অনাসক্ত অবিকারী বলিয়া অব্যয় ও নির্লিপ্ত বলিয়া অকর্ত্তা বলা হইয়াছে।১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥১৪

অন্বয়। কর্ম্মাণি (সৃষ্ট্যাদীনি) মাং ন লিম্পন্তি (আসক্তং কুর্ব্বন্তি) কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন (অস্তি) ইতি যঃ মাং অভিজানাতি স কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (নিরহঙ্কারত্ব-নিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপি অহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ)।১৪

বঙ্গানুবাদ। "আমি কর্ম্মে লিপ্ত হই না এবং কর্ম্ম-ফলে আমার স্পৃহা নাই" আমাকে যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কর্ম্মে আবদ্ধ হন না। কারণ, আমার নির্লিপ্ততা নিস্পৃহতা জানায় তাঁহারও কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মেনা।১৪

আলোচনা। জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর কর্ম্মে লিপ্ত নন, কর্ম্মফলে তাঁহার স্পৃহা নাই, ইহা জানা থাকিলে জ্ঞানবান্ পুরুষ কখনও কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হন না। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী না হইলে তাহাকে কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না।১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥১৫

অন্বয়। (অহঙ্কাররাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি) এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ (জনকাদিভিঃ) মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতং তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ [পূর্ব্ববর্ত্তিভিঃ সাধুভিঃ] পূর্ব্বতরং [পুরাকালে] কৃতং কর্ম্ম এব কুরু।১৫

বঙ্গানুবাদ। অহঙ্কারাদিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবদ্ধ হয়না—এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছেন অতএব তুমিও পুরাকালের পূর্ব্বতন সাধুগণের ন্যায় কর্ম্ম কর।১৫

আলোচনা। জনকাদি রাজর্ষিগণ সংসারে

থাকিয়াও সংসারের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান-লাভার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব তুমিও তাঁহাদিগকে আদর্শ স্থানীয় করিয়া ফলাফল-কামনা না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর।১৫

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬

অন্বয়। কিং কর্ম্ম কিং অকর্ম্ম ইতি অত্র [অস্মিন্ অর্থে] কবয়ঃ [বিবেকিনঃ] অপি মোহিতাঃ [মূঢ়ভাবং গতাঃ] [অতঃ] যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ [সংসারপাশাৎ] মোক্ষ্যসে [মুক্তো ভবিষ্যসি] তৎকর্ম্ম তে [তুভ্যং] প্রবক্ষ্যামি।১৬

বঙ্গানুবাদ। কি কর্ম্ম কর্ত্তব্য, আর কি কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, ইহা নির্ণয় করিতে বুদ্ধিমান্‌গণও মোহিত হন। অতএব যাহা জানিলে তুমি সংসাররূপ অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, আমি সেই কর্ম্মই তোমাকে বলিব।১৬

আলোচনা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয় অতি দুরূহ। বহুদর্শী বিবেকিগণেরও যথাযথ নির্ণয়ে ভ্রম হয়। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, কোন্‌টী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আর কোন্‌টী অকরণীয়, তাহা বুদ্ধিমানেরাও নির্ণয় করিতে অসমর্থ হন সুতরাং তাহা নির্ণয় করা তোমার পক্ষে কঠিন, অতএব আমি তোমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-কর্ম্ম তত্ত্ব বলিব।১৬

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

অন্বয়। কর্ম্মণঃ [বিহিতব্যাপারস্য] অপি বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] বিকর্ম্মণঃ [নিষিদ্ধ ব্যাপারস্যাপি] বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] অকর্ম্মণঃ [তুষ্ণীম্ভাবস্য চ] বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] হি যতঃ কর্ম্মণো গতিঃ গহনা [দুর্জ্ঞেয়া] ১৭

বঙ্গানুবাদ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম অর্থাত্ কর্ম্মত্যাগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়।১৭

আলোচনা। সাধারণত ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কর্ম্ম। তদ্ভাবৎ অকরণের নাম অকর্ম্ম। এস্থলে তাহা নয়। বেদ-স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম। বেদ-স্মৃতি-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বিকর্ম্ম এবং সমস্ত কর্ম্মত্যাগের নাম অকর্ম্ম। এই ত্রিবিধ ব্যাপারের তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ইহার বিশেষ বিবরণ না জানিলে যাথার্থ্য নিরূপণ হয়না।১৭

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

অন্বয়। যঃ কর্ম্মণি [ভগবদারাধনাবিষয়ে] [বন্ধকত্বাভাবাৎ] অকর্ম্ম [কর্ম্মেদং ন ভবতি ইতি] পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ [বিহিতাকরণে, কর্ম্মাভাবে বা] [বন্ধকত্বাৎ] কর্ম্ম পশ্যেৎ মনুষ্যেষু স বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিতঃ) স যুক্তঃ যোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সর্ব্বকর্ম্মকৃচ্চ)।

বঙ্গানুবাদ। যিনি কর্ম্মেতে অর্থাৎ বেদস্মৃতিবিহিত কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যগণ মধ্যে পণ্ডিত, তিনি যোগ যুক্ত ও সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।১৮

আলোচনা। পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও

অকর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা কথিত হইয়াছে। এখানে জ্ঞানী যে কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্ম মধ্যে কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইতেছে। পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, বেদ-স্মৃতি-বিহিত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকে কর্ম্ম বলে। সেই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মও যদি কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ববিষয় মাত্র হয়, যাহাতে ইহ বা পরজন্মের কোন ফলকামনা নাই—যাহা দ্বারা কর্ম্মবন্ধ হয়না এইরূপ হয়, জ্ঞানী পুরুষ সেই কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। আর অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মরাহিত্যও যদি প্রত্যবায়জনক অর্থাৎ বন্ধের কারণ হয়, তাহা হইলে সেই অকর্ম্মও কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। যথা—সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত বৈধতা-প্রযুক্ত উহাতে বন্ধনভয় নাই, বরং তত্তাবতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। সন্ধ্যোপাসনাদি "কর্ম্ম" হইলেও বন্ধের কারণ নাই বলিয়া উহা অকর্ম্ম এবং সন্ধ্যোপাসনাদি-ত্যাগরূপ অকর্ম্মে প্রত্যবায় জন্ম বন্ধের কারণ থাকায় উহা কর্ম্ম। এইপ্রকার কর্ম্ম মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্ম মধ্যে কর্ম্ম যিনি দর্শন করেন, তিনি বুদ্ধিমান্ কর্ম্মকর্ত্তা। অহং জ্ঞান অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" এই জ্ঞান ও ফলকামনাই জীবের বন্ধের হেতু। দেহেন্দ্রিয়-ব্যাপারে যিনি আত্মাকে নির্লিপ্ত বলিয়া জানেন, দেহেন্দ্রিয়-কেই তত্তৎ কার্য্যের কর্ত্তা মনে করেন, তিনি সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্, তিনিই কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন।১৮

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯

অন্বয়। যস্য সর্ব্বে [যাবন্তঃ] সমারম্ভাঃ [সম্যগারভ্যন্তে সমারম্ভাঃ] কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ [ফল-কামনাহীনাঃ] বুধাঃ [পণ্ডিতাঃ] জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতং আহুঃ।১৯

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার সমুদায় কর্ম্ম কামনাশূন্য ও সঙ্কল্প-বর্জ্জিত, জ্ঞানরূপ অগ্নিতে যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে, বুধগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন।১৯

আলোচনা। সঙ্কল্প ও ফলকামনাই মনুষ্যের জন্ম-জন্মান্তর-ভোগরূপ কর্ম্মবন্ধনের বীজস্বরূপ। "জগত্ ব্রহ্মময়" এই জ্ঞান-রূপ অগ্নি দ্বারা যিনি শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দগ্ধ করিতে পারেন, যিনি স্বর্গাদি ফল-কামনা এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানমূলক সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই পণ্ডিত।১৯

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০

অন্বয়। সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং [কর্ম্মণি তত্ ফলেচ আসক্তিং] ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ [নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ] [অতএব] নিরাশ্রয়ঃ [যোগ ক্ষেমার্থ আশ্রয়নীয় রহিতঃ] [সন্] কর্ম্মণি [স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি] অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিত্ এব ন করোতি [তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যতে ইত্যর্থঃ] ২০

বঙ্গানুবাদ। তিনি কর্ম্ম-ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত সুতরাং তাঁহার কোন আশ্রয় অনাবশ্যক; তিনি কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত থাকিলেও তাঁহার

কর্ম্মসকল অকর্ম্মতা প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ অকামতা হেতু অদৃষ্ট ফলদ হয়না।২০

আলোচনা। কার্য্যানুষ্ঠান কালে যে কর্ত্তৃত্বাভিমান তাহার নাম কর্ম্মাসঙ্গ এবং তজ্জন্য ফল-কামনার নাম ফলাসঙ্গ। যিনি এতদুভয় ত্যাগ করিয়া আত্মাকে অকর্ত্তা অভোক্তা অসঙ্গ জানিয়া সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত ও আনন্দযুক্ত, প্রয়োজনাভাবে তিনি নিরাশ্রয়, দৃষ্টতঃ তিনি কোন কার্য্য করিলেও সে কার্য্যে তাঁহার কোন অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল জন্মেনা, কারণ তিনি ফল চাননা। সুতরাং তিনি কর্ম্ম করিয়াও করেন না অর্থাৎ তাহার পক্ষে কর্ম্ম করা না করা তুল্য।২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।২১

অন্বয়। নিরাশীঃ [নিষ্কামঃ] যতচিত্তাত্মা (যতং সংযতং চিত্তং অন্তঃকরণম্ আত্মা বাহ্যকার্য্যকরণসংঘাতঃ, যস্য সঃ) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহাঃ যেন সঃ) কেবলং শারীরং (শরীরস্থিতিপ্রয়োজনং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি কিল্বিষং (পাপং বন্ধনং) ন আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি)। ২১

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিষ্কাম হইয়া দেহ ও চিত্তকে সংযত করিয়া সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, তিনি কেবল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম করিলেও পাপ প্রাপ্ত হন না।২১

আলোচনা। যিনি দেহ ও মনকে বশীভূত করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া কোন বস্তুরই গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি দেহধারণের জন্য স্বাভাবিক ভিক্ষাদি করিলেও বিহিত কর্ম্মের অকরণ-জন্য পাপভাগী হন না।২১

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২

অন্বয়। যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ (অপ্রার্থিতোপস্থিতোলাভঃ যদৃচ্ছালাভঃ তেন সন্তুষ্টঃ) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদ্যতীতঃ) বিমৎসরঃ (বিগতমৎসরো নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ) সিদ্ধৌ (হর্ষে) অসিদ্ধৌ (বিষাদে) সমঃ (তুল্যঃ) যঃ এবম্ভুতঃ সঃ বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে (বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি) ২২

বঙ্গানুবাদ। যিনি প্রার্থনা ব্যতীত অনায়াসলব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদিসহনশীল, সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী, লাভ অলাভে হর্ষ-বিষাদ-রহিত, এতাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না। ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

অন্বয়। গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) মুক্তস্য (রাগাদিভির্মুক্তস্য) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবস্থিতং চেতো যস্য তস্য) যজ্ঞায় (পরমেশ্বরারাধনার্থং) কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং কর্ম্ম (ফলেন সহ) প্রবিলীয়তে (বিনশ্যতি অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে)। ২৩

বঙ্গানুবাদ। নিষ্কাম, রাগাদি হইতে মুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং ভগবদারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সমুদয় কর্ম্ম তৎফল-সহিত লয় প্রাপ্ত হয়। ২৩

আলোচনা। যিনি বিনাচেষ্টায় লব্ধ

বস্তুতে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদিতে যাঁহার সুখ-দুঃখ-বোধ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, লাভালাভে হর্ষবিষাদ হীন, নিষ্কাম আসক্তি-রহিত এবং জ্ঞানী, তিনি ঈশ্বরারাধনার্থ বা লোকানুগ্রহার্থ বা যজ্ঞ-ক্রিয়া-রক্ষার্থে যে যজ্ঞ করেন, তাহা ফলপ্রদ হইলেও তাঁহার পক্ষে ফলশূন্য হয়—অর্থাৎ কামনা না থাকায় তাঁহার পক্ষে বন্ধন-স্বরূপ হয় না। ২২।২৩

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত।



কে

তৎ ত্বম্ অসি—সেই তুমি এই হও।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আযে ধামানি
দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা
বিদ্যতেঽয়নায়।

হে মর্ত্ত্যধামবাসী আত্মবিস্মৃত ভ্রাতৃগণ! তোমরা আপন স্বরূপ জান, আর না জান, আমি জানি, তোমরা ভগবানের সন্তান। রাজার রাজা—মহারাজার তোমরাই উত্তরাধিকারী। একোঽহং বহুস্যাম—"আমি এক আছি বহু হইব" ভগবান্ এই সঙ্কল্প-পূর্ব্বক পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। শিব-স্বরূপ তোমরা জীব সাজিয়া শিক্ষার জন্য জগতে আসিয়াছ। পরমকল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি, তোমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ভোগ করাইয়া ও দর্শনীয় পদার্থ দেখাইয়া, তোমাদিগকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইতেছেন। বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গুণ আর কর্ম্মের বিভাগানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিয়া ধর্ম্মের বর্ণ-পরিচয় অর্থাৎ মৃত্তিকা কাষ্ঠ ও প্রস্তর—নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা হইতে তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ১ম স্তরের অধিকারিগণ সত্ত্বগুণ-প্রধান; শম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা সরলতা জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ইহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন একমাত্র ধর্ম্ম। ২য়-স্তরের অধিকারিগণ সত্ত্বরজঃ-প্রধান; শৌর্য্য তেজ ধৃতি দক্ষতা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা দান প্রভু-ভাব ও ভোগাসক্তির পরিবর্জ্জন ইহাদের প্রকৃতিজাত কর্ম্ম এবং রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও সমাজরক্ষা একমাত্র ধর্ম্ম। ৩য় স্তরের অধিকারিগণ রজস্তমঃ-প্রধান; কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য ও দান ইহাদের স্বভাবজ কর্ম্ম এবং অর্থোপার্জ্জন ধর্ম্ম। ৪র্থ স্তরের অধিকারিগণ তমঃ-প্রধান; অগ্রজগণের পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবাই ইহাদের ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম। ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে যে শ্রেণীর উপযুক্ত অর্থাৎ যে যেরূপ গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিলে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, সে সেরূপ লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। স্বাভাবিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-সম্পন্ন হও এবং

স্বীয় প্রকৃতিজাত কর্ম্মে নিরত থাক। সহজে ও সত্বরে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আত্মায় অনন্তজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে, তোমরা স্বধর্ম্ম পালন করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতম সোপানে আরোহণ কর। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তিতে সংসারচক্র—পরিভ্রমণের পরিসমাপ্তি বা জীবের শিবত্ব-লাভ।

জীবের শিবত্ব-লাভের উপায়।

১। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—ভাই নিজেকে অসহায় ভাবিও না। তুমি আত্মবিস্মৃত! কে তুমি? একবার চিন্তাকর। তৎ ত্বম্ অসি—সেই তুমি এই হও। তোমার আত্মায় অনন্ত শক্তির বীজ নিহিত আছে। তুমি শিব-স্বরূপ! স্বইচ্ছায় জীব সাজিয়া জগতে অভিনয় করিতে আসিয়াছ। তোমার জগৎ তুমি নিজকর্ম্ম দ্বারা নিজেই রচনা করিয়াছ ও করিতেছ। তোমার খেলাঘর তুমি নিজে নষ্ট না করিলে অপর কেহ তাহা নষ্ট করিতে পারে না। তুমি গুটী পোকার ন্যায় স্বকর্ম্ম-গঠিত জালে আবদ্ধ রহিয়াছ এবং জ্ঞানান্ধ বলিয়া মুক্তির জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থী হইয়া ক্রন্দন করিতেছ। ভাই, তুমি নিজে মুক্ত না হইলে অপর কাহারও তোমাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ভগবানের সন্তান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ হও এবং কর্ম্মজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হও এবং শিবত্ব লাভ কর।

২। মাগৃধঃ কস্যাস্বিদ্ধনম্। কাহারও ধনে লোভ করিও না। স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক। তুমি ভগবানের সন্তান, যাহা কামনা করিবে তাহাই হইবে। এ জন্মে পূর্ব্বজন্মের বাসনার অনুরূপ শরীর পাইয়াছ; পরজন্মে এ জন্মের কামনানুযায়ী দেহ ধারণ করিবে। তুমি নিজেই নিজের অদৃষ্টের নির্ম্মাতা। তোমার সুখ-দুঃখের জন্য তুমি নিজেই দায়ী। সকলকেই কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্মণা-সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা। জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণোবশাৎ।

৩। কখনও ঋণ-গ্রহণ করিওনা। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। অপরিগ্রহ-ব্রত অবলম্বন কর। তুমি ভগবানের সন্তান, তোমার কিসের অভাব? তোমার কি প্রয়োজন, সে বিষয় কি প্রেমময় পিতা অবগত নন্? শিশু-সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ দিবার কথা কি মা'কে বলিয়া দিতে হয়? প্রেমময় পিতার আদেশে পরমহিতৈষিণী ধাত্রী প্রকৃতি অহর্নিশ তোমার অভাবমোচনের জন্য নিযুক্তা আছেন। যাহা ব্যতীত তুমি বাঁচিতেই পারনা, তাহাই তোমার প্রকৃত অভাব। বিলাসিতার জন্য কাল্পনিক অভাব সৃষ্টি করিয়া অযথা ঋণগ্রস্ত হইও না। আমি ভগবানের আদেশ শুনিতে পাইয়াছি, তিনি আমার ঋণগ্রস্ত ভ্রাতৃগণের শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাকে ঋণমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জুতা পায় ও পিরাণ গায় দিতে নিষেধ এবং একতরকারী দিয়া ভাত খাইতে আদেশ করিয়াছেন। পরম পিতার আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী পিতৃভক্ত ভ্রাতৃগণ, আমাকে অনুসরণ করিয়া ঋণমুক্ত হও।

৪। দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিও না। ন প্রজয়া ধনেন ন নচেজ্যায়া ত্যাগে-নৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ। অমৃতত্ব-লাভের উপায় পুত্র নয়, বিত্ত নয়, যজ্ঞ নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়। পিত্রালয়ে অবস্থিতা পতিব্রতা রমণীর ন্যায় সংসারে অবস্থান কর ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন কর। সদাচার ও সদালাপ তোমার অঙ্গের ভূষণ হউক্। সতীনারী পতির সহিত মিলনের জন্য যেরূপ ভাবে পিত্রালয় পরিত্যাগ করে, তুমিও প্রেমময় ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য সেইরূপ ভাবে সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।

যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

৫। ভিক্ষুক জ্ঞানে অবহেলার সহিত কাহাকেও ভিক্ষা দিও না। যে ভিক্ষা গ্রহণ করে, তাহার মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হয়। আত্মীয়-জ্ঞানে প্রকৃত অভাবগ্রস্তের অভাব-মোচনের জন্য প্রত্যহ যথা সাধ্য দান কর। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেও, পীড়িতকে ঔষধ দেও, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দেও, এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেও। ভগবান্ তোমার মনুষ্যত্ব-বিকাশের সুযোগ ও পরীক্ষার জন্যই নানা বেশে দর্শন দিয়া থাকেন। মানবকে সাহায্য করা রূপ ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাওয়া কি তোমার মহাসৌভাগ্যের বিষয় নয়? পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তান যেমন মনে করে না "আমি পিতা-মাতার উপকার করিলাম" সেইরূপ নররূপী নারায়ণের সেবা করিয়া, "তুমি তাহাদের উপকার করিলে" মনে এইরূপ ধারণা রাখিও না। অপরের সেবা করিলে নিজেরই উপকার-সাধন করা হয়। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি"॥

৬। উপবাস বা বনবাস দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। "যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাব-বোধস্য যোগো ভবতি দুঃখ-হা"। সন্তানের উপবাসে বা বনবাসে পিতার পরিতোষ জন্মে না। "রসোবৈসঃ।" পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভাই বন্ধু অথবা স্বামী যে ভাবে ইচ্ছা— ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ভালবাস ও অকপটে প্রাণের কথা নিবেদন কর। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। যা'র যেমন ভাব তা'র তেমন লাভ। ইষ্ট-নাম উচ্চারণে হৃদয়ে যদি ভাব না খেলে, তবে শুধু তোতার ন্যায় মন্ত্রজপে কি ফল ফলিবে? ভগবান্ প্রেমাধীন। তাঁহার উপর তোমার জীবনের সব ভার অর্পণ কর ও তোমার অন্তর্নিহিত প্রেমশক্তির বিকাশের জন্য প্রত্যহ পঞ্চমহাযজ্ঞ কর। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞঃ অতিথি-পূজনং॥"

৭। ভাই! তুমি তোমার প্রেমময় পিতার অর্চ্চনার ভার অপরের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। বিশ্বনাথের সেবা পূজা ও ভক্তি করিবার সকলেরই অধিকার আছে। "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়োবৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥" সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন

প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্॥" তুমি "বিশ্বনাথের" পূজার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তোমার প্রকৃতিগত অভিরুচি অনুসারে পত্র পুষ্প ফল জল দ্বারা প্রত্যহ তাঁহার পূজা কর। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

৮। তীব্র ব্যাকুলতা ও ভালবাসা ভিন্ন ঈশ্বর-লাভ হয় না। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি" ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়। তুমি যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন মনুষ্যরূপেই তোমাকে ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জীব ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হন। তাই, ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং তোমাকে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হইবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" যাঁহার প্রতি তোমার ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মে, তাঁহাকেই তোমার জীবনের আদর্শও বিশেষ উপাস্য-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর-প্রতীকজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি কর।

এই জন্মেই ভগবান্‌কে লাভ করিব—এইরূপ আশা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

৯। "ত্বমাস্তে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম-পরাৎপরম্। যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাং তপঃ।" জনক-জননীকে ঈশ্বর-প্রতীকজ্ঞানে প্রত্যহ পূজা কর ও বিশ্ববাসীকে ভ্রাতৃ-ভাবে দর্শন কর। সর্ব্ব-ভূতের অভ্যন্তরে এক অন্তরাত্মা রহিয়াছেন। কাহারও প্রীতির জন্য কেহ কাহারও প্রিয় হয় না, কেবল আপনার প্রয়োজন অর্থাৎ আত্মার প্রীতির জন্যই পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইয়া থাকে। "যত্রযত্র মনোযাতি তত্রতত্র পরং পদং।" ভালবাসার পাত্রকে অর্থাৎ সন্তান, জননীকে ও স্ত্রী, স্বামীকে ঈশ্বর-প্রতীকজ্ঞানে সেবা পূজা ও ভক্তি করিলে অতি সহজে ভগবদ্দর্শন ঘটিয়া থাকে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর কর। প্রাণ ভরিয়া মা দয়াময়ী ও মা প্রেমময়ী বলিয়া ডাকিতে থাক, কাঁদিতে থাক। "কর্ম্মণ্যেবাধিকা-রস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অজ্ঞ সন্তান "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে ও কোলে নিতে প্রেমময়ী জননী আপনা হইতেই ছুটিয়া আসেন। যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে তাঁহার করুণা ভিন্ন অন্য উপায়ে বিদ্যা-বুদ্ধি যোগযাগ তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা লাভ করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

ভগবচ্চিন্তা।

কি যে মহীয়সী শক্তি আছে বিশ্ব-মূলে,
নরাধম-সম আছি সেকথাটী ভুলে।
জাগে চিতে যদি মম কখন কখন,
লাগে ধাঁধাঁ জুটে নানা বাধা বিড়ম্বন।
সমস্যা কঠিন বড় করিতে বিচার,
চিন্তায় স'হিতে হেরি ঘোর অন্ধকার!
কি শক্তি আমার তত্ত্ব করি নিরূপণ?
যেখানে পরাস্ত মানে, ষড় দরশন।
"আছে কোন মহাশক্তি" কথাটী নিশ্চয়,
নতুবা বিরাট্ বিশ্ব কি প্রকারে রয়?
কোথা সে শক্তির মূল—কিম্বা মূলাধার,
কেমনে সিদ্ধান্ত করি, করিয়া বিচার?
জ্ঞান-গবেষণা যত কোথা উড়ে যায়,
মরুক্ষেত্রে মরীচিকা-ভ্রান্ত পান্থ প্রায়!
সংসারের আবর্জ্জনা রেখেছে ঘেরিয়া,
না পাই সন্ধান, যাই কেমনে লঙ্ঘিয়া।
হ'তেছি ব্যথিত শত দুঃখের তাড়নে,
বিষয়-বাসনা কত, তবু জাগে মনে!
আশার কুহকে—ভাবি ভুলিবনা আর,
কোথা সে পরম-নিধি খুঁজি একবার।
ভাগ্য সুপ্রসন্ন যার সে পায় সন্ধান,
লভিবে কেমনে নিধি মাদৃশ অজ্ঞান?
প্রথমেই চেয়ে দেখি বিরাট্ আধার,
গর্ভে যার কোটি কোটি কাণ্ড চমৎকার!
গ্রহ উপগ্রহ কত সে মহামণ্ডলে,
করে আবর্ত্তন, কিবা বিচিত্র কৌশলে।
স্খলিত কি কক্ষচ্যুত কখন কি হয়?
অযুত নিযুত আছে জীবের আশ্রয়।
জ্যোতিষ্ক অসংখ্য তার নৈশ গগনে,
কতই বৈচিত্র আহা নিরখি নয়নে!
দিবসে তাদের কিন্তু দেখা নাই আর,
রবি-রশ্মি-জালে দীপ্তি বিলুপ্ত সবার।
এমতি পদার্থ কত নিরখি নয়নে,
সৃষ্ট নয় কোন বস্তু বিনা-প্রয়োজনে।
সকলের আদিভূত অনন্ত আকাশ,
যেখানে অশেষবিধ বস্তুর বিকাশ।
সলিল অনিল আদি যত কিছু আছে,
নহে শক্তিশালী কিছু মার্ত্তণ্ডের কাছে;
আকাশের কেন্দ্রস্থলে যার অবস্থান,
সর্ব্বত্র আলোক তাপ করিতে প্রদান।
দৃষ্টি-শক্তি জীবের বাস্তব কিছু নয়,
ভানু-কর বিনা বিশ্ব অন্ধকারময়!
সিন্ধু শুষি করে সেই বারিদ-সঞ্চার,
বরষি উর্ব্বর শক্তি দেয় বসুধার।
সলিল-সিঞ্চনে ধরা সুস্নিগ্ধ যেমন,
তাপে করে উদ্ভিজ্জের খাদ্য আয়োজন।
ফলে ফল-শস্য তাই প্রভূত ধরায়,
যাতে পরিপুষ্ট হ'য়ে প্রাণী বৃদ্ধি পায়।
কত শুভকর শক্তি নিহিত তপনে!
গায়ত্রী গভীরে যার মহিমা বর্ণনে।
কার শক্তি বলে রবি হেন শক্তিমান্?
বেদে তাঁর মহিমার রয়েছে প্রমাণ;
ব্যক্ত তায় "অদ্বিতীয় নিত্য-নিরাকার"
ভাবিয়া স্তম্ভিত নয় নিরখে আঁধার।
ক্ষুদ্র-ঘটে ঘটে কি সে রূপের ধারণা।
তবে কি সাধন ভবে বৃথা বিড়ম্বনা?
সৃষ্টির চরমফল মানব-সন্তান,
বিকাশ অন্তরে যে জাতির দিব্যজ্ঞান;
স্রষ্টার চক্ষুতে তা'রা হেয় কভু নয়,
আসেন তাদের মাঝে অবেশ নিশ্চয়।
ভক্তের উপর যবে ঘটে উপদ্রব,
পাষণ্ড প্রবল হ'য়ে ঘটায় বিপ্লব।

জানিয়া আসন্নমৃত্যু হ'য়ে নিরুপায়,
ডাকে ভক্ত ভগবানে, "রহিলে কোথায়" ?
নারেন ভিষ্ঠিতে আর নীরবে তখন,
পুরাতে ভক্তের আশা দেন দরশন।
ধ্রুব প্রহ্লাদের সেই প্রাচীন আখ্যান,
ধরাধামে একথার জলন্ত প্রমাণ।
রক্ষিতে ভকতে অবতরি মর্ত্ত্য তলে,
প্রচারেন যুগধর্ম্ম সুনীতি-কৌশলে।
বিপন্নের বন্ধু তিনি বুঝিলাম ভাবে,
পেয়েছি সন্ধান প্রভু, আর কোথা যাবে ?
যতই কঠোর হোক্ তোমার সাধন,
বিপত্তি বিষম আসি দি'ক্ দরশন;
মুষ্টি-ভিক্ষা মাগি লব জীবিকার তরে,
তরুতল আশ্রয় করিব অকাতরে।
সংসার-সুখের আশা করিবনা আর,
সমর্পিব মন প্রাণ উদ্দেশে তোমার।
অবশেষে যেন দেব, তব দেখা পাই,
ধন জন সুসার সম্পদ্ নাহি চাই।
চাই সেই দিব্যচক্ষু, দেব নিরঞ্জন,
যে চক্ষে তোমারে নর করে দরশন।
আঁখি দাও, জ্ঞান দাও, শান্তি দাও মনে,
স্থান দান কর দেব রাজীব-চরণে।
চিরদাস হ'য়ে রব সেবিব চরণ,
বিমোচন কর নাথ সংসার-বন্ধন।

শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার।

উপায়ের কথা।

শাস্ত্রবাক্য "চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তি-পাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিদ্ধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ।"

শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিলে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি হয়। যজমানের অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া চণ্ডীপাঠ করি, কিন্তু তাদৃশ ফল প্রত্যক্ষ হয় না কেন ? ফল হওয়া দূরে থাকুক্, ঘটনা-চক্রে বিরুদ্ধ ফল লক্ষিত হয় কেন ? তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা, না আমরা যথাবিধি পাঠ করিতে জানি না! এত গেল পুরাণের কথা। আমরা প্রত্যহ বৈদিকমন্ত্রে স্বস্তি-বাচন করিয়া থাকি—"স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধ-শ্রবাঃ"—অর্থাৎ আমরা বৃদ্ধপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি—ইন্দ্র জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তাই ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করি—আমাদের স্বস্তি হউক্। কেননা, কালে সুবৃষ্টি হইলে শস্য হয়, শস্য হইলে আমা-দের স্বস্তি হয়; কিন্তু সে স্বস্তি হয় না কেন ? তবে কি বেদ মিথ্যা ? ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের স্বার্থসাধনামূলক স্বকপোল-কল্পিত ? আবার বলি—"স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ"। অর্থাৎ বিশ্বসংসারের প্রকাশক সূর্য্য আমাদের স্বস্তি করুন। তাৎপর্য্য, নীরোগাবস্থায় যেন স্বস্তিতে থাকি। সূর্য্যের কিরণ স্থানীয় মৃত্তিকার বিপাকে রোগ উৎপাদন করে। একই জল ভিন্ন২ জলাশয়ে পতিত হইয়া ভিন্ন২ গুণধারণ করে, সেইরূপ একই সূর্য্যকিরণ মৃত্তিকাবিশেষের সহযোগে স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর হয়। এতন্মূলকই "শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্নীয়াৎ গৃহ্নীয়াৎ মার্গপৌষয়োঃ।" বচন। সূর্য্যের একটী নাম আরোগ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আছে,

"আরোগো ভ্রাজঃ পটরঃ পতঙ্গঃ
স্বর্ণরো জ্যোতিষীমান্ বিভাসঃ।
তে অস্মৈ সর্ব্বে দিবমাতপন্তি
উর্জ্জং দুহানা অনপস্ফুরন্ত ইতি।"

ইহার অর্থ—সূর্য্যের সাতটি নাম—আরোগ, ভ্রাজ, পটর, পতঙ্গ, স্বর্ণর, জ্যোতিষীমান্ ও বিভাস। গুণভেদে নাম ভেদ হইয়াছে এই আরোগ সূর্য্য আকাশে প্রকাশ পাইয়া কি করেন? যদি প্রতিকূল-স্বরূপে প্রকাশ না পান, তাহা হইলে বল-পুষ্টি সম্পাদন করেন। অন্যথা নানা রোগের উৎপাদন করেন। ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন এহেন সূর্য্যের ... তথা সূর্য্যকে দ্বার করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি স্বস্তি হয়না কেন? কেন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হই! তবে কি বৈদিক ফল পার-লৌকিক? ইহজীবনে কি উহা প্রত্যক্ষ হয় না? কিন্তু বেদের একটি নাম প্রত্যক্ষ—
"স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং।"
এতৈরাদিত্যমণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে॥

স্মৃতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বেদ ঐতিহ্য ও ও অনুমান এই প্রমাণ-চতুষ্টয়ের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের অনুমান করিবে। সেই প্রত্য-ক্ষের কথা অপ্রত্যক্ষ হয় কেন? কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ না হওয়ায় নানা কুটতর্কের উদয় হয়। বাস্তবিক বেদও মিথ্যা নয়, কর্ম্মকাণ্ডও মিথ্যা নয়, ফলও অপ্রত্যক্ষ নয়। ফল কথা, আমরা মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে জানি না। আমাদের নিকট শ-ষ-স সবই সকার, জ-য দুইই জকার, দুটী ণ-নই ন ইত্যাদি। কাজেই প্রার্থনাও ঠিক হয় না, ফলও ফলেনা। বরং বিপরীত ফল হয়। ঋগ্ভাষ্যোপোদ্ঘাতে আছে—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো
ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি। যথেন্দ্র-
শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

আবার উচ্চারণ ঠিক হইলেও অর্থ-বোধ না হইলে ফল হয় না।

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ
অধীত্য বেদং ন জানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে
নাকমেতি জ্ঞান-বিধূত পাপ্মা॥

ডালপালাহীন শুষ্ক বৃক্ষের নাম স্থাণু অর্থাৎ মুড়গাছ। মুড়গাছ যেমন আপনার ভার আপনি বহন করে মাত্র, বৃক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ফলফুল সম্পাদন করিতে পারে না; কেবল জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য দরকার হয়, সেইরূপ অর্থ-বোধ না করিয়া উচ্চারণ শিখিয়া বেদের অভ্যাস করিলে ভারবাহী হইতে হয়, প্রকৃত ফললাভ হয় না। তবে ব্রাত্যত্ব নামক একজাতীয় পাপনাশ হয় মাত্র। আরও বলিয়াছেন—

"যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো নতজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥"

যাহা (অবিজ্ঞাত) অর্থবোধ না করিয়া গুরুর নিকট পঠিত হইয়া যথাযথ উচ্চারিত হয়, তাহাও অগ্নিশূন্য অঙ্গারে প্রক্ষিপ্ত শুষ্ক-কাষ্ঠের ন্যায় জ্বলে না—অর্থাৎ সেরূপ বেদমন্ত্র পাঠে ফল হয়না। তাদৃশস্থলে বেদের মুখ্যবেদত্ব থাকেনা। কেননা, জ্ঞানার্থ বিদ্ ধাতু হইতে বেদশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বেত্তি অনেন ইতি বেদশব্দ-নির্ব্বাচনম্। তথাচ
"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়োন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা।"

প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যেবস্তু বোঝা যায়না, তাহাই বেদে বিদিত হওয়া যায়

বলিয়া 'বেদ' বেদ নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের নিকট বেদ অবেদ হইয়াছে। কাজেই ফল হয়না।

> উতত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচং
> উতত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাং।
> উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
> জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

অর্থাৎ কেহ দেখিয়াও বেদবাক্যকে দেখে না, কেহ শুনিয়াও শোনে না। স্ত্রী যেমন সুবেশ ধরিয়া কামযমান পতির নিকট আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ যে বেদরক্ষা করিবার চেষ্টা করে, বেদ তাঁহারই নিকট আত্মপ্রকাশ করেন।

বিনা অর্থবোধে ফলস্বীকার করিতে হইলে, শুকপক্ষীর অহরহঃ কৃষ্ণনামোচ্চারণে স্বর্গলাভ স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা যায়, "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"। কিন্তু ভাব কৈ? আমাদের ভাব থাকিলে তো ভগবান্ ভাবগ্রহণ করিবেন? আমাদের যে ভাবেরই অভাব। অর্থবোধ এবং যথাস্বরে উচ্চারণ না হইলে ভাব আসিবে কেন? রসবোধ থাকিলে তো রসের সঞ্চার হইবে?

একে উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই, দ্বিতীয়তঃ অর্থবোধ করিবার ক্ষমতা নাই। তৃতীয়তঃ আমাদের মুখ্য অধিকারও নাই। তৈত্তিরীয়-উপনিষদে লিখিত হইয়াছে— যাচকের আস্তিক্যবুদ্ধি চাই এবং সংযম ও তন্ময়তা প্রভৃতি গুণ না থাকিলে কার্য্যে ফল হয় না। বঙ্গে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদ্বারা ক্রিয়াদক্ষ লোক প্রস্তুত হয়না কেন? বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফল চিরস্থায়ী। অচিরফলস্থায়ী পুরোহিত-বিদ্যালয় স্থাপন একান্ত কর্ত্তব্য। কার্য্যফল প্রত্যক্ষ দেখান'র চেষ্টা করুন। যথাযথ ক্রিয়াবান্ পুরুষ প্রস্তুত হইলে আর বাহ্যোপকরণের বেশী আবশ্যকতা থাকিবেনা। যাহা এখন যন্ত্রে হয়, সেকালে তাহা মন্ত্রে হইত। আমরা এখন সেই মন্ত্রকে সারাৎসার করিয়া মন্ত্রোচ্চারে যত্নবান্ ... উপসংহারে বক্তব্য—

> "সেক্তব্যো ননু মারবস্তরুরয়ং পাথোদ
> পাথোভিরৈর।
> ... পরিষিঞ্চ কিং চিরয়সে কালঃ
> পরিক্রামতি।
> মূলে শুষ্করসে দলে বিগলিতে
> শীর্ণে শিখা বল্কলে
> নস্যাদস্য পরিস্থিতেঃ কতুকতো
> ধারাপি ধারাং ভব॥

অর্থাৎ হে মেঘ! এখনও মরুভূমিতে বৃক্ষ সজীব আছে। অতএব সলিলের জলকণা দ্বারা ইহার সেচন কর। সেকাল সময় কিন্তু যায়। মূল নীরস হইলে, পাতা ঝরিয়া পড়িলে ... শুষ্ক হইলে, মুষলধারায় ... করিলেও ... হইবে না। অতএব ক্রিয়াসংস্থাপন ... সময়ে চেষ্টা করুন। ... প্রত্যেক ব্যক্তি বর্ণাশ্রমোচিত অ... পালনপূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করুন ব্যষ্টিচেষ্টা সমষ্টি-চেষ্টার ফলপ্রসব করিবে।

আজকাল প্রায় সমস্ত জাতিই উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টায় ধাবিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কেবল অর্থলালসায় ... বসিয়া পড়িয়াছেন। সঙ্করণশীল উপবিষ্টকে ধরিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাই ব্রাহ্মণ আর অন্য জাতিতে ভেদ উপলব্ধ হয় না

আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্য্যে সব সমান হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভাবা উচিত—

"ব্রাহ্মণস্যচ দেহোহয়ং ক্ষুদ্র-কামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসেচেহ পরত্রচৈব শর্ম্মণে॥"

ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র বিষয়ভোগের জন্য দেহ-ধারণা অভিমত নয়। ইহকালে কেবল কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং পরকালে শান্তি-সুখের জন্য ব্রাহ্মণের শরীর-ধারণ। ভগবান্ ব্রাহ্মণগণকে আবার ক্রিয়ারত মন্ত্রপরায়ণ করুন্। যথাবিধি অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্ম সুফল প্রসব করুক্। দেশের উপদ্রব উপসর্গ দূরীভূত হউক্। জনগণ চরিতার্থ হউক্।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

সংসার-মরু।

সংসার-মরু মাঝারে বুঝি প্রাণ যায়!
আছে নাকি মরূদ্যান?
খুজিয়াছি বহু স্থান
না পেয়ে তা'র সন্ধান,
ভুলিয়াছি বহুবার মৃগতৃষ্ণিকায়॥

আঁকি চারু চিত্র তা'র মত কল্পনায়
সাহসে করিয়া ভর
হইতেছি অগ্রসর;
সীমাহীন এ প্রান্তর,
দুঃখ-শোক-সৌর-তাপে দহিতেছে কায়।

শুনেছি উদ্যান নাকি সুচারু শোভায়
শোভে সদা মনোহর,
নির্ম্মেঘ নীল অম্বর
ঢালে দিনে সৌরকর
যে কর মৃদুলস্পর্শে প্রসূনে ফোটায়।

ধীরি ধীরি সমীরণ বহিছে তথায়;
নাহি ঝরে ফোটা ফুল,
সৌরভে প্রাণ আকুল,
মধু-লোভী অলিকুল
মধুর গুঞ্জনে সদা পরাণ মাতায়।

রজনীতে সুধাকর ভাসায় ধরায়
তরল রজত করে,
প্রতিনিশি ব্যোমপরে
পূর্ণকলা শোভা ধরে
দিক্ হ'তে দিগন্তরে ভাসিয়া বেড়ায়।

মঞ্জু কুঞ্জবনে তথা পাখী সদা গায়,
সুমধুর কল-তানে
সুধাধার ঢালে প্রাণে,
ভক্ত যথা মত্ত প্রাণে—
বিভুগুণ-গানে সদা শ্রবণ জুড়ায়।

সকল ঋতুর ফুল ফুটিছে তথায়,
সকল ঋতুর ফল
প্রসবিছে দ্রুমদল,
তাহে পুনঃ সুশীতল
ছায়া-দানে সদা তা'রা পথিকে জুড়ায়।

কুলুকুলু গান করি স্রোতস্বতী-ধায়,
আছে যার সেই কাণ
শোনে সে মধুর গান
মুগ্ধ যাহে মনঃ প্রাণ,
কিবা তালে বীচিভঙ্গে নেচে নেচে যায়।

চলি ভব-মরু-মাঝে ক্লান্ত মম কায়;
সে উদ্যান লক্ষ্য করে
চলেছি সাহস-ভরে,
দগ্ধ দেহ সৌর-করে
হ'য়েছে পাথেয় খাদ্য নিঃশেষিত প্রায়।

মাতা পিতা বন্ধুজন ছেড়েছে আমায়
　　কেহ আগে কেহ পাছে
　　ক্লান্ত হয়ে পড়িয়াছে।
　　ক্ষীণকণ্ঠে জল যাচে
সম্মুখে বনিতা মম বালুকা-শয্যায়॥

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী।

আয়ুর্ব্বেদ।

আহার—ঔষধ।

জানিনা, কেন আমার ভিষক্ বন্ধুগণ সময়ে আমাকে দ্রব্যগুণ শিখান নাই। দ্রব্য-গুণ যৌবনে জানা থাকিলে, আমি আজ অকর্ম্মণ্য হইব কেন? কত দীর্ঘজীবন পাইতাম। দ্রব্যগুণে অধিকার থাকিলে সমাজ হইতে কতশত রোগ দূরে থাকিত। কতরোগ অঙ্কুরে বিলুপ্ত হইত। কত অকাল-মরণ নিবারিত হইত।

বুঝিবা বাঙ্গালীর মজ্জাগত আলস্যগুণে ভিষক্‌কুল সনাতন আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারে বিমুখ। (১) নতুবা মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত যাহাকে অপথ্য বলিয়াছেন, হিন্দুর গৃহে গৃহে তাহা নিত্য ব্যবহৃত হইবে কেন?

ঋতুবিশেষে খাদ্যরস ব্যবস্থা করিতে হয়। গ্রীষ্মে যে রস সুপথ্য, শীতে সে রস কুপথ্য এবং গ্রীষ্মে যে রস কুপথ্য, শীতে তাহা সুপথ্য। এ সকল খাদ্যবিচার হিন্দুর গৃহে কি হইয়া থাকে?

আবার কতকগুলি দ্রব্য কুপথ্য বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুর রন্ধনশালায় ঐ বর্জ্জিত খাদ্যগুলি সাদরে নিত্য গৃহীত হইতেছে।

সুপথ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে ঋতু-বিশেষে ধাতুর বল—অবল জানা আবশ্যক। যথাঃ—

ধাতু	গ্রীষ্ম	প্রাবৃট্	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত	বসন্ত
বায়ু	সঞ্চয়	ব্যাধি	উপশম	০	•	•
পিত্ত	•	•	সঞ্চয়	ব্যাধি	উপশম	•
কফ	উপশম	•	•	•	সঞ্চয়	ব্যাধি।

সুতরাং গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্‌কালে (২) বায়ু-নাশক রস গ্রহণ করিতে হইবে, বর্ষা ও শরৎকালে পিত্ত-নাশক রস গ্রহণ করিতে হইবে এবং হেমন্ত ও বসন্তকালে কফনাশক রস গ্রহণ করিতে হইবে।

　আয়ুর্ব্বেদ-মতে স্বাদু-অম্ল ও লবণ রসঃ—
　বায়ুনাশক ও কফবর্দ্ধক
　কটু তিক্ত কষায় রসঃ—
　বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-নাশক
　স্বাদু তিক্ত এবং কষায়রসঃ—
　পিত্ত নাশক ও অপরত্রয় পিত্তবর্দ্ধক।

স্থির সিদ্ধান্ত এই যেঃ—

বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত স্বাদু অম্ল লবণরস ভোজন করিবে এবং কটু তিক্ত কষায়-রস ত্যাগ করিবে। ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত স্বাদু তিক্ত কষায়রস ভোজন করিবে এবং অম্ল লবণ কটু বর্জ্জন করিবে। এবং পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত

(১) আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ চিকিৎসক-গণ লুকাইয়া রাখেন নাই। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক তাঁহারা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা যেরূপ অল্পমূল্যে দ্রব্যগুণ বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন, তাহা জানা থাকিলে এঅনুযোগ 'অকারণ' মনে হইবে। হিঃ পঃ সঃ

(২) প্রাবৃট্ ও বর্ষা এক। লেখক শীতের উল্লেখ করেন নাই। গোল হইয়াছে। হিঃ পঃ সঃ।

কটু তিক্ত কষায়-রস ভোজন করিবে এবং স্বাদু অম্ল লবণ রস বর্জন করিবে।

যে হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদের বলে হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতা, জগতে অদ্যাপি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সেই প্রাচীন সভ্যতার নিয়ম গুলি যথার্থ প্রতিপালিত হইতেছে না। তাই হিন্দুর সভ্যতা বচন-গত।

মানুষ মারিবার কল আবিষ্কারে পাশ্চাত্য সভ্যতা অদ্বিতীয়। মানবের দীর্ঘ-জীবন-লাভের উপায় আবিষ্কারে প্রাচ্য প্রাচীন সভ্যতা অদ্বিতীয়।

ঋতু-বিশেষে ভোজন-রস নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য কিনা—এ প্রশ্ন পাশ্চাত্য-মস্তিষ্কে অদ্যাপি উদিত হয় নাই।

ঋতুবিশেষে ভোজন-রস-নির্ব্বাচন-বিধির অনেক পরিপোষক আছে।

সর্ব্বঋতুতে ত্রিদোষঘ্ন দ্রব্য গুলি গ্রহণের কোন বাধা নাই বরং উহারা গুণ-কারক।

ত্রিদোষঘ্ন দ্রব্য।

১। রক্তশালি তণ্ডুল
২। ষষ্টিক তণ্ডুল
৩। সৈন্ধব লবণ
৪। হরিণ (তাম্রবর্ণ মৃগ) মাংস
৫। এণ (কৃষ্ণবর্ণ মৃগ) মাংস
৬। ছাগ মাংস
৭। লাবপক্ষীর মাংস
৮। তিত্তিরি পক্ষীর মাংস
৯। ছাগ দধি
১০। নারী দুগ্ধ
১১। ছাগদধি
১২। ত্রিদোষঘ্ন দ্রব্যসহ পাকে ঘৃত
১৩। পুরাণ মধু
১৪। পুরাণ ইক্ষুগুড়
১৫। মধুর দাড়িম
১৫। প্রাচীন আমলক
১৬। শুষ্ক কুল
১৭। পাকা কুষ্মাণ্ড
১৮। পটোল
১৯। অঙ্কবাল মূলক
২০। সিদ্ধ কপিত্থ
২১। হরিতকী
২২। বৃষ্টির জল
২৩। শিলাজল

(ক্রমশঃ)

শ্রীবৃদ্ধ—

বিধবা।

শুভ্রবসনসংবৃত কায়
শ্বেত-সরোজ চিত্ত।
হিন্দুর ঘরে দেব-দুর্লভ
পূত পরম বিত্ত।
হৃদি গুণ্ঠন মাখা চন্দন
নন্দনতরু-মূলে।
পূর্ণ জ্যোতিঃ বিকাশি বিশ্ব
নিয়েছ আপন কোলে
চিরবঞ্চিত করি সিঞ্চিত
পানীয়-সেরা স্নেহ।
অশান্তি-ঘেরা সংসারমরু
শান্তি ভরিয়া দেহ।
মূর্খ মানব বোঝে না তাই
তোমায় 'বিধবা' কহে।
ওগো তবতরে সংসার ঘোরে
প্রীতির মলয়া বহে।
কিসের বিধবা, তুমি যে সধবা
পূর্ণতা-ভরা প্রাণ ;—
স্বামীর পুণ্য-প্রেম-চিন্তা—
ভরিত হৃদয় খান॥

(২)

বন্ধন-হীন বন্দনে তব
  সান্ত্বনা নব প্রাণে,
গৃহ প্রাঙ্গণে স্নেহসিঞ্চনে
  অমরতা টানি আনে।
ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মচর্য্যে
  নূতন আলোক আনি'—
পুরিত নবীন প্রেম-প্রবাহে
  বাঙ্গালীর গৃহখানি।
থাকুক তুচ্ছ সমাজ-কার্য্যে
  সতত তোমার মানা ;—
বাঙ্গালীর গৃহে ওগো চিরতরে
  করিও গৃহিনী-পণা।
মুক্তি মঙ্গল সম্বল তব—
  দেব মন্দির খানি।
তব আবাহন গোলোক ত্যজিয়া
  হরিকে আনিবে টানি।
কিসের বিধবা, তুমি যে সধবা
  পূর্ণতা-ভরা প্রাণ ;—
স্বামীর পুণ্য-প্রেম-চিন্তা—
  ভরিত হৃদয় খান॥

(৩)

একের চিন্তা বিদায় নিয়ে
  তোমার হৃদয় ত্যজে।
শতেক চিন্তা উদিত হ'য়ে
  শতেক প্রকারে রাজে।
বিস্মৃতি পুনঃ জগত ত্যজিলে
  স্মৃতির আবেশে পুরা।
মহতী প্রকৃতি মহৎ হৃদয়
  বিরাট্ মহতে ভরা।
"বিধবা-বিবাহ নাহি 'দশে আর
  আ্যাগেনা কভু দেশ।"
বলে যারা, তারা চাহে ডুবাইতে
  অতীত গরিমাশেষ।
ধর্ম্মের তরে অমর-ব্রত
  আদর্শ মহা উচ্চ ;—
প্রার্থনা কভু তাদের নহে
  সংসার-সুখ তুচ্ছ।
কিসের বিধবা, তুমি যে সধবা
  পূর্ণতা-ভরা প্রাণ ;—
স্বামীর পুণ্য-প্রেম-চিন্তা-
  ভরিত হৃদয় খান॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ ভারতী।

রাজনীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উত্থানহীনো রাজাপি বুদ্ধিমানপি নিত্যশঃ।
প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রূণাং ভুজঙ্গ ইব নির্বিষঃ॥১৬

রাজা বুদ্ধিমান্ হইয়াও নিয়ত উদ্যোগ-বিহীন হইলে নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় শত্রু-গণের ধর্ষণীয় হইয়া থাকেন।১৬

নচ শত্রুরবজ্ঞেয়ো দুর্ব্বলোহপি বলীয়সা।
অল্পোহপি হি দহত্যগ্নির্বিষমল্পং হিনস্তি চ॥১৭

শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করা বলবানের কর্ত্তব্য নহে, কারণ অগ্নি অল্প হইলেও দগ্ধ করিতে এবং বিষ অল্প-মাত্র হইলেও জীবন নাশ করিতে পারে।১৭

একাঙ্গেনাপি সম্ভূতঃ শত্রুর্দুর্গমুপাশ্রিতঃ।
সর্ব্বং তাপয়তে দেশমপিরাজ্ঞঃ সমৃদ্ধিনঃ॥১৮

শত্রু, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অঙ্গ সকলের একাঙ্গ মাত্র লইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সমৃদ্ধিমান্ নৃপতির সমস্ত দেশকেই সন্তাপিত করিতে পারে।১৮

রাজ্ঞো রহস্যং তদ্বাক্যং যথার্থং-লোক-সংগ্রহঃ।
হৃদি যচ্চাস্য জিহ্মং স্যাৎ কারণেন চ যদ্ভবেৎ
॥১৯

যচ্চাস্য কার্য্যং বৃজিন মার্জ্জবেনেহ নির্দ্দিশেৎ।
দম্ভনার্থঞ্চ লোকস্য ধর্ম্মিষ্ঠামাচরেৎ ক্রিয়াম্ ॥২০

রাজ্যং হি সুমহৎ তন্ত্রং ধার্য্যতে নাকৃতাত্মভিঃ।
ন শক্যং মৃদুনা বোঢুমায়াসস্থান মুত্তমম্ ॥২১
রাজ্যং সর্ব্বামিষং নিত্যমার্জ্জবেনেহ ধার্য্যতে।
তস্মান্মিশ্রেণ সততং বর্ত্তিতব্যং যুধিষ্ঠির ॥২২

রাজা নিজ গোপনীয় বাক্য সকল, শত্রুবিজয়ের নিমিত্ত লোকসংগ্রহ এবং শারীরিক বা মানসিক কৌটিল্যাদি এবং যে সকল হীনকার্য্য করিয়া থাকেন, সকলের নিকট সারল্য প্রকাশ করিয়া তৎসমস্তই গোপন করিবেন। লোক সকলকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্ম সকলের আচরণ করিবেন; কারণ অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ সুমহৎ রাজ্যতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যুধিষ্ঠির! অত্যন্ত মৃদু ব্যক্তি এরূপ আয়াসস্থান রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না এবং নিতান্ত সরল-প্রকৃতি হইলেও এতাদৃশ সর্ব্ব-লোক-লোভজনক রাজ্য রক্ষা হয় না; সুতরাং সারল্য ও ক্রৌর্য্য এই উভয়মিশ্র বৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ১৯—২২

যদ্যপ্যস্য বিপত্তিঃ স্যাদ্রক্ষ্যমাণস্য বৈ প্রজাঃ।
সোঽপ্যস্য বিপুলোধর্ম্ম এবং-বৃত্তা হি ভূমিপাঃ ॥২৩

যদি এই নিয়মে প্রজা সকলকে রক্ষা করিতে রাজার বিপত্তিও উপস্থিত হয়, তথাপি ইহাই তাঁহার বিপুল ধর্ম্ম; কারণ এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করাই নৃপতির কর্ত্তব্য। ২৩

(ক্রমশঃ)
শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

অপরাধের কথা। ধর্ম্মজ্ঞানের শৈথিল্যে দেশে অপরাধের প্রাবল্য ঘটিতেছে। প্রকাশ—১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ৩৫২০৮৭টী ফৌজদারী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের অপেক্ষা এই বর্ষে ১৯০১৮টী অধিক অপরাধজনক ব্যাপার ঘটিয়াছে। অপরাধের এরূপ প্রসরবৃদ্ধি বস্তুতই আশঙ্কাজনক।

পরীক্ষাসংবাদ। আগামী জ্যৈষ্ঠ-মাসের ৩ শে হইতে ফরিদপুর সুহৃৎসভার নানাবিভাগের পরীক্ষা আরব্ধ হইবে। ফরিদপুরের যে সকল ব্যক্তি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অচিরে ২০০।৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আবেদন করুন।

সম্পাদনে রাজ্ঞী। ভাওনগরের মহারাণী সাহেবা গুজরাটী ভাষায় একখানি সংবাদপত্র পরিচালন করিয়া থাকেন। অপর সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়াও থাকেন। সম্প্রতি মহারাণী সাহেবা, বিলাতের সংবাদপত্রসম্পাদিকাদের সমিতির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। বেশত!

নূতন কলেজ। কলিকাতা ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ সাউথ্ সুবার্ব্বন্ স্কুল কলেজে পরিণত হইল। আপাততঃ ইণ্টারমিডিয়েট্ আর্ট কোর্স পর্য্যন্ত অধ্যাপনার ব্যবস্থা। কর্ত্তৃপক্ষের যত্নচেষ্টা অক্ষুণ্ণ থাকিলে কালে আরও উন্নতি হইবে।

গ্রীক্ ফায়ার্। গ্রীক্ ফায়ার্ একপ্রকার ভীষণ পদার্থ। ইহার অনল এমন তীব্র যে, তাহা জলেও নির্ব্বাপিত হয়না। কিয়দ্দিনপূর্ব্বে মিরাটে একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক, কতকগুলি বোমা ও কয়েক বোতল গ্রীক্ফায়ার্ সহ ধৃত হইয়াছে। এই যুবক আমেরিকা—প্রত্যাগত। এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা না করাই ভাল ছিল। কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা পরিণামে সমুদ্রমধ্যে দ্বীপেই বাস করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২২ বর্ষ, ২২ শ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩২২ সাল।
২য় সংখ্যা। | | ১৮৩৭ শকাব্দা।

পুনর্জ্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ।

জন্মান্তরবাদ বিষয়ে আর্য্যশাস্ত্রকারগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। জন্মান্তরবাদ অপরদেশের মনীষিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সমর্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু অধুনা সকলের স্বীকৃত। জীবগণের মৃত্যুই জীবনের শেষ নহে, বরং দ্বার বলা যাইতে পারে। জীবের দেহ যখন জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আইসে, তখনই মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় নূতন দেহ গ্রহণ করিতে হয়।

পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও বাসনাসমন্বিত পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের জীব—সংজ্ঞা। অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত জীবচৈতন্য, অখণ্ড পরম চৈতন্যের অংশ। মৃত্যুর পর যে জীব আপনার বাসনার সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারিয়াছে, সেই জীবই মুক্ত। জন্মজন্মান্তরের পাপপুণ্যোপচিত দৃঢ়বদ্ধ বাসনার সমূলে উচ্ছেদ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে। ঐ বাসনাদ্বারা জীব সম্পূর্ণ পরবশ হইয়া থাকে; ঐ বাসনাবশেই পরলোকে সুখদুঃখ, মর্ত্ত্যে পুনরায় দেহ–ধারণ।

এই মুক্তপুরুষেরই কেবল পারলৌকিক স্বর্গনরক বা পুনর্জ্জন্ম নাই। এতদ্ব্যতীত সকল জীবেরই পুনর্জ্জন্ম অপরিহার্য্য। কেহবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, কেহবা কিয়দ্দিন পরে, কেহবা বহুকাল পরে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবেই। বায়ুতে যেমন সুগন্ধ থাকে, বাসনা তদ্রূপ জীবে নিরন্তরই বিদ্যমান রহে। বাসনার অনুরূপই জন্ম। সৎবাসনার ফলে শুভজন্ম, অসৎ বাসনার

ফলে অশুভ জন্ম। পুণ্যাত্মিকা বাসনা সৎ, পাপাত্মিকা বাসনা অসৎ। পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্য পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার। উহাই মৃত্যুর অন্তে বাসনারূপে জীবের অনুবর্ত্তন করে। যৌবনে অত্যাচারের ফলে বার্দ্ধক্যে রোগ-ভোগ হয়। পিতা মাতা বা পূর্ব্বপুরুষের অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে। তবে পূর্ব্বজন্মোচিত পাপপুণ্যময়ী বাসনা জীবে অনুবর্ত্তিত হইবেনা কেন? বাসনার অবশ্য প্রকারভেদ আছে। কাহারও বাসনা সাধারণী। কাহারও বাসনা পাপপুণ্যোপচিতা অসাধারণী, কাহারও বা বাসনা উৎকটপাপপুণ্যোপচিতা অনন্য-সাধারণী। সাধারণ-বাসনা-সমন্বিত জীব মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জন্মিয়া থাকে; কারণ, তাহাদের বাসনা পাপপুণ্যোপচিতা না হওয়ায় অনুরূপ পারলৌকিক সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, বা স্বানুরূপ দেহ-ধারণের জন্য অপেক্ষাও করিতে হয় না। যাহাদের পাপপুণ্যোপচিতা বাসনা, তাহাদিগকে কিছুদিন আকাশে মেঘ-ঘটার মত আতিবাহিক লিঙ্গদেহে অবস্থিতি করার পর পুনরায় জন্ম লইতে হয়। আর যাহারা উৎকটপাপপুণ্যোপচিত-বাসনা-সমন্বিত, তাহারা বাসনার প্রাখর্য্যে লিঙ্গদেহে মানস-সংকল্প সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া অনুরূপ জন্ম-গ্রহণ করে।

প্রত্যেক জীবকেই স্থাবরসংশ্লেষ লাভ করিয়া তৎপরে জীবরূপে জন্ম লইতে হয়। স্থাবরের সহিত লক্ষ লক্ষ বাসনাময় চেতনাসমন্বিত জীব সংশ্লিষ্ট থাকে। শস্য-ভক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট জীব, রক্তের ভিতর দিয়া প্রথম শুক্ররূপে পশ্চাৎ রমণীগর্ভে গর্ভস্থ শিশুরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। শস্যের ভিতর জীব জন্মে না, রক্তের মধ্যে উৎপন্ন হয় না। সূক্ষ্ম বীজভূত জীব, শস্যে সংশ্লিষ্ট না থাকিলে চৈতন্যকে দেহের ধর্ম্ম মানিতে হয়, চার্ব্বাকমতই আসিয়া পড়ে।

দেহ পাঞ্চভৌতিক সংঘাত পদার্থ। চৈতন্য ইহা হইতে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র কোন চেতন না থাকিলে, সংহত রূপরসাদি বিষয় কখনও চেতন-সমন্বিত হইত না, এবং চেতনের অপেক্ষা ব্যতীত জড় পদার্থ, কখনই পরস্পর মিলিত হইতেও পারিত না। জড় বস্তু আর চৈতন্য, পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের মত বিরুদ্ধস্বভাব। মৃত্যু হইলে মৃতদেহই পড়িয়া থাকে, তাহা হইতে এমন একটি বস্তু চলিয়া যায়, যাহা মৃতদেহ হইতে স্বতন্ত্র।

"শরীরেষু ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ" চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইলে দেহের সঙ্গেই লোপ পাইত। আর তাহা হইলে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য-লোপ দেখিতে পাওয়া যাইত না। স্মৃতি, অনুভূতি, উপলব্ধি প্রভৃতি দ্বারা চৈতন্যের সত্তা

উপলব্ধি করিতে হয়। একের স্মৃতি কখন অপরে স্মরণ করে না, একের অনুভব অন্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই স্মৃতি ও অনুভব—যাহা আমি উপলব্ধি করি, অপরে যখন তাহা উপলব্ধি করে না, তখন স্মৃতি ও অনুভবাদি, প্রত্যেক চেতনভেদে পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু রূপরসাদি বিষয় আমার নিকট এবং প্রত্যেকের নিকট একই রূপ। আবহমান কাল ধরিয়া জড়ের দর্শন একই প্রকার। আমি যাহার যে রূপ, আকার ও পরিমাণ দেখি, সকলে তাহাই দেখে। ইহাই জড়ের প্রকৃতি। তাই বিষয় জড়, বিষয়ী চৈতন্য।

প্রত্যেক মানব মৃত্যু-অন্তে মানবই হইবে এমত নহে। কেহ উৎকৃষ্ট-যোনি, কেহ নিম্নশ্রেণী নর, কেহ পশু পক্ষী, কেহ কীটপতঙ্গ, কেহ বৃক্ষলতা, কেহ বা লোষ্ট্রপাষাণ রূপে জন্ম গ্রহণ করে।

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।

কৃতকর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে পর ক্রমে হউক, একবারে হউক, পুনরায় মানব-জন্মলাভ ঘটে। একজন্মের পাপেই বহুকাল নরক-ভোগ হইয়া থাকে, বা বহুজন্ম স্থাবর পশু পক্ষী বানরাদি জন্ম লাভ করিয়া ক্রমে মানব-পদবীতে উন্নীত হইতে হয়। পাশ্চাত্যের ক্রমোন্নতিবাদ কৃতকর্ম্মের ফলভোগের ক্রমিক স্তর মাত্র। এই ক্রমোন্নতিবাদ আর্য্যগণের পুনর্জ্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের অসম্পূর্ণ একাংশ মাত্র। এইরূপ একাংশ দৃষ্টে আপনার মত প্রচার করিয়া ডারুইন্ জগদ্ব্যাপী যশোরাশির দ্বারা অলঙ্কৃত। কৃতকর্ম্মের ফলভোগান্তে কাহারও ২ ক্রমোন্নতি বস্তুতই এই প্রকার হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতি তৎতৎকৃত পাপপুণ্যেরই ফল।

জন্মান্তরবাদ মানিলেই জগতের যাবতীয় বৈষম্যের মীমাংসা হইতে পারে। বৈষম্য সৃষ্টির স্বভাব—ইহার অর্থ কি? একজন হাইকোর্টের বিচারক, অপরে কুলী কেন? আপাতদৃষ্টিতে ইহা বর্ত্তমান জন্মের পুরুষকারেরই ফল। কিন্তু একজন রাজপুত্র হইয়া জন্মিল, অপরে অসভ্য-গৃহে জন্মিল—ইহা ত তাহার তৎজন্মের পুরুষকার নহে। অথচ বিচারক ও কুলীর বেলায় পুরুষকার, জন্মগত দারুণ বৈষম্যের বেলায় ঐ পুরুষকার হইবে না কেন? পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারের ফলেই কেহ উৎকৃষ্ট জন্ম, কেহ অপকৃষ্ট জন্ম লাভ করে। পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারের নামই দৈব বা অদৃষ্ট। একজনের বুদ্ধি কুশাগ্রতীক্ষ্ণ, অপর জনের বুদ্ধি মৃত্তিকা-স্থূল; একজনের প্রতিভা জগন্মান্য, অপরে তাহাতে বঞ্চিত; একজনের মেধা অনন্যসাধারণ, অপরের অতিস্থূল—এইরূপ সাঙ্ঘাতিক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তৎতজ্জন্মের পুরুষকার অর্থাৎ

অদৃষ্টই কারণ। জন্মান্তর ব্যতীত অদৃষ্টসত্তা নাই। পুনর্জ্জন্ম না মানিলে এই ঘোরতর পার্থক্যের কোন সন্তোষপ্রদ কারণ দৃষ্ট হয় না। "পিতা মাতার গুণে" ইহা মানিলে শিশুর প্রতি অবিচার করা হয়। পিতা-মাতার কৃত কর্ম্মের ফল সন্তান পাইবে কেন? একের কর্ম্মফল অপরে ভোগ করিবে কেন? পিতা মাতা ও পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণ সন্তানে সংক্রামিত হয় সত্য, কিন্তু সে দোষগুণ শিশুরই পূর্ব্বকৃতকর্ম্মানুযায়িক হইয়া থাকে।

গোবৎস জন্মিয়াই মাতার স্তন খুঁজিয়া লয়, বানর-শিশু জন্মিবা মাত্র বৃক্ষ-শাখা ধরে, পক্ষীশাবক ডিম্ব ফাটিয়া বাহির হয়। এ অণ্বেষণ, এ শাখা-গ্রহণ, এ বহির্গমন কে তাহাকে শিখাইল? পূর্ব্বজন্মের অনুসৃত শিক্ষা, বা জন্মান্তরোচিত সংস্কার ব্যতীত এ সকলের অন্য কোন কারণ বুঝা যায় না। রামকৃষ্ণের কথামৃতে পড়িয়াছি যে, (অনেকেই পড়িয়াছেন) এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারা আকাশেই ডিম্ব প্রসব করে; ডিম্ব শূন্যেই ফাটিয়া গিয়া তাহা হইতে শাবক বহির্গত হয়; পৃথিবীতে পড়িবার পূর্ব্বেই শাবকের চক্ষু ফুটে, তৎক্ষণাৎ উন্মিলচক্ষু শাবক, মাতার দিকে আকাশে উড়িয়া যায়। ইহার কারণ পুনর্জ্জন্ম-সংস্কার বিনা আর কি হইতে পারে? জন্ম, প্রবৃত্তি, রুচি, শিক্ষা, বুদ্ধি, মেধা প্রভৃতির ঘোরতর পার্থক্যের মীমাংসা পুনর্জ্জন্মবাদ ব্যতীত কোন রূপেই করা যায় না। অন্ধকার লক্ষ্যে লোষ্ট্রক্ষেপের মত প্রকৃতি বা স্বভাব-স্বীকারের কোন সার্থকতা নাই। প্রকৃতি বা স্বভাব-বৈষম্যের হেতু কি? পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মানুযায়ী প্রকৃতি বা স্বভাব গঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি বা স্বভাব আকাশ হইতে নামে না, ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হয় না। প্রস্তর, লোষ্ট্র প্রভৃতির প্রকৃতি বা স্বভাব, সৃষ্টির আদি হইতেই প্রত্যেকের একরূপ। একজাতীয় জড়ের প্রকৃতির পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক মানবের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। ইহার কারণ প্রত্যেকের কৃতকর্ম্ম। তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের পার্থক্য-হেতু প্রকৃতিও ভিন্ন ২। আকস্মিক বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইলে একই প্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আকস্মিক বা যদৃচ্ছালব্ধ বলিলে সৃষ্টি-কর্ত্তাকে খামখেয়াল, পক্ষপাতী, অথবা নিষ্ঠুর বলিতে হয়। সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখিলে আকস্মিক বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বলা কোন ক্ষেত্রেই চলে না।

পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নহে। পুনর্জ্জন্মযায়ী জীব সংকল্পের মত, স্বপ্নের মত স্বকৃত কর্ম্মানুরূপ বাসনার স্মরণ করে। তৎপর ঐ বাসনার অনুরূপ সংস্কারবশে স্বকর্ম্মার্জ্জিত শরীর গ্রহণ করে।

স্বকামনানুরূপাণি দুঃখানি নরকে পুনঃ।
অনুভূয়াথ যোনীষু জায়ন্তে ভূতলে চিরাৎ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

মুক্ত ব্যতীত সকলকেই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্ত বিনা কাহারও অব্যাহতি নাই।

অতি শৈশবকালের কথা লোকে স্মরণ করিতে পারে না, জন্মান্তর-কথা স্মরণ করিবে কিরূপে? স্মৃতিশক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হইলে পুনর্জ্জন্মস্মৃতি ক্বচিৎ কোন ব্যক্তিতে সম্ভব হয়। ইহার উদাহরণ ১ বৎসর পূর্ব্বে একটি বালিকায় দেখা গিয়াছিল। সে আশ্চর্য্য পুনর্জ্জন্মস্মৃতির কাহিনী, সমস্ত সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের শাস্ত্র বলে, উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলে, জন্মান্তরদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্মস্মৃতি অস্পষ্ট ভাবে উদিত হইয়া থাকে। "যেন এই স্থান কখন দেখিয়াছি, ইহাকে বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে" ইত্যাকার স্মরণই জন্মান্তর-স্মৃতি।

তবে সাধারণতঃ পূর্ব্বজন্মে মানব ছিল কিনা নিশ্চয় নাই—একই দেশে জন্মিয়াছিল কিনা স্থির নাই—জন্মান্তরদৃষ্ট কোন বস্তুর দর্শন মিলিবে কিনা তাহার ঠিক নাই, কাজেই জন্মান্তরস্মৃতি কিরূপে উদিত হইবে? আর একই গৃহে পুনরায় জন্মিলে জন্মান্তরস্মৃতি অস্পষ্টও ফুটে না, কারণ শৈশব অবস্থা হইতে একই গৃহ, একই আত্মীয় পরিজন দেখিয়া "আমার ইহা জন্মান্তরদৃষ্ট" এরূপ অস্পষ্ট স্মৃতির অবকাশ-লাভ ঘটে না। পূর্ব্বজন্মে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, বিশেষ পরিচিত, বারবারদৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে যদি বর্ত্তমান জন্মে জ্ঞানসঞ্চারের পর দেখা যায়, তবেই অস্ফুট জন্মান্তরস্মৃতি অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে। কদাচিৎ প্রস্ফুট হইলে সংসারবিতৃষ্ণা স্বতই আসিতে থাকে, অবিদ্যাগ্রন্থি শিথিল হইয়া আইসে। বাসনার উচ্ছেদ হয় না বলিয়া মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু বাসনার মোহকারিতা সম্পূর্ণ নাশ প্রাপ্ত হয়। "আমি জানিতেছি, গত জন্মে, আমি উহার পতি বা স্ত্রী ছিলাম, উঁহাদের সন্তান ছিলাম," এরূপ বিশ্বাস জন্মিলে বর্ত্তমান জন্মের উপরও তেমন বিশ্বাস থাকে না, সেরূপ আদর হয় না। সংসারমায়া সেরূপ থাকে না, থাকিলেও তাহা মিষ্ট বোধ হয় না। কাজেই প্রস্ফুট জন্মান্তরস্মৃতির উদ্রেক বিধাতার অভিপ্রেত নহে, সৃষ্টিরক্ষোপকারী নিয়ম নহে। তবে অস্ফুট জন্মান্তরস্মৃতির উদয়ে কোন ক্ষতি নাই; উহা কিছুক্ষণের জন্য একটু উতলা ও ব্যাকুল করে মাত্র। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটিকে

পরমকবি কালিদাস অস্ফুট জন্মান্তরস্মৃতি একটি শ্লোকে সুন্দর ফুটাইয়া দিয়াছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি॥

"রম্য কোন বস্তু দেখিলে, মধুর কোন শব্দ শুনিলে, সুখী ব্যক্তিও কখন কখন পর্য্যুৎসুকমনা হইয়া থাকেন। নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির অবোধপূর্ব্ব জন্মান্তর স্মৃতিই মানসপটে সমুদিত হয়। জন্মান্তর সৌহার্দ জন্মান্তরেও স্থির থাকে। মৃত্যুকালে জীব যে ভাবনা করিবে, যাহার স্মরণ করিবে, সেই ভাবনা—সেই স্মরণ মৃত্যু-অন্তেও জীবে অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাপী মৃত্যুকালে স্বীয় দুষ্কৃতবশে বিভীষিকাই দেখে, কৃতকর্ম্মের ফল স্বরূপ ভাবনাই ভাবে। পাপীর পাপাত্মিকা বাসনা সমুদিত হওয়াই স্বাভাবিক। পুণ্যাত্মার পুণ্যফলস্বরূপ ভাবনা ও স্মরণ হয়। মৃত্যুকালে জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নাম করে, তজ্জন্য আত্মীয় স্বজন "গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া মরণাতুরের কর্ণের নিকটে চীৎকার করেন। আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি যাহাতে ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতে পারে, তজ্জন্য আত্মীয়বর্গ যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়া থাকেন। গঙ্গা—শক্তি। নারায়ণ—সগুণ সাকার পরমেশ্বর। ব্রহ্ম—নির্গুণ নিরাকার পরম চৈতন্য।

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইতে ইচ্ছা করি। তাহা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই।

একদিন আমার মাতামহ তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় একমাত্র পুত্রকে লইয়া গোন্দল-পাড়ায় যান। কারণ সন্তানকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। গোন্দলপাড়ায় কুকুরে কামড়ান'র ভাল ঔষধ আছে, ইহা সকলেই জানেন। মাতামহ সন্তানকে লইয়া যখন নৌকাযোগে ফিরিতেছিলেন, তখন পুত্র কহিল "বাবা, যে বাড়ীতে আমরা যাই, তাহার পাশের বাড়ীতে আমি ছোটবেলায় কত আসিয়াছি, কত খেলা করিয়াছি, বাড়ীতে একটি পেয়ারা গাছ আছে, ঐ গাছ হইতে আমি কত পেয়ারা খাইয়াছি। এমন কি বোধ হইতেছে যে, ঐ ঘরে শুইতাম। ঐ বাড়ীতে এক-জনকে আমি "মা" বলিতাম। তাহার পর রোগ হইল, আর জানি না। আমি ঐ বাড়ীতে যাইলে পর সেই "মা" কত আদর করিল, কোলে করিয়া ঘরে লইয়া

গেল, খাবার দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আবার আসিবে বাবা"? আমি বলিয়া আসিলাম, "শীঘ্রই আবার তোমার কাছে আসিব।" বাবা, বল না, আবার আমাকে এইখানে আনিবে?

বালক জন্মান্তর-ব্যাপারটিকে তাহারই বাল্যকালের ঘটনা বলিয়া মনে করিয়াছিল। মাতামহ বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পুত্রকে তিরস্কার করিয়া একথা কাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিলেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যে ঐ পুত্র, আমার একমাত্র মাতুল মারা গেলেন। বালক সেই কথাটি আমার দিদিমা প্রভৃতিকে প্রায়ই গল্প করিত। বারণ শুনে নাই।

কিছুকাল পরে মাতামহকে আবার কি কার্য্যে গোন্দলপাড়ায় যাইতে হয়। গিয়া দেখেন যে, সেই বাড়ীর পার্শ্বের পেয়ারা গাছে উঠিয়া একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক পেয়ারা পাড়িতেছে। তাঁহারই পুত্রেরই মত আকৃতি, কথার আওয়াজও সেই রূপই। অবশ্য আকৃতিগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্রই জন্মিয়াছে। মাতামহ আর সেই বালকটীকে দেখা দিলেন না। আবার তাহার পিতামাতার নয়নের আনন্দ সন্তানটিকে তাঁহাদের ক্রোড়চ্যুত করিবার ইচ্ছা করিলেন না। অশ্রুছলছল চক্ষু লইয়া মাতামহ তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমার মাতুল মরিবার সময়ে "মা আমি যাইতেছি" বলিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে এরূপ সত্য কাহিনী অনেক শোনা গিয়াছে। অনেকে সে সকল পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু এটি যে সত্য, আমাদের ইহা স্থির ধারণা।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪

অন্বয়। অর্পণং (অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণং স্রুবাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ (অর্প্যমাণ-ঘৃতাদিকং) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) ব্রহ্মণা (কর্ত্রা কর্ত্তাপি ব্রহ্মৈবেতি যজমানঃ স্বয়ং ব্রহ্মবিৎ) হুতং (হোমঃ) ব্রহ্ম, তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (ব্রহ্ম এব কর্ম্ম তস্মিন্ সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং তেন) ব্রহ্ম এব গন্তব্যং।২৪

বঙ্গানুবাদ। যদ্দারা যজ্ঞে ঘৃতাদি অর্পিত হয় সেই স্রুবাদি ব্রহ্ম; যজ্ঞার্থ ঘৃত ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম এবং হোমকর্ত্তা যজমানও ব্রহ্ম, তৎকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম; ঈদৃশ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা-বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন।

আলোচনা। যিনি জগতের যাবতীয় বস্তুতে এবং সমস্ত কার্য্যেই ব্রহ্ম-দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। যজ্ঞ-কার্য্যে, যিনি যজ্ঞার্থ দ্রব্য স্রুব ঘৃত অগ্নিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন এবং সেই হোমকর্ত্তা যজমানকে এবং হোমকার্য্যকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে সাধক কবি রামপ্রসাদের একটি গান এই—

শয়নে প্রণাম-জ্ঞান, নিদ্রায় কর মা'কে ধ্যান
ওরে নগর ফিরে মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মা'রে।
যত শোন কর্ণ-পুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশতবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মা'রে ॥২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫

অন্বয়। অপরে (অন্যে) যোগিনঃ (কর্ম্ম-যোগিনঃ) দৈবং (দেবা ইন্দ্রাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্ তং) এব (এবকারেণ ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্) যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি) অপরে (জ্ঞান-যোগিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব (উপায়েন, ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ) যজ্ঞং উপজুহ্বতি (যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তি) (সোঽয়ং জ্ঞান-যজ্ঞঃ)। ২৫

বঙ্গানুবাদ। অন্যযোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগীরা দৈব-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অপরযোগী অর্থাৎ জ্ঞানযোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিলাপন-সাধন করিয়া থাকেন—অর্থাৎ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মে অর্পণ করেন। ইহাই জ্ঞান-যজ্ঞ।২৫

আলোচনা। কর্ম্মযোগিগণ ইন্দ্রাদি-দেবোদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাতে উপাস্য দেবতায় ব্রহ্মবুদ্ধি থাকে না, দেবত্ব অর্থাৎ দৈবশক্তি-সম্পন্নত্ববোধে তত্তৃপ্ত্যর্থ যজ্ঞানুষ্ঠান থাকে। আর জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিলাপন-সাধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্ম-জ্ঞানে ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া থাকেন। ইহার নামই জ্ঞানযজ্ঞ।২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬

অন্বয়। অন্যে (নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমাগ্নিষু (ইন্দ্রিয়সংযমরূপেষু অগ্নিষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি (প্রবিলাপয়ন্তি ; ইন্দ্রিয়ানি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ) অন্যে (গৃহস্থাঃ) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়ান্যেব অগ্নয়স্তেষু) শব্দাদীন্ বিসয়ান্ জুহ্বতি (বিষয়ভোগসময়েঽপি অনাসক্তাঃ সন্তঃ অগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তি ইত্যর্থঃ)। ২৬

বঙ্গানুবাদ। অন্যে অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা, ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন। অন্য কেহ অর্থাৎ গৃহস্থগণ, ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল নিক্ষেপ করেন।২৬

আলোচনা। পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়-বিষয়-সংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীরা অর্থাৎ অনন্যচিত্ত ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ ব্রহ্মচারীরা, ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্মুখ করিয়া বাহ্য ব্যাপারে অনাসক্ত থাকিয়া সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থিতি করেন। অন্য কেহ অর্থাৎ গৃহস্থগণ, ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে ঘৃতরূপ শব্দাদি বিষয় সকল নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদির ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া তত্তৎ বিষয় ভোগ করিয়া সংসারে বাস করেন।২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞান-দীপিতে ॥২৭

অন্বয়। অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মনি সংযমঃ ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এব অগ্নিঃ তস্মিন্) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি তেষাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্ পাণ্যাদীনি তেষাং বচনাদীনি কর্ম্মাণি) প্রাণকর্ম্মাণিচ (প্রাণানাং দশানাং কর্ম্মাণি) জুহ্বতি [ধ্যেয়ং সম্যক্ জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মনঃ সংযম্য সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তি ইত্যর্থঃ] ।২৭

আলোচনা। যাঁহারা ঈশ্বর-লাভের জন্য ধ্যানযোগনিষ্ঠ, তাঁহারা আত্ম-সংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম হোম করেন—অর্থাৎ আত্মসংযমপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম অর্থাৎ

নেন্দ্রিয় চক্ষুঃকর্ণাদির কর্ম্ম দর্শন-শ্রবণাদি, কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্‌পাণ্যাদির কর্ম্ম ...ন-গ্রহণাদি এবং দশবিধ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান উদান, নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়—এই দশবিধ প্রাণের কর্ম্ম যথাক্রমে বহির্গমন, অধোনয়ন, আকুঞ্চন-প্রসারণ, সমুন্নয়ন, উর্দ্ধোন্নয়ন, উদ্‌গার, উন্মীলন ক্ষুৎকার, বিজৃম্ভন, সর্ব্বাঙ্গব্যাপিত্বাদি হইতে উপরত হইয়া একমাত্র ধ্যেয় ব্রহ্মে মনোনিয়োগ করিয়া যাবতীয় বাহ্য বিষয় হইতে মুক্ত থাকেন। ইহার নাম ধ্যান-যোগ। ধ্যানযোগী ধ্যানে পরমব্রহ্ম-দর্শনে আত্মানন্দ লাভ করেন।২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথা পরে
স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

অন্বয়। তথা পরে দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে) তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে) (কেচিৎ) যোগযজ্ঞাঃ (যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে) স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ (যথাবিধি বেদাভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে) জ্ঞানযজ্ঞাঃ (জ্ঞানং শাস্ত্রার্থ-বিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে) যতয়ঃ (যত্নশীলাঃ) সংশিতব্রতাঃ চ (সম্যক্‌শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে) ২৮

বঙ্গানুবাদ। কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, কেহ বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রয়ণাদি-তপোরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, কেহ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগযজ্ঞের অনু-ষ্ঠানকারী, কেহ বেদের অধ্যয়ন-শ্রবণাদি রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কেহ শাস্ত্রার্থ-বিজ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা; অপর কেহ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত। ২৮

আলোচনা। শ্রীভগবান্ বহুপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ করিতেছেন। দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী-খনন, দেব-মন্দির ধর্ম্মশালাদি নির্ম্মাণ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান—প্রতিপালন ইত্যাদি বিহিত দানের নাম দ্রব্যযজ্ঞ। সংযমন-সাধ্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের নাম তপোযজ্ঞ। চিত্তবৃত্তিনিরোধপূর্ব্বক যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম যোগযজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরু-শুশ্রূষাপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত বেদা-ভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়যজ্ঞ বা বেদযজ্ঞ। যুক্তিপূর্ব্বক বেদের গূঢ়ার্থ-নিচয়ের অব-ধারণের নাম জ্ঞান-যজ্ঞ। কোন নিয়মের কিয়দংশেও ত্রুটী না হয় এরূপ সাবধানে অনুষ্ঠিত নিয়মপালনের নাম দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ॥ ২৯

অন্বয়। তথা অপরে অপানে (অধোবৃত্তৌ) প্রাণং (ঊর্দ্ধবৃত্তিং) (পূরকেণ) জুহ্বতি (প্রক্ষিপন্তি) (পূরককালে প্রাণান্ অপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি) তথা (কুম্ভকেন) প্রাণাপানগতী (প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধো গতী) রুদ্ধা (নিরুধ্য) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-তৎপরাঃ) রেচককালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি। [এবং পূরক-রেচক-কুম্ভকৈঃ উপরমন্তি ইত্যর্থঃ]। ২৯

বঙ্গানুবাদ। অপর প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী, প্রাণাপান-গতি রোধ করিয়া প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু আহুতি প্রদান করেন। অপানবায়ুতে প্রাণ বায়ু আহুতি দান করেন। ২৯

আলোচনা। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকি তাহার নাম প্রাণ-বায়ু। এবং প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ত্যাগ করি, তাহার নাম অপান বায়ু। এই বায়ুর গমনাগমনই আমাদের শারীর ক্রিয়ার মূল। প্রণালীপূর্ব্বক এই বায়ুর গ্রহণ ধারণ ও ত্যাগের নাম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গযোগের প্রধান অঙ্গ। প্রাণবায়ু-গ্রহণের নাম পূরক, অপান-বায়ুত্যাগের নাম রেচক এবং প্রাণ বায়ু গ্রহণ করিয়া উভয়বায়ুরোধের নাম কুম্ভক। প্রাণ বায়ু গ্রহণ করিয়া পূরক, উভয় বায়ু রোধ করিয়া কুম্ভক, পরে অপান বায়ু ত্যাগ করিয়া রেচক—পুনরায় বিপরীতভাবে পূরক কুম্ভক রেচক করার নাম প্রাণায়াম। ইহাই অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি ও প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর হোম ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণাপান-বায়ুর একীকরণ রূপ প্রাণায়াম। ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম-সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরু-সত্তম ॥ ৩১

অন্বয়। অপরে নিয়তাহারাঃ [নিয়তঃ সংযতঃ আহারঃ যেষাংতে] [প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ সন্তঃ] প্রাণান্ [বায়ু ভেদান্] প্রাণেষু [প্রাণভেদেষু] জুহ্বতি। [কুম্ভকেন হি সর্ব্বেপ্রাণাঃ একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেষু ইন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ] এতে সর্ব্বেঽপি যজ্ঞ-বিদঃ [যজ্ঞজ্ঞাঃ] যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ। [যজ্ঞক্ষয়িতপাপাঃ [ভবন্তি]। ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ [যজ্ঞাবশিষ্টম্ অমৃতরূপং অন্নং ভুঞ্জতে যে তথোক্তাঃ] [তে] সনাতনং [নিত্যং] ব্রহ্ম [জ্ঞান দ্বারেণ] যান্তি [প্রাপ্নুবন্তি] হে কুরুসত্তম, অয়ং [অল্প-সুখঃ অপি] লোকঃ [মনুষ্য-লোকঃ] অযজ্ঞস্য [যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য] ন অস্তি কুতঃ অন্যঃ [বহুসুখঃ পরলোকঃ] ৩১

বঙ্গানুবাদ। অপর কেহ আহার-সংযম পূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া কুম্ভক দ্বারা সকল প্রাণের (বায়ুভেদ) একীকরণ দ্বারা হোম ভাবনা করেন। এবম্প্রকারে যজ্ঞ দ্বারা উক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞকারীর পাপক্ষয় হয়। ৩০

যজ্ঞকারীরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতরূপ অন্ন ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ, যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, তাহারা ইহলোকে সামান্য সুখও প্রাপ্ত হয় না, শ্রেষ্ঠ সুখের কথা কি! ৩১

আলোচনা। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোক্ত ২৫শ হইতে ৩০শ শ্লোক দ্বারা দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ ক্রিয়া। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-লাভের জন্য দ্বাদশ প্রকার ক্রিয়ার নাম দ্বাদশ যজ্ঞ। ১। তত্ত্বজ্ঞান-যজ্ঞ, ২। ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়সংযম-যজ্ঞ, ৩। ইন্দ্রিয়সংযমযজ্ঞ, ৪। ধ্যানযোগযজ্ঞ, ৫। দ্রব্যযজ্ঞ, ৬। তপোযজ্ঞ, ৭। যোগযজ্ঞ, ৮। স্বাধ্যায়যজ্ঞ, ৯। জ্ঞানযজ্ঞ, ১০। দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ, ১১। প্রাণায়ামযজ্ঞ, ১২। নিয়তাহারযজ্ঞ।

১। যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মে অর্পণ করার নাম তত্ত্বজ্ঞান-যজ্ঞ। ইহা ২৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

২। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় দর্শন-শ্রবণাদিতে অনাসক্ত হইয়া তত্তত্ বিষয় ভোগ করার নাম ইন্দ্রিয়বিষয়-সংযম-যজ্ঞ।

৩। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্মুখ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য জগতে অনাসক্ত থাকিয়া সংযমী হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়সংযমযজ্ঞ। ২৬শ শ্লোকে এই ২য় ৩য় যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে।

৪। আত্মসংযমপূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইয়া দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম হইতে উপরত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মে মনোনিয়োগ করার নাম ধ্যানযোগযজ্ঞ। এই ধ্যানযোগযজ্ঞ ২৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

৫। দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী-খনন, দেবমন্দির-ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান—প্রতিপালন ইত্যাদি বিহিত দানের নাম দ্রব্য-যজ্ঞ।

৬। সংযমপূর্ব্বক সাধিত কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের নাম তপোযজ্ঞ।

৭। চিত্তবৃত্তিনিরোধপূর্ব্বক যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগসাধনের নাম যোগ-যজ্ঞ।

৮। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত বেদাধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায় বা বেদযজ্ঞ।

৯। যুক্তিপূর্ব্বক বেদের গূঢ়ার্থনিচয়ের অবধারণের নাম জ্ঞানযজ্ঞ।

১০। কোন নিয়মের কোন অংশে ত্রুটী না হয় এইভাবে অতি সাবধানে সুষ্ঠুরূপে দৃঢ়ভাবে নিয়মপালনকরার নাম দৃঢ়ব্রত বা সংশিতব্রতযজ্ঞ।

পঞ্চম হইতে ১০ম পর্য্যন্ত যজ্ঞগুলি ২৮শ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

১১। পূরক—কুম্ভক—রেচক—ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম করার নাম প্রাণায়ামযোগযজ্ঞ। ইহা ২৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

১২। নিয়মী হইয়া যোগশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে উদরের চতুর্থ ভাগ শূন্য রাখিয়া আহারসংযমপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সংযমের নাম নিয়তাহার যজ্ঞ। এই যজ্ঞ ৩০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ, যিনি শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতান্ন ভোজন করেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল যজ্ঞব্রত করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে মুক্তি বা স্বর্গাদিসম্পত্ দূরের কথা, সামান্য সুখ-লাভও হয়না। ৩০। ৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

অন্বয়। ব্রহ্মণো (বেদস্য) মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (বিস্তীর্ণাঃ) (তথাপি) তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ (বাঙ্মনঃকায়-কর্ম্মজনিতান্ আত্মস্বরূপ-সংস্পর্শ-রহিতান্) বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা (জ্ঞাননিষ্ঠঃসন্) বিমোক্ষ্যসে (সংসারাত্ বিমুক্তো ভবিষ্যসি) ৩২

বঙ্গানুবাদ। বেদে এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে। সে সকলই কর্ম্মজ জানিও। এইরূপ জানিয়া (জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে) সংসার হইতে মুক্ত হইবে। ৩২

আলোচনা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে সকল যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, বেদে এইরূপ বহুযজ্ঞের বিধি আছে। এই সকল যজ্ঞ কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া হইতে উত্পন্ন, ইহাতে আত্মস্বরূপের সংস্রব নাই। এই প্রকার স্থির জানিয়া তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্ত হও। ৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩

অন্বয়। হে পরন্তপ, দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দেবাদি যজ্ঞাত্) জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ হে পার্থ অখিলং (ফল-সহিতং) সর্ব্বং (শ্রৌতং স্মার্ত্তং লৌকিকং বা) কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। (অন্তর্ভূবতি) ৩৩

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ, দ্রব্যসাধিত যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যে

হেতু হে পার্থ, বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত বা লৌকিক সকল কর্ম্মই জ্ঞানে অন্তর্ভূক্ত হয়। ৩৩

আলোচনা। বেদ-স্মৃতি-বিহিত বা লৌকিক যত প্রকার কর্ম্ম আছে, সকলই জ্ঞানের অনুগামী। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি-লাভ হয়। ৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪

অন্বয়। প্রণিপাতেন (প্রণামেন) পরিপ্রশ্নেন (কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্তেত ইতি জিজ্ঞাসয়া) সেবয়া (গুরু-শুশ্রূষয়া) তত্ জ্ঞানং বিদ্ধি (প্রাপ্নুহি) জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ) তত্ত্বদর্শিনঃ তে (তুভ্যং) জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি। ৩৪

বঙ্গানুবাদ। প্রণিপাত দ্বারা এবং "আমি কে, কিরূপে আমার সংসার-ভোগ নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা ও গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বদর্শীগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। ৩৪

আলোচনা। "আমি কে"? এবং "কি উপায়ে আমার সংসারযাতনার নিবৃত্তি হইবে?" ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। সদ্গুরু ব্যতীত এ প্রশ্নের উত্তর অন্যে দিতে পারেনা। সেই উপদেষ্টা গুরুতে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন। গুরুতে ভক্তি-বিশ্বাস ও তাঁহার যত্নশুশ্রূষা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয়না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত।

আচার্য্য শঙ্কর।

কোন্ তীব্রসাধনার সঞ্চিত পুণ্যরাশি-ফলে লভেছিল
ভারত তোমা' হৃদয়াকাশে হে আচার্য্য শঙ্কর!—প্রকাশিল
দীপ্তিমান্ অংশুমালী অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করি—
প্রচারিলে ধর্ম্ম সনাতন, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করি
ভারতের প্রাণ; শিখাইলে প্রসন্নগম্ভীর ভাষ্যে অমর-
অদ্বৈতকথা, বিচারি 'তত্ত্বমসি'-বাক্য মহান্ উদার

তোমার প্রসাদে নিমেষে মিলাইল যত তাপ-দুঃখ-ব্যথা ;
শিখিল নর 'জীব নহি' 'ব্রহ্ম আমি' ; ডুবিল বিশ্বজড়তা
ফুটিয়া উঠিল আনন্দের মহোদ্বেলতা। দাঁড়াও আসিয়া
বিশ্ব-কেন্দ্রমাঝে, শুনাও পুনঃ বহুত্বের দ্বার উদ্ঘাটিয়া
পূর্ণতা-লাভ হবে নহে বহুর কিন্তু একের আস্বাদনে—
—নহে ভোগের জঞ্জালে, কর্ম্মের বন্ধনে, কিন্তু ত্যাগে ও প্রেমে।
জেগে উঠুক আজি আবার বিশ্বের সুষুপ্ত স্তব্ধ পরাণ,
লভুক শান্ত ধ্যানে নির্বিশেষ-সমাধির সঞ্চার মহান্।
দূর হোক্ কোলাহল বৃথা মর্য্যাদা-গর্ব্ব আত্ম-অবমান
থাক্ সুধু নিত্য মৌন "স্বে মহিম্নি" স্থিত প্রকাশ গরীয়ান্।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ।

প্রেম।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্র প্রেমের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মানা। প্রেমের রাজত্ব, এ জগতে স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র বিরাজিত। প্রেমের বলেই এই জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি। জীব, প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়াই সেই জীবনের চরমলক্ষ্য অনন্ত, অপার, অসীম মহাপ্রেমার্ণবে পৌঁছিতে পারে।

"সর্ব্বভূতে প্রেম-প্রদর্শনই" সর্ব্বধর্ম্মের মূলকথা। জীব যে পর্য্যন্ত অন্য জীবের প্রতি প্রেম না দেখায়, সে পর্য্যন্ত সে সেই সর্ব্বপ্রেম-ময়কে পায়না। যেহেতু ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত জীবই সেই বিশ্ব-প্রেমিকের প্রেমের পাত্র। সসীমে প্রেম প্রদর্শন করিলে, তবে ত অসীমের প্রতি প্রেম দেখাইবার অধিকার জন্মে।

প্রেমে কি না করিতে পারে? সর্ব্ব-প্রেমময়ের একবিন্দু প্রেমের প্রভাবে এই সমগ্র বিশ্ব এত মধুময় হইয়াছে। তাঁহার কণামাত্র প্রেমের বলে আজ জীবের ঘর-বাড়ী এত প্রেমময়। জানিনা, সেই সর্ব্বপ্রেমের আধার, বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক কত সুন্দর—কত মধুর।

ভ্রান্ত মানব, কেন তুমি বৃথা বাহিরে প্রেমের অনুসন্ধান করিতেছ? এক-বার তোমার আপন ঘরের দিকে দৃষ্টি কর। দেখিবে, সেথায় প্রেমের কি

অপূর্ব্ব লীলাই হইতেছে। একই গৃহে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, দৌহিত্র, পৌত্র মিলিয়া একে অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইয়া নিত্য কি অপরূপ প্রেমের খেলাই খেলিতেছে! হিন্দু-পরিবারে নিত্য যখন এইরূপ প্রেমের খেলা হইয়া থাকে, তখন আবার প্রেমের অনুসন্ধানে বাহিরে ফিরিবার প্রয়োজন কি ?

হিন্দু-পরিবার একের স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে সমর্থ পুরুষ কায়িক ও মানসিক শ্রম করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ আনিয়া পরিবারের প্রধান ব্যক্তির নিকট প্রদান করেন, তিনি তদ্দ্বারা সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। সংসারের মধ্যে যদি কেহ অক্ষম হয়, বা অন্য কেহ অধিক উপার্জ্জন করে, তাহা হইলেও কেহ সে বিষয়ে দৃক্‌পাত করেনা। সকলেই অক্ষম সক্ষম নির্ব্বিশেষে সমান যত্নে, সমস্নেহে লালিত পালিত হয়। ইহা কি প্রেমের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন নহে ?

অনেকে আছেন, যাঁহারা হিন্দু পরিবারের এইরূপ একান্নবর্ত্তিতার দোষ কীর্ত্তন করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যাঁহারা একান্নবর্ত্তিতার মহদ্‌গুণ জানেন, তাঁহারা ইহার নিন্দাবাদ করেন না। হিন্দু-পরিবার একটি বিদ্যালয়; একজনকে অপর জনের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয়। এ বিদ্যালয় পুত্রকে মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি, ভ্রাতাকে ভ্রাতৃস্নেহ এবং মাতাপিতাকে পুত্রবাৎসল্য শিক্ষা দেয়। এ বিদ্যালয় "স্বার্থত্যাগ"রূপ মহামন্ত্র শিক্ষা দেয়। হিন্দুসন্তান সেই মহামন্ত্র শিখিয়া অন্যের সুখ-সুবিধার জন্য আপন স্বার্থ বলিদান করে। স্বার্থত্যাগ ব্যতিরেকে প্রেমের অস্তিত্ব সম্ভবপর কি ?

হিন্দু-পরিবারের ললনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাই! এখানে মাতা ও ভগ্নী প্রভৃতি রমণীগণ স্বামী বা ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষগণের জন্য নিজের স্বখস্বাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দেন।

প্রেম কখনও একাকী থাকিতে পারে না। অন্যের প্রতি প্রেম দেখাও, সেও নিশ্চয় তোমার প্রতি দেখাইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রেম, কাহারও প্রেমের প্রতীক্ষা করেনা। "তুমি আমাকে ভালবাস বা না বাস, আমি তোমাকে ভাল বাসিব"—ইহাই প্রকৃত প্রেমের নিদর্শন।

হিন্দু-স্ত্রী, পাশ্চাত্যখণ্ডের তথাকথিত সভ্য রমণীবৃন্দের অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির। স্বামীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া জীবন অতিবাহিত করাই হিন্দু-নারীর জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু-স্ত্রী গৃহ-কার্য্যে শ্বশ্রূকে সাহায্য করেন এবং কায়মনোবাক্যে পতি-সেবা করেন। তাঁহা দ্বারা যদি শ্বশুরগৃহে

কন্যার যশঃ প্রতিভাত হয়, তাহাহইলে কন্যার পিতার আনন্দের আর সীমা থাকে না। অন্যদেশে স্ত্রী, স্বামীর বিলাসিতার সহায় ও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আধার-বিশেষ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে হিন্দু-স্ত্রীর নাম "সহধর্ম্মিণী"। এদেশে হিন্দু-স্ত্রী শুধু ভর্ত্তার ভোগবিলাসের ইন্ধন নহেন, তিনি স্বামীর সহিত ধর্ম্মাচরণের সহায়তাকারিণীও ধর্ম্মাধিকারিণী। এখানেই প্রকৃত প্রেম—সত্য-ভালবাসা। এ ভালবাসার স্থান পার্থিব জগতে নাই; ইহা স্বর্গরাজ্যের।

অধুনা এদেশীয় যুবকগণ, অভিভাবকেরা তাঁহাদের জন্য যে পাত্রী স্থির করেন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে নির্দ্দোষ বালিকা-হৃদয়ের পবিত্র প্রেমের স্রোত প্রতিহত হয়। পাঠকগণ অবশ্য সক্রেটীসের নাম শুনিয়া থাকিবেন। সক্রেটীসের স্ত্রী বড় কোপনা ছিলেন। সক্রেটীস্ তাহা শুনিয়াও তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনি জানিয়া শুনিয়াও কেন এই কোপনা ও মুখরা স্ত্রী-লোককে বিবাহ করিলেন?" তখন তিনি বলিতেন, "ইহার মুখে সর্ব্বদা ক্রোধ-পূর্ণবাক্য শুনিয়া এবং তাহা সহ্য করিয়া আমি অন্যের ক্রোধপূর্ণ বাক্য সহ্য করিতে পারিব বলিয়াই ইহাকে বিবাহ করিয়াছি।"

পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বামী-ত্যাগের (Divorce) বিষয় অনেকে জানেন। পাশ্চাত্য দেশের আদালতে এই শ্রেণীর মোকদ্দমা যত অধিক হয়, অন্য কোন শ্রেণীর মোকর্দ্দমা তত অধিক নহে। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, পাশ্চাত্য দেশীয় স্বামী-স্ত্রী, প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম কাহাকে বলে, তাহা আদৌ জানে না। সংসার করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে স্বামীস্ত্রীতে অল্পবিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে। এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা উভয়কেই ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হয়। স্বামী যদি দেখেন, স্ত্রী আপন কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখী, বা স্ত্রী যদি দেখেন যে তাঁহার স্বামী স্বীয় কর্ত্তব্যে উদাসীন, তবে উভয়ের উচিত, উভয়কে আপন আপন কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া সুপথে আনিবার চেষ্টা করা। এইরূপ সামান্য কারণে চির জীবনের জন্য একে অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক নহে। বলা বাহুল্য, এরূপ দাম্পত্য-প্রেম পাশ্চাত্যখণ্ডে দেখা যায়। প্রাচ্যভূমি এখনও এতটা অধঃপতিত হয় নাই।

হিন্দু-পরিবারে আর একটি যে স্বর্গীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরিবারস্থ কোন লোক যদি ব্যাধিগ্রস্ত—এমন কি ঘোর সংক্রামক ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে পুরুষ-স্ত্রী সকলেই তাহার

সেবা-শুশ্রূষায় প্রাণপণ প্রযত্ন করেন। রোগীর শয্যা-ধৌতকরণ হইতে যাবতীয় সেবা-শুশ্রূষা আপন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াও করেন। এরূপ প্রেম যে স্বর্গীয়, দেবদুর্ল্লভ প্রেম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-পরিবার ছাড়িয়া প্রতিবেশীগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রেমের কি অত্যুজ্জল নিদর্শন দেখিতে পাই। যখন কোন প্রতিবেশীর বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকলে যাইয়া কর্ম্মকর্ত্তার বাটীতে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে। এটিও প্রেমের কম নিদর্শন নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। প্রেমের রাজত্ব অসীম-অনন্ত—অপার। প্রেম শত্রুকে মিত্র করে। প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীচৈতন্য বিধর্ম্মী মুসলমানকেও "ভাই" বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন বলিয়াই নিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"মারলি মারলি করলি ভাল
একবার হরিনাম বল্‌রে।"

এই প্রেমের বলেই যীশুখৃষ্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ-কালে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না যে ইহারা কি করিতেছে।"

হিন্দুপরিবারে নিয়ত প্রেমের যে কিরূপ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রত্যেক হিন্দু, দরিদ্র হউক্, ধনী হউক্ দ্বারস্থ ভিক্ষার্থীকে কখনও একমুষ্টি ভিক্ষা না দিয়া ফিরায় না। অতিথি হিন্দু-জাতির নিকট দেবতাবৎ পূজ্য। হিন্দু জানে "সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ"। প্রত্যেক হিন্দু বিশ্বাস করে—

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে
স তস্মৈ দুষ্কৃতিং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

হিন্দু অধ্যাপক, বিনা বেতনে, আহারাদি প্রদান করিয়া সযত্নে সমাগত বিদ্যার্থীকে শিক্ষা দান করেন। হিন্দু পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ তীর্থক্ষেত্রসমূহে তীর্থযাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য "ধর্ম্মশালা" নির্ম্মাণ করেন—দরিদ্রদিগের গ্রাসাচ্ছনের নিমিত্ত সত্রাদির প্রতিষ্ঠা করেন এবং পথিমধ্যে পান্থদিগের বিশ্রাম ও তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য বৃক্ষরোপণ, জলাশয়-খনন করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন না।

পাঠক, একবার অবহিত চিত্তে ভাবুন, হিন্দু-জীবনে প্রেমের বিকাশ কতটা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রেমের আরও বিকাশ দেখিতে পাই। সেখানে ভিক্ষুক বা নিরাশ্রয় প্রতি গৃহস্থের দ্বারে ২ যাইয়া ভিক্ষা করে না। খ্রীষ্টানগণ সকলেই স্বস্ব অবস্থানুযায়ী অর্থ "সাহায্য-সভায়" দান করেন। পাশ্চাত্য দেশের যে সমস্ত ধনশালী ব্যক্তির উত্তরাধিকারী নাই; তাঁহারা যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি এই "সাহায্য সভায়" প্রদান করেন। এইরূপে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, সেই অর্থের সুদে সাহায্য-সভার কর্ম্ম-নির্ব্বাহক মহাশয় প্রতিদিন শত শত দরিদ্রের অন্নাভাব দূর করেন। পীড়িত, নিরাশ্রয়দিগের জন্য ইউরোপ খণ্ডে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই হাঁসপাতালে চিকিৎসক, ভৃত্য ও শুশ্রূষাকারী থাকেন। তাঁহারা কোনও রূপ পারিশ্রমিক না লইয়া রোগীর যথাযোগ্য তত্ত্বাবধারণ করেন। উন্মত্ত ব্যক্তির জন্যও পাশ্চাত্যখণ্ডে আশ্রয়ের অভাব নাই। নিরাশ্রয়, মাতৃ-পিতৃহীন বালক বালিকাগণের জন্যও আশ্রয় স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পাশ্চাত্য মানব পরাঙ্মুখ হন নাই। সেই সমস্ত আশ্রয়ে বালক-বালিকাগণকে যে কেবলমাত্র আহার ও বাসস্থানাদিই দেওয়া হয়, তাহা নহে; যাহাতে তাহারা রীতিমত সুশিক্ষিত হইতে পারে, তৎকল্পে বিশেষ যত্ন করা হয়। মূক বা বধিরগণও ইউরোপবাসীর কৃপাদৃষ্টিতে বঞ্চিত হয় নাই। এমন কি, যদি কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যবসায় বা চাকুরীতে অকৃতকার্য্যতা-নিবন্ধন পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হন, তবে এই "সাহায্য-সভা" যতদিন না তাঁহারা পরিবারের ব্যয়-নির্ব্বাহে সমর্থ হন, ততদিন তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। ইউরোপবাসী কেবল নিজের দেশের লোকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি আপনাপন দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন নাই—কোন বৈদেশিক দেশভ্রমণাভিলাষে ইউরোপে গেলেও তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান ও যথাযোগ্য যত্ন করেন।

প্রেম কেবল আপনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে না। প্রেমিক লোক অপরের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। ইহার উদাহরণ পাশ্চাত্য খণ্ডে কিছু বিরল নহে। জন হার্ডওয়ার্ডের ন্যায় লোক সমগ্র জীবন কেবল রোগীর সেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ফাদার দামিয়েন্ জনৈক সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সেবা করায় স্বয়ং সেই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার, যোসেফাইন্ বাট্লার, কুমারী

ফ্লোরেন্‌স্ নাইটেঙ্গল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য রমণীগণ সারা জীবন কেবল দীনদরিদ্র, আতুর, রোগী, ও রণাহতদিগের সেবায় কাটাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ দীন, দরিদ্র আতুর, অনাথ, রোগী বা রণাহতের সেবায় পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কতকটা পশ্চাৎপদ, তাহা দেখাইবার জন্য আমি পাশ্চাত্যখণ্ডের বিষয় উপরে লিখিলাম। একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, হিন্দুগণ অধুনা কেবল আত্ম-সুখেই নিমজ্জিত, দীন-দুঃখীর করুণ ক্রন্দন এখন আর পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে না। হায়! যে দেশের শাস্ত্র বলেন—

মাতরং পিতরং পুত্রং দারাননিথিসোদরান্
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥

* * *

বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যোভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ
ইহৈবলোকে গর্হ্যোঽসৌপরত্র নারকী ভবেৎ ॥

* * *

জ্ঞাতিঃ বন্ধুজনঃ বহ্নিস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ
অন্যোঽপ্যধনযুক্তশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

সেই দেশের হিন্দুগণের আজ কি অধঃপতন! হিন্দু আজ তাহার জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছে, তাই দেশের মধ্যে এরূপ দারিদ্র্য ও দুঃখ দৃষ্ট হইতেছে। যে একান্নবর্ত্তিপরিবারপ্রথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, অধুনা কেবল নব্যশিক্ষিতই সেই একান্নবর্ত্তি-পরিবারপ্রথার দোষ-কীর্ত্তন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের পারিবারিক জীবন অনুকরণ করিতে যাইয়া অস্মদ্দেশীয় নব্য-শিক্ষিতেরা একান্নবর্ত্তিপরিবারপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, খাদ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা এখন আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা জ্ঞাতি-কুটুম্বকে পালন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের একবার বিবেচনা করা উচিত যে, বর্ত্তমানে তাঁহাদের আয়ের পরিমাণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আয়ের পরিমাণের তুলনায় অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভাবের এক-মাত্র কারণ বিলাসিতা। ইঁহারা এখন আর পিতৃ-পিতামহের ন্যায় সরল ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন না। একবার যদি তাঁহারা বিলাসিতার মাত্রা একটু হ্রাস করেন, তবে দেখিবেন, অচিরে তাঁহারা নিকট ও দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি-কুটুম্বগণকে পালন ও সাহায্যাদি করিতে সক্ষম হইবেন।

আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইবার আর একটি কারণ আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ-সমাপনান্তে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে যাইয়া আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ কোন কার্য্য পান না। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। কিন্তু তন্মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই কর্ম্ম লাভ করেন। অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কোন কোন আপীষে মাসিক কুড়ী, পঁচিশ টাকা বেতনে অনেক "বি এ" "এম্ এ" উপাধিধারী যুবককে শিক্ষানবিশী করিতে দেখা যায়। দেশের অবস্থা যখন এতদূর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন Technical বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে প্রয়োজনীয়। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেশের প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি যাঁহার বিন্দুমাত্র প্রেম আছে, দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম কর্ম্ম। Indian industrial association অবশ্য এ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা সাধন করিয়াছে; কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায়ের দান-প্রবৃত্তি এই মহৎ কার্য্যটীর প্রতি প্রধাবিত না হওয়ায় এই association দেশের ততটা কল্যাণ-সাধন করিতে পারে নাই।

এইবার মনুষ্যেতর প্রাণীদিগের বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক্। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য, ছাগ, গো, মহিষাদি জন্তুর উপর বড়ই নিষ্ঠুরতা-প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। লোকে মনে করে, এই সমস্ত জীব ভগবান্ কর্ত্তৃক কেবল মনুষ্যের সুবিধা ও রসনার তৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এরূপ ধারণা কি ন্যায়সঙ্গত? আপন শিশুসন্তানকে যেমন মাতৃ-স্তন্যের অমৃতধারা হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার মনে অব্যক্ত দুঃখ উপস্থিত হয়, গোবৎসকেও তাহার মাতৃস্তনের দুগ্ধ-হইতে বঞ্চিত করিলে তাহারও মনে সেইরূপ কষ্ট হয়। কিন্তু নিষ্ঠুর মানব তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। ভগবান্ মেষাদি জন্তুকে শীত-নিবাণের জন্য পশম প্রদান করিয়াছেন, আমরা আপনাদের শীতবস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদিগকে সেই ভগবদ্দত্ত পদার্থ হইতে বঞ্চিত করি। আমাদিগের শকটাদি টানিবার জন্য নিরীহ অশ্ব বা গোজাতিকে কি ভীষণ কষ্টই না দেই। ধন্য বুদ্ধদেব! ধন্য তাঁহার অমৃতময়ী বাণী! আজ বৈষ্ণব ও জৈন সম্প্রদায় তাঁহারই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীব-হিংসা হইতে আপনাকে বিরত রাখিয়াছে। জানিনা, নৃশংস মানব কবে এই-রূপ নিষ্ঠুর জীবহত্যা ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদ্‌ভোজী হইয়া মনুষ্যেতর জীবের প্রতি প্রেম-প্রদর্শন করিবে?

সর্ব্বপ্রাণীর উপর সমভাবে প্রেম-প্রদর্শন করিয়া তবে সেই সর্ব্ব-প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে পৌঁছিবার অধিকারী হইতে হইবে। প্রেম আমাদিগকে এ জগতে আনয়ন করিয়াছে—প্রেমের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুতে প্রেম বিলাইতে হইবে—শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা হইতে হইবে, তবেই ত আমরা ঠিক্ সত্যের অধিকারী হইব—তখনই আমাদের মুখ দিয়া স্বতঃই—এই বাণী বহির্গত হইবে—

"এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা' সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা
সুন্দর নাম বিহঙ্গ-অঙ্গে লেখা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছে।"

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অধ্যাত্ম রামায়ণান্তর্গত—

শ্রীরাম গীতা।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততোজগন্মঙ্গল মঙ্গলাত্মনা
বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাম্।
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমো
রাজর্ষিবর্য্যৈরভিসেবিতং যথা ॥১।

শ্রীমহাদেব বলিলেন—

যাহা পাঠ করিলে জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞানজন্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-লাভ হয়, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও মনের অশেষ তৃপ্তিকর, এবং যাহা মুক্তির একমাত্র সোপান, সেই রামায়ণ গ্রন্থের বর্ণনীয় রাবণ-বধাদি লীলা-নিমিত্ত উত্তমকীর্ত্তি-লাভ করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, পূর্ব্ব-পুরুষেরা ও অন্যান্য রাজর্ষিবৃন্দ যেরূপ ভাবে প্রজা-পালনাদি করিয়া জনগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজারঞ্জন কার্য্যে তৎপর হইয়াছিলেন ॥১।

সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্যতির্য্যকৃত্বমথাহ রাঘবঃ ॥২॥

উদারচিত্ত লক্ষ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, সংপ্রসঙ্গাধীন প্রাচীন ইতিহাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজা নৃগ পুণ্যবান্ ও দানশীল ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র ধেনু দান করিতেন। একদা কতকগুলি গাভী এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী গাভী ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে পলাইয়া যায়, রাজানুচরগণ পথ হইতে সেই গাভী আনয়ন করিয়াছিল। রাজা না জানিতে পারিয়া সেই গাভীটী পুনরায় অন্য ব্রাহ্মণকে দান করেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ যখন গো সমূহ লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব্বদানগ্রাহী ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে ঐ গো সমূহের অন্তর্গত নিজ গাভী দেখিয়া পরস্বাপহারী বলিয়া উহার সহিত বিবাদ করেন। অবশেষে উভয়ে মীমাংসার নিমিত্ত রাজ-সমীপে সমাগত হইলেন। রাজা তখন অন্তঃপুরে ছিলেন। ব্রাহ্মণ, প্রদত্ত গাভী অন্যকে অর্পণ করা হেতু রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতে রাজা নৃগ কৃকলাস-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুষ্য যেমন কর্ম্মই করুক না—অনবধানতা-প্রযুক্ত তাহাতে অশুভাশঙ্কা থাকেই। রাজা নৃগের অজ্ঞানকৃত পাপ-ভোগের ন্যায় শুভাশুভ কর্ম্ম-জন্য সুখ-দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥২॥

কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিত-পাদ-পঙ্কজম্।
সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনঃ
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীত্ ॥৩॥

তত্ত্বজ্ঞানের এইরূপ মহিমা শ্রবণ করিয়া লোকোপদেশের জন্য একদা পবিত্র-চেতাঃ লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন সেই নির্জ্জনপ্রদেশ-স্থিত ভগবান্ রামচন্দ্রকে প্রণামকরতঃ ভক্তিসহকারে বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন ॥৩॥

ত্বং শুদ্ধবোধোঽসিহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশোঽসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ং।
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে!
পাদাব্জ-ভৃঙ্গাহিতসঙ্গসঙ্গিনাম্ ॥৪॥

হে ভগবন্! তুমি বিশুদ্ধ বোধ-স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার জীবগণের আত্মা

ও অধীশ্বর, অর্থাৎ অন্তর্যামিতা হেতু তুমি সকলের নিয়ন্তা অথচ তুমি আকাররহিত। তবে যে সকল ভক্ত, ভৃঙ্গের ন্যায় তোমার পাদ-পঙ্কজ-পীযুষপানে একান্ত পিপাসু, সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মগণের নিকটেই তুমি স্বয়ং প্রকাশিত হও, অন্যে তাহা দেখিতে পায়না ॥৪।

অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো!
ভবাপবর্গং তব যোগি-ভাবিতম্।
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধিমাম্ ॥৫।

হে প্রভো! আমি অনন্যগতি হইয়া আপনার যোগিগণবন্দিত সংসার-মোক্ষপ্রদ চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইলাম, যাহাতে আমি এই অজ্ঞানরূপ অপার ভবপারাবার পার হইতে পারি, আপনি তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করুন ॥৫।

শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্ত্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ
বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে
শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণঃ ॥৬।

অনুরক্ত ভক্তগণের অশেষক্লেশমোচনকারী, জনকাদি রাজর্ষিগণের ভূষণ-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, অনুজ লক্ষ্মণের বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া সকল অনর্থের মূল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক কথা কহিলেন ॥৬।

শ্রীরাম উবাচ।

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তত্পূর্ব্ব মুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েত্ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥৭।

শ্রীরাম বলিলেন—

হে লক্ষ্মণ! প্রথমতঃ নিজবর্ণাশ্রমবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনাদিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা জানিয়া নিষ্কামচিত্তে সমস্ত ফল ভগবান্‌কে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং আত্মজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ॥

ইহাদ্বারা স্পষ্টই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, যে বর্ণের ও যে আশ্রমের যে ধর্ম্ম বিহিত, তাহাদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করে, এবং ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন

হয়, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন না এবং সেই ধর্ম্মে যাঁহারা অনধিকারী, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান হইতে পারেনা, সুতরাং মুক্তি তাঁহাদের বহুদূরে বিদ্যমান ; অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় ॥৭।

ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ ॥৮।

যাহারা "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি অভিমান বশতঃ ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ না করে, সেই সকাম পুরুষবর্গের আদর-সহকারে অনুষ্ঠিত পূর্ব্বজন্মকৃত সুখদুঃখের হেতুভূত শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ বর্ত্তমান-শরীরোৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়। আর ইহজন্মে শুভাশুভ কাম্যকর্ম্ম-জনিত শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট পুনরায় দেহোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং এই সংসার কুলালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে। নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম-ফল সঞ্চিত হয়না, সুতরাং তাহা ভোগ করিবার জন্য আর দেহধারণেরও প্রয়োজন থাকেনা। দেহ কর্ম্মফলের ভোগায়তনমাত্র। যিনি বাসনাবিমুক্ত না হইয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহার পুনর্জন্মে বিশ্বাস না থাকিলেও স্বভাবসূত্রে দেহ-ধারণ করিতেই হইবে ॥৮।

অজ্ঞানমেবাস্যহি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে
বিদ্যেব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥৯।

অজ্ঞানই সংসারের সমবায়িকারণ ; কর্ম্ম অর্থাৎ তজ্জন্য অদৃষ্ট নিমিত্তকারণ। কর্ম্মদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারেনা, কেননা কর্ম্ম সকল অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর অবিরোধী, কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়ের পরস্পর বিরোধ থাকায় একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানপাশ-চ্ছেদনে সম্পূর্ণ সমর্থ ॥৯।

নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেত্।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা
তস্মাদ্বুধোজ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥১০।

হে লক্ষ্মণ! কর্ম্ম ও অজ্ঞান উভয়ে সম্পূর্ণ অবিরোধী, এ কারণ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অজ্ঞানের কিছুমাত্র হানি হয় না, এবং বিষয়ানুরাগ-বিলোপ-জনিত

চিত্ত-শুদ্ধিও জন্মে না, বরং তাহাহইতে ক্ষণোৎপত্তিশীল ও ক্ষণভঙ্গুর সুখ-দুঃখ-স্বরূপ দোষবশতঃ কর্ম্মজালের উদ্ভব হয় এবং তাহা সংসার বৃদ্ধি করে। অতএব বিবেকী ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞান-লাভার্থ বেদান্ত-বাক্য দ্বারা জ্ঞান-বিচারে তৎপর হইবেন ॥১০।

ক্রমশঃ—

শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।



পঞ্চ'ম'-কার।

ব্রহ্ম-রন্ধ্রে ঝরে সোমধারা,
সে অমৃত পানে যেবা মাতোয়ারা,
মদ্য-সাধনা তা'র;
'মা'-রূপা রসনা,-তাহারি অংশ
অশনে তৃপ্ত পরমহংস,
মাংস-সাধনা যা'র।
বহিছে নিয়ত নির্ম্মল-নীরা
গঙ্গা যমুনা—পিঙ্গলা ইড়া—
উচ্ছ্বসি' জীব-দেহ;
শ্বাস প্রশ্বাস" তাহে দুটী মীন,
যে করে ভোজন হ'য়ে যোগাসীন,
মৎস্য-সাধক সেহ।
কোটি রবি জিনি' অতি উজ্জ্বল,
কোটি শশী জিনি' অতি সুশীতল,
স্বচ্ছ পারদাকার;
আত্মা বিরাজে যে মহাপদ্মে,
কুণ্ডলিনীরে আনে সে সদ্মে,
মুদ্রা-সাধন যা'র।
প্রকৃতির সনে পুরুষ-মিলন
সৃজন-পালন-প্রলয়-কারণ
মৈথুনরস-সার,

সে রসে মজিয়া যেই যোগীজনা
আপনারি মাঝে ডুবায় আপনা
মৈথুন-যোগ তা'র ॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ॥

রাজশাসন।

প্রাচীন ভারতের নৃপতিবর্গ প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য দেশে শান্তি, নীতিও সদ্ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য "শাসন" প্রচার করিতেন। রাজ-শাসনবাণী ডিণ্ডিমধ্বনি-সহযোগে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইত। শাসন-বাক্য লিপীবদ্ধ হইয়া চতুষ্পথ প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে শাসন-ফলকে শোভা পাইত। দেশের জনসাধারণ, শাসনঘোষকের মুখে রাজশাসন-বাণী শুনিতে পাইত—চতুষ্পথাদি স্থানে স্থাপিত লিখিত শাসনবাক্য পাঠ করিত। প্রজাগণ "শাসন" প্রতিপালন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত। তাই তাহারা শান্তির সুখময় ক্রোড়ে নিরাতঙ্কে কালযাপন করিত। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আছে কেবল—অনুস্মৃতি। প্রাচীন ভারতের ব্যবহারাচার্য্য মহামুনি উশনা, রাজশাসনের যে পরিচয় দিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের নিকট তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

উশনা বলিয়াছেন—

"দাসে ভৃত্যেঽথ ভার্য্যায়াং পুত্রে শিষ্যেঽপিবা ক্বচিৎ।
বাগ্‌দণ্ডপরুষং নৈব কার্য্যং মদ্দেশসংস্থিতৈঃ॥
তুলা-শাসন-মানানাং নাণকস্যাপি বা ক্বচিৎ।
নির্য্যাসানাঞ্চ ধাতূনাং সজাতীনাং ঘৃতস্য চ॥
মধুদুগ্ধ-বসাদীনাং পিষ্টাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা।
কূটং নৈব তু কার্য্যং স্যাদ্বলাচ্চ লিখিতং জনৈঃ॥
উৎকোচগ্রহণং নৈব স্বামিকার্য্যবিলোপনম্।
দুর্বৃত্তকারিণং চোরং জারং মদ্দ্বেষিণং দ্বিষম্॥
ন রক্ষস্ত্বপ্রকাশং হি তথান্যানপকারকান্।
মাতৄণাং পিতৄণাঞ্চৈব পূজ্যানাং বিদুষামপি॥

নাবমানং নোপহাসং কুর্য্যুঃ সদ্বৃত্তশালিনাম্।
ন ভেদং জনয়েয়ুর্বৈ নৃনার্য্যোঃ স্বামিভৃত্যয়োঃ॥
ভ্রাতৃনাং গুরুশিষ্যানাং ন কুর্য্যুঃ পিতৃপুত্রয়োঃ।
বাপী-কূপারাম-সীমাধর্ম্মশালাসুরালয়ান্॥
মার্গান্নৈব প্রবাধেয়ুঃ হীনাঙ্গবিকলাঙ্গকান্।
দ্যূতঞ্চ মদ্যাপণঞ্চ মৃগয়াং শস্ত্রধারণম্॥
গোগজাশ্বোষ্ট্রমহিষীনৃণাং বৈ স্থাবরস্য চ।
রজত-স্বর্ণরত্নানাং মাদকস্য বিষস্য চ॥
ক্রয়ো বা বিক্রয়োবাপি মদ্যসন্ধানমেব চ।
ক্রয়পত্রং দানপত্রং ঋণনির্ণয়পত্রকম্॥
রাজাজ্ঞয়া বিনা নৈব জনৈঃ কার্য্যং চিকিৎসিতম্।
মহাপাপাভিশপনং নিধিগ্রহণমেব চ॥
নবসমাজনিয়মে নির্ণয়ং জাতি-দূষণং।
অস্বামিনাষ্টিকধনসংগ্রহং মন্ত্রভেদনং॥
নৃপদুর্গুণালাপস্তু নৈব কুর্য্যুঃ কদাচন।
স্বধর্ম্মহানিরনৃতং পরদারাভিমর্ষণম্॥
কূটসাক্ষ্যং কূটলেখ্যং অপ্রকাশপ্রতিগ্রহং।
নির্দ্ধারিতকরাধিক্যং স্তেয়ং সাহসমেব চ॥
মনসাপি ন কুর্ব্বন্তু স্বামিদ্রোহং তথৈব চ।
ভৃত্যা শুল্কেন ভাগেন বৃদ্ধ্যাদর্পাদ্বলাৎ ছলাৎ॥
আধর্ষণং ন কুর্ব্বন্তু যস্য কস্যাপি সর্ব্বদা।
পরিমাণোন্মানমানং ধার্য্যং রাজবিমুদ্রিতম্॥
গুণসাধনসংদক্ষা ভবন্তু নিখিলা জনাঃ।
সাহসাধিকৃতে দদ্যুর্বিনিগৃহ্যাততায়িনম্॥
উৎসৃষ্টা বৃষভাদ্যাযৈস্তৈস্তে ধার্য্যাঃ সুযন্ত্রিতাঃ।
ইতি মচ্ছাসনং শ্রুত্বা যেঽন্যথা বর্ত্তয়ন্তিতান্॥
বিনিশিষ্যামি দণ্ডেন মহতা পাপকারকান্।
ইতি প্রবোধয়েন্নিত্যং প্রজাঃ—"

রাজা ঘোষণা করিতেছেন "আমার দেশের কোনও প্রজাই দাস, ভৃত্য, ভার্য্যা, পুত্র বা শিষ্য প্রভৃতি কাহারও প্রতি বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য প্রকাশ করিবে না।"

দাস অর্থ—ক্রীত দাস। ভৃত্য অর্থ—বেতনভোগী কর্ম্মকর। কেহ কেহ বলেন—দাস অর্থ—কিঙ্কর, আর ভৃত্য অর্থ—ভরণার্হ পোষ্যবর্গ। বাক্‌পারুষ্য অর্থ—নিষ্ঠুর, অশ্লীল ও তীব্রবাক্যপ্রয়োগ, মোট কথা "গালিগালাজ করা।" দণ্ডপারুষ্য—দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত করা, সাধারণ কথা—"মারপিট্ করা"। আমি বাড়ীর কর্ত্তা, পত্নী, পুত্র, অপর পোষ্যজন, দাস সকলেই আমার অধীন; আমি অধ্যাপক, শিষ্য আমার অধীন,—কিন্তু তাই বলিয়া যে আমি ইহাদিগকে নিষ্ঠুর অশ্লীল বা তীব্র ভাষায় গালি দিতে বা প্রহার করিতে অধিকারী, তাহা নয়। আমি যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ইহাদিগকে গালি দেই, প্রহার করি, তবে রাজা আমাকে দণ্ড দিতে পারিবেন। এদেশের অনেকের এবং কোনও ২ পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরও ধারণা এইরূপ যে "হিন্দুপরিবারের যিনি কর্ত্তা, তিনি পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবন-মরণের বিধাতা। প্রাচীন ভারতে এই নিয়ম ছিল।" তাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিলে ভ্রান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। প্রভু, ক্রীতদাসের প্রতিও অকারণ অত্যাচার করিলে রাজদণ্ডের অধীন হইবেন। তবে সদুদ্দেশে তিরস্কার, স্বল্পদণ্ড-বিধান ও সদুপদেশে সুপথে আনিবার অধিকার সকল কর্ত্তারই আছে। তাই বলিয়া শিক্ষক মহাশয় শিষ্যটীকে বা প্রভু ভৃত্যকে "জখম্" করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী নহেন।

রাজা প্রচার করিতেছেন, "তুলাশাসনমান, নাণক, নির্য্যাস, সজাতি ধাতু, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, বসা ও পিষ্ট প্রভৃতি কেহ কূট করিবে না।" তুলাশাসনমান অর্থ—তুলাদণ্ডে পরিমাণনির্ণয়ের জন্য যে 'মান' বা বাঁট্‌খারা ব্যবহৃত হয় তাহা। অন্যভাবে তুলা অর্থ—তুলাদণ্ডে ব্যবহৃত বাঁট্‌খারা, শাসন অর্থ—তাম্রশাসন, মান অর্থ—পরিমাণযন্ত্র বেত্র, বংশ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র—ধান্ মাপিবার খুঁচী বা কাঠা, তৈলাদি মাপিবার চোঙ্গা বা ভাঁড় প্রভৃতি। 'নকল' বা 'কমি' তুলা, শাসন ও মান রাখিবে না। নাণক অর্থ মুদ্রা। জাল টাকা রাখিবে না—তাৎপর্য্যতঃ টাকা 'জাল' করিবে না। ধূপ কর্পূর প্রভৃতি নির্য্যাস, কৃত্রিম করিবে না,—তাহার সহিত অন্য দ্রব্য 'ভেজাল' দিবে না। একজাতীয় ধাতুর সহিত অন্যজাতীয় ধাতু মিশাইবে না। আর 'সোণা' বলিয়া 'পিতল' চালাইবে না। ঘৃত মধু দুগ্ধ চর্ব্বি প্রভৃতি দ্রব্য কৃত্রিম করিবে না অর্থাৎ এক দ্রব্যে অন্যদ্রব্য মিশাইবে না এবং এক দ্রব্য বলিয়া অন্য দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। তখন ঘৃতে চর্ব্বি মিশাইলে বা দুগ্ধে জল মিশাইলে অপরাধ হইত। এখন 'মিশ্রিত ঘৃত' বা 'জ'লোদুধ্' বলিয়া বিক্রয় করিলে দোষ হয় না; তবে "খাঁটী ঘৃত" বা "খাঁটী দুগ্ধ' বলিয়া বিক্রয় করিলে অপরাধ হয়। ধর্ম্ম-বুদ্ধির বৈপরীত্য। 'নকল' ও 'ভেজাল' জিনিষ উভয়ই প্রাচীনভারতের রাজশাসন-বিরুদ্ধ ছিল।

রাজার শাসনবাণী—"বলপূর্ব্বক দলীল লেখাইয়া লইবে না।" স্বেচ্ছায় সুস্থ-চিত্তে যে দলীল লিখিয়া দিবে, তাহাই যথার্থ দলীল। বলপূর্ব্বক, ভয় দেখাইয়া যে দলীল লওয়া হইবে, তাহা ব্যর্থ, পরন্তু যে ঐরূপে দলীল লইবে, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

রাজার ঘোষণা—"উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কেহ প্রভুর ন্যায্য কার্য্য নষ্ট করিবে না।" উৎকোচ গ্রহণ—ঘুঁষ লওয়া। ঘুঁষ লওয়া দোষাবহ, ইহাতে প্রভূত অনিষ্ট হয়। অন্যত্র উশনা বলিয়াছেন "উৎকোচ-দাতাও দণ্ডভাগী হইবেন।" রাজশাসনে উৎকোচ-গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিন্তু এখানে উৎকোচ-দানের দোষ কীর্ত্তিত হয় নাই।

রাজা জানাইতেছেন—"দুষ্কার্য্যকারী চোর, জার ও রাজশত্রু এবং অন্যবিধ অপকারকগণকে যেন কেহ গোপনে রক্ষা না করে।" অনেকে স্বার্থবশে চোর ও জার এবং দেশের শত্রুকে গোপনে স্থান দেয়। ইহারা রাজ-দণ্ডের যোগ্য।

রাজা আদেশ করিতেছেন—"মাতা, পিতা, অপর পূজনীয় জন, বিদ্বান্‌লোক, ও সদাচারসম্পন্ন লোকদিগের অবমান করিবে না। কেহ ঐ সকল লোককে উপহাসও করিবে না।" যে সকল লোক, মাতা, পিতা, গুরুজন, পণ্ডিত বা সদাচার জনগণের অবমাননা করে, তাহারা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল। তাহাদের শাসন-সংযমন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজা ঘোষণা করিতেছেন "পতি-পত্নীর মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিবে না। প্রভু ও ভৃত্যের, গুরু ও শিষ্যের, পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিবে না।" যাহারা মিথ্যাবাক্য দ্বারা এই সকলের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করে, সেই সব 'ঘরভাঙ্গা' লোক, দেশের শান্তি নষ্ট করে, তাহারা দণ্ডার্হ। রাজা প্রচার করিতেছেন—"পুষ্করিণী, কূপ, উদ্যান, সীমা, ধর্ম্মশালা, দেবালয় ও পথে বাধা দিবে না। হীনাঙ্গ ও বিকলাঙ্গগণকে পীড়া দিবে না।" পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতিকে দূষিত করা দোষাবহ। পুষ্করিণী প্রভৃতি সাধারণের উপকারী, সুতরাং উহা প্রস্তুত করিতে বাধা দেওয়া ঠিক নহে, উহা নষ্ট করিয়া জনসাধারণের অপকার করাও সঙ্গত নহে। সীমাচিহ্ন নষ্ট করা অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মশালা ও দেবালয়-নির্ম্মাণে বাধা দেওয়া বা উহা বিনষ্ট করা সম্পূর্ণ অন্যায়। পথ বন্ধ করা গুরুতর কুকর্ম্ম। যাহারা এই সকল অপকর্ম্ম করে এবং কাণা, খোঁড়া প্রভৃতিকে কষ্ট দেয়, তাহারা দণ্ডিত হইলেই ভাল হয়।

রাজার ঘোষণা—"দ্যূতস্থান, (জুয়াখেলার আড্ডা) মদ্যাপণ (মদের দোকান)

মৃগয়া, শস্ত্রধারণ, গো গজ অশ্ব উষ্ট্র মহিষী প্রভৃতি—স্থাবর ভূম্যাদি সম্পত্তি—অস্থাবর স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন প্রভৃতি ও বিষ—এই সকল দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়, মদ্য-সন্ধান, (মদ্যপ্রস্তুত করা) ক্রয়পত্র, (কোবালা) দানপত্র, ঋণনির্ণয়পত্রের (খতের) প্রণয়ন এবং চিকিৎসাকার্য্য রাজাজ্ঞা ব্যতীত কেহই করিতে পারিবে না।” জুয়ার আড্ডায় লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়, সুতরাং রাজা ঐ কার্য্যের প্রসর কমাইতে ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই রাজানুমতি ব্যতীত “জুয়ার আড্ডা” খুলিলে দণ্ডিত হইতে হইবে। “মদের দোকান” করিতে রাজানুমতি চাই,—লাইসেন্স দরকার। মৃগয়ায় রাজানুমতি চাই। মৃগবংশও বাঁচাইতে হইবে। অবস্থাবিশেষে কোনও জন্তুর সংখ্যাল্পতা ঘটিলে সে জন্তু হত্যা করিতে নিষেধ করা হইত। অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে হইলে ‘পাশ’ চাই। গবাদি পশু, ভূমিসম্পত্তি, স্বর্ণরজতাদি, বিষ প্রভৃতি রাজানুমতি ব্যতীত ক্রীত বা বিক্রীত হইবে না। ক্রয়-বিক্রয় রাজপুরুষের গোচরে হইলে ‘গরু চুরির মামলা’ প্রভৃতি কমিয়া যায়; চোর ধরিবার সুযোগ হয়; বিষ-প্রয়োগ বিরল হয়। সকলে মদ্য প্রস্তুত করিলে গোল হয়। মদ্য সহজলভ্য হওয়ায় লোক সব মদ্যপায়ী হইয়া পড়ে; সেই জন্য রাজানুমতির ব্যবস্থা। ক্রয়পত্র দানপত্র প্রভৃতি রাজার বা রাজপুরুষের জ্ঞাতসারে না হইলে “মিথ্যা দলীল” বেশী হয়—পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ‘রেজেষ্ট্রি’ ভিন্ন সিদ্ধ হইবে না, এই ব্যবস্থা। চিকিৎসক রাজানুমতি লইয়া রাজদ্বারে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়া তবে লোকের জীবন লইয়া খেলা করিবেন, ইহার পূর্ব্বে পারিবেন না। ফলতঃ ‘হাঁতুড়ের’ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া আশঙ্কাজনক। চিকিৎসা-ব্যপদেশে অনেক দুর্বৃত্তই বহু কুকর্ম্ম করিতে পারে, সুতরাং চিকিৎসকের “লাইসেন্স” থাকা উচিত। যাহারা এই সকল বিধান অতিক্রম করিবে, তাহারা রাজদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

রাজার শাসনবাক্য—“মহাপাপের উল্লেখ করিয়া কাহাকেও অভিশাপ দিবে না। অস্বামিক ধন কেহ গ্রহণ করিবে না। রাজানুমতি ব্যতীত কেহ নূতন সমাজ-নিয়ম স্থাপন করিবে না। কোনও জাতির দোষ কীর্ত্তন করিবে না। অপরের যে ধন হারাইয়া গিয়াছে, তাহা পাইলেও কেহ লইবে না। মন্ত্রণা প্রকাশ করিবে না। কখন রাজার নিন্দাবাদ করিবে না।” কাহারও উপর মহাপাপের আরোপ অর্থাৎ কাহাকেও সুরাপায়ী, সুবর্ণহারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরু-পত্নীগামী প্রভৃতি বলিবে না। এ সব দোষ আরোপিত হইলে লোকের মাননাশ হয়, সুতরাং শান্তির জন্য রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করা দরকার। “অস্বামিক ধন” রাজার

প্রাপ্য, উহা যে লয় সে রাজার অনিষ্ট করে, কাজেই দণ্ডিত হয়। নূতন নিয়ম-স্থাপনে রাজার অনুমতি চাই। রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সভাসদ্‌গণের পরামর্শ লইয়া দেশের সমাজের মুখ্য ব্যক্তিগণের অভি-প্রায় অবগত হইয়া সমাজ-নিয়ম স্থাপন করিতে অনুমতি দিবেন। প্রাচীন ভারতের রাজা একাধারে প্রজার চতুর্ব্বর্গের বিধাতা। জাতিবিশেষের নিন্দা বা দোষকীর্ত্তনে জাতিবিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তাহাতে সমাজের একতানতা নষ্ট হয়, সুতরাং উহা দোষাবহ। "হারণ জিনিষ" পাইলে রাজপুরুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। রাজপুরুষ ঘোষণা দ্বারা দ্রব্যস্বামীকে আহ্বান করিবেন। দ্রব্য-স্বামী উপস্থিত হইয়া দ্রব্যের অবস্থা ও অপহরণের দেশ-কাল-পাত্রাদির যে বিবরণ দিবেন, তাহা প্রকৃত ঘটনার সহিত মিলিলে (উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া) দ্রব্য-স্বামীকে রাজা সেই দ্রব্য দিবেন। ইহাই রীতি। যে রাজদ্বারে উপস্থিত না করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করে, সে একরূপ চোর; তাহাকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত।

রাজার আদেশে—"কেহ স্বধর্ম্মনাশ করিবে না। মিথ্যা কথা বলিবে না। পরদার গমন করিবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। লেখ্য (দলীল) কূট (জাল) করিবে না। গোপনে দান-গ্রহণ করিবে না। কর-সংগ্রাহক কর্ম্মচারি-গণ প্রজার নিকট হইতে রাজ-নির্দ্ধারিত কর অপেক্ষা অধিক অর্থ গ্রহণ করিবে না। কেহ চুরি করিবে না। সাহস (দস্যুতা, হত্যা ও সতীত্বনাশ প্রভৃতি) করিবে না। প্রভুর অনিষ্টচিন্তা কেহ মনেও স্থান দিবে না।" ধর্ম্মনাশ অপেক্ষ প্রাণনাশও লঘু, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস, সুতরাং ইহা নিষিদ্ধ কর্ম্মই বটে। মিথ্যাকথা বলা দোষ, ইহা সর্ব্বসম্মত। (সম্মতিমতে) পরপত্নীগমনও অধর্ম্ম, ইহা উপেক্ষণীয় নহে। সাক্ষ্যে মিথ্যা বলায় সত্য-নির্ণয়ের গোল হয়; বিচা-রক ভ্রমে পতিত হন, সুতরাং সাক্ষ্যে মিথ্যাবাদীর শোধন আবশ্যক। "জাল দলীল" অসত্যকে সত্যে পরিণত করিতে শয়তানের মহাস্ত্র; উহার মূলোৎপাটন রাজার কর্ত্তব্য। গোপনে প্রতিগ্রহ করায় প্রতিগ্রহীতার স্বত্বলাভ অন্যের অজ্ঞাত থাকে। পরিশেষে দাতা প্রতিগ্রহীতার বা তাহাদের পরবর্ত্তিদের মধ্যে স্বত্ব লইয়া গোল হইতে পারে। যাহারা গোপনে লয় বা দেয়, তাহারা সরলভাবে কার্য্য না করিতেও পারে, সুতরাং ঐ কার্য্য রাজার দৃষ্টিতে দুরভিসন্ধি-মূলক ও মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। যে সকল কর্ম্মচারী প্রজার নিকট হইতে রাজ-করের অতিরিক্ত অর্থ ফাঁকি দিয়া লয়, তাহারা দেশের কণ্টক, সুতরাং দণ্ডার্হ। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি যাহারা করে, সমাজের হিত করিতে হইলে তাহাদের দণ্ডবিধান সর্ব্বথা সঙ্গত।

রাজার শাসন-বাক্য—"রাজকর্ম্মচারী বা অন্য কেহ দর্পভরে, বলপূর্ব্বক বা ছল করিয়া বেতন, কর, ভাগ, বৃদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা কাহারও পীড়ন করিবে না।" বেতন—নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মমূল্য; মাসিক বা বার্ষিক অথবা কার্য্যসমাপ্তির পরক্ষণে দেয় ইত্যাদি নানাবিধ। শুল্ক—ব্যবসায়ীগণের নিকট রাজপ্রাপ্য অংশ। ভাগ—বিভাগ বা বণ্টন। বৃদ্ধি—সুদ। সেকালে বেতনের দ্বারা রাজকর্ম্মচারীরা প্রজাকে উৎপীড়িত করিতে পারিতেন, কারণ অনেকশ্রেণীর কর্ম্মচারী, প্রজার নিকট হইতে রাজ-নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন। প্রজার হিতার্থেই এই সকল কর্ম্মচারী ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রবন্ধান্তরে সে সব কথা বলিব। শুল্ক বেশী করিয়া লইলে ব্যবসায়ীরা নিপীড়িত হয়। ভাগ করিয়া লইয়া অংশীকে পীড়িত করা যায়, সকলেই পারেন—মধ্যস্থ রাজকর্ম্মচারী অনুচিত ভাগ করিয়া অনুগতের উপকার ও অপরের অপকার করিতে (বিশেষভাবে) পারেন। অতিরিক্ত হারে (বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হইতেও অধিক হারে) সুদ লইয়া লোককে পীড়ন করা দোষাবহ, সুতরাং উহা নিষিদ্ধ এবং দণ্ডযোগ্য।

রাজা প্রচার করিতেছেন—"পরিমাণ, উন্মান ও মান রাজ-মুদ্রাঙ্কিত না হইলে ব্যবহার করিবে না।" ভূমিপরিমাপের শৃঙ্খল, রজ্জু বা দণ্ড সবই রাজচিহ্নাঙ্কিত এবং রাজানুমোদিত হওয়া চাই; তুলাদণ্ডের বাঁট্‌খারা রাজ-মুদ্রাঙ্কিত হওয়া চাই; ধান্যাদি ও তৈলাদি মাপিবার খুঁচী ও ভাঁড় প্রভৃতি রাজচিহ্নাঙ্কিত এবং রাজানুমোদিত হওয়া দরকার। খাঁটী মাপের বা খাঁটী ওজনের উপায় এই সব। অন্যথা হইলে বলিতে হইবে, "কম্ বাঁট্‌খারা" বা "কমি খুঁচী" চালাইয়া ব্যবসায়ী, ক্রেতাকে ঠকাইতেছে। ইহার প্রতীকার অবশ্যকর্ত্তব্য।

রাজার ঘোষণা—'সমস্ত প্রজা যেন সদ্‌গুণ উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হয়।' শুধু কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইলেই চলে না, সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হওয়াও উচিত। রাজার উদ্দেশ্য রাজ্যের কল্যাণ। প্রজা গুণবান্ না হইলে তাহার আশা নাই।

রাজার শাসন-বাক্য—"সকল প্রজাই আততায়িগণকে ধরিয়া সাহসাধিপতির নিকট সমর্পণ করিবে।" আততায়ী ছয় প্রকার। যে কেহ গৃহে অগ্নি প্রদান করে, যে কেহ বিষ খাওয়ায়, যে কেহ অস্ত্র লইয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, যে কেহ ধন অপহরণ করে, যে কেহ ক্ষেত্র (ভূমি) অপহরণ করে, যে কেহ দারা অপহরণ করে, ইহারা সকলেই আততায়ী। ইহাদের ধরিয়া, স্থানীয় প্রধান শান্তিরক্ষক বা শাসনবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রদান করিতে হইবে।

নিজে দণ্ডদিলে চলিবে না, অথবা, অর্থলোভে ইহাদের ছাড়িয়া দিলেও চলিবে না। রাজ-পুরুষের নিকট সমর্পণ করিতেই হইবে। যাহারা ইহা করিবে না, তাহারা দণ্ডার্হ।

রাজার আদেশ—"যে যে বৃষ উৎসর্গ করিয়াছে, সে সেই বৃষ বাঁধিয়া রাখিয়া পালন করিবে।" উৎসৃষ্ট বৃষ "ধর্ম্মের ষাঁড়," তাহার কেহ মালিক নাই। তাই বলিয়া সে সকলের ফসল নষ্ট করিবে, লোকের ক্ষতি করিবে—ইহা সঙ্গত নয়। আবার গো-জাতির উন্নতির জন্য সুস্থ সবল সেচনসমর্থ বৃষ চাই। কাজেই রাজার বিধান—উৎসৃষ্ট বৃষ, উৎস্রষ্টাই পালন করিবেন। তদ্দ্বারা লোকের অনিষ্ট না হয় এজন্য বাঁধিয়া পুষিবেন। সময়দোষে উৎসৃষ্ট বৃষ এখন 'ময়-লার গাড়ীতে' যোজিত হয়, গোখাদক কর্তৃক ভক্ষিত হয়,—অবস্থা-বিশেষে ব্যক্তি-বিশেষের হাতে পড়িয়া কৃতক্লীব-(দাম্ড়া-) রূপে প্রকাশ পায়। দেশে এত বৃষোৎসর্গ হয়, কিন্তু বৃষ কৈ? যোগ্য বৃষের অভাবে রুগ্ন দুর্ব্বল ক্ষুদ্রকায় গোবৎস জন্মিতেছে, ক্রমে দুগ্ধাদিও অল্প হইতেছে। গোবংশ নির্ব্বংশ হইবার সূচনা হইতেছে। এই প্রাচীনভারতের রাজশাসন, হিন্দুর দেশে বিশেষ মূল্য-বান্, বলা বাহুল্য।

রাজা সর্ব্বশেষে জানাইতেছেন—"আমার এই শাসন-বাক্য শুনিয়া যে তাহার অনুরূপ আচরণ না করিবে, অথবা যে কেহ ইহার অন্যথা ব্যাখ্যা করিবে, আমি সেই পাপকারীকে প্রবল দণ্ডে দণ্ডিত করিব।"

সেকালে রাজা প্রজাগণকে এই সকল উপদেশ দ্বারা প্রবোধিত করিতেন। আমরা মনে করি, এই শাসন-প্রচার উপকারক ছিল।

শ্রী————ভারতী।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক তৃতীয়সূক্ত)

অস্মিন্ বসু বসবো ধারয়ন্ত্বিন্দ্রঃ পূষা বরুণো মিত্রোঅগ্নিঃ।
ইমমাদিত্যা উত বিশ্বেচ দেবা উত্তরস্মিন্ জ্যোতিষি ধারয়ন্তু ॥১

পদবোধিনী ব্যাখা। অস্মিন্ (ফলকামে জনে) বসবঃ বসু (অভিলষিতং ধনং) ধারয়ন্তু (স্থাপয়ন্তু) ইন্দ্রঃ (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তোদেবানামধিপতিঃ) পূষা (পোষকঃ

দেবঃ) বরুণঃ (বৃণোতি সর্ব্বং জগৎ নিগ্রহীতুং পাশজালেন ব্যাপ্নোতীতি রাত্র্যভিমানী দেবঃ) মিত্রঃ (অহরভিমানী দেবঃ) অগ্নিঃ (এতষামিন্দ্রাদীনামগ্রণীঃ মুখ্যভূতো বা দেবঃ) এতেঽপি বসু ধারয়ন্তু ইতি সম্বন্ধঃ। উত (অপিচ) আদিত্যাঃ বিশ্বেদেবাশ্চ ইমং (পুরুষং) উত্তরস্মিন্ (উৎকৃষ্টতরে) জ্যোতিষি (তেজসি) ধারয়ন্তু (স্থাপয়ন্তু,তেজসা সর্ব্বোৎকৃষ্টং কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ।)

বঙ্গানুবাদ। ইন্দ্র, বসুগণ, পূষা, বরুণ, মিত্র ও অগ্নিদেব এই ফলকামনাশীল পুরুষকে ধন প্রদান করুন। অপিচ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ এই ফলকাম পুরুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজঃ প্রদান করুন।

টিপ্পনী। এই মন্ত্রে দেবশক্তির নিকট ধন ও তেজঃসম্পৎ কামনা করা হইতেছে। পরমেশ্বরের সংরক্ষিণী-শক্তির নানাবিকাশ নানাদেবমূর্ত্তি। দেবশক্তিই বিশ্বযন্ত্রের চালনায় রত। জড়জগতে আমরা যে সমস্ত ক্রিয়া বা পরিণতি উপলব্ধি করি, তাহার মূলে তদভিমানিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা পরিচালিকা শক্তি। দিন ও রাত্রির অভিমানিনী দেবতার নাম মিত্র ও বরুণ। পোষণশক্তির উৎস পূষা। ধন-দেবতা পক্ষান্তরেআবাস-দেবতা বসুগণ। অগ্নি—বাড়বানল, জাঠরাগ্নি ও বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি দহনমূর্ত্তির অধিষ্ঠাতা। চরম ও পরম ঐশ্বর্য্যের বিকাশকেন্দ্র ইন্দ্রদেবতা। অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, পূষা, বসুগণ এই সব দেবশক্তি যথার্থ অনুকূলভাবে কার্য্য করিলে কামনাশীল পুরুষ, প্রকৃতির অনুগ্রহে ধনসম্পদে শোভমান হন। আর এই সকলের প্রতিকূলতা ঘটিলে প্রকৃতিক্ষোভজনিত দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির প্রকোপে পতিত হইয়া ধনাভাবের কষাঘাত প্রাপ্ত হন। বসুগণ "অষ্টবসু" নামে পরিচিত ধর ধ্রুব প্রভৃতি অষ্টদেব। আদিত্য—প্রকাশক জ্যোতি। "বিশ্বদেব" একশ্রেণীর গণদেবতার নাম। পক্ষান্তরে বিশ্বদেব অর্থ সমস্ত দেবতা। ইঁহারা কামনা-সম্পন্ন যজমানের তেজোবৃদ্ধি করিবেন। কারণ, দ্বাদশ আদিত্য বিশেষভাবে এবং বিশ্বদেবগণ সাধারণ-ভাবে তেজঃশক্তির আধার। কেবল যজমানকে ধনবান্ করিলে চলিবে না, তাহাকে শ্রেষ্ঠজ্যোতিষ্মান্ করিতে হইবে। যেন যজমান তেজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন, তেজোমূর্ত্তি দেবগণ তাহাই করুন, এইরূপ কামনা করা হইয়াছে।

অস্য দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরস্তু সূর্য্যো অগ্নিরুত বা হিরণ্যম্।
সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং নাকমধিরোহয়েমম্ ॥২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে দেবাঃ! অস্য (ফলকামস্য পুরুষস্য) প্রদিশি (প্রদেশনে প্রশাসনে আজ্ঞায়াম্) জ্যোতিরস্তু। (কিং তৎ জ্যোতিঃ ?) সূর্য্যঃ

অগ্নিঃ (ঔর্ব্বজাঠরবৈদ্যুতাদিরূপঃ) উত (অপি) বা (চ) হিরণ্যম্ (সুবর্ণম্) (সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ প্রকাশপ্রবর্ষণাদিনা অস্য উপকরোতু, নিখিলসম্পন্মূলভূতং ধনমপি অস্য বশে বর্ত্ততামিত্যর্থঃ) (যত এবমতঃ) সপত্নাঃ (শত্রবঃ) অস্মৎ (অস্মদীয়-পুরুষাৎ) অধরে (নিকৃষ্টাঃ) ভবন্তু। উত্তমং (উৎকৃষ্টতরং) নাকং (স্বর্গং—ন অকং দুঃখং যস্মিন্ তথাভূতং) ইমং (পুরুষং) অধিরোহয় (অধিরোহয়ত—প্রাপয়ত ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে দেবগণ! (আপনাদের কৃপায়) সূর্য্য, অগ্নি, ও হিরণ্যজ্যোতি, এই ফল-কাম যজমানের আজ্ঞাধীন হউক্। শত্রুগণ আমাদের এই যজমান অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক্। এই যজমান যাহাতে শ্রেষ্ঠস্বর্গে আরোহণ করিতে পারে, (আপনারা)তাহা করুন।

টিপ্পনী। পূর্ব্বমন্ত্রে ফলকাম যজমানের ধনবৃদ্ধি ও তেজোবৃদ্ধির কামনা করাহইয়াছে। এমন্ত্রে বলা হইতেছে—সূর্য্য, ও অগ্নি এই যজমানের অভিপ্রায়ের অনুকূলে থাকিয়া সুবৃষ্টি দ্বারা প্রচুর ফল-শস্য প্রদান করুন এবং জাঠরাগ্নি, যজমানের অনুকূল হইয়া পরিপাককার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যজমানের তেজোবৃদ্ধি করুক। আর তৈজস ধাতু স্বর্ণ, যজমানের গৃহে প্রভূত-মাত্রায় বিদ্যমান থাকিয়া ধনবৃদ্ধি করুক্। কেবল এইমাত্র হইলেই চলিবেনা। যজমানের শত্রুগণ যাহাতে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহাদের ধন—জন তেজঃ স্বাস্থ্য যাহাতে হ্রাস পাইতে থাকে, দেবগণ তাহাও করিবেন। যজমান ইহজীবনে ধনী, মানী, স্বাস্থ্যবান্ বীর্য্যবান্ হইয়াও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ—শ্রেষ্ঠস্বর্গলাভ চাই। দেবগণ তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা স্বর্গকে ভৌম সুখস্থানবিশেষ মনে করেন, তাঁহাদের মতে যজমানের স্বর্গস্থানে শ্রেষ্ঠতা-লাভও প্রার্থনীয়। দেবতারা স্বর্গের অধিকারী প্রধানপুরুষ, সুতরাং তাঁহারা যজমানকে ধন তেজঃ প্রভৃতি দিয়া যজমানের শত্রুগণের ক্ষতি করিয়া, শেষে স্বর্গরাজ্যে যজমানের মানমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেও পারেন। আমরা 'স্বর্গ' অর্থে দুঃখহীন সুখ অর্থাৎ মুক্তির ব্রহ্মানন্দ বুঝি। আগে প্রবৃত্তিমার্গের ধনাদিভোগের কথা, শেষে ত্যাগফল ব্রহ্মানন্দের কথা বলাই সমধিক সঙ্গত মনে করি।

যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্যুত্তমেন ব্রহ্মণা জাতবেদঃ।
তেন ত্বমগ্ন ইহ বর্দ্ধয়েমং সজাতানাং শ্রৈষ্ঠ্য আধেহ্যেনম্॥ ৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে জাতবেদঃ। যেন উত্তমেন ব্রহ্মণা (ঋত্বিজা) (মন্ত্রেণ করণভূতেন) পয়াংসি (ক্ষীরাজ্যাদিরূপাণি হবীংষি) ইন্দ্রায় সমভরঃ

(সমহরঃ প্রাপিতবানসি) হে অগ্নে ! ত্বং তেন (ব্রহ্মণা) ইমং (ফলকামং জনম্) ইহ (অস্মিন্ লোকে) বর্দ্ধয়, (অপি চ) সজাতানাং (সমানজন্মনাং পুরুষাণাং মধ্যে) শ্রৈষ্ঠ্যে (শ্রেষ্ঠত্বে) এনং (পুরুষং) আধেহি (নিধেহি স্থাপয়।)

বঙ্গানুবাদ। হে জাতবেদঃ ! যে শ্রেষ্ঠ 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিকের দ্বারা (মন্ত্র-যোগে) ইন্দ্রকে হবিঃ প্রদান করাইয়াছেন, সেই 'ব্রহ্মা' ঋত্বিক্ দ্বারাই (মন্ত্রবলে) এই যজমানকে বর্দ্ধিত করুন। হে অগ্নে ! আপনি এই যজমানকে ইহার সজাত-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপন করুন।

টিপ্পণী। যজ্ঞে যে সমস্ত ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ যজ্ঞবিদ্যাবিশেষজ্ঞ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সমস্তবেদের কর্ম্মকাণ্ডে প্রবীণ। যজ্ঞে কোন কার্য্য অনুচিতরূপে অনুষ্ঠিত হইলে অথবা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান আদৌ না হইলে, যিনি সেই সকল ভ্রম-প্রমাদের পরিহার করিতে সমর্থ, তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার কার্য্যই প্রধানতঃ ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন। এই 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিকের যজ্ঞবিদ্যাবিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থই বেদের "ব্রাহ্মণ" নামক অংশ। ব্রহ্মা যজ্ঞকার্য্যের সফলতার জন্যই প্রধানতঃ প্রশংসাভাজন। "ব্রহ্মা "ঋত্বিকের কর্ত্তৃত্বে ইন্দ্রের উদ্দেশে অগ্নির মধ্যস্থতায় যজমানের হবিঃ প্রদত্ত হয়। এখানে বলা হইতেছে, অগ্নি যে ব্রহ্মার দ্বারা ইন্দ্রকে হবিঃ দেওয়াইয়াছেন, সেই ব্রহ্মার দ্বারা যজমানের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন। সায়নাচার্য্যের মতে ব্যাখ্যা এইরূপ। আমরা মনে করি, 'ব্রহ্মণা' বেদমন্ত্রেণ। ব্রহ্ম অর্থ বেদমন্ত্র। যে প্রত্যক্ষফল মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রের উদ্দেশে হবিঃ প্রদত্ত হইয়াছে, হে অগ্নে ! সেই বীর্য্যবান্ বেদমন্ত্র দ্বারা যজমানকে বর্দ্ধিত করুন। ব্রহ্মা অভিজ্ঞ ঋত্বিক্ হইলেও তিনি দ্রষ্টা মাত্র। অধ্বর্য্যুই যজ্ঞের যথার্থ নেতা। 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিক্ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন না ; সুতরাং ব্রহ্মা দ্বারা হবিঃপ্রেরণ কষ্টকল্পনা মাত্র। যজমান বৃদ্ধিলাভ করুন এবং জাতিশ্রৈষ্ঠ্য প্রাপ্ত হউন্—এই কামনা যজ্ঞের দেব-সম্বন্ধ-নির্ব্বাহক অগ্নির নিকটই করা হইতেছে।

ঐষাং যজ্ঞমুত বর্চ্চো দদেহং রায়স্পোষমুত চিত্তান্যগ্নে।
সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং নাক মধিরোহয়েমম্ ॥৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে অগ্নে ! এষাং (শত্রূণাং) যজ্ঞং (স্বর্গাদিসাধনং) অহং আদদে (ত্বৎপ্রসাদাৎ অপহরামীত্যর্থঃ) উত (অপিচ) বর্চ্চঃ (তেজঃ) (তথা) রায়স্পোষং (ধনস্য পুষ্টিং) চিত্তানি (মনাংসি) আদদে ইতি সম্বন্ধঃ। (যতএবমতঃ) সপত্নাঃ (শত্রবঃ) অস্মৎ (অস্মদীয় পুরুষাৎ) অধরে (নিকৃষ্টাঃ)

ভবন্তু, ইমং (ফলকামং পুরুষং) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) নাকং (স্বর্গং) অধিরোহয় (প্রাপয় চ ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে অগ্নে! শত্রুগণের যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম, তেজঃ, ধনবৃদ্ধি এবং চিত্ত (আপনার কৃপায়) আমি অপহরণ করিতেছি। শত্রুগণ আমাদের যজমান হইতে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হউক্। এই ফলকাম যজমানকে উত্তম স্বর্গে স্থাপন করুন।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে—শত্রুগণের স্বর্গাদিসাধক যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তেজঃ, ধনবৃদ্ধি ও চিত্ত আমি অপহরণ করিতেছি অর্থাৎ শত্রুগণের স্বর্গ-প্রাপক যজ্ঞাদি কর্ম্ম যাহাতে নষ্ট হয় বা যাহাতে তাহাদের যজ্ঞে প্রবৃত্তি না হয়—তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতেছি এবং যাহাতে তাহাদের তেজোহানি ঘটে, ধননাশ হয়, তাহা করিতেছি ও তাহাদের চিত্ত অপহরণ করিতেছি। শত্রুগণের ধর্ম্মকর্ম্ম পণ্ড হইলে, তাহাদের তেজঃ বিনষ্ট হইলে, ধনবল বিলুপ্ত হইলে এবং তাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইলে, এককথায় তাহাদের ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইলে, তখন তাহারা যজমান অপেক্ষা প্রকৃতই নিকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ঋত্বিক্ এখানে অগ্নির নিকট বলিতেছেন "আমি মন্ত্রবলে ও আপনার কৃপায় যজমানের শত্রুগণের সর্ব্বনাশ করিতেছি। এদিকে তাহারা যজমান অপেক্ষা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হউক্, অপরদিকে আপনি আমার যজমানকে উত্তম স্বর্গে স্থাপন করুন।" যদি ঋত্বিক্ বা যজ্ঞের কথা না হইয়া ইহা যুদ্ধবিগ্রহের কথাই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, অগ্নির নিকট প্রার্থনাকারী যোদ্ধা, তাঁহাদের অনুগতজনের ধনসম্পৎ রক্ষা করিতেছেন এবং শত্রুগণের সুখসাধনের উদ্‌যোগ আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন, তাহাদের তেজোবধ করিতেছেন, তাহাদের ধন-বৃদ্ধিতে বাধা দিতেছেন, আর নানা কৌশলে তাহাদের চিত্তবিভ্রম ঘটাইতেছেন। এদিকে অগ্নি, অনুগত ব্যক্তিকে স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করিতেছেন। তবে এ ব্যাখ্যায় 'যজ্ঞ' কথাটীর অপমৃত্যু ঘটে, সুতরাং আর্য্যধর্ম্মে বিশ্বাসী জনগণ এ ব্যাখ্যায় উপেক্ষা করুন।

শ্রীঃ——



দয়াময় প্রভু।

শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে ঘোষণা করিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

যে, আমাকে যে ভাবে অর্থাৎ প্রভুভাবে, সখাভাবে, পুত্রভাবে, বা পতিভাবে ভজনা করিবে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করিব। এমনটি না হইলে কি দয়াময় বলা যায়!

সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় যাঁহার সহিত জগতের ওতপ্রোত সম্বন্ধ, যিনি অন্তরে বাহিরে, দূরে, সমীপে. পার্শ্বে, জীবনে, মরণে বিরাজমান, তাঁহার ভজনার রীতি কঠিন ও জটিল হইবে কেন? এমন কোন্ ভাব আছে, যাহা তাঁহার নিকট পৌঁছে না? এমন কি ভাষা আছে, যাহা দয়াময়ের নিকট অজ্ঞাত? তিনি অন্তর্যামী, তিনি ভাবগ্রাহী। সকল ভাবই তিনি গ্রহণ করেন।

মূর্খো বদতি "বিষ্ণায়", ধীরো বদতি "বিষ্ণবে"'
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

মুর্খ বলে "বিষ্ণায়", পণ্ডিত বলেন "বিষ্ণবে", কিন্তু উভয়েরই তুল্য পুণ্য হয়, কারণ, ভগবান্ ভাবগ্রাহী, তিনি ভাষার শুদ্ধি অশুদ্ধি বাদ দিয়া ভাবটাই গ্রহণ করেন।

গঙ্গা-জলে কিং নবসন্তি মৎস্যাঃ?
দেবালয়ে পক্ষিগণা বসন্তি।
ভাবোজ্ঝিতাস্তে্ন ফলং লভন্তে।
তদ্ভাবশুদ্ধিং কুরু চেতসস্তে।

যে গঙ্গার স্মরণমাত্রে জীব পাপমুক্ত হয়, সেই গঙ্গাজলে বাস করিয়া মৎস্যগণ কি নিষ্পাপ হইবে? দেবালয়ে বাস করে বলিয়া কি পক্ষিগণ পূত হইবে? কখনই নহে। ভাব-শুদ্ধি চাই, ভাব ভিন্ন ভবারাধ্য ধনকে পাওয়া যায় না। যোগ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, জ্ঞান, কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, এক মাত্র ভাব-রজ্জুতে তিনি বাঁধা পড়েন। সাধনমার্গ দুরারোহ, কিন্তু ভাব-(ভক্তি-) সম্পৎ থাকিলে সে পথ সরল সমতল ও কুসুমাস্তরণশোভিত হইয়া দাঁড়ায়। হৃষীকেশের দয়া হইলে, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা কিছুরই আবশ্যক থাকে না। তখন ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন হয় না, কারণ সে সময় সকল ইন্দ্রিয়ই ভগবদভিমুখ হইয়া উঠে। মোট কথা, মন-প্রাণ তাঁহার চরণ-কমলে ফেলিয়া রাখা চাই, আর

"দয়াময়ের" চরণে সতত শরণাপন্ন হওয়া চাই। ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি, যুগে ২ অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ড-দলন ও ভক্তজন-মনোরঞ্জন করেন। যদিও সর্ব্বশক্তিমান্ হরি, ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ, তবুও ভক্ত-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই বিবিধ লীলা প্রকাশ করেন। ভক্তানুগ্রহই তাঁহার লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য দুষ্ট-নিগ্রহ, গৌণ উদ্দেশ্য।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতে দয়াময় প্রভুর অবিছিন্ন দয়া-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রভুর দয়ার সীমা নাই। অদ্ভুত কৌশলপূর্ণ জড়জগতে, জলভাগে, স্থলভাগে যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রভুর বিচিত্র করুণা-কৌশল দেখিতে পাই। আমরা এ স্বপ্নতুল্য জীবনে অণুক্ষণ দয়াময়ের দয়া অনুভব করি। জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভগবানের দয়া আমাদিগকে অনন্তবাহু বিস্তার করিয়া রক্ষা করিতেছে। ক্ষণধ্বংসী এ তুচ্ছ জীবনের যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে সেও প্রভুর করুণার প্রভাব। ভগবন্! তুমি, ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশ-সাধন করিয়া এ স্বপ্নময় জীবনে স্থূল, সূক্ষ্ম কত জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়াছ, মনের সৃষ্টি করিয়া কত সুগভীর মননশক্তি করতলে প্রদান করিয়াছ, বিবেক-বুদ্ধি দিয়া সঙ্কীর্ণ-চেতন পশুরাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছ, তোমাকে চিনি-বার জানিবার শক্তি দিয়া মানবের দেবত্ব-লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছ। কিন্তু, প্রভো! আমি মূর্খ, পথ ভুলিয়া সেই পশুত্বের পথেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বলিব কি, আমি কর্ম্মদোষে নরক-যাতনা ভোগ করিতেছি। একটি চণ্ডদহন-তাপ প্রাণীর পক্ষে অসহ্য, আমি নিরবধি ত্রিতাপ-দাব-দহনে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতেছি। নাথ! আমার দুর্গতির বর্ণনা করিবার যোগ্য ভাষাও নাই। প্রভো! কত দিনরজনী একমুষ্টি অন্নের জন্য উদ্‌গ্রীব লোলদৃষ্টি সারমেয়ের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া কত যাতনা ভোগ করিয়াছি! সামান্য অর্থের জন্য অবিশ্রান্ত মুখে দাতার অসত্য গুণগানে সময়াতিপাত করিয়াছি। অনাদৃত অবজ্ঞাত উপেক্ষিত হইয়া কত যে ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, তাহা অন্তর্যামিন্, তোমারও কি অজ্ঞাত? দয়াময়! সে অরুন্তুদ যাতনার কথা তুমিও কি ভুলিয়াছ? না—না প্রভো, তুমি ভুল নাই, আমিই তোমাকে ভুলিয়া কষ্ট পাইয়াছি। সর্ব্বসিদ্ধি যাঁহার চরণতলে, কমলা যাঁহার গৃহিনী, রত্নাকর যাঁহার শয়ন-মন্দির, তাঁহাকে যে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারে, তাহার আবার কষ্ট কি? তুমি বিশ্বম্ভর, তোমার রাজ্যে, মহীপতি হইতে কীট পর্য্যন্ত কেহই ত অভুক্ত থাকে না। তবে তোমাকে ভুলিয়া যাই বলিয়াই এত কঠোর যাতনা পাই। প্রভো! এ কি পরীক্ষা না শিক্ষা?

দয়াময়! আমি অজ্ঞানের ঘোরে অমূল্য জীবন-রত্ন কাল-জলধিতলে নিঃক্ষেপ করিয়াছি। কাচ-মূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করিয়াছি। বৃথাই জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছি। আহা! জীবনের সে দিনগুলি আর কি কখনও ফিরিয়া আসিবে? সে দিনগুলির একটী মুহূর্ত্তও যদি দয়াময়ের নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইত, তবে সেই এক মুহূর্ত্তও অনন্ত সুখের কারণ হইয়া রহিত। বাল্যে বার্দ্ধক্যে মানব-জীবনের অর্দ্ধাংশ গত হয়। অবশিষ্ট অংশ, আহার, নিদ্রা ও বিষয়-চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া যায়। বৃথা সারাটী জীবন কাটিয়া যায়, কিন্তু ভগবৎ-প্রসঙ্গ জুটে না। বড় দুর্লভ জন্ম পাইয়াছিলাম, কিন্তু হায়! ইহার দ্বারা কোনই প্রয়োজনসাধন হইল না। স্বর্ণভূমি পড়িয়া রহিল, আবাদ করিতে পারিলাম না। আহা! কবে আমার সে দিন হইবে, যে দিন ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্ত গলদশ্রু, প্রেমোন্মত্ত ভগবদ্ভক্তের চরণ-রেণু গায়ে মাখিয়া চরিতার্থ হইব? কবে দয়াময়ের নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে আমার গাত্রে স্বেদ রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইবে? কবে প্রণয়িনীর প্রণয়-সঙ্গ-লালসার ন্যায়, অনুদ্ভিন্ন পক্ষ অজাতচক্ষু বিহঙ্গ-শিশুর জননী-লাভাশার ন্যায়, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির জল-পিপাসার ন্যায়, আমার কৃষ্ণলিপ্সা সেই দয়ানিধির চরণ-সরোজের উদ্দেশে ধাবিত হইবে? কবে আমার জীবন জনন সফল হইবে? কবে আমার মন ব্রজধামে ধাবিত হইবে? কবে আমার হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইবে? কবে আমার সকল সংশয় দূরীভূত হইবে? কবে আমি ধন্য হইব? কবে আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত দয়াময়ের চরণ-সরোজ-পরাগে মিশিয়া যাইবে। ধরার সার, দেহের সার, প্রাণের সার, জ্ঞানের সার, ধ্যানের সার, তপস্যার সার, যজ্ঞের সার সেই দয়াময় প্রভু। তাঁহার চরণে যদি মন প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারি, তবে জীবন মরণ ভিন্ন অন্য কি?

সারাৎসার, প্রাণের একমাত্র দেবতা, তোমায় ভুলিয়া হরি হে! আমার পাপ মন বিষয়-বিষে আসক্ত হইল কেন? দুর্নিবার মনকে বশে আনিবার ক্ষমতা নাই। যদি নাথ! তুমি দয়া কর, তবেই সে অবাধ্য মন বশে আসিতে পারে। তুমি ইন্দ্রিয়-বাজি-রাজির নেতা, তুমি অনুগ্রহ করিলে কি না হইতে পারে? জানি, তোমার অনুগ্রহ সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত হয়। তোমাকে যে শত্রুভাবে দেখে, সেও তোমার দয়ায় বঞ্চিত হয় না, যে মিত্রভাবে ভজনা করে, তাহার কথা আর কি বলিব? আমি নিরুপায়, অনন্যগতি, আমার মত পতিত জনকে কৃপা না করিলে হরি হে! তোমার দীনবন্ধু নামের গৌরব নষ্ট হইবে। তুমি অনন্তবাহু, অনন্তপাদ, অনন্তচক্ষু, অনন্তশ্রোত্র, অন্তর্যামী, আমার এ বিলাপবাণী

অবশ্যই তোমার শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিবে। অবশ্যই এক দিন তুমি দয়া করিবে। তুমি কৃপা করিয়া হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া না দিলে কোন্ পথে যাইব ? আমি অজ্ঞানান্ধ তাহাতে দিগ্‌ভ্রান্ত। তাহারপর ঋষিগণের নানা মত—নানা পথ। এ বিষম সঙ্কটে তুমি না ত্রাণ করিলে আর কে রক্ষা করিবে ? তুমি যুগে যুগে কত শত জনকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। যে ডাকিতে জানে, দয়াময়, তুমি কি তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া থাকিতে পার ? তাই বলি দয়া কর।

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।" ভগবদ্বিষয়িনী দৃঢ়মতি কখনই তর্ক দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিতে নাই। কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে, তবে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তবে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তৎপর আসক্তি, নিষ্ঠা, রতি, ভাব, প্রেম, মহাভাব প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তখন জীব, জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্ভক্ত অথবা ভক্তের দাসানুদাসের কৃপা ব্যতীত শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি, ভাব প্রভৃতির উদয় না। সে কৃপা পাইতে হইলে সৎসঙ্গ চাই। সৎসঙ্গে নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন ঘটে। নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন ঘটিলে ভবের ভাবনা ক্রমে দূর হয়। নামই সর্ব্বস্ব, নাম ভিন্ন গতি নাই।

নাম্নস্তু যাদৃশী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎকর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ॥
হরি-নাম-গুণ গানে যত পাপ হরে,
জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে।
জ্ঞাত্বা কৃত্রিমকাননে হরিকথাবীজং ময়া রোপিতং।
ভক্ত্যম্ভঃ পরিষেচনং কুরুত ভোস্তদ্বৃদ্ধয়ে সাম্প্রতং॥
তদ্বৃক্ষে যদি জায়তেঽমৃতফলং কালান্তরে সম্ভবং।
তদ্ভক্তুর্নহি ভূতলে প্রভবিতা যামী পুনর্যাতনা॥

হরিনামের মহিমা জ্ঞাত হইয়াই হৃদয়-কাননে হরি-কথা-বীজ রোপণ করিয়াছি, হে ভক্তগণ! আপনারা সেই বীজ-বৃদ্ধির জন্য সতত ভক্তি-বারি-সেচন করুন। যদি কালান্তরে সেই বৃক্ষে মোক্ষফল উৎপন্ন হয়, তবে তদুপভোগীর আর কখনই যম-যাতনা হইবে না।

দয়াময় প্রভু নানাবেশে আসিয়া নামের উপদেশ দিয়া পাপ-তাপ-তাপিত জীবের নিস্তার করিতেছেন। আমরা অন্ধ, তাই দেখিতে পাই না। প্রভু, দয়া-দানে কাতর নহেন। আমরাই হতভাগ্য, আমরা তাঁহার দয়া আকর্ষণ করিতে জানি না। তাঁহার করুণা-ধারার বিচ্ছেদ নাই, আমরাই সে ধারা ধরিয়া লইতে

জানি না। দয়াময়! সব ছাড়িয়া তোমাকে সম্বল করি নাই, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে। এখন, দয়া করিয়া এ কাঙ্গাল সন্তানের হাত ধরিয়া তুলিয়া লও, আমার এই স্বপ্ন-তুল্য জীবনের সফলতা বিধান কর, আমার অশ্রু-সিক্ত মুখ মুছাইয়া দাও, আমায় শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া লও, আমার মোহ-মদিরার নেশা দূর করিয়া দাও। জানিও, সতত আমি তোমার করুণা-ভিখারী।

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মৃত্যুপথ।—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত—প্রায় দুই শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—এক টাকা মূল্যের গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনটী পাদ বা বিভাগ আছে। প্রথম পাদের বিষয় 'পথিক'। দ্বিতীয় পাদের বিষয় "পথ"। তৃতীয় পাদের বিষয় "পাথেয়"। প্রথম পাদে ৫টী অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে ৪টী অধ্যায়, তৃতীয় পাদে ৪টী অধ্যায়। প্রথম পাদে প্রথম অধ্যায়ে পথিক, জন্মমৃত্যু, নব-কলেবর, প্রেতদেহসংঘটনপ্রণালী প্রভৃতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কারণ-শরীর-বিচার, তৃতীয় অধ্যায়ে সূক্ষ্মশরীরের আকৃতি প্রকৃতি, গুণ, ধর্ম্ম, উৎপত্তি, পঞ্চকোষবিচার প্রভৃতি, চতুর্থ অধ্যায়ে ভাবিদেহবিচার, পঞ্চম অধ্যায়ে আতিবাহিক দেহ-বিচার প্রভৃতি আছে। দ্বিতীয় পাদে প্রথম অধ্যায়ে মার্গ-বিচার, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গতিতে রশ্মি ও নাড়ী-সম্বন্ধ, তৃতীয়াধ্যায়ে মার্গত্রয়, উত্তরায়ণমার্গ, দক্ষিণায়ণমার্গ, দেবযানবাসী ও পিতৃযানবাসী প্রাণী, প্রশস্ত অপ্রশস্ত গতি প্রভৃতি, চতুর্থ অধ্যায়ে প্রেতপুরীর পথ, যমরাজ, যমদূত, যম-সভা বিচার, নরক প্রভৃতির কথা আছে। তৃতীয় পাদে প্রথম অধ্যায়ে পাথেয় কর্ম্মফল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্তরমার্গ ও পিতৃযানমার্গ-প্রাপক কর্ম্ম, গোলক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক অগ্নিলোক গ্রহলোক বরুণলোক প্রভৃতির পাথেয়ের কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মগতি, পাপানুসারে রোগোৎপত্তির কথা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধাদির কথা আছে। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারাই এই সকল তত্ত্বের আলোচনা ও সমাধান করিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ। মৃত্যু অনিবার্য্য। জন্মান্তর ও যমলোকাদিতে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক, মরণের কথা সকলকেই ভাবিতে হইবে। এই সকল তত্ত্ব, সাধারণ মানবের বুদ্ধির অতীত হইলেও

অলৌকিকপ্রজ্ঞ শাস্ত্রকারগণের জ্ঞানচক্ষুর আয়ত্ত ছিল। আমরা উহা জানিবার জন্য স্বল্প সাধনশ্রম না করিয়াই উহার সম্বন্ধে বিপরীত মত প্রকাশ করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী নহি। শাস্ত্রের এই নির্দ্ধারণে অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। সংসারবিরাগী ঋষিগণ প্রতারক বা মিথ্যাবাদী ছিলেননা। শাস্ত্র-সিদ্ধ আর্য পরলোকমার্গের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থ সকলের পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ ৬০নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতায় মুদ্রিত। গ্রন্থকারের নিকট উত্তরপাড়ায় (হুগলী) গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীভূমি।—(প্রথমবর্ষ প্রথমসংখ্যা বৈশাখ ১৩২২।) শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত নূতন মাসিকপত্র। আকার ডিমাই ৮ পেজী. ৬৮ পৃষ্ঠা। বার্ষিক মূল্য দুইটাকা ছয় আনা। এই সংখ্যায় ৪টী কবিতা, একটী কীর্ত্তন, ১টী গান, তাহার স্বরলিপি ও স্বরলিপি-ব্যবহৃত সঙ্কেতচিহ্নের ব্যাখ্যা, ১খানি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের কিয়দংশ, ও ৯টী প্রবন্ধ আছে। শ্রীভূমি শ্রীহট্ট শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি। শ্রীভূমির কাছে বঙ্গসন্তান অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। রঘুনাথের তর্ক-বিদ্যা, বঙ্গের গৌরব। আর শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম, বঙ্গের কেন, ভারতের—আরও বেশী জগতের গৌরবের। "শ্রীভূমি" শ্রীভূমির গৌরবগাথা সম্বল লইয়া বাহির হইয়াছে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি। ছাপা কাগজ ভাল। "শ্রীভূমির পূর্ব্বকথা" একটী প্রবন্ধ। যাঁহারা শ্রীহট্টের পুরাতন কথা জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। 'সামুদ্রিকশাস্ত্র' প্রবন্ধে পাশ্চাত্যদেশে সামুদ্রিক-শাস্ত্রের উন্নতি ও এ দেশে অবনতির সুদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া লেখক শেষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'-প্রবচনের দৃষ্টান্তস্থল। 'ভারতে বিদ্যা-গুপ্তি' প্রবন্ধের লেখক বলিতেছেন, এ দেশে যে বিদ্যাগুপ্তি ছিল, তাহা ভালই ছিল, অনধিকারীকে বিদ্যাদান অন্যায়। বিদ্যাগুপ্তির ফল ভাল হওয়া সঙ্গত, পূর্ব্বে হইতও বটে। কিন্তু আমরা নিজদোষে উহার ফল মন্দ করিয়া ফেলি-য়াছি। ইউরোপেও বিদ্যাগুপ্তি ছিল। গুপ্তবিদ্যার গুরু এখনও আছেন, যোগ্য শিষ্য মিলিতেছে না ইত্যাদি। কথাটী খাঁটী, কিন্তু অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা দরকার হয়। অন্যান্য প্রবন্ধ চলনসই। "মহারাণী ইন্দুপ্রভা" উপন্যাস কাঁচা হাতের বিশেষত্ববর্জ্জিত রচনা। গানটীতে বিশেষত্ব নাই। কীর্ত্তনে শ্রীযুক্ত সুন্দরী-মোহন দাস মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার শ্রীহট্টীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত, গ্রন্থকার, কীর্ত্ত-নীয়া প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই সি এস্ মহাশয়ের

'শ্রীভূমি' কবিতাটী শ্রীভূমির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে বঙ্গভারতীর সেবাব্রতে দীক্ষিত দেখিয়া বস্তুতঃই আশা ও আনন্দের উদয় হয়। কবিতাটী ছন্দে শব্দসম্পদে ভাবে উত্তম হইয়াছে। কবিতাটী উদ্ধৃত হইল—

রম্য-ভারতভূমি বাম-ক্রোড়াশ্রিত- আর্য্য-ভূমি-পরিশেষ,——
নীল ভূধরতলে শ্যামল বিস্তৃত স্বাদু-ফলান্বিত কুঞ্জ-বিভূষিত
নাতিগভীর-জল প্রান্তর-শোভিত রাজিছে নিরুপম দেশ।
দূর নগর বন ভ্রমিয়া আর্য্যগণ রম্যনিকেতন আশে,
বিবিধ বিবিধ কত দেশ অতিক্রমি উপনীত "শ্রীভূমিতে" শেষে ;
যেথা—সন্তান-বৎসলা স্নিগ্ধা প্রকৃতিদেবী মণ্ডিতা ফল-ফুল-ভারে,
(বর) বক্র সুরমারূপা (ক) স্তন্য-যুগল-ধারা ক্ষুধা তৃষা সতত নিবারে !
চির মধুর এই পুণ্যভূমিতে আশা পুরিল, মন মোদিল,
নব-দেশান্তর আকুল তিয়াসা চিত হ'তে হেথা ঘুচিল !
কালে কালে যেথা আর্য্য-প্রতিভা-শিখা ভাতিল উজ্জ্বল-দীপ্তি,
যেথা — ভারত-শিরোমণি "তার্কিক রঘুনাথ" উপজিল, অক্ষয়-কীর্ত্তি ;
জ্যোতিষী নীলাম্বর উদিল ;—ধ্বনিল যার, উপবন প্রান্তরবীথি।
মুখরি মধুরতানে বৈষ্ণব-কবি-কুল- -কণ্ঠ-নিনাদিত-গীতি—
নিঃসৃত যেথা হতে নিমাই-নিঝর-ধারা— —গলিত-ভকতি-রস বন্যা
প্রেম-তুফানভরে পুলক-তরঙ্গিত প্লাবিল বঙ্গভূমি ধন্যা ;——
ধরিবে সে বরা ভূমি সত্য-পতাকা পুনঃ উত্তোলিত করি তুঙ্গে ;
বিকশিত করি পুনঃ জ্ঞান-প্রদীপ-ভাতি গরবিয়া উজলিবে বঙ্গে !
সেই সুমহৎ ব্রত সাধিতে দীপ জ্বাল হে জ্যোতিঃ ঢালহে আগে চল হে
মধু-"শ্রীভূমি"র গুণগরিমা পুনঃ জাগ্রত কর হে !

তপোবন। (প্রথমবর্ষ দশম সংখ্যা বৈশাখ ১৩২২) ৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সচিত্র মাসিকপত্র। বার্ষিক মূল্য ২।৵০ মাত্র। সম্পাদক শ্রীশ্যামাচরণ সরকার। এ সংখ্যায় তাজমহলের রঞ্জিত চিত্র ও বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর চিত্র আছে। আটটী পদ্য এবং ১০টী গদ্য সন্দর্ভ এবারকার তপোবনে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে "গতবর্ষ" শীর্ষক ঘটনা-বিবরণী এডুকেশন গেজেট্ হইতে উদ্ধৃত।

(ক) বর-বক্র—(অপভ্রংশ) বরাক্ নদী। সুরমা—সুরমা নদী।

'ব্রাহ্মণ' শীর্ষক পদ্যে একজন ব্রাহ্মণ-মহিলা, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের অধঃপতন উল্লেখ করিয়া অনাচার অপব্যবহার পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন। কবিতা হিসাবে ব্যর্থ রচনা। "স্মরণে" শ্রীমতী হেমন্তবালার চলনসই পদ্য। 'তপোবন' শীর্ষক পদ্য এসংখ্যার উল্লেখযোগ্য কবিতা। অন্য কবিতা গুলি স্থান-পূরণার্থে মুদ্রিত ভাবিলে ক্ষতি নাই। "পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা" পড়িবার যোগ্য, ভাবিবার যোগ্য। "বিলাতে উপনিবেশশাসন-প্রণালী" জ্ঞাতব্য-পূর্ণ। 'নেতৃত্ব ও স্বার্থত্যাগ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মত বলিয়া প্রচার করা হইতেছে যে, স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার করা যায় না। কথাটা নূতন নহে, কিন্তু রচনা নিতান্ত কাঁচা। "প্রতিশোধ" গল্প জমে নাই। 'আবাসের পত্র' পাঁঠা আর কুষ্মাণ্ডের কথা লইয়া জ্যাঠামীপূর্ণ বাগ্‌বিস্তর। ধর্ম্মটা পাঁঠায় পরিণত হইয়া পেটে ঢুকিতেছে, আর কুষ্মাণ্ডটা 'বলি' হইয়া কর্ত্তার ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে ইত্যাদি অপূর্ব্ব তথ্য লইয়া সময়-ক্ষেপ করায় ব্যক্তি-বিশেষের আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-সাধনার সাধ এ ভাবে পূর্ণ করায় সাহিত্যের যে পুষ্টি-সাধন হয়, তাহা শোথের ন্যায় আশঙ্কাজনক। "জীবের জন্মরহস্য" প্রবন্ধে গর্ব্ভ-কথা ও ভ্রূণের বৃদ্ধি পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-মতের অসম্পূর্ণ ইঙ্গিত। বৈদ্যক গ্রন্থে ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, লেখকের সে সব জানা থাকিলে ভাল হইত। "বিবিধ সংগ্রহ" প্রবন্ধে বলা হইতেছে—ইংলণ্ডেশ্বর মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, প্রজার নিকট বার্ষিক ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি পান। নিজ জমিদারী হইতে ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা পান। ৩ লক্ষ টাকা বাড়ী-ঘর মেরামত করিবার জন্য অতিরিক্ত পান। রুষ-সম্রাট্ গড়ে ১২০ কোটি টাকা পান। জর্ম্মান্‌সম্রাট্ রাজ্য ও সাম্রাজ্য হইতে গড়ে ১৩৫০৮৩১০ টাকা পান। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ ১ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা পান। স্পেনের রাজা ৫৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত টাকা পান। ইটালীর রাজা ৯৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পান। জাপান-সম্রাট্ ৪৫ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে বরোদার গাইকোয়াড় মহাশয়ের রত্ন মণি, মাণিক্য, অলঙ্কার ইত্যাদির মূল্য লেখা আছে। তপোবনের উন্নতি হইলে আমরা আনন্দিত হইব। ছাপা কাগজ ভাল।

ভারতী। (৩৯ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ) সচিত্র মাসিক-পত্রিকা।

সম্পাদক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়। এ সংখ্যায় ৯৬ পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। প্রথম সুরঞ্জিত চিত্র "অশোকের রাণী ও তাঁহার সতীন বোধিদ্রুম।" ইহার মূল চিত্রের মালিক শ্রীশ্রীমতী ভারত সম্রাজ্ঞী। এ সংখ্যায় আর কয়েকটী সাধারণ চিত্র আছে। ভারতী পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথের "আধুনিক ভারত" তথ্যপূর্ণ ও সুপাঠ্য। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্য" নিতান্ত রহস্য নয়। সাধারণ ধারণাই প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষতত্রাণ—রক্ষামূর্ত্তি ক্ষত্রিয়ের বিশেষত্ব, এ তথ্য আবিষ্কার করিতে বেগ পাইতে হয় না। 'দৈব পরীক্ষা' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের দৈব প্রমাণের আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক, দৈব পরীক্ষার প্রতি অনুচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গুলি নিতান্ত 'গাঁজাখুরী' নয়, উহার মধ্যেও কিছু সত্য আছে। পরের মুখে ঝাল না খাইয়া নিজে পুঁথি পড়ুন, বুঝিবেন, উহাতে ভ্রমের প্রতিষ্ঠা মিলিবে না। তিনি যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন ও উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ গুলির প্রকৃত বর্ণনা উহা হইতে বিভিন্ন। ঐতিহাসিক হইলেও বৈদেশিকের পক্ষে সত্য-নির্ণয় দুঃসম্পাদ্য। আমরা 'দৈব পরীক্ষা'র আলোচনা করিব। 'চয়ন' বিভাগে প্রেমধর্ম্মে হিংসাবাদ, পাদের সৌন্দর্য্য ও জাতিতত্ত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ, সাহসের সম্মাননা, পাঠের কথা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ক মন্তব্য সুপাঠ্য। "স্রোতের ফুল" ও "নবাব" ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস চলিতেছে। 'নালক' ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প। 'অন্ধ' ও 'ঠাকুরঝী' ক্ষুদ্র গল্প। ঠাকুরঝী গল্পে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। 'অন্ধ' গল্পে বিশেষত্ব নাই। 'আলো' একটী পদ্য—সাধারণ। 'রাজা ভড়ং' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রহস্য-কবিতা। রঙ্গ রহস্যেরও স্থান এবং মূল্য আছে, কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথের এ রহস্যে মৌলিকতা নাই, অনুকৃতি আছে মাত্র। নবীন সম্পাদক-যুগল ভারতীর পূর্ব্বগৌরব রাখিতে পারিলে সুখের কথা।

আল্ এস্লাম। সচিত্র মাসিক পত্র। বৈশাখ ১৩১২, ১ম সংখ্যা। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী আছে। আভাষ, অভিনন্দন, কোরআন্, কোরআনের দুইটী আদর্শ, পুণ্য কথা, এস্লাম-প্রচার, মূল বাইবেল কোথায়? পারস্য-সাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান, সাহিত্য-শক্তি ও জাতি-সংঘটন, আল্ এস্লাম, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, প্রার্থনা। প্রবন্ধাবলী সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনে লক্ষ্য করিয়া এই পত্র প্রকাশিত হইলেই মঙ্গল। আমরা জগদীশ্বরের নিকট এই পত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করি। ইহার বার্ষিক মূল্য ২৷৴০ আনা। কলিকাতা ৩৩ নং ফুলবাগান রোড হইতে মোহম্মদ মোজাফারুদ্দিনের দ্বারা আল্ এস্লাম্ প্রকাশিত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

প্রেস্ কংগ্রেস্। আমেরিকা কালিফর্ণিয়ার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরে আগামী জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক প্রেস্-কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইবে। ঐ কংগ্রেসে 'বেঙ্গলী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমন্ত্রিত হইয়াছেন। ভাগ্য !

দুশ্চেষ্টা। ফরিদপুর—ভাঙ্গার উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ঘরে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ ও ভারত-সাম্রাট্-মহিষীর চিত্র ছিল। কে বা কাহারা ঐ মহনীয় চিত্র ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এই দুশ্চেষ্টার মূলে দুর্বৃত্তগণের দুর্বুদ্ধির বিকাশ অনুমান করা যায়। এই শ্রেণীর বিকৃত ব্যক্তিবর্গের দুর্বুদ্ধির মূল উৎপাটিত হইলেই আনন্দের কারণ হইবে।

রচনায় পদক। রংপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ ও রংপুর জমিদারসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রংপুর-জিলা স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার দত্তকে বাঙ্গালা-ভাষার সৎ প্রবন্ধ রচনার জন্য স্বীয় স্বর্গগতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতির সম্মানার্থে একটী স্বর্ণ-পদক প্রদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর বঙ্গ-ভাষানুরাগ আরও উজ্জ্বল হউক্।

উন্নতি-মার্গের সংবাদ। বরদা রাজ্যে নিত্য নূতন উন্নতিকর বিধান বিধিবদ্ধ হইতেছে। সম্প্রতি না কি বরদায় বিবাহের পণের নির্দ্দিষ্ট হার নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে একটী নূতন বিধান প্রণীত হইতেছে! দেখা যাউক্, ফল কি হয়!

-:০:-

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২২ বর্ষ, ২২ শ খণ্ড | আষাঢ়। | ১৩২২ সাল।
৩য় সংখ্যা। | | ১৮৩৭ শকাব্দা

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথমকাণ্ড—দ্বিতীয় অনুবাক—চতুর্থ সূক্ত)

অয়ং দেবানামসুরো বিরাজতি বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
ততস্পরি ব্রহ্মণা শাশদান উগ্রস্য মন্যোরুদিমং নয়ামি।১

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং মধ্যে) অসুরঃ (ক্ষেপ্তা নিগ্রহীতা, অয়ং বরুণঃ বিরাজতি (বিশেষেণ দীপ্যতে) হি (যস্মাৎ কারণাৎ) সত্যা (সত্যানি পদার্থ জাতানি) রাজ্ঞঃ (রাজমানস্য) বরুণস্য বশা (বশানি অধীনানি) ভবন্তীত্য-ধ্যাহৃতেন সম্বন্ধঃ। ততঃ (তস্মাৎ কারণাৎ) পরি (সর্ব্বতঃ) ব্রহ্মণা (মন্ত্রেণ হবিষা বা) শাশদানঃ (অত্যর্থং তীক্ষ্ণঃ প্রাপ্তবল ইত্যর্থঃ) অহম্ উগ্রস্য (দুষ্প্রধর্ষস্য বরুণস্য) মন্যোঃ (ক্রোধাৎজলোদর-হেতুভূতাৎ) ইমং (জলোদররোগার্ত্তং) উৎ-নয়ামি (উদ্গময়ামি উন্মোচয়ামি ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। দেবগণের মধ্যে অসুর (নিগ্রহকারী) এই বরুণদেবতা বিশেষভাবে দীপ্তিমান্। কারণ সমস্ত সত্য বস্তুজাতই রাজমান বরুণদেবের অধীন। সেই নিমিত্ত বেদমন্ত্র দ্বারা বা মন্ত্রপূত হবিঃপ্রদান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বল-সম্পন্ন হইয়া আমি, উগ্র বরুণদেবের ক্রোধ হইতে এই জলোদর-রোগ-গ্রস্ত যজ-মানকে মুক্ত করিতেছি।

টিপ্পনী। বরুণ-কোপে জলোদর-রোগ-গ্রস্ত যজমানের মুক্তির জন্য বারুণী

ইষ্টির অনুষ্ঠান পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। জলের দেবতা বরুণ। উদরে জলোপচয়রূপ যে দুশ্চিকিৎস্য জলোদর-রোগ জন্মে, তাহা জল-দেবতা বরুণের কোপেরই পরিণাম; বরুণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে উহা দূরীভূত হয়, এ কথা বৈদিক ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন। এ মন্ত্রে সেই বরুণপাশ বা জলোদর-রোগের নিবারণার্থে বরুণের উদ্দেশে স্তুতি-পাঠ ও হবিঃ প্রদানাদিরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের ইঙ্গিত করা হইতেছে। যজ্ঞের ঋত্বিক্ বলিতেছেন, "বরুণ দেবতাগণের মধ্যে অসুর—অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ বা পীড়ক। কেননা, সমস্তই তাঁহার করায়ত্ত। বরুণ অত্যন্ত উগ্র। মন্ত্র বা স্তুতি-বাক্য-প্রয়োগ এবং মন্ত্রপূত-হবিঃ-প্রদান করিলেই বরুণ পরিতুষ্ট হইতে পারেন, সুতরাং সেই উপায় অবলম্বন করিয়াই বরুণের কোপ বা জলোদর-রোগ হইতে যজমানকে রক্ষা করিতে হইবে, অন্য পথ নাই।" কেহ কেহ বলেন এ মন্ত্র ঋত্বিকের উক্তি নয়, অগ্নির উক্তি। অগ্নি বলিতেছেন, "বরুণ নিতান্ত উগ্র দেবতা, দেবতাদের মধ্যে একেবারে অসুর,—একান্ত একগুঁয়ে, বরুণের অধীনে অনেক অনুচরও আছে, কিন্তু আমি উত্তমরূপে হবিঃ ভক্ষণ করিয়া বলবান্ হইয়া যজমানকে বরুণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিব"। এ ব্যাখ্যায় জলোদর-রোগের কথা নাই। অবশ্য মূলে জলোদরের নাম নাই। বরুণ হয়ত এক সময় অসুরদলে মিশিয়া যজ্ঞকারিগণের অনিষ্ট করিতেছিলেন। যাজ্ঞিক, বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়া অগ্নিকে আহ্বান করিলে, অগ্নি আসিয়া হবিঃ ভক্ষণ পূর্ব্বক বলবান্ হইয়া বরুণের কবল হইতে যজমানকে উদ্ধার করেন এই ঐতিহাসিক তথ্য এখানে থাকিতে পারে। অন্য ভাবে বরুণ জলীয়াংশের দেবতা, অগ্নি তেজের দেবতা। জলীয়াংশের বৃদ্ধিতে জলোদর জন্মে, অগ্নি পুষ্ট হইলে তাহা সারিয়া যায়। সে ভাবেও অগ্নির উক্তি হইতে পারে।

নমস্তে রাজন্ বরুণাস্তু মন্যবে বিশ্বং হ্যুগ্র নিচিকেষি দ্রুগ্ধম্।
সহস্রমন্যান্ প্রসুবামি সাকং শতং জীবাতি শরদস্তবায়ম্ ॥২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে রাজন্ (দ্যোতমান) বরুণ! তে (তব) মন্যবে (ক্রোধায়) নমঃ অস্তু। (তত্র হেতুমাহ) হে উগ্র (উদ্‌গূর্ণবল) বরুণ! বিশ্বং (কৃৎস্নম্) দ্রুগ্ধম্ (অপকারকং, দ্রোহং অপরাধং বা) নিচিকেষি (জানাসি) (যত এবমতঃ) সহস্রং (সহস্র সংখ্যাকান্) অন্যান্ (সাপরাধান্) সাকং (সহ, যুগপদেব ইত্যর্থঃ) প্রসুবামি (প্রেরয়ামি, অস্য প্রতিনিধিত্বেন প্রযচ্ছামি ইত্যর্থঃ) (তস্মাৎ) অয়ং (রোগার্ত্তঃ) (তব অনুগ্রহাৎ) শতং শরদঃ (শত সংখ্যাকান্ সম্বৎসরান্) জীবাতি (জীবতু) (সাপরাধান্ অন্যান্ অপরিমিতান্ স্বীকৃত্য এনং নীরোগং কৃত্বা শতসম্বৎসরং জীবয় ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে দ্যোতমান বরুণদেব! আপনার ক্রোধকে নমস্কার করি। হে উগ্র বরুণদেব! (যেহেতু) আপনি সমস্ত অপরাধ (বা অপকারকগণকে) অবগত আছেন। আমি এই যজমানের প্রতিনিধিরূপে একসঙ্গে অন্য সহস্র অপরাধী আপনাকে প্রদান করিতেছি। (আপনি তাহাদিগকে লইয়া তুষ্ট হউন্) এই রোগার্ত্ত যজমান (আপনার অনুগ্রহে নীরোগ হইয়া) শতবর্ষ জীবিত থাকুক।

টিপ্পনী। এই মন্ত্রে যজমানের কল্যাণ কামনায় ঋত্বিক্ (মতান্তরে অগ্নি) বরুণের স্তব করিতেছেন। প্রথম বলিতেছেন—"রাজন্ বরুণ! আপনার ক্রোধকে নমস্কার। আপনার ক্রোধ অনর্থক নহে। আপনি সমস্ত অপরাধ এবং অপরাধিদের জানেন,—অপরাধিদের উপরই ক্রোধ করেন। এই যজমানকে ছাড়িয়া দিউন্। ইহার বদলে সহস্র অপরাধী আপনাকে দিব। যজমানের জীবন দান করুন।" বরুণ-যজ্ঞের প্রসঙ্গ এ স্থলে আলোচ্য। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেখা যায়, রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্র অবস্থায় বরুণের নিকট প্রার্থনা করেন যে "আমাকে পুত্র দান করুন, পুত্র জন্মিলে তাহা দ্বারা আপনার যজ্ঞ করিব।" বরুণ প্রার্থনা পূরণ করেন। পুত্র জন্মিলে বরুণ বলিলেন "যজ্ঞ কর।" হরিশ্চন্দ্র ওয়াদা করিতে লাগিলেন। শেষে বরুণের পীড়াপীড়িতে অগত্যা পুত্রকে বলিলেন "বাপু হে তোমা দ্বারা বরুণ-যজ্ঞ করিব।" পুত্র ঐ কথা শুনিয়া বনে পলাইল। এ দিকে বরুণের কোপে হরিশ্চন্দ্রের জলোদর-রোগ হইল। উপায় না পাইয়া অগত্যা হরিশ্চন্দ্র পুত্রের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞ করা স্থির করিলেন। একটী ব্রাহ্মণ-বালক সংগৃহীত হইল। বরুণ স্বীকৃত হইলেন। বহু শোচনীয় ঘটনার পরে ব্রাহ্মণ-বালক রক্ষা পাইল। ব্রাহ্মণ-বালকের স্তব-স্তুতিতে বরুণ প্রভৃতি দেবগণ তুষ্ট হইলেন। হরিশ্চন্দ্রের জলোদর-রোগ সারিয়া গেল। এখানে দেখিলাম, পুত্রের পরিবর্ত্তে অন্যের পুত্রকে বরুণের উদ্দেশে বলি দিবার চেষ্টা। ঋত্বিক্ সেই ভাব মনে রাখিয়া এখানে অন্য অপরাধী দিয়া জলোদর-রোগ-গ্রস্ত যজমানকে রক্ষা করিতে চাহিতেছেন। এ মন্ত্রে অগ্নির প্রার্থনা বুঝিতে হইলে বলিতে হইবে—অগ্নি বলিতেছেন, হে বরুণ! এই যজমান বন্দীকে ছাড়িয়া দিউন্। ইহার পরিবর্ত্তে সহস্র লোককে আপনার হস্তে দিব। অথবা যে সহস্র অপরাধী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব। বন্দি-বিনিময়ের কথা মনে করিলে বুঝিতে হইবে, বরুণ এখন অসুর দেব-বিরোধী। তাঁহার পক্ষের সহস্র বন্দীর বিনিময়ে যজমান বা হবির্দাতাকে (রসদের মালিককে) ছাড়াইয়া লওয়া হইতেছে। অগ্নিপক্ষের ব্যাখ্যায় জলোদর রোগ-প্রসঙ্গ নাই, সুরাসুর যুদ্ধের কথা আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পূর্ব্বমন্ত্রের অনুকূলে চলিতে পারে।

যদুবকৃথানৃতং জিহ্বয়া বৃজিনং বহু।
রাজ্ঞস্ত্বাসত্যধর্ম্মণো মুঞ্চামি বরুণাদহম্ ॥৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে জলোদর-রোগগ্রস্ত পুরুষ!) জিহ্বয়া যৎ অনৃতং (অসত্যম্) উবকৃথ (উক্তবান্ অসি) (তৎ) বহু (অধিকং) বৃজিনং (পাপম্ (অন্যস্মাৎ পাপ-কর্ম্মণঃ অধিকতরপাপ-হেতু অনৃত-বদনমিত্যর্থঃ) সত্যধর্ম্মণঃ (সত্য ভাষণস্বভাবাৎ) রাজ্ঞঃ বরুণাৎ ত্বা (ত্বাং) অহং মুঞ্চামি (মোচয়ামি) (অনৃত বদনসম্ভূতাৎ জলোদররূপাৎ বরুণপাশাৎ মন্ত্রপ্রভাবেণ ত্বাং বিযোজয়ামি ইত্যর্থঃ)

বঙ্গানুবাদ। (হে রোগগ্রস্ত পুরুষ!) তুমি জিহ্বা দ্বারা যে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত পাপজনক। (আমি,) সত্যবাদী দ্যোতমান বরুণ দেবের কবল হইতে তোমাকে (মন্ত্রপ্রভাবে) মুক্ত করিতেছি।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে মিথ্যাকথনের নিন্দা করা হইতেছে। মিথ্যাকথন সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম হইতে গুরুতর কুকর্ম্ম। যজ্ঞ-পক্ষের ব্যাখ্যায় বলা যায়—মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগেই বরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন এবং জলোদর-রোগ ঘটে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানে দেখা যাইতেছে,—হরিশ্চন্দ্র মিথ্যাবাদী হইলেন—প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইলেন না, সেই জন্যই বরুণ-ক্রোধে জলোদর-গ্রস্ত হইলেন। মিথ্যাবাক্য মিথ্যা-ব্যবহার দেব-কোপের মূল, তৎফলে রোগোৎপত্তি। সত্যধর্ম্ম সত্যবাদী বরুণের কৃপা-লাভ ভিন্ন ঐ উপসর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অন্য উপায় নাই। যুদ্ধ-পক্ষের ব্যাখ্যায় অগ্নি বলিতেছেন—হে বরুণ-গৃহীত বন্দী যজমান তুমি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্যই হইয়াছে। কারণ মিথ্যা কথন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপকর্ম্ম। যাহা হউক্, বরুণদেব সত্যবাদী, (অর্থাৎ যখন তিনি সহস্র অপরাধীর বিনিময়ে তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন—এ কথা আমার নিকট বলিয়াছেন, তখন) তাঁহার নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত করিতে পারিব। ভাবে বোধহয়, যজমান মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ করিয়াই বরুণ কর্ত্তৃক পাশবদ্ধ হইয়াছিলেন যজ্ঞ-পক্ষে বক্তা ঋত্বিক্।

মুঞ্চামি ত্বা বৈশ্বানরাদর্ণবাৎ মহতস্পরি।
সজাতানুগ্রেহা বদ ব্রহ্ম চাপচিকীহি নঃ ॥৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে রোগগ্রস্ত) ত্বা (ত্বাম্) বৈশ্বানরাৎ (বিশ্বনর হিতাৎ) মহতঃ (প্রভূতাৎ) অর্ণবাৎ (সমুদ্রাৎ সমুদ্রাভিমানিনো দেবাৎ বরুণাৎ পরিমুঞ্চামি (বরুণ-কৃতাদ্ জলোদররোগাৎ মোচয়ামি ইত্যর্থঃ) (যদ্বা বৈশ্বানর জাঠরাগ্নিঃ তস্য আবরকত্বেন সম্বন্ধী সোঽপি বৈশ্বানরঃ তথাবিধাৎ মহতঃ

দুশ্চিকিৎস্যাৎ অর্ণবাৎ জলময়াৎ রোগাৎ ত্বাং মুঞ্চামি মোচয়ামি ইত্যর্থঃ) হে উগ্র বরুণ! (ত্বমপি) সজাতান্ (সহচারিণঃ ভটান্) ইহ (অস্মিন্ পুরুষে) আবদ (সমন্তাৎ কথয়) (যথা পুনঃ পুনরাগত্য এনং ন নিঘ্নন্তি তথা কথয় ইত্যর্থঃ) তত্র হেতুমাহ, নঃ (অস্মদীয়ং) ব্রহ্ম (হবিঃ স্তুতিং বা) (স্বীকৃত্য) অপ (অপহায় অপরাধং বিস্মৃত্য) চিকীহি (জানীহি) চ (স্তুত্যা তুষ্টঃ ভয়াদি নাশয় ইতি ভাবঃ।)

বঙ্গানুবাদ। (হে রোগগ্রস্ত!) বৈশ্বানর মহৎ অর্ণব হইতে তোমাকে পরিমুক্ত করিতেছি। হে উগ্র বরুণদেব! আপনি এই রোগার্ত্ত ব্যক্তির (মুক্তি) সম্বন্ধে আপনার অনুচরগণকে বলুন। আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ বা স্তুতিবাদ স্বীকার করিয়া অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যজমানকে নির্দ্দোষরূপে অবগত হউন্।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে যজমানকে বলা হইতেছে "তোমাকে বৈশ্বানর মহৎ অর্ণব অর্থাৎ বরুণ হইতে মুক্ত করিতেছি।" বরুণকে বলা হইতেছে, "বরুণদেব! আপনার অনুচরগণকে বলিয়া দিউন্, তাহারা যাহাতে এই যজমানকে পুনরাক্রমণ না করে। আর আপনি আমাদের অপরাধ বিস্মৃত হউন্, আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করুন, যজমানকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানুন।" এখানে 'বৈশ্বানর মহৎ অর্ণব' অর্থে 'বিশ্বমানবের হিতকর সমুদ্রাভিমানী দেব বরুণ' বুঝা যায়। আবার "বৈশ্বানর" অর্থ জঠরাগ্নির আবরক দুশ্চিকিৎস্য জলময় উদর-রোগ। জলোদররোগ হইতে এবং জলোদরের মূল কারণ বরুণ হইতে উদ্ধার করা একরূপই। বরুণের অনুচর জলোদররোগ-প্রাপক কারণকূট। বরুণ তাহাদিগকে নিষেধ করিবেন, তাহারা পুনরায় যজমানের রোগোৎপাদন করিবে না। যজ্ঞ-পক্ষে ঋত্বিক্ বলিতেছেন—হে বরুণদেব যজমানকে রোগমুক্ত করুন, আপনাকে হবিঃপ্রদান করিতেছি। যুদ্ধপক্ষেও অগ্নি যজমানকে বলিতেছেন হে যজমান! তোমাকে বিশ্বনর-বিদিত মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতেছি। বরুণকে বলিতেছেন "বরুণদেব! আপনার অনুচরদের বলিয়া দিউন্, যজমানকে ছাড়িয়া দিক্। আপনাকে যজ্ঞভাগ হবিঃ প্রদান করিব।" এখানে মনে হয়, যেন কোনও যজমান ইন্দ্রের ইঙ্গিতে বরুণকে যজ্ঞভাগ দিতে অনিচ্ছুক হয়, এবং মিথ্যা কথা বলে। বরুণদেব ক্রোধে দল ছাড়িয়া অসুর-দলে গিয়া অনুচর-সহায়ে সেই যজমানকে পাশবদ্ধ করিয়া সমুদ্রে (পোতে) বন্দী করিয়া রাখেন। শেষে যজমানের প্রার্থনায় অগ্নি (ইন্দ্রাদিরপক্ষ হইতে) বরুণকে যজ্ঞভাগ দিবার প্রস্তাব ও বন্দিবিনিময়ের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হন এবং যজমানকে মুক্ত করেন। বরুণ দেবদলে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার মূল সূত্র ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দেখা যায়। বরুণযজ্ঞ যাহাতে না হয়, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র যাহাতে রাজ্যে

গিয়া পিতার কথা না শুনে, তাহার জন্য ইন্দ্র উপদেশ দিতেছেন এ কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। ইন্দ্র বরুণে বোধহয় তখন বিরোধ ছিল।

কর্ম্মফল ও পরিত্রাণ।

কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। কারণ ও প্রয়োজন ব্যতীত কোন বস্তুর উৎপত্তি হয়না। বৃক্ষ ফলহীন, মেঘ জলহীন, জীবন সুখহীন, কেবলি চতুর্দ্দিকে মর্ম্ম-স্পর্শী হাহাকারধ্বনি! ইহার কারণ কি? আমাদিগের কর্ম্মফল। প্রয়োজন— আমাদিগের সুখ-দুঃখ-সাধন। পরম কারুণিক পরমপিতা পরমেশ্বরের অহৈতুকী দয়া বিস্মৃত হইয়া থাকায় এত যাতনা। দুই একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্য-পুঞ্জফলে একটি পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ ঘটে। জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল, ভগবানের চিরসেবক। সেই গৃহেই বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি ভক্তরাজ প্রহ্লাদের জন্ম। ঘোর এই কলিযুগে নরনারী প্রায়ই যেমন নরকের যাত্রী, জঠর-আকাশে সেইরূপ নারকী পুত্রই উদিত হইতেছে। সুপুত্র বিরল, কারণ সুপিতাও বিরল। এখনকার দিনে আর কেহই বলিবে না যে, পিতঃ! আমি তোমার জন্য

ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং পতেয়মপিপাবকে।

পুণ্যকর্ম্ম, পিতৃকার্য্য, পিণ্ডদান, এমন কি পরকাল-চিন্তা পর্য্যন্ত গিয়াছে! দেবদেবীপূজা এখন পৌত্তলিকতা—ঘোর কুসংস্কার বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এ যুগে কর্ম্মদোষে ধর্ম্মসাধন দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। দয়াময় ভগবান্ ইহা জানিয়াই পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যোগ, যাগ, জ্ঞান, তপস্যা, ধ্যান, দান প্রভৃতি দ্বারা যে ফল হইতে পারিত, এই ভীষণ কলিযুগে, অল্পায়ু অন্ন-গতপ্রাণ মানবের পক্ষে একান্তচিত্তে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম জ্ঞান দুইখানি তরি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, দয়ানিধি মহা-প্রভু, ভক্তির "খেয়াঘাটে" বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যে পারে, সে "বিনা কড়িতে" পার হইতে পারে। এ সুযোগ যে হারাইবে, তাহার পারের উপায় রহিবে না। দীন দয়াল কাঙ্গালের বন্ধু শ্রীচৈতন্য এই ব্যাধি-সঙ্কুল দেশে ভবরোগের

সহজ ও সুলভ ঔষধ আনিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য ত্রিতাপদগ্ধ শ্মশান-ভূমি চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। শুধু এইমাত্র নয়, যাঁহারা লক্ষ্মীর প্রার্থী, তাঁহারা যদি লক্ষ্মীকান্ত-চরণোপান্তে শরণাগত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।

ভগবান্ ভক্তের অপ্রাপ্ত বস্তু মিলাইয়া দেন ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করেন। গীতায় শ্রীমুখের উক্তিতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। তাঁহার নরলীলা, ব্রজ-লীলা, যুগাবতার অংশাবতার সমস্ত লোক-শিক্ষার জন্য। নতুবা তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম। "কৃতে তু ধ্যানং" সত্যযুগে ভগবানের ধ্যান-ধারণা তৎ-প্রাপ্তির উপায় ছিল। কলিতে শক্তিহীন মনুষ্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তাহার জন্যই বলা হইয়াছে "কলৌ নাস্ত্যেব" কলিতে তাহা নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি? "হরের্নামৈব কেবলং" একমাত্র হরিনাম তাহার প্রতিনিধি। "ত্রেতায়াং যজ্ঞমুচ্যতে" ত্রেতায় যজ্ঞ। তাহা কলিতে অসম্ভব। এজন্য বলা হইল "কলৌ নাস্ত্যেব"। তাহার বিনিময়ে কি? "হরের্নামৈবকেবলং" একমাত্র হরিনাম। 'দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং' দ্বাপরযুগে শ্রীহরির সেবায় তাঁহার পদ-প্রাপ্তি। কলিতে তাহাও অসম্ভব। এজন্য বলা হইল, "কলৌ নাস্ত্যেব"। তাহার প্রতিনিধি কি? "হরের্নামৈব কেবলং" একমাত্র হরিনাম। নাম নামীর অভেদ, এজন্যই নামের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। একবার হরিনামে যত পাপক্ষয় হয়, জীবের সাধ্য নাই যে তত পাপ করিতে পারে। কিন্তু নামাপরাধ প্রজ্ঞাপরাধ বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি বর্জ্জনপূর্ব্বক তদ্‌গত চিত্তে নাম-কীর্ত্তন করিতে পারিলে, তবে জীব পাপমুক্ত হইবে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।০।

যে ব্যক্তি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, তাহার যাবতীয় মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়, সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। সে ব্যক্তি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া চিদানন্দঘনস্বরূপ হয়।

যাঁহার একটি নিশ্বাস ব্যতীত আমরা পরিচালিত হইতে পারি না। অভিমানে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, তাঁহার প্রতি জীবনের সমস্ত ভার অর্পণ করা প্রকৃত মনুষ্যের উপযুক্ত কার্য্য। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাগতি প্রার্থনীয়। আমরা যেন তাঁহার রাতুল চরণ-মূলে অন্তিমমুহূর্ত্তে তদ্‌গতচিত্ত হইতে পারি। শেষ দিনে যেন রসনাকে বলিতে পারি যে, জিহ্বে ভক্ষ্যমভক্ষ্যবস্তু-নিবহং

দত্তং তু তে প্রীতয়ে। প্রাণান্তে সমুপস্থিতে হরিকথালাপেঽলসং মাকুরু। হে রসনে! তোমার তৃপ্তির জন্য কত ভক্ষ্য, কত বা অভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রকারেই তোমার সেবা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আজ প্রাণান্তকালে যেন হরি-গুণগানে বিমুখ হইওনা। তুমি একবার আমার উপকার কর; শেষ অনুরোধ রক্ষা কর; আমি কৃতার্থ হই; কর্ম্মফলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

অন্বয়। হে পাণ্ডব যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং (স্বজন-বধাদি নিমিত্তং) মোহং ন যাস্যসি যেন (জ্ঞানেন) ভূতানি অশেষেণ (ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি) আত্মনি (এব অভেদেন দ্রক্ষ্যসি) অথো (অনন্তরং) আত্মানং ময়ি (পরমাত্মনি) অভেদেন দ্রক্ষ্যসি। ৩৫

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব, যে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর মোহাভিভূত হইবে না, যাহা দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীতে অভিন্ন ভাবে আত্মদর্শন করিতে পারিবে এবং স্বীয় আত্মায় আমাকেও অভিন্ন রূপে দর্শন করিবে। ৩৫

আলোচনা। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে কি হইবে? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তুমি শাস্ত্রদর্শী গুরুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে স্বজন-বন্ধু-জ্ঞাতি-বধ-শঙ্কায় তোমার যে অলীকমোহ জন্মিয়াছে তাহা দূর হইবে। প্রাণীমাত্রে সমভাবে আত্মদর্শন করিতে পারিবে এবং আমাকেও তোমার আত্মায় অভিন্ন-রূপে দর্শন করিতে পারিবে। জগৎ যে কেবলব্রহ্মময় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। ৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ-কৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

অন্বয়। চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (পাপকারিভ্যঃ) পাপকৃত্তমঃ (অধিক পাপকারী) অসি (তথাপি) সর্ব্বং বৃজিনং (পাপ-সমুদ্রং) জ্ঞান-প্লবেন (জ্ঞানপোতেন) এব সন্তরিষ্যসি (অক্লেশেন তরিষ্যসি)। ৩৬

বঙ্গানুবাদ। যদি তুমি সকল পাপী হইতেও অধিক পাপ করিয়া থাক, তাহা হইলেও তুমি জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা পাপ-সমুদ্র পার হইতে পারিবে। ৩৬

আলোচনা। অজ্ঞানবশতই পাপকার্য্যে মন লিপ্ত হয়। জ্ঞান জন্মিলে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে তথা জ্ঞানাগ্নিঃ (প্রারব্ধ কর্ম্মফল-ব্যতিরিক্তানি) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ৩৭

বঙ্গানুবাদ। প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করে, তেমন জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম-রাশিকে ভস্মসাৎ করে। ৩৭

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অন্বয়। ইহ (তপোযোগাদিষু মধ্যে) জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং (শুদ্ধিকরং পুরুষার্থ-সাধকতমং) নহি বিদ্যতে তৎ (আত্মজ্ঞানং) কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগেন যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্) আত্মনি স্বয়মেব বিন্দতি (লভতে) নতু কর্ম্মযোগং বিনা। ৩৮

বঙ্গানুবাদ। ইহলোকে পূর্ব্বোক্ত যোগের মধ্যে আর কোন যোগ আত্মজ্ঞান-যোগের ন্যায় পবিত্র নহে। কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা যোগ্যতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি যথাকালে আত্মাতে স্বয়ং আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ৩৮

আলোচনা। সমস্ত সাধনের মধ্যে আত্ম-জ্ঞান-সাধনই শ্রেষ্ঠ। কেননা, উপাসনাদি কর্ম্ম দ্বারা পাপ-নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু পাপাদির মূল-ভিত্তি-স্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হয় না, পুনঃ পাপাচরণের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান জন্মিলে পাপাচরণের মূল-ভিত্তি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং আর পাপ আচরণের আশঙ্কা থাকে না। কর্ম্মযোগাদিসিদ্ধি-সম্পন্ন না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার হয়না। এই জন্য আত্মজ্ঞান-পিপাসু-সাধক, নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ ও ভক্তি-যোগ সাধন করিলে তাঁহার আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে।

সাধক কবীর বলিয়াছেন—

তৌ লোঁ তারা জগ মগৈ জৌ লোঁ উগে সুর।
তৌ লোঁ জিয় জগ কর্ম্মবশ জৌ লোঁ জ্ঞান ন পুর ॥

যেমন যতক্ষণ না সূর্য্যের উদয় হয় ততক্ষণই তারকামালা ঝক্ মক্ করিতে থাকে,

সেই প্রকার যতক্ষণ না মানবের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় ততক্ষণই তাহার বিষয়জ্ঞান সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান থাকে। (কবীর) ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অন্বয়। শ্রদ্ধাবান্ (গুরূপদিষ্ট অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদেক-নিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে, জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং (নিরতিশয় সুখাত্মি-কাং) শান্তিং (মুক্তিং) অধিগচ্ছতি। ৩৯

বঙ্গানুবাদ। শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরূপদেশে আস্তিক্য-বুদ্ধিশালী গুরূপদেশ-পরায়ণ বিষয়-ভোগ হইতে সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরমা শান্তি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

অন্বয়। অজ্ঞঃ (গুরূপদিষ্টার্থে অনভিজ্ঞঃ) (কথঞ্চিৎ জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীনঃ) সংশয়াত্মা বিনশ্যতি (স্বার্থাৎ হীয়তে) সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি নচ পরঃ (পরলোকঃ) নচ সুখম্। ৪০

বঙ্গানুবাদ। অল্প-জ্ঞানবিশিষ্ট গুরূপদেশে শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি অভীষ্ট-লাভ হইতে ভ্রষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কোথাও সুখ হয়না। ৪০

আলোচনা। লভেরাঙ্খিতার্থং পরং ব্রহ্মসংজ্ঞং।
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নং ॥ (শঙ্করাচার্য্য)

গুরুর উক্তি যাঁহার অন্তরে দৃঢ় লগ্ন, তিনিই বাঞ্ছিত পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

বিশ্বাসো ধর্ম্ম-মূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনম্।
(মহাজন-বাক্যম্)

যিনি গুরূপদেশে বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ অসংশয়িত-চিত্ত এবং বিষয়-ভোগ হইতে সংযত, তিনিই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তি-লাভের অধিকারী হন। আর যিনি অনভিজ্ঞ গুরূপদেশে শ্রদ্ধাহীন সংশয়িত-চিত্ত, তিনি কখন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, সুতরাং শান্তি-লাভও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। সংশয়িত-চিত্ত ব্যক্তি সদা কর্ত্তব্য অব-ধারণে বিমূঢ়, হিতাহিত-নির্ব্বাচনে অসমর্থ। কি উপদেশ, কি ধর্ম্মকথা, কি ভোগ্য-বস্তু কিছুই তাহার নিঃসন্দেহভাবে গ্রহনীয় হয় না, সুতরাং ঐহিক পারত্রিক কোন প্রকার সুখই তাহার ভাগ্যে ঘটে না।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—

"ঈশ্বর-লাভের পথই (গোঁড়া) হ'ল বিশ্বাস। যার বিশ্বাস লাভ হোল, তার

সবই হ'য়ে গেল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে পারলে বেশী খাটতে হয় না। যার বিশ্বাস নাই তার ঘুরে মরাই সার।" ৩৯।৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞান-সংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

অন্বয়। হে ধনঞ্জয়, যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন তং) জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ং (জ্ঞানেনাকর্ত্রাত্মবোধেন ছিন্নঃ সংশয়ো যস্য তম্) আত্মবন্তং (অপ্রমাদিনং) জনং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।৪১

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়, যিনি ঈশ্বরারাধনারূপ যোগ দ্বারা কর্ম্মসকল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন, যিনি আত্মজ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়াছেন, সেই অপ্রমাদী আত্মবান্ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মসকল আবদ্ধ করিতে পারে না। ৪১

আলোচনা। যিনি 'অহং কর্ত্তা' এই জ্ঞানরহিত, যাঁহার যাবতীয় কার্য্যই ঈশ্বরের প্রীতি-অর্থে তাঁহাতেই সমর্পিত, "জগৎ ব্রহ্মময়" এই জ্ঞানে যিনি অসংশয়িত, জগতের কোন কর্ম্মই তাঁহার সংশয়-বন্ধনের কারণ হয় না, তিনি মুক্ত পুরুষ। ৪১

তস্মাদজ্ঞান-সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

অন্বয়। তস্মাৎ অজ্ঞান-সম্ভূতং হৃৎস্থং (হৃদি স্থিতং) এনং (শোকাদি-নিমিত্তং) সংশয়ং জ্ঞানাসিনা (দেহাত্মবিবেক-জ্ঞান-খড়্গেন) ছিত্ত্বা যোগং (পরমাত্মজ্ঞানোপায় কর্ম্মযোগং) আতিষ্ঠ (আশ্রয়) হে ভারত উত্তিষ্ঠ। ৪২

বঙ্গানুবাদ। অতএব আত্মবিষয়ক অজ্ঞানোৎপন্ন অন্তঃকরণস্থ দেহাত্ম-বিবেক-রূপ সংশয়কে জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়ভূত কর্ম্ম-যোগ অবলম্বন কর; হে ভারত উঠ। ৪২

আলোচনা। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "হে অর্জ্জুন, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষ-লাভের উপায়। সংশয়ই সমস্ত অনর্থের মূল। অতএব তুমি জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা সংশয় ছিন্ন করিয়া নিষ্কাম চিত্তে যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ৪২

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

তোমার দান।

(১)

কবে— কোকিল-গুঞ্জনে মলয়-স্পন্দনে
আমার হৃদয়খানি—
দিলে— করিয়া মুক্ত প্রীতি-সিক্ত
তোমার আশীষ দানি ॥
মুগ্ধ মোহ আবরণে
ক্লান্ত হৃদয়-গগনে
স্নিগ্ধ তব বরদানে
পূর্ণিত করি প্রাণ,—
আমার এ শুধু জীবন বঁধু—
তোমারি যে গো দান ॥

(২)

এযে— বাঁধা বিকল স্বর্ণ-শৃঙ্খল
সংসার-দীনতা-পাশ—
এযে— ক্ষুব্ধ চক্ষে নিভৃত কক্ষে
মুক্ত যাতনা শ্বাস।
আমি— বহিতে পারি না আর
হৃদয়-বেদনা ভার
লও টানি দয়াধার!
করিতে পাপী ত্রাণ,—
মোহ-মুগ্ধ দাব-দগ্ধ—
আমারি ক্ষীণ প্রাণ;—
এযে— তোমারি প্রভো! দান।

(৩)

কেন— শ্রান্ত দেহে ভ্রান্ত মোহে
বাঁধিয়া রেখেছে মোরে,
মিছে— সারাটী জীবন আমারে এমন
ভাসাবে নয়ন-লোরে।

অকুল গহন-পথে
নিয়ে চল মোরে সাথে
প্রবঞ্চিত করুণাতে
ক'রো না ভগবান,—
লয়ে— রয়েছি বসে তোমারি আশে
ব্যথিত হীন প্রাণ ;—
সেযে— তোমারি প্রভো! দান ॥

(৪)

ওগো— আমার যন্ত্রী হৃদয়-তন্ত্রী
বাঁধিয়াছ কোন্ সুরে,
সুমধুর রাগে সুরট বেহাগে
ঝঙ্কারিছ কোন্ তারে—
তবে— হৃদয়ের জ্বালা যত
গাঁথিয়া মনের মত
করিব চরণে নত
করুণা মাখা তান—
ক্ষরিত সুধার মৃদুল আধার
করাবে তোমায় স্নান।
প্রভো— তোমারি সে যে দান ॥

(৫)

আজি— আঁখি বারি সঞ্চিত করি
এনেছি পূজার অর্ঘ—
লহ— করুণা দানি' যদিও জানি
এ নহে তোমার যোগ্য,
তবুও তোমারি তরে
তিল তিল যত্ন ক'রে
সাজায়ে পূজার ভারে
এসেছি তব স্থান ;—
প্রভো— যেওনা ফেলি চরণে দলি
আমার ক্ষুদ্র দান।
ওগো!— তোমারি সে যে দান।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

সংখ্যার দৈব-শক্তি।

এক হইতে নব সংখ্যার শেষ অঙ্ক সর্ব্ব-কনিষ্ঠ বলিয়া "নব" নাম পাইয়াছে। তুলনা কর—"নব কর্ত্তা" "ন—বাবু"।

অঙ্ক নব লিখিতে নব শব্দের আদি অক্ষর ন (৯) লিখি।

মুখে নব বলিতে নয় (নব্‌য়) বলি। নব সংখ্যার দৈব শক্তি অতীব বিস্ময়কর।

উদাহরণ ১

(W. Green)

"কোন রাশিদ্বারা নব সংখ্যাকে গুণ করিলে গুণফল—রাশির অঙ্ক সমষ্টি নব-ময় হইবে।"

যথা

১×৯=৯, এবং ৯=৯
২×৯=১৮ „ ১+৮=৯
৩×৯=২৭ „ ২+৭=৯
৪×৯=৩৬ „ ৩+৬=৯
৫×৯=৪৫ „ ৪+৫=৯
৬×৯=৫৪ „ ৫+৪=৯
৭×৯=৬৩ „ ৬+৩=৯
৮×৯=৭২ „ ৭+২=৯
৯×৯=৮১ „ ৮+১=৯
১০×৯=৯০ „ ৯+০=৯
১১×৯=৯৯ এবং ৯+৯=১৮
এবং ১+৮=৯
১২×৯=১০৮ „ ১+০+৮=৯
১৩×৯=১১৭ „ ১+১+৭=৯
১৪×৯=১২৬ „ ১+২+৬=৯
১৫×৯=১৩৫ „ ১+৩+৫=৯
১৬×৯=১৪৪ „ ১+৪+৪=৯

১৭×৯=১৫৩ ১+৫+৩=৯

১৮×৯=১৬২ ১×৬+২=৯

১৯×৯=১৭১ ১+৭+১=৯

২০×৯=১৮০ ১+৮+০=৯

এইরূপ চল যত পার।

উদাহরণ ২

(M. De. Maivan)

"কোন রাশির অঙ্কগুলির ক্রম-পরিবর্ত্তন করিলে যে রাশি লাভ হয়, সেই রাশি মূল রাশি হইতে বিয়োগ করিলে বিয়োগ-ফল ৯ কিম্বা ৯ সংখ্যার গুণ-ফল হইবে। সুতরাং গুণফলের অঙ্কগুলির সমষ্টি ৯ হইবে।"

যথা

(ক) রাশি ২১ লও। এই রাশির অঙ্কের ক্রম-পরিবর্ত্তনে ১২ পাই। ২১ হইতে ১২ বিয়োগ কর, বিয়োগ ফল ৯ হইল।

(খ) রাশি ৩১ লও। অঙ্কের ক্রম-পরিবর্ত্তনে ১৩ হয় হয়। ৩১ হইতে ১৩ বিয়োগ করিলে বিয়োগ-ফল ১৮ হইল ৯ এর গুণ-ফল ১৮ এবং ১+৮=৯।

(গ) রাশি ৪১ লও। অঙ্কের ক্রম-পরিবর্ত্তনে ১৪ হয়। ৪১ হইতে ১৪ বাদ দিলে বিয়োগ-ফল ২৭ হয়। ৯ এর গুণ-ফল ২৭। এবং ২+৭=৯।

(ঘ) রাশি ৫১ লও। অঙ্কের ক্রম-পরিবর্ত্তনে ১৫ হয়। ৫১ হইতে ১৫ বাদ দিলে বিয়োগ ফল ৩৬ হয়। ৯ এর গুণ-ফল ৩৬। এবং ৩+৬=৯।

উদাহরণ ৩

কোন সংখ্যার বর্গ-ফল হইতে সেই সংখ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যার বর্গ-ফল বাদ দিলে যে বিয়োগফল হয়, ঐ বিয়োগফল উভয় সংখ্যার যোগফল হইবে। (†)

যথা—

(ক)	৩	এর	বর্গফল	৯
	২	"	"	৪
যোগ ফল	৫		বিয়োগ ফল	৫

(†) অর্থাৎ যে দুই সংখ্যার পার্থক্য ১, সেই দুই সংখ্যার যোগ ফল তাহাদের বর্গফলের পার্থক্যের সমান।

(খ)		৪	এর	বর্গফল	১৬
		৩	,,	,,	৯
	যোগ ফল	৭		বিয়োগ ফল	৭
(গ)		৫	এর	বর্গফল	২৫
		৪	,,	,,	১৬
	যোগ ফল	৯		বিয়োগ ফল	৯
(ঘ)		১০	এর	বর্গফল	১০০
					৮১
	যোগ ফল	১৯		বিয়োগ ফল	১৯
(ঙ)		২০	এর	বর্গফল	৪০০
		১৯			৩৬১
	যোগ ফল	৩৯		বিয়োগ ফল	৩৯

উদাহরণ ৪

যে দুই রাশির পার্থক্য দুই, তাহাদের সমষ্টির দ্বিগুণ তাহাদের বর্গফলের পার্থক্যের সমান।

(ক)		৭	এর	বর্গফল	৪৯
		৫	,,	,,	২৫
	সমষ্টির	১২		বিয়োগ ফল	২৪
	দ্বিগুণ	২৪			
(খ)		১২	এর	বর্গফল	১৪৪
		১০	,,	,,	১০০
	সমষ্টি	২২		বিয়োগ ফল	৪৪
	দ্বিগুণ	৪৪			
(গ)		২১	এর	বর্গফল	৪৪১
		১৯	,,	,,	৩৬১
	সমষ্টি	৪০		বিয়োগ ফল	৮০
	দ্বিগুণ	৮০			

উদাহরণ ৫

যে দুই রাশির পার্থক্য তিন, তাহাদের সমষ্টির ত্রিগুণ তাহাদের বর্গফলের পার্থক্যের সমান।

যথা—

(ক)	৭	এর	বর্গফল	৪৯
	৪	,,	,,	১৬
সমষ্টি	১১		বিয়োগ ফল	৩৩
ত্রিগুণ	৩৩			
(খ)	১৩	এর	বর্গফল	১৬৯
	১০	,,	,,	১০০
সমষ্টি	২৩		বিয়োগ ফল	৬৯
ত্রিগুণ	৬৯			
(গ)	২৩	এর	বর্গফল	৫২৯
	২০	,,	,,	৪০০
সমষ্টি	৪৩		বিয়োগ ফল	১২৯
ত্রিগুণ	১২৯			

সিদ্ধান্ত

যে দুই রাশির যত পার্থক্য, তাহাদের সমষ্টির তত গুণ, তাহাদের বর্গফলের পার্থক্যের সমান।

যথা—

(ক)	১০০	এর	বর্গফল	১০০০০
	২	,,	,,	৪
সমষ্টি	১০২		বিয়োগ ফল	৯৯৯৬
৯৮ গুণ	৯৯৯৬			

ব্যাখ্যা। ১০০ এবং ২ এর পার্থক্য ৯৮। ১০০ এবং ২ এর সমষ্টি ১০২।
১০২ × ৯৮ = ৯৯৯৬

আবার

১০০	এর	বর্গফল	১০০০০
২	এর	বর্গফল	৪
		পার্থক্য	৯৯৯৬

যদি প্রশ্ন হয় ঃ—

৯৯৯ এবং ৮৮৮ এই দুই সংখ্যার বর্গফলের পার্থক্য কত—

সহজ উত্তর এই ঃ—

৯৯৯ + ৮৮৮ = ১৮৮৭

৯৯৯ − ৮৮৮ = ১১১

১৮৮৭

১৮৮৭

১৮৮৭

গুণ ফল ২০৯৪৫৭

ও দিকে বর্গফলের পার্থক্য—

$৯৯৯^২$ = ৯৯৯

৯৯৯

৮৯৯১

৮৯৯১

৮৯৯১

৯৯৮০০১

$৮৮৮^২$ = ৮৮৮

৮৮৮

৭১০৪

৭১০৪

৭১০৪

৭৮৮৫৪৪

২০৯৪৫৭ বিয়োগ ফল।

প্রবাদ আছে—আলেকজাণ্ড্রিয়া-রত্ন বলিয়াছিলেন যে "রেখা-গণিতের রাজপথ নাই"। স্থল-বিশেষে পাটীগণিতের "রাজপথ" আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ শর্ম্মা।

লীলাময়।

শিষ্য। সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ভগবানের পূর্ণাবতার পুরাণবর্ণিত লীলাকারী নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণে মানব-সুলভ নানা দোষ দৃষ্ট হয়, তাহার নিরাকরণের সমীচীন পন্থা কি?

গুরু। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এবং রসোৎকর্ষ-বিধান জন্য বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের দোষ হয় নাই, বরং লীলার উৎকর্ষই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎ-স্বরূপের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের দ্বৈবিধ্য-প্রযুক্ত জ্ঞান ও ভক্তি দ্বিবিধ হয়। ঐশ্বর্য্য-মূলক ভক্তিতে নরলীলার অপেক্ষা থাকে না, ঈশ্বরভাবই প্রকাশ পায়। এই ভাবে ভগবান্ পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতিকেও স্বীয় ঈশ্বর-ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মাধুর্য্য-ভক্তিতে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ; ঐশ্বর্য্যের লীলা থাকিলেও তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না।

শিষ্য। তন্ত্রে কথিত আছে ভগবচ্ছরীর অষ্টাদশদোষরহিত। মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বণকাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমতা, পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশটি দোষ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় উক্ত দোষ সকল দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে তিনি পূর্ণ ভগবান্ হইলেন কিরূপে? ব্রহ্মার গোবৎস-হরণ-সময়ে জানিতে না পারিয়া বনমধ্যে অন্বেষণ করায় মোহ অর্থাৎ অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। গোপবালকসহ বাহু-যুদ্ধে শ্রম, খিন্ন হইয়া শয়ন করায় খেদ, ইত্যাদি-রূপে ব্রজলীলায় অষ্টাদশ দোষই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে পূর্ণ ভগবান্ বলা যায়?

গুরু। ভগবানে মোহাদি যে দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা ভক্তের আনন্দ-বৈচিত্র্য-বিধান ও বাৎসল্যাদি-রসোদয় জন্য জানিবে। কিন্তু, তাহা হইলেও তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব লীলাকালেও বিলুপ্ত হয় না। লীলার অসিদ্ধিতে ভগবানের পূর্ণতার অসিদ্ধি হয়। সুতরাং ঐগুলি গুণপক্ষেই গণ্য করিতে হইবে।

শিষ্য। ভগবদ্দেহে দোষ দৃষ্ট হইলে ভক্তের রুচির ব্যাঘাত হইতে পারে, ফলতঃ তাহা হইতে দেওয়া বিধেয় নহে।

গুরু। কেহ কেহ বলেন, মৌগ্ধ্যাদি পার্থিব ধর্ম্ম, স্বীয় ভক্তের আনন্দ-বৃদ্ধি জন্য

ভগবান্ অনুকরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ঐ সকল দোষ নাই। ভাগবতে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো।

"তুমি যে বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বের গুণ অনুকরণ কর, নাথ! সে কেবল স্বীয় ভক্তের আনন্দবৃদ্ধি করিবার জন্য।" অতএব বুঝিতে হইবে, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কোন প্রাকৃত দোষ নাই। শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, অন্যান্যাবতার তাঁহার কলাংশাদি তুল্য। সম্বিৎহ্লাদশক্তি-স্বরূপা রাধা, ভগবানের স্বীয়াশক্তি। তিনিই বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী এবং লীলার সহচারিণী। অন্যান্য শক্তি, তাঁহার অংশকলাদি-স্বরূপা। ভগবানের লীলা ও লীলাধাম এবং লীলার সহচরবর্গ নিত্য।

শিষ্য। হইতে পারে, কিন্তু আমার বিবেচনায় জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞেয় ভগবৎ-স্বরূপ জানা যাইতে পারে, সুতরাং জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, প্রেম চিত্তবিকার মাত্র।

গুরু। প্রেম, চিত্ত-বিকার নহে, সচ্চিদানন্দরস-স্বরূপ। ভক্তি সস্পৃহ সাভিলাষ-দৃষ্টি স্বরূপ। জ্ঞান নির্নিমেষ-দৃষ্টি তুল্য ভাবশূন্য। সুতরাং রাগাত্মিকা প্রেম-ভক্তিই শ্রেষ্ঠা এবং ভগবদ্বশীকারিণী জানিবে। প্রণয়, স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব—প্রেমের এই সমস্ত অবস্থাভেদ হইয়া থাকে, এবং উত্তরোত্তর ভাবের উৎকর্ষ হইয়া থাকে।

শিষ্য। এক ব্যক্তির কালাভেদে স্থান-ভেদে নানা জনের সহিত লীলা করা অসম্ভব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় তাহা দৃষ্ট হয়। অসম্ভাবিত বিষয় কিরূপে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে? দ্বিতীয় কথা,—লীলা, ক্রিয়া ভিন্ন কিছুই নহে, ক্রিয়া মাত্রেই সাদি ও সান্ত—সুতরাং লীলাই বা কিরূপে নিত্য হইতে পারে?

গুরু। ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—

স একধা ভবতি, দ্বিধাভবতি, ত্রিধাভবতি, সপ্তধাভবতি, নবধাচৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ। শতঞ্চ দশচৈকঞ্চ সহস্রানিচ বিশতিরিতি। অর্থাৎ সেই হরি, এক, দুই, তিন, শত, সহস্র অসংখ্যরূপ ধারণ করিতে পারেন। সুতরাং লীলার ইচ্ছা হইলে, সত্য-সংকল্প হরি প্রতিলীলা সাক্ষাৎকার করিবার ইচ্ছায় বহুরূপ ধারণ করিতে পারেন। সুতরাং দেশাদি-ভেদে, তাঁহার লীলা-প্রকাশে ব্যাঘাত হইতে পারে না। এই লীলাময় শ্রীহরি, রসশব্দ-বাচ্য হইয়া থাকেন। সেই রসপ্রাপ্তিতে পরমানন্দ-সন্দোহপ্রাপ্তি ঘটে।

শিষ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণাদিতে প্রবৃত্ত হইলে নিকেতনস্থিত

ভক্তজনের দর্শনাভাব ঘটিয়াছিল, সুতরাং প্রত্যেক লীলায় তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

গুরু। সংযোগের ন্যায় ভগবদ্বিয়োগের ও রসাবহত্ব আছে, সুতরাং বিয়োগ-স্থানও তদনুভব বটে। বিশেষ ভগবানের আকারের, প্রকাশের, লীলার আনন্ত্য ও অনন্ত-বৈকুণ্ঠগত লীলার আনন্ত্য এবং সেই সেই লীলাঙ্গ পার্ষদগণের আনন্ত্য আছে, সুতরাং ক্রিয়ারূপলীলা অনিত্য, এমত আশঙ্কা করা বৃথা। ভগবানের অবয়ব-লীলাদি বিষয়ে আনন্ত্যের প্রমাণ শ্রুতিস্মৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে।

জন্ম-কর্ম্মাভিধানানি সন্তিমেঽঙ্গ সহস্রশঃ।
নশক্যন্তেচ সংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি।

আমার জন্ম, কর্ম্ম, নাম, শরীর অসংখ্য—এমন কি আমিও তাহার সংখ্যা করিতে অসমর্থ।

অখণ্ডানাং সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানিচ।
তাদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানিচ। পুরাণ

এই প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডেরও আনন্ত্য সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং লীলার ক্রিয়ারূপতা থাকিলেও অবিচ্ছেদ-নিবন্ধন নিত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ভগবানের রূপ, গুণ, কর্ম্ম, প্রকৃতি, তাঁহার কৃপা ব্যতীত দুর্জ্ঞেয়। ভাগবতের দ্বিতীয়-স্কন্ধে ভগবান্ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈবতত্ত্ব-বিজ্ঞানং, অস্তুতে মদনুগ্রহাৎ।

ভগবান্ অবিচিন্ত্যপ্রভাব হেতুক তাঁহাতে কিছুই অসম্ভব নহে।

অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বান্নাত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটং।

ভগবানের পার্থিব লীলা অনিত্যা হইলেও নিত্যধামের লীলা নিত্যা, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ভগবদ্বিষয়িনী ভক্তি দ্বিবিধা, বৈধী অর্থাৎ বিধিমূলা, দ্বিতীয়া রাগাত্মিকা। ভক্তির একমূর্ত্তি সাধ্যরূপা অর্থাৎ ভজন-সাধন হইতে উৎপন্ন হয়, আর দ্বিতীয়া অহেতুকী অর্থাৎ বিধি-নিষেধ-সাপেক্ষা নহে। উভয় ভক্তিই অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির হেতু। সুতরাং উহাই পরম-পুরুষার্থ বলিতে হইবে।

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।



দেব-তত্ত্ব।

(শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্, মহোদয়ের ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।)

১। দেবগণ ও তাঁহাদের পরিচয়।

হিন্দুশাস্ত্রে দেবগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা কি? অনেকে সাধারণতঃ মনে করেন যে, দেবগণ ও ঈশ্বর একই। কিন্তু তাহা নহে। যাঁহারা ভাবেন যে, হিন্দুধর্ম্মের অনেকগুলি ঈশ্বর, তাঁহাদেরই ঐরূপ ধারণা। বস্তুতঃ ঈশ্বর ও দেবগণ এক নহেন। তাঁহারা শূন্যগর্ভ বাক্যবিন্যাস বা বাক্যের অলঙ্কারও নহেন। তাঁহারা পরমেশ্বরের বিভূতির নামও নহেন। দৃশ্যমান বস্তুনিচয় যেমন ভগবানের সৃষ্ট, তেমনি দেবগণও তাঁহারই সৃষ্ট। তাঁহারা পৃথক্ সত্ত্বা। বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগৎকে স্বর্লোক বলে। দেবগণ এই স্বর্লোকের অধিবাসী।

(ক) বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকজ্ঞান উভয়ই দেবের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতির কার্য্য বেশ ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিতেছে। এ ধারার বিচ্ছেদ নাই। একটানা স্রোতে কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। ধাতব উদ্ভিজ্জ ও জৈব—রাজ্য একই শৃঙ্খলে সংযুক্ত। তিনটী স্তরের ভিতরেই সর্ব্বক্ষণ জীবন-প্রবাহের ক্রম-বিকাশ হইতেছে। এ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছে, কোন স্থানে ফাঁক পড়ে নাই। আজ কাল বিজ্ঞানও দিন দিন এই সত্যের উদ্ঘাটন করিতেছে। ঐ তিনটী (ধাতব, উদ্ভিজ্জও জৈব) প্রধান স্তরের মাঝে পার্থক্য-সূচক কোন রেখাপাত নাই। তিনটী স্তর যেন একই অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত। বর্ণচ্ছত্রে দেখা যায়, একটী বর্ণের পর অন্য একটী থাকে বটে, কিন্তু দুইটীর সংযোগ-স্থলে কেমন সুন্দর বেমালুম মিল, সেইরূপ ঐ স্তর তিনটীরও প্রত্যেক দুইটীর সংযোগস্থলে কেমন ভিতরে ভিতরে মিল—কেমন সুন্দর অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল—জীবনীশক্তির কেমন সুন্দর ক্রম-বিকাশ। বিজ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে যে, ধাতু ও উদ্ভিদের মধ্যে একটী সংযোগ আছে; উভয়ের মধ্যে এমন একটী জীবন-প্রবাহ আছে, যাহাতে উভয়েরই প্রকৃতি প্রকট। উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগতের মধ্যেও ঐরূপ। আমরা জানি, আর বেশ বুঝিতেও পারি, যে, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী। এই ব্যবধানের মধ্যে কি বাস্তবিকই কোন সংযোগ নাই? একদিকে মানুষ, অন্যদিকে ঈশ্বর বা আদর্শ জীবন; ইহার মধ্যে একটা

অলঙ্ঘ্য ফাঁক কিরূপ করিয়া থাকিতে পারে? একদিকে নির্দ্দোষ নিখুঁত ঐশজীবন, আর—একদিকে তুচ্ছ ভ্রমান্ধ মনুষ্য, ইহার মধ্যে যদি আর কোন জীবের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তাহার সামঞ্জস্য কি সম্ভবপর? এই দুর্ব্বল ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মানুষই কি বিবর্ত্তনের চরম উৎকর্ষ? ইহা অসঙ্গত। সকল ধর্ম্মেই দেবতাদিগের কথা আছে। যদি না থাকে, তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আর থাকে না; তাহা হইলে তাঁহাকে নররূপী ও হীনাবস্থা-প্রাপ্ত হইয়া পড়িতে হয়। তাহা হইলে সেরূপ ঈশ্বরকে ঈশ্বর না বলিয়া মানুষ বলিলেই চলে; কেননা মানুষের যেরূপ বাসনা-কামনা ভ্রমপ্রমাদ, তখন ঈশ্বরেরও তাহাই ঘটিয়া থাকে; না ঘটিয়াই পারে না। যদি আমরা এরূপ ধারণা করি যে, বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ রহিয়াছে, অথচ মানব-চরিত্রে যে সমুদয় ঘৃণিত দোষ দেখা যায়, তাহার অনেকগুলি তাঁহার চরিত্রেও আছে, তবে আমাদিগের সে ধারণাটা বিজ্ঞান-সম্মত হয় না। এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ধারণায় ধর্ম্মের যতটা ক্ষতি হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় ততটা হয় নাই। এই বিষয় লইয়া শ্রীমতী আনি বেশান্ত যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় সারগর্ভ। পাঠকদিগের জন্য আমি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

(খ) শ্রীমতী আনি বেশান্ত বলিয়াছেন—

"প্রথমতঃ, আমরা একটী অতীব কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিব। বিষয়টী ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের ধারণা। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে একটী মূলতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। সেই তত্ত্বটী এই যে, "যাহা কিছু আছে সব একই সত্তা হইতে উদ্ভূত।" ঈশ্বর ও মানুষ যদি মূলতঃ পৃথক্ হন, যদি একটী বিশাল অতলস্পর্শ খাত উভয়ের মধ্যে রহিয়া যায়, আর যদি উভয়ের মধ্যে কোন রূপ সংযোগ-সেতু না থাকে, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ প্রভৃতি কঠিন তত্ত্ব গুলির মীমাংসা হইয়া উঠে না। কিন্তু যদি ধারণা করা যায় যে, ঈশ্বর ও মানুষ মূলতঃ এক, যদি মনে করা যায় যে, মানবজাতি একই "জীবন-তরুর" একটা শাখা এবং মানব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট আরও কত শত শাখা বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেন একই সমুজ্জ্বল তোরণ অগণ্য প্রাণী-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ও প্রত্যেক প্রাণীই ঐশ আত্মায় অনুপ্রাণিত, তবে আর মনুষ্য-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পাশ্চাত্য-দিগের ধারণা এই যে, ঈশ্বর ও মানুষ পৃথক্। এই কারণেই তাঁহারা অপরিপক্ক

মানব একেশ্বরবাদ ও দার্শনিক প্রত্যক্ষবাদ এই উভয়ের মধ্যে দোলায়মান হইতেছেন। ইহার কোনটীই গ্রহণ করা যায় না। প্রাচ্যগণ অদ্বৈতবাদী; এই নিমিত্ত উহাঁরা প্রফুল্লচিত্ত। এই অদ্বৈতবাদ, চিত্তের সংশয় দূর করিয়া হৃদয়ে সন্তোষ প্রদান করে। পাশ্চাত্যগণের নিকট অদ্বৈতবাদ জিনিষটী এখনও বিদেশীয় দ্রব্যের ন্যায় রহিয়াছে অর্থাৎ উহাঁরা এখনও ঐ জিনিষটীকে নিজস্ব করিয়া লইতে পারেন নাই; যাঁহারা নিতান্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেবল তাঁহারাই উহার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদীরা ঈশ্বরকে খুব মহান্ বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি যে ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি থাকা কর্ত্তব্য, সে সব তাঁহাদের হৃদয়ে আদৌ নাই। প্রাচ্য অদ্বৈতবাদ বলেন যে, "এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, ব্রহ্মে সর্ব্বভূত ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন; অনন্ত মূর্ত্তিতে স্বাভাবিক ভাবে এই ব্রহ্মেরই বিকাশ হইতেছে। এই বিকাশে কোন স্থানে উচ্চ প্রকৃতি, কোন স্থানে প্রভূত শক্তি, কোন স্থানে সুনির্ম্মল চৈতন্য পরিস্ফুট হইতেছে।" এই প্রকার অদ্বৈতবাদে মনের যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হয়। খৃষ্টান একেশ্বরবাদীরা মন ও হৃদয়ের তৃপ্তির জন্য যে বস্তু খুঁজিয়া বেড়ান, তাহা এই অদ্বৈতবাদেই মিলিয়া থাকে। প্রাচ্য অদ্বৈতবাদ বলেন যে, ঐশ আত্মা নানাপ্রকার মূর্ত্তিতে প্রকট হইতেছেন; ইহাদিগের দ্বারাই মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানটুকু বিনষ্ট হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ, ক্ষমতা-শালী দেবযোনির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই দেবগণ সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ শাসন করেন। যে সকল দেব প্রকৃতির নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখেন ও মানুষের ভাগ্য লক্ষ্য করেন তাঁহারাও ইহাঁদের অধীন। জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই ইহাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ। ইহাঁরা ভক্তি ও আরাধনার উপযুক্ত পাত্র। এই দেবগণের নাম যাহাই হউক্ না কেন, ধর্ম্ম, ইহাঁদের অস্তিত্ব যতই স্বীকার করিবে ও মানব-জীবনের সহিত ইহাঁরা কার্য্যতঃ যতই সংসৃষ্ট হইবেন, অবিশ্বাস ও প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব ততই দূরীভূত হইবে; কেননা, এই সূক্ষ্মদেহীরা বিবর্ত্তন-প্রথানুসারে নিজেরাও উন্নত হইতে হইতে যেমন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন, তেমনি আবার মনুষ্যগণকে বোধগম্য ঐশ আদর্শ দিতে২ যান। তাঁহাদের আপন আপন উন্নতি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রদত্ত আদর্শেরও উন্নতি ও সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকে। বিবর্ত্তনের প্রত্যেক ক্রমেই এই সকল আদর্শে মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া থাকে। যখন এমন সঙ্কট দাঁড়ায় যে, মানবীয় সাহায্যে আর কুলায় না, তখন আমরা

ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রতি বিশ্বাসবান্ হইয়া তাঁহাকে ভক্তি-সহকারে অর্চ্চনা করি। সেই অবস্থায়, উপরোক্ত আদর্শ আমাদিগের প্রাণের পিপাসা মিটায়। বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঈশ্বর-ধারণাও সংকীর্ণতার গণ্ডী ত্যাগ করিয়া ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে। উন্নতির প্রত্যেক ক্রমেই ঈশ্বরা-নুভূতির উচ্চতর আদর্শ মনুষ্যের সমক্ষে প্রকট থাকে। এই আদর্শ বিবর্ত্তনের প্রথমস্তরে অতি সংকীর্ণ থাকে, তখন উহা সামান্যবুদ্ধিগ্রাহ্য থাকে মাত্র। পরিশেষে উন্নত অবস্থায় ইহা এতই মহান্ হইয়া দাঁড়ায় যে, প্রগাঢ়চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতিভাও উহার সম্যক্ ধারণা করিয়া উঠিতে কষ্ট বোধ করে।" (জীবনের কয়েকটী কঠিন তত্ত্ব ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা।)

২। সকল দেশের লোকেই দেবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন।

এই পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি যদি আমরা আলোচনা করিয়া দেখি, তবে জানিতে পারি যে, মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে যে ব্যবধানটুকু আছে তাহাও জীবে পূর্ণ। ঐ সকল জীবকেই দেব-যোনি বলে। প্রত্যেক বিখ্যাত ধর্ম্মই এই দেবযোনির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহাঁরাই ভগবানের বিবর্ত্তন-শৃঙ্খল অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন। জিউস্, জুপিটর প্রভৃতি গ্রীক্ ও রোমকদিগের দেব। গথ্ জাতির দেবের নাম—থর ও ওডিন্। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মের দেবের নাম অমাসম্পন্থ ও অহুর; ইহাঁদিগকে ফেরিস্তা বলে। হিন্দুদিগের দেব অর্থাৎ সুর, প্রজাপতি, আদিত্য প্রভৃতি আছেন। বৌদ্ধদিগের ধ্যানচোহন প্রভৃতি আছেন, খৃষ্টধর্ম্মেও ছোটবড় দেবদূত আছেন।

দেখা যাইতেছে যে, মানুষ ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সকলেই একটা দেব-যোনির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্বীকার করা যে সকলেরই ভ্রম, একথা বলা যায় না। বরং বলা যায় যে, যখন সকল দেশের লোকই ঐরূপ বিশ্বাস করেন, তখন ঐ বিশ্বাসই সত্যমূলক। অতএব, দেবের অস্তিত্ব অবজ্ঞার সহিত উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। দেবগণ সৃষ্টির প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন ও গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ক্রমে আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

৩। দেবগণের স্বাভাবিক বাসস্থান।

ভারতের প্রাচীন ঋষিদের মতে বিশ্ব সপ্তভূমিতে বিভক্ত। যে সৌর জগতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহাও তাঁহাদের মত সপ্তলোকে বিভক্ত। সপ্তলোকের নাম এই—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, মহঃ, তপঃ, ও সত্য।

উহাদিগের অর্থ যথাক্রমে ভৌতিক, নাক্ষত্রিক, মানস, আধ্যাত্মিক, নির্ব্বাণিক, পরিনির্ব্বাণিক ও মহা-পরিনির্ব্বাণিক ভূমি বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সপ্ত-ভূমির প্রত্যেকটীই জড় উপাদানে গঠিত। সেই জড়-উপাদানই প্রকৃতি। নাক্ষত্রিক ভূমির উপাদান, ভৌতিক ভূমির উপাদান হইতে সূক্ষ্মতর। এই-রূপে উচ্চতর ভূমির উপাদান, নিম্নতর ভূমির উপাদান অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও কম ঘনীভূত। সত্যলোক সর্ব্বোচ্চভূমি। এখানে উপাদান সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও বিরলাবয়ব। এই সপ্তভূমির প্রত্যেক ভূমি আবার সাতটী বিভাগে বিভক্ত। তাহা হইলে মোটের উপর উনপঞ্চাশটী ভূমি হইল। ভৌতিক ভূমির জড় উপাদানের সাতটী অবস্থা এই—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অনুপদক (সূক্ষ্মতম ব্যোমপদার্থ) ও আদি (আণবিক পদার্থ)। ক্ষিতি বা নিরেট পদার্থকে অপ্ বা তরল পদার্থে পরিণত করা যায়। তাহারপর উহা বাষ্প হইতে পারে। এই বাষ্পই "তেজঃ" অবস্থা। বাষ্পকে আবার যে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত করা যায়, তাহা গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, উহাকে আণবিক অবস্থায় পর্য্যন্ত আনিতে পারা যায়। ভৌতিক ভূমির একটী পরমাণু, ভৌতিক পদার্থেরই সূক্ষ্মতম অংশ। কিন্তু উহা বিভক্ত হইলে ভৌতিক না থাকিয়া নাক্ষত্রিক হইয়া উঠে। নাক্ষত্রিক ও অপর পাঁচটী ভূমির সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। ভৌতিক ভূমির ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি যে সাতটী অবস্থা বলা হইল, নাক্ষত্রিক প্রভৃতি ভূমিরও ঐরূপ সাতটী করিয়া অবস্থা আছে।

আমরা সকলেই জানি যে ভূর্লোক অর্থাৎ এই ভৌতিক ভূমিতে নানা শ্রেণীর জীব বাস করে। উদ্ভিদ্‌রাজ্য না ধরিলেও প্রাণী ও মনুষ্যই এখানে কত প্রকার! কীট পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্যাদি, পক্ষী, স্তন্যপায়ী জীব ইত্যাদি কতপ্রকার জীব রহিয়াছে! জীবগুলির প্রত্যেকটীর সংখ্যা দূরে থাকুক উহাদের শ্রেণী-জাতিও অসংখ্য। আবার, জীবগুলির কোন কোন জাতি ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতির কোন কোন অবস্থার অনুকুল। মৎস্য বেশীর ভাগ জলে, পক্ষী বায়ুতে, অশ্ব নিরেট ভূমিতে বাস করে। বিশ্বের ভূর্লোক ছাড়া আর সমস্ত লোকগুলি জীবশূন্য, এরূপ চিন্তা করা কি যুক্তি-সঙ্গত? গুপ্ত-বিদ্যা-বিশারদ বুল্‌বার লিটন্ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) বুলবার লিটন বলিয়াছেন—

"মানুষের মধ্যে যে যত অজ্ঞ, সে তত উদ্ধত। অহং-জ্ঞানের দিকেই

মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক্। জ্ঞানের শৈশব অবস্থায় তাহার মনে হয় যে, সমস্ত বস্তু তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অকুল সমুদ্রের জল-বুদ্‌বুদের মত অনন্ত গগনে অগণ্য গ্রহ ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলে। মানুষ বহুযুগ ধরিয়া ভাবিয়াছিল যে ঐ গুলি ক্ষুদ্র ২ বাতি; ভগবান্ রজনীকে মনোহারিণী করিবার নিমিত্তই ঐ বাতির ব্যবস্থা করেন। খ-গোলবিজ্ঞান মানুষের এই কল্পনা দূর করিয়াছে। ইচ্ছা না থাকিলেও এক্ষণে মানুষকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, নক্ষত্রগুলি আমাদের পৃথিবীর অপেক্ষাও প্রকাণ্ড ২ পৃথিবী, এবং যে ভূমণ্ডলের উপর আমরা বিচরণ করিতেছি উহা বিশ্বের বিপুল মানচিত্রে অতীব ক্ষুদ্র একটী বিন্দুবৎ দৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ক্ষুদ্র হউক্, বৃহৎ হউক্, ঈশ্বর সকল স্থানেই যথেষ্ট প্রাণীর সমাবেশ করিয়াছেন। পথিক বৃক্ষটী দেখিয়া মনে করে যে উহার শাখাপ্রশাখার ছায়ায় গ্রীষ্মকালে মানুষ বিশ্রাম করিবে ও শীতকালে উহার কাষ্ঠে আগুন করিয়া মানুষ শীত হইতে পরিত্রাণ পাইবে—এই অভিপ্রায়েই উহা সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শাখা-প্রশাখার প্রত্যেক পাতাটীতে ঈশ্বর এক একটী পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন! উহা অসংখ্য জাতিতে পরিপূর্ণ। তোমার পরিখার প্রত্যেক জলবিন্দু একএকটী ভূমণ্ডল-সদৃশ; মানুষের একটী রাজ্যে যত লোক বাস করে, তাহা অপেক্ষা অধিক জীব, ঐ জলবিন্দুতে অবস্থান করে। ভগবানের এই সুবিরাট্ বিশ্বের প্রত্যেক স্থানেই বিজ্ঞানের আলোকে নূতন নূতন জীব প্রকাশ পাইতেছে। জীবনই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী উপাদান। আমরা যাহার মৃত্যু ও পচন দেখিতেছি তাহাতেও অর্থাৎ ঐ পচনক্রিয়াতেও নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতেও নূতন উপাদানের উদ্ভব হইতেছে। কি সুন্দর সাদৃশ্য! একটী পৃথিবীতে অসংখ্য জীব, আবার একটী জল-বিন্দুতে বা একটী পত্রেও অসংখ্য জীব! একটী পত্র বা একটী জলবিন্দু যেন এক একটী পৃথিবী! এক একটী নক্ষত্র যেমন এক একটী পৃথিবী, উহাও তেমনি এক একটী পৃথিবী। শুধু তাহাই নহে, এক একটী মনুষ্যও এক একটী পৃথিবী; কেননা, মানুষ যেমন পৃথিবীতে বাস করিতেছে, তদ্রূপ কোটি কোটি জীব মনুষ্যের রক্তে বাস করিতেছে। এই সব দেখিয়া অতি সাধারণ বুদ্ধিতেও একথা আইসে যে, যাহাকে আমরা অন্তরীক্ষ বলি অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ইহাদের মধ্যে যে অনন্ত স্থান পড়িয়া রহিয়াছে সেখানেও বাসোপযোগী জীব বিদ্যমান আছে। একটা ক্ষুদ্র পত্রে যখন পুঞ্জ ২ প্রাণী, তখন অনন্ত অন্তরীক্ষে প্রাণী নাই, একথা নিতান্ত অসম্ভব নহে কি? ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মানুসারে একটী

পরমাণুরও অপচয় নাই। ঐ নিয়মানুসারে একটী ক্ষুদ্রস্থানও জীবশূন্য অবস্থায় থাকিবার যো নাই। গলিত দ্রব্যের আবাসেও উৎপাদন ও সঞ্জীবন ক্রিয়া দেখা যায়। ঐরূপ যখন ক্ষেত্র, তখন শুধু বিশাল অন্তরীক্ষটী জীবশূন্য হইয়া, একটী জীবপূর্ণ পত্র বা মৃত জীবদেহ অপেক্ষা কিম্বা জীবপূর্ণ জলবিন্দু অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়া থাকিবে, ইহা কি ধারণায় আইসে? অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তুমি পত্রের উপরিস্থিত জাববৃন্দকে দেখিতে পাইবে। অসীম অনন্তে যে সমুদয় প্রাণী বাস করে, তাহারা পত্রস্থিত জীব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাহাদিগকে দেখিবার যোগ্য যন্ত্র আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐ সকল জীব দেখা যায় না, তথাপি মানুষের সহিত উহাদের রহস্যপূর্ণ একটা সম্বন্ধ আছে। এই কারণেই লোকের ভূত-প্রেতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও ভূত-প্রেত-বিষয়ক বিস্তর গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল গল্পের সকলগুলি সত্য না হইলেও সকল গুলিই যে মিথ্যা তাহা নহে। প্রাচীন কালের মনুষ্যগণ সরলপ্রকৃতি হইলেও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের লোক স্থূলবুদ্ধি। এই কারণে প্রথমোক্ত ব্যক্তিবর্গই বেশী ২ রকম ভূতপ্রেত দেখিতে পাইতেন। একজন অসভ্যের দর্শনশক্তি বা ঘ্রাণশক্তি এত বেশী যে, বহুদূরে যে শত্রু রহিয়াছে তাহাকে সে দেখিতে পায় বা ঘ্রাণদ্বারা জানিতে পারে। কিন্তু কোন সুসভ্য জন্তুর এমন শক্তি নাই। সুসভ্যদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি স্থূল হইয়া যায়। এ কারণে সুসভ্য অপেক্ষা অসভ্য লোকই ব্যোমচারী জীবকে বেশী ২ দেখিতে পায়।"—(জেনোনি, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ২২৫-২৬ পৃষ্ঠা)।

"কয়েকটী আলোচিত প্রশ্ন-প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় হক্স্লিও বলিয়াছেন:— "পৃথিবীর ঘটনা-পারম্পর্য্য আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বিশ্ব এমন সব জীবে পূর্ণ, যাহারা উন্নত হইতে ২ শেষে সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে।"

"মৃত্যু ও পরকাল" নামক গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে— "মনুষ্যেই বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ, মনুষ্য ব্যতীত আর কোন উচ্চতর জীব নাই, অন্তরীক্ষ জীবশূন্য মরুতুল্য, এরূপ ধারণা করাও বিস্ময়কর ব্যাপার।"

অন্তরীক্ষে জীব নাই এরূপ ধারণা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আমাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্বের সমস্ত ভূমিতেই জীব আছে। ঐ সকল ভূমিতে বাস করিবার উপযোগী জড় পদার্থে উহাদিগর দেহ গঠিত আমরা এই লোকে স্থূলদেহে যেরূপ বিচরণ করিতেছি, তাহারাও তদ্রূপ সেই ২

লোকে তদনুরূপ দেহ লইয়া বাস করিতেছে। জড় জগতের প্রেতাত্মা ভুবর্লোকে বাস করে।* নিম্নশ্রেণীর দেব বা দেবদূতগণ স্বর্লোকে বাস করেন। "জন" লোকে ও অন্যান্য উচ্চলোকে উচ্চশ্রেণীর দেবগণ, প্রধান ২ দেবদূত ও বৌদ্ধদিগের ধ্যান-চোহনগণ অবস্থান করেন। অতএব, বিশ্বের সর্ব্বত্রই জীব বিদ্যমান, কোনস্থানই জীবশূন্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

অক্ষর-চৌত্রিশ *

প্রাচীন হস্তলিপি হইতে সংগৃহীত।

১। '৺' আঞ্জি নিরখিয়া ব্রহ্মা করিয়া ধিয়ান।
আঞ্জি আদি অক্ষরের করিলা পরিমাণ

* যক্ষোগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণ-সেবিতম্ অন্তরীক্ষম্। সায়ন ধৃত তাপনীয়শাখা-বচনম্॥ আদিত্যা ঋভবোবিশ্বে সাধ্যাশ্চ পিতরস্তথা। ঋষয়োঽঙ্গিরসশ্চৈব ভুবর্লোকং সমাশ্রিতাঃ॥ —বায়ু পুরাণ।

* লেখকের পত্র—

"মহাত্মন্! আমি আপনার হিন্দু পত্রিকার এক নগণ্য গ্রাহক। আপনি ঐকান্তিক যত্ন ও বিপুল পরিশ্রমে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সাধারণের অজ্ঞাত বিষয়গুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে সাধারণে বিতরণ করিয়া যে ভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকমাত্রেই আপনার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আপনার সুমহান্ উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর কর্ত্তব্য-পথে চলিতে থাকুক ও মদ্বিধ অজ্ঞলোকেরা হিন্দু-পত্রিকার উপদেশ-লাভে কৃতকৃত্য হউক; আপনি ভগবানের কৃপালাভে সুস্থ ও শান্তিতে থাকুন, ইহাই আমাদের ভগবানের নিকট কায়মনে প্রার্থনা।

অতি শৈশব সময়ে শুনিয়াছি, আমাদের দেশে বালকদিগকে প্রাচীন গুরু-মহাশয়েরা অক্ষরচৌত্রিশের কবিতা শিখাইতেন। আমার নিকট প্রাচীন হস্ত-লিখিত কবিতাগুলি ছিল; আমি সেগুলি নকল করিয়া এবং যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া ভবৎসকাশে পাঠাইলাম। আপনার অভিপ্রেত হইলে পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন; আমার শিক্ষার অভাবে বর্ণাশুদ্ধি থাকা সম্ভব, ঐগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।"

শ্রীগুরুচরণ দাস
শ্রীহট্ট।

আঞ্জি ভেদিয়া কর আত্মপরিচয়।
অঞ্জনা হইয়া আঞ্জি অন্তরে আছয় ॥*

২। 'ক'য়ে বলে কর মন গুরুতে ভকতি।
করুণ হইয়া ভজ, কমলার পতি ॥
কপট চাতুরি ছাড়, কৃষ্ণগুণ গাইয়া।
কলির ভব মহানন্দে যাইবা তরিয়া ॥

৩। 'খ'য়ে বলে কর খেলা গুরু উদ্দেশিয়া।
খণ্ডব্রত কর কেন গুরু না ভজিয়া ॥
খণ্ড খণ্ড হৈয়া দেহ পড়িবে নিশ্চয়।
খণ্ডিবে সকল পাপ ভজ দয়াময় ॥

৪। 'গ'য়ে বলে গুরু-বাক্য যার নাহি চিতে।
গর্ব্ববান্ হইয়ে ফেরে নানান যোনিতে
গুরু না ভজিলে লোকের এইমত গতি।
গোবিন্দের নাম বিনে নাহি অব্যাহতি ॥

৫। 'ঘ'য়ে বলে ঘট মধ্যে হয় ব্রহ্মধ্বনি।
ঘটনা করয়ে শ্যাম অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
ঘন ঘন ঘণ্টারব হয় নিরন্তর।
ঘটমধ্যে খেলা করে ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥

৬। 'ঙ'য়ে বলে উচ্চ হইয়া নাকর বড়াই।
উচ্চ নীচ ভাঙ্গিয়া করিব একঠাই ॥
উচল চঞ্চল মন স্থির কর মতি।
অনুক্ষণ গুরুপদে করহ ভকতি ॥

৭। 'চ'য়ে বলে চেত মন চৈতন্য থাকিতে।
চৈতন্য থাকিতে কেন ফির অন্য পথে ॥

* আঞ্জি অক্ষরের প্রচলন নাই, পূর্ব্বে ছিল। এই অক্ষরটি সিদ্ধিদাতা অগ্রপূজ্য গণেশের পরিচায়ক। বর্ত্তমানে মহাজনদের খাতার প্রারম্ভে এই আকারের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দেবতার ও মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে যে ৺ চিহ্ন দেওয়া হয়, ইহাই আদিকালের আঞ্জির নিদর্শন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির প্রত্যেক কার্য্যেই ধর্ম্মভাব জড়িত। আঞ্জি স্বতন্ত্র অক্ষর না হইলেও অগ্রপূজ্য ভগবান্ গণেশের নামোচ্চারণ উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ইহাকে অক্ষর-রূপে আদিতে প্রয়োগ করা হইত। লেখক।

চিনহ পরম পদ লও পরিচয়॥
চারিবেদে কহে প্রভু হরি দয়াময়॥
৮। 'ছ'য়ে বলে ছোটবড় সকলি সমান।
ছান্দনে বন্ধনে মূর্ত্তি করিছে নির্ম্মাণ॥
ছায়াবাজী লীলাখেলা সকলি তোমার।
ছায়া দিয়া রাঙ্গাপদে রাখ আপনার॥
৯। 'জ'য়ে বলে জগন্নাথ জগৎমোহন।
জীব নিস্তারিতে নাম ধর জনার্দ্দন॥
জীবন যৌবন দিয়া ভজয়ে যুবতী।
জগতের নাথ হরি মোহনমূরতী॥
১০। 'ঝ'য়ে বলে ঝাটে ভজ শ্রীগুরু-চরণ।
ঝটা ঝগড়া মন কর কি কারণ॥
ঝিকি মিকি যত দেখ কদলীর দল।
ঝরিয়া পড়িবে তনু শিশিরের জল॥
১১। 'ঞ'য়ে বলে নিয়মেতে রাখিছে সংসার।
নিউন্ হইয়া ভজ প্রভু ভগবান্॥
নিউন্ নিউন্ প্রভু নাহি হুড়াহুড়।
নিলক্ষ্যের নাথ হরি দয়ার ঠাকুর॥
১২। 'ট'য়ে বলে টলমল করিছে সংসার।
টুটাবাড়া জন্ম-মৃত্যু হয় বার বার॥
টলিছে রসের সিন্ধু না হইও ভোলা।
টল লাগাইয়া রস পিয়ে সাধুজনা॥
১৩। 'ঠ'য়ে বলে ঠোল মাঝে রাখিছে সংসার।
ঠাকুরালি খেলা যত সকলি তোমার॥
ঠেকাঠেকি না করিও মিথ্যা সাক্ষী দিয়া।
ঠেকিলে শমন-দূতে শাস্তি দিবে নিয়া॥
১৪। 'ড'য়ে বলে ডোরে ধরি খেঁচে নিরন্তর।
ডগমগ মাত্র সার সকলের ভিতর॥
পাপ ডুরি কাট ভাই হরিনাম স্মরি।
ডরাবে শমন-দূত বল হরি হরি॥

১৫। 'ঢ'য়ে বলে ঢলিয়াছে সকল তোমার।
ঢলিলে গোবিন্দের পদে কর্ম্ম নাহি আর
ঢলিতে গোবিন্দ-পদে না হইও ভোলা।
ঢলিয়া পড়িবে তনু মাটীর পুতুলা॥

১৬। 'ণ'য়ে বলে নাসা-পথ করহ আশ্রয়।
ধীরে ধীরে যাও চলি না করিয়া ভয়॥
উচ্চ মঞ্চে নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
পাইতে তাঁহার দেখা স্থির কর হিয়া॥

১৭। 'ত'য়ে বলে তরিবার না দেখি উপায়।
তরণ-কারণ প্রভু তুমি যে সহায়॥
তরঙ্গ ভবের তাপ সাক্ষাতে রাখিয়া।
তরিবার উপদেশ গুরু দিবা কইয়া॥

১৮। 'থ'য়ে বলে স্থির হইয়া ভজ কলেবর।
স্থাবর-জঙ্গম যত দেহের ভিতর॥
স্থানাস্থান ভেদাভেদ কর পরিহার।
সর্ব্ব স্থানে দয়াময় পাবে দেখিবার॥

১৯। 'দ'য়ে বলে দয়া-ধর্ম্মে যার নাই চিত॥
দারুণ মুদ্গর যেন ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত॥
সর্ব্বজীবে দয়া-দানে না করিও হেলা।
দয়ার ঠাকুর যিনি তারে কর মেলা॥

২০। 'ধ'য়ে বলে ধীর হও ধরণীমণ্ডলে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া দিন গেল হেলে॥
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-বুদ্ধি গুরুপদে চিত।
ধর্ম্ম ছাড়া যেই জন পাতকী নিশ্চিত॥

২১। 'ন'য়ে বলে নিত্যধামে শ্রীনন্দনন্দন।
নব রসের ক্রীড়া করে লইয়া গোপীগণ॥
নিত্য কল্পতরু-মূলে নিত্যানন্দ মেলা।
যেই চায় সেই পায় নাহি করে হেলা॥

২২। 'প'য়ে বলে পাপে লিপ্ত না হইও নর।
পশ্চাতে পুছিলে নর কি দিবা উত্তর॥

পাপ পুণ্য এই দুই আছয়ে নির্ণয়।
পাপ-বুদ্ধি যার ঘটে পাতকী নিশ্চয় ॥
২৩। 'ফ'য়ে বলে ফির মন মায়া বুদ্ধি লৈয়া।
ফুকুরি ফুকুরি উঠ মায়াকে ছড়িয়া ॥
ফেরাফের না করিও মিথ্যা ব্যবহার।
ফাঁকিতে ঠেকিলে শেষে না পাবে নিস্তার
২৪। 'ব'য়ে বলে বল-বুদ্ধি দিনে দিনে যাবে।
বঞ্চিত জনের প্রভু কিবা গতি হবে ॥
বন্ধন মোচন কর প্রভু দয়াময়।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি জানিও নিশ্চয় ॥
২৫। 'ভ'য়ে বলে ভবে জন্ম না হইবে আর।
ভজিলে ভজনা-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥
ভকতবৎসল প্রভু জগতের পতি।
ভকতি জন্মাও মোর ছাড়ায়ে দুর্গতি ॥
২৬। 'ম'য়ে বলে মোহময় এ ভব সংসার।
মায়ামুগ্ধ হৈয়া কেন কর অহঙ্কার ॥
মগ্ন হইয়া ভজ মন মুকুন্দ মুরারি।
মদনমোহন কৃষ্ণ কেশব কংশারি ॥
২৭। 'য'য়ে বলে যমদূত বান্ধিবে যখন।
কোথা রবে পুত্র কন্যা কোথা রবে ধন ॥
যন্ত্রণায় জড়সড় জরার পীড়নে।
যতনে গোবিন্দ-নাম জপ রাত্রি দিনে ॥
২৮। 'র'য়ে বলে রং ঢং নিশার স্বপন।
রাম নাম নিলে হয় বন্ধন-মোচন ॥
"রাম কৃষ্ণ" নাম লও হৃদয় দড়াইয়া।
রাশি রাশি পাপ যাবে ভস্মরাশি হৈয়া ॥
২৯। 'ল'য়ে বলে লোভে লিপ্ত না হইও আর।
কোন কার্য্য সিদ্ধ নয় লম্পট জনার ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধে না হইও অধীন।
লাঘব হইলে হয় অলক্ষ্মীর চিন্ ॥

৩০। 'শ'য়ে বলে শিব-শিবা অভেদ প্রকার।
শব হৈয়া শিব হয় কি আশ্চর্য্য আর ॥
শাস্ত্র মধ্যে উক্ত আছে শরীরের গতি।
শিব-শক্তি সমাযোগে শরীরের উৎপত্তি ॥

৩১। 'ষ'য়ে বলে শেষকাল দেখ বিচারিয়া।
পাঁচ স্থানে পাঁচ জনে যাইবে চলিয়া ॥
শূন্য ঘট প'ড়ে রবে মাটীর উপর।
শেষ বিচারের দিন কি দিবে উত্তর ॥

৩২। 'স'য়ে বলে সত্যপথে সদা রাখ মন।
সত্যসিন্ধু সদানন্দ শমন-দমন ॥
সহস্র সখীর সনে হৈলা আনন্দিত।
সহস্র গোপিকা সঙ্গে কৃষ্ণ বিরাজিত ॥

৩৩। 'হ'য়ে বলে হতভাগ্য হরি যে না ভজে।
হারাইয়া সাধু-সঙ্গ অসৎসঙ্গে মজে ॥
"হর-হরি" নাম ভাই বড়ই মধুর।
অভেদে যে জন ভজে সে বড় চতুর ॥

৩৪। 'ক্ষ'য়ে বলে ক্ষীণ তনু ক্ষণেকে বিশাল।
ক্ষণেকেতে ক্ষয় হয় নাহি কালাকাল ॥
ক্ষীণ হয়ে প'ড়ে থাক ক্ষীণের মাঝার।
ক্ষীণ হৈলে না যাইও কুটুম্বের ঘর ॥ ৵

শ্রীগুরুচরণ দাস।

৵ অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ দান 'অক্ষর-চৌত্রিশের' প্রচারকগণের মুখ্য লক্ষ্য। অক্ষরশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুর হৃদয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষার বীজ বপন করা যায়, অনুকূল অবস্থা পাইলে হয়ত কালে তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারে। একদিন তাহা বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া পুণ্যময় অমৃতফলও প্রদান করে। জাতীয়-ভাবের শিক্ষাই সমধিক ফলবতী। এই কবিতাগুলির মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের ভক্তি, যোগ, নীতি ও বৈরাগ্য-মূলক উপদেশ বিদ্যমান। হিন্দুর নিজস্ব ভাব ইহার মধ্যে আছে। এরূপ কবিতার প্রচলন হিতকর। 'কাব্য' হিসাবে এরূপ কবিতার মূল্য অল্প, কিন্তু হিন্দুর জাতীয়শিক্ষার বীজ ইহার মধ্যে নিহিত আছে। "ঙ" "ঞ" "ণ" "ষ" এই কয় বর্ণের পরিচায়ক শ্লোকে ঐ বর্ণ গুলির সঙ্গত ব্যবহার নাই। ইহা কবিতার ত্রুটী। বর্ত্তমানে অক্ষরশিক্ষাবিষয়ক পুস্তকে কবিতা ও

শ্রীরাম-গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ননু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা
যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থ-সাধনং।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যাসহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ॥ ১১।

যেমন বেদাদি শাস্ত্রে তত্ত্ব-জ্ঞানই মোক্ষলাভের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেইরূপ জপযজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহও পুরুষার্থ-সাধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অতএব বেদ-বিহিত কর্ম্ম-সমূহ প্রাণিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই কর্ম্মই মুক্তি-হেতু জ্ঞানের সহায় হইয়া থাকে॥ ১১।

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ
তস্মাৎ সদাকার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
ননু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী
বিদ্যানকিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে॥ ১২।

বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ আছে, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু মোক্ষ-জনক বিদ্যা বা জ্ঞান (তেজঃ যেমন স্বয়ংই অন্ধকার বিনাশ করে, সেইরূপ) নিরপেক্ষভাবে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে॥ ১২।

ন সত্যকার্য্যোঽপিহি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
র্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে॥ ১৩।

সত্যকর্ম্মযুক্ত যজ্ঞ যেমন সময়, স্থান, উপকরণ, হোতা ও হবনাদির অপেক্ষা করে, সেইরূপ বিদ্যাও (জ্ঞান) কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের

চিত্রের সাহায্যে অক্ষর-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। "ক'য়ে কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটী। খ'য়ে খেঁকশিয়ালী পলায় ছুটী।" ইত্যাদি শ্লোক ও কাকাতুয়া প্রভৃতির চিত্র, হিন্দুর উপকার করে না। ক'য়ে কৃষ্ণ বা কালী প্রভৃতি চিত্র ও হিন্দুর উপকারক শ্লোক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত। হিন্দু সমাজের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন, দেবদেবীর চিত্র ও ধর্ম্মভাব-পূর্ণ কবিতার সাহায্যে শিশুর অক্ষরশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মমূলক জাতীয় শিক্ষার বীজ বপন করুন। শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

উৎপত্তি হয় না, সুতরাং জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধরূপে বিকসিত হইয়া মুক্তি-দানে সমর্থ হয় না, কর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই মোক্ষ-জনক হয়॥ ১৩।

কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদ্দৃষ্ট-বিরোধকারণাৎ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যা গতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিধ্যতি॥ ১৪।

কোন কোন বাদী, কর্ম্মের মোক্ষসাধনত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যে উক্তরূপে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা অন্যায় কারণ উহা অপসিদ্ধান্ত। কেননা, সেরূপ উক্তিতে বিরোধ দেখা যাইতেছে। কর্ম্ম দেহাভিমান ভিন্ন সম্পাদিত হয় না—অর্থাৎ "আমি দেহী" "আমি কর্ত্তা" "যজ্ঞ আমার কর্ত্তব্য" ইত্যাকার বুদ্ধিই কর্ম্ম-সাধনের মূল, আর বেদান্তবাক্যের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন-জন্য দেহাভিমাননাশেই তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ অবিদ্যা ও কর্ম্ম কখনই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকাশক হয় না, বরং তাহা হইতে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হয়॥ ১৪।

বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-বিরোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভিঃ
নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্॥ ১৫।

বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-সূর্য্যালোকিতা বেদান্ত-বাক্য-বিচার-লব্ধ-চরমব্রহ্মাকারা অন্তঃ-করণবৃত্তিকে বিদ্যা কহে; আর কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বভাবপূর্ণ অজ্ঞান-সম্ভূত কর্ম্ম-সমূহ স্বর্গ-সুখাদি ফল-দানের হেতু হয়; তদ্দ্বারা জীব ক্রমশঃ অনন্তকাল কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়, অতএব কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা স্থিরীকৃত হইল॥ ১৫।

তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধী-
র্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধান-পরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ॥ ১৬।

জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধ থাকায় উভয়ে কখনও মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না, অতএব মুমুক্ষু মহাত্মগণ কাম্য-কর্ম্মসমূহ সর্ব্বতোভাবে

পরিত্যাগ করিবেন, এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করতঃ অনুক্ষণ আত্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইবেন॥ ১৬।

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্বিধেয়োবিধিবাদকর্ম্মণাম্।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্যতৎ
জ্ঞাত্বাপরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥ ১৭।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রাণাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকিবে, সে কাল পর্য্যন্ত বেদবিধিবোধিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর "নেতি নেতি" অর্থাৎ 'ইহা নয়' 'ইহা নয়' এই ভাবে বেদান্তবাক্যবিচার দ্বারা মায়িক নশ্বর পদার্থে আত্ম-বুদ্ধির নিষেধ করিয়া যখন একমাত্র উৎ-পত্তিনাশরহিত বিজ্ঞানের চরম সীমা পরমাত্মাকে বিদিত হইবেন, তখন অনা-বশ্যক-বোধে ক্রিয়া-বুদ্ধির অভাববশতঃ কর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগ করিবেন॥ ১৭।

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরং।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেঽঞ্জসা
সকারকা কারণমাত্মসংসৃতেঃ॥১৮

যখন নির্ম্মল অন্তঃকরণে ভেদবোধ-নিদান অবিদ্যাদি উপাধির বিনাশক তত্ত্ব-জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রকাশ হয়, অর্থাৎ যে সময়ে চিত্তের নিতান্তবিশুদ্ধতা বশতঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের স্বরূপ-বিচারে ও অবিদ্যাদি উপাধির বিনাশ হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রকাশক আত্মজ্ঞানে সমস্ত 'এক' বোধ হয়, তখন জীবের সংসারের উপাদান-কারণ (যথা ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা) অবিদ্যা, কর্ত্তৃত্বাদিবুদ্ধিসহিত বিনষ্ট হয়, অতঃপর "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অভিমান থাকে না॥ ১৮

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতাচ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্য-কারিণী।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্দ্বিতীয়ত-
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি॥১৯

তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পুনরায় অভ্যুদিত হইতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞান-জাত কর্ম্মসমূহের আর প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা

থাকে না। যাঁহারা বিশুদ্ধবিজ্ঞানলব্ধ অদ্বয় পরমাত্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আর অবিদ্যা প্রকাশ পাইতে পারে না ॥১৯

যদিস্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্মেতি মতিঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥২০

যদি অবিদ্যা জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইলে পুনরায় প্রকাশিত না হয়, তবে "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি অজ্ঞানসম্ভূত বুদ্ধিই বা কিরূপে উদিত হইবে? অর্থাৎ অবিদ্যা নষ্ট হইলে অহংবুদ্ধি হইতেই পারে না। অতএব জ্ঞান একাকী স্বাধীন-ভাবে জীবের মুক্তিবিধান করিয়া থাকে। জ্ঞান অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করে না একারণ উহা স্বতন্ত্র ॥২০

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

পরিচয়।

(বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ যে দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, যে দেশের বিজ্ঞান, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ ও গণিতশাস্ত্র পর্য্যন্ত কবিত্বমাখা, যে দেশের চন্দ্রের কিরণ, মলয় সমীরণ, বিহগ-কূজন, কবিত্বের মোহিনী শক্তির আধার, যে দেশের মাটী, জল, বায়ু কবিত্ব-রসে পরিপ্লুত, কবিত্ব-শক্তি সে দেশের প্রকৃতিগত ভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "গুণ-রাশিনাশী দারিদ্র্য-দোষ"যুক্ত রোগ-ক্লিষ্ট সে দেশের লোকের এই প্রকার প্রকৃতি-গত উচ্চভাব প্রস্ফুরিত হইবার অবকাশ নাই, তাই আমরা ভিন্ন দেশের কাব্য-জগতের সহিত বিশেষ পরিচিত, কিন্তু স্বদেশের গুপ্ত বা লুপ্ত রত্নের কোন সংবাদই রাখি না। দেশে এখন বিক্রমাদিত্য বা শিলাদিত্যের পণ্ডিত-সভা নাই। মাসিক পত্রিকা-দিতে ফরাসী বা ইংরাজী মাসিক পত্রিকা হইতে অনূদিত ছোটগল্প ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের বিশেষ আদর নাই। তাই প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ অনেক স্থলেই লেখকের হস্ত-লিখিত (পাণ্ডুলিপিতে) পুঁথিতে শেষ হইয়া থাকে। নিম্নে যে একটী কবিতা প্রকাশিত হইল, তাহার রচয়িতা এই কারণেই সাধারণের

নিকট আজিও সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইঁহার প্রণীত প্রচুর কবিতা আমার নিকট সংগৃহীত আছে, ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ ইহার গুণাগুণ বিচার করিবেন।

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই,)

নিস্ফল বাসনা।

প্রভো!
কেন, না করিলে মোরে জ্যোৎস্নার আলো!—
সাজিয়া মোহন বেশে
ভ্রমিতাম হেসে হেসে
নাশিতাম জগতের আঁধারের কালো।

কেননা করিলে মোরে সায়াহ্ন গগন!
ভুলিয়া ভবের জ্বালা
খেলিতাম কত খেলা
নূতন নূতন শোভা করিয়া ধারণ।

কেননা করিলে মোরে নব জলধর!
গভীর গর্জ্জন করি
ঢালি অশ্রু প্রাণ ভরি'
করিতাম সুশীতল বিশ্ব চরাচর।

কেননা করিলে মোরে শ্যামল প্রান্তর!
মনের মতন ক'রে
সাজাইয়া কলেবরে
তুষিতাম মহাসুখে ধরার অন্তর।

কেননা করিলে মোরে পাখীর কূজন!
ভ্রমর-ঝঙ্কার সহ
মিশি মিশি অহরহ
কত সুখে ভ্রমিতাম বন উপবন

কেননা করিলে মোরে শিশুর বদন!
সন্তান-সমান জ্ঞানে
সমাদরে সযতনে
কতই পেতাম আহা সোহাগ-চুম্বন।

কেননা করিলে মোরে বীণার ঝঙ্কার!
হৃদয়ে হৃদয়ে গিয়ে
মধুর সঙ্গীত গেয়ে
নামাইতে পারিতাম হৃদয়ের ভার।

কেননা করিলে মোরে বিকশিত ফুল!
বালক বনিতা যত
হ'য়ে আনন্দিতচিত
আমার সৌরভে কত হইত আকুল।

কেননা করিলে মোরে বিরহের গান!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মোরে
সবাই রাখিত ধ'রে
সবাই হইত শুনি আকুলপরাণ।

করিতে যদ্যপি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মেলা—
কত আনন্দিত মনে
মৃদুল পবন সনে
রঙ্গ ভরে করিতাম জগতের খেলা

কোন সাধ মিটিল না এই অভাগার
নিষ্ফল বাসনারাশি
শোকের তরঙ্গে মিশি
করিতেছে আকুলিত হৃদয়-পাথার।

তবু কেন ভাসে প্রাণ আশার সাগরে?
সসাগরের কূলে বসি

কাঁদিলে, রতন রাশি—
রত্নাকর কোন্ কালে দিয়াছে কাহারে ?

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত ।

আয়ুর্ব্বেদ ।

আহার—ঔষধ ।

(২)

লঘুপাক দ্রব্য ।

লঘু দ্রব্য সর্ব্ব ঋতুতেই সুপথ্য ।

তালিকা ।

১ ।	দগ্ধভূমিজ ধান্য	২ ।	ষষ্টিক ধান্য
	রোপ্য ধান্য	৪ ।	অতিরোধ্য ধান্য এবং পুরাণ তণ্ডুল
৫ ।	মুদ্গ	৬ ।	হরিণ-মাংস
৭ ।	শশমাংস	৮ ।	সজারু-মাংস
৯ ।	লাবপক্ষীর মাংস	১০ ।	কপিঞ্জল　„
১১ ।	ক্রকর　„	১২ ।	উপচক্র　„
১৩ ।	ঘুঘু　„	১৪ ।	শুক　„
১৫ ।	বাস্তূক শাক	১৬ ।	তণ্ডুলীয় শাক
১৭ ।	রাজক্ষবক শাক	১৮ ।	মুলক পোতিকা
১৯ ।	পক্ক কুমড়া	২০ ।	শূরণ
২১ ।	মোচক	২২ ।	পরূষক
২৩ ।	বৃহতী	২৪ ।	মাতুলুঙ্গ
২৫ ।	পুরাণ কুল	২৬ ।	পুরাণ মধু
২৭ ।	ছাগ—দুগ্ধ দধি ঘৃত	২৮ ।	উষ্ট্র-দুগ্ধ
২৯ ।	একশফদুগ্ধ	৩০ ।	নারী-দুগ্ধ
৩১ ।	দাড়িম	৩২ ।	খেজুর

৩৩।	সৈন্ধব লবণ	৩৪।	সৌবর্চ্চল লবণ
৩৫।	শুণ্ঠী	৩৬।	মরিচ
৩৭।	হিঙ্গু	৩৮।	বিড়ঙ্গ
৩৯।	সর্ষপ তৈল	৪০।	খ-অম্বু, কারক-অম্বু, নদীজল
৪১।	যবাগূ	৪২।	লাজমণ্ড

(৩)

অতঃপর আমরা অগ্নি-দীপন দ্রব্যের তালিকা দিব। দীপন দ্রব্যের উপকারিতা স্বতঃসিদ্ধ।

তালিকা।

১।	যব	২।	তিল
৩।	শুকমাংস	৪।	সর্পমাংস
৫।	গ্রাম্যজন্তু-মাংস	৬।	ইলিস মৎস্য
৭।	বাস্তূক শাক	৮।	মূলক-পোতিকা
৯।	কাল শাক	১০।	চাঙ্গেরী
১১।	বার্ত্তাকু	১২।	পক্ক কুমড়া
১৩।	জালি এর্বারুক	১৪।	জালি কর্কারু
১৫।	জালি শীর্ণবৃন্ত	১৬।	অম্ল বেতস
১৭।	তিন্তিড়ীক	১৮।	মাতুলুঙ্গ
১৯।	মধু কর্কুটী	২০।	তোদন
২১।	শতাবরী	২২।	শূরণ
২৩।	পরূষক	২৪।	হরিতকী
২৫।	নারী-দুগ্ধ	২৬।	গব্য দধি
২৭।	ছাগদধি	২৮।	অশ্বদধি
২৯।	গব্য নবনীত, ঘৃত	৩০।	ছাগঘৃত
৩১।	তৈল	৩২।	মধু
৩৩।	মদ্য	৩৪।	গোমূত্র
৩৫।	সৈন্ধব	৩৬।	মরিচ
৩৭।	বিট্ লবণ	৩৮।	সৌবর্চ্চল লবণ
৩৯।	ক্ষার মাত্র	৪০।	শুণ্ঠী

৪১।	শুষ্ক শিপ্পলী	৪২।	হিঙ্গু
৪৩।	জীরক	৪৪।	যবানী
৪৫।	ধন্যাক	৪৬।	লশুন
৪৭।	দ্রাক্ষা—দাড়িম	৪৮।	পুরাণ কুল

(৪)

পরিপাককারী পাচন দ্রব্যের তালিকা।

১।	গুটিকা লবণ	২।	হিঙ্গু
৩।	লশুন	৪।	মদ্য

(৫)

শ্বাস—কাস-প্রশমনী তালিকা।

১।	গবয়মাংস	২।	গোমাংস
৩।	শুক মাংস	৪।	পর্ণ-মৃগ-মাংস
৫।	শুষ্ক পেপুল	৬।	শুণ্ঠী
৭।	ধন্যাক	৮।	লশুন
৯।	জম্বীর	১০।	মাতুলুঙ্গ
১১।	দ্রাক্ষা	১২।	উষ্ণোদক
১৩।	ছাগদুগ্ধ	১৪।	ছাগদধি
১৫।	নবনীত	১৬।	মধু
১৭।	শ্বেতসুরা } পুরাণ		
১৮।	সীধু } পুরাণ		

(ক্রমশঃ)

শ্রীবৃদ্ধ—

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব।

নমি দেব জগন্নাথ,　　বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ,
অধম পতিতজনে বিতর করুণা,

কলি-কলুষ-নাশন, তুমি মদনমোহন,
শ্রীপদ-সেবনে আমা ক'রনা বঞ্চনা।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি, হলায়ুধ সঙ্গে করি,
রয়েছ সুভদ্রা-শক্তি সহ একাসনে,
অপূর্ব্ব ভাব-লহরী, মরি কি রূপ-মাধুরী,
উদ্ধারিছ পাপী তাপী দরশন-দানে।
পুণ্যভূমি উৎকলে, রয়েছ সাগর-কূলে,
সূক্ষ্মরূপে আছ পুনঃ প্রতি জীবাধারে,
কে বুঝে এ লীলা তব, জান তুমি ভবধব,
কি খেলা খেলাও তুমি এই চরাচরে!
যবে ধর্ম্ম লোপ পায়, অধর্ম্ম প্রবল হয়,
পাপ-পথে জীব সব করে বিচরণ,
ধর্ম্ম-সংস্থাপন পরে সাধুগণ-ত্রাণ তরে,
যুগে যুগে নব-দেহ করহ ধারণ।
(তাই) অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সর্ব্ব ব্রহ্মময় মর্ম্ম,]
দেখাইছ মহাতত্ত্ব পুণ্য পুরীধামে,
জাতি-ভেদ নাহি তথা, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যথা,
অন্যায্যে মহাপ্রসাদ দিতেছে বদনে।
রেখেছ লুকায়ে পদ ভব-বিরিঞ্চি-সম্পদ,
ভক্তজন সদা যাহে করে অভিলাষ,
যে লভেছে "নিষ্ঠা ভক্তি" সেই সে ধরেছে শক্তি
সেবিতে ওপদ তব হ'য়ে চিরদাস।
জীবের উদ্ধার তরে অৰ্দ্ধ-অঙ্গ দেহ ধ'রে,
নব-ভাবে নববেশে করিছ বিহার,
নিজ ভক্তগণ সঙ্গে নিত্যলীলা নানা রঙ্গে,
সদানন্দময় তুমি শান্তির আধার।
দু'বাহু বিস্তার করি চিদানন্দরূপে হরি:
ডাকিতেছ প্রেম-স্বরে নিজ দয়া বলে,
"আয় আয় আয় সবে ভয় নাহি আর ভবে,
পাপ তাপ দূরে যাবে, আয় মোর কোলে।"

সঙ্গে দেব সংকর্ষণ করিছেন আকর্ষণ,
মধ্যে ভদ্রা-শক্তি তাহে মঙ্গল-কারণ,
একাসনে তিন ভাবে, (তব তত্ত্ব কেবা পাবে ?)
ধরা-ভার নাশিবারে অধমতারণ।
আমি পাপাচারী জন সদা পাপ-কার্য্যে মন,
বিষয়-মদিরা-পান শুধু প্রাণে চায়,
ভক্তি-পথ সুমধুর জানিনা সে কতদূর,
কেমন তাহার রূপ কিবা সে উপায় !
ভজন-পূজন শুনি কভু তাহা নাহি জানি,
শ্রবণে শ্রবণ মাত্র হৃদয়ে লুকায়,
চির অশান্তি-অনলে হৃদয় সতত জ্বলে,
তবু তাহে সুখ-আশা মানস মজায়।
হ'য়ে রিপু-পরবশ করিয়াছি সর্ব্বনাশ,
এখন নিকট কাল বিষম বিপদ্,
গিয়েছে সকল শক্তি তবু প্রবল আসক্তি,
ছাড়ে না ক্ষণেক তরে ভাবিতে শ্রীপদ।
অধম-তারণ তুমি তুমি হে জগৎস্বামী,
পতিতপাবন হরি ত্রিতাপ-নাশন,
তাই ভরসা কেবল অভয়-পদ-যুগল,
তরিতে এভব-বারি বিপদ-বারণ।
দেহ-রথে হ'য়ে রথী বিজ্ঞান ক'রে সারথি,
নিবৃত্তি সুমতি অশ্ব করিয়া যোজন,
নাশি পাপ-রিপু গণে শান্ত করি দুষ্ট মনে
দাও মোরে ভক্তি-ধনে কাটিয়া বন্ধন।

শ্রীবরদাকান্ত দে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পশু-চিকিৎসা। (তৃতীয় সংস্করণ) পশুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি, কর্ত্তৃক রচিত (ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী) ১১৫ পৃষ্ঠায়

সমাপ্ত পশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। মূল্য আট আনা। রংপুর পশুচিকিৎসালয়ে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। পুস্তকখানি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের টেক্‌ষ্ট্-বুক্ কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত। এই পুস্তকে সংক্ষেপে গবাদি পশুর পালন-রক্ষণাদি বিষয়ে ও উহাদের কতিপয় রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ বিদ্যমান। গো, অশ্ব, কুক্কুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণকে রোগের আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রাচীনকাল হইতেই মনস্বী মানবগণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে অর্থাৎ আর্য্যযুগেই পশুচিকিৎসার যথেস্ট উন্নতি হইয়াছিল। কেবল পশুচিকিৎসায় নহে, পশুপালনে এবং পশুজাতির সমুন্নয়নেও প্রাচীন আর্য্যগণ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অথর্ব্ববেদে পশু-চিকিৎসার কথা আছে। ঋষি দীর্ঘতমা গোবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রসিদ্ধ পাণ্ডব নকুল ও সহদেব, অশ্ববিদ্যা ও গোবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতে তাঁহাদের বিদ্যা-নৈপুণ্য বর্ণিত হইয়াছে। গো অশ্বের পীড়াদি চিকিৎসায় তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন। বিশিষ্ট বৃষের দ্বারা বন্ধ্যা গাভীর গর্ভাধানসাধন যে প্রকারে সম্ভব, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। দুগ্ধবৃদ্ধির উপায় তাঁহারা অবগত ছিলেন। দুস্ট অশ্বের দমন-প্রথা জানিতেন, অশ্বের গতি-সৌষ্ঠব-কৌশল অবগত ছিলেন। নল রাজা অশ্ব-বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। পুরাণে এই সকল বিদ্যার পরিচয় ও বিবৃতি পাওয়া যায়। 'অশ্ববৈদ্যক' 'পালকাপ্য' (হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ) প্রভৃতি পশুচিকিৎসা-বিষয়ক সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এই সুপ্রাচীন পশুচিকিৎসা-পদ্ধতির উপদেষ্টা বিরল, প্রয়োগ সুতরাংই নাই। এক-দল অজ্ঞ লোকের উপরই বর্ত্তমানে পশুচিকিৎসার ভার ন্যস্ত। এ অবস্থায় বৈদেশিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সুতরাংই রঘুনাথ বাবুর গ্রন্থের উপযোগিতা স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞ 'গো-বৈদ্য' গণ যে প্রণালীতে চিকিৎসা করে, তাহার ফল সর্ব্বত্রই মন্দ হয় না; উহা একেবারে উপেক্ষণীয় মনে করি না। তবে সংস্কার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। রঘুনাথ বাবু লিখিয়াছেন, "৫ বৎসর বয়সের পর গরু ও মহিষের দাঁত দেখিয়া ঠিক্ বয়স নির্ণয় করা বড় সুকঠিন।" আমরা কিন্তু ঐ অশিক্ষিতগণকে দাঁত দেখিয়া বৃদ্ধ গাভীর বয়স ঠিক্ বলিতে শুনিয়াছি। যে ২। ১ স্থানে দেখিয়াছি, বৎসর-সংখ্যা মিলিয়াছে। রঘুনাথ বাবুর গ্রন্থে যাহার বর্ণনা পাইলাম না, এমন রোগ গাভীর হইতেও দেখিয়াছি। যাহারা নিজে নিজের রোগের কথা বলিতে বা বুঝাইতে পারে না, সেই অনুপায় পশুগণের রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা করা সুকঠিন ব্যাপার। রঘুনাথ বাবুর গ্রন্থ, ঐ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিবে,

তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগ-চিকিৎসার জন্য সর্ব্বত্র ডাক্তারি ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া সহজলভ্য "বেনে দোকানের বকালের" ও তৈলাদির ব্যবস্থা করিয়া রঘুনাথ বাবু, পল্লীবাসীর প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছেন। এই পুস্তক-পাঠে অনেকেই উপকৃত হইবেন। ছাপা কাগজ ভাল। এই পুস্তক গৃহস্থের গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।

সংবাদ ও মন্তব্য।

কৃতকার্য্যতা। বঙ্গীয় বিদ্যার্থী শ্রীমান্ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বিলাতের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ত্রিপস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমানের এই কৃতকার্য্যতায় আমরা আনন্দিত।

স্মৃতিরক্ষা। ভারতের অন্যতম সুসন্তান মহারাষ্ট্রীয়ব্রাহ্মণ পরলোকগত গোখেলের স্মৃতিরক্ষা-ভাণ্ডারে এ যাবৎ ৫৪ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। মহামতি গোখেলের স্মৃতি, দেশবাসীর হৃদয় হইতে শীঘ্র অপসৃত হইবার নয়।

দুঃখের কথা। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ—যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট স্যারজন্ মেটসন্ মহোদয়ের পুত্র ফ্রান্সে মহাসমরে আহত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার কল্যাণ করুন।

জীবন্ত চতুর্ভুজা। পত্রান্তরে প্রকাশ—ভবনগরে একটী চতুর্ভুজা বালিকা আছে। বালিকার চরণ চারিখানি, মুখ দুইখানি। সকল কর-বদন-চরণই কার্য্য-কর। বালিকা এখন নবমবর্ষীয়া। চতুর্ভুজা দেবীর কথা শুনিয়া যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই বালিকাকে দেখিলে বুদ্ধির বড়াই ছাড়িবেন।

পরীক্ষা-বার্ত্তা। এবার স্থানীয় রঘুনাথ চতুষ্পাঠীর দুইটী ছাত্র, কাব্যের মধ্য পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে, অন্য একটী ছাত্র আদ্য পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। চতুষ্পাঠীর অধিকতর উন্নতি আমরা হৃদয়ের সহিত কামনা করি।

দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী। পত্রান্তরে প্রকাশ—ত্রিপুরার চাঁদপুর মহকুমায় দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। অন্নাভাবে লোকে পাটের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া অতি কষ্টে জীবন-ধারণ করিতেছে! বিপন্নগণকে রক্ষা করিবার জন্য রাজা-প্রজানির্ব্বিশেষে সকলেরই বদান্যতার উৎস উৎসারিত হওয়া উচিত।

শোক-সংবাদ।

যশোহরের সুবিখ্যাত সর্ব্বজনপ্রিয় গুণনিকেতন উকীল বাবু প্রসন্নগোপাল রায় বি এল্ মহাশয় গত ১০ই আষাঢ় শুক্রবার প্রাতঃকালে বহুমূত্ররোগে দেহত্যাগ করিয়া অমরগতি লাভ করিয়াছেন। প্রসন্ন বাবু সরল, বিনয়ী, অমায়িক, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্ঠাবান্ অনুষ্ঠানরত, স্বধর্ম্মপরায়ণ

খাঁটী হিন্দু ছিলেন। ইঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কখনও পাপের ছায়াস্পর্শও ঘটে নাই। ইনি দেব-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, আর আজীবন সাধারণের সাধুবাদ লাভ করিয়া শেষ দিনে প্রফুল্লবদনে 'শিব—নারায়ণ—জগন্নাথ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ধীর স্থির ভাবে নির্ভয় হৃদয়ে ভগবদাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শান্তিময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ইষ্টদেবতার চরণোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। সংসার-চিন্তা পরিহার করিয়া ইষ্টনামে অবহিত হইয়া হাস্যমুখে এ ভাবে পরলোকের পথে প্রস্থান করিতে প্রকৃত হিন্দুই পারে!

কেবল ধর্ম্মে নয়, কর্ম্মেও প্রসন্নবাবু অসাধারণ ছিলেন। কর্ম্মজীবনে তিনি বীরের ন্যায় অচল অটল ছিলেন। প্রসন্নবাবু ওকালতীতে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তিনি একজন যথার্থ স্বদেশ-সেবক, স্বজাতি-সেবক, ও স্বধর্ম্ম-সেবক ছিলেন। স্বদেশী-শিল্পের উন্নয়ন ও স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রচুর প্রচলনে তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যশোহরের "স্বদেশী-ভাণ্ডার" তাঁহার অভিভাবকতায় অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রসন্নবাবু দীর্ঘকাল "স্বদেশী-ভাণ্ডার" কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর্ ছিলেন। দীর্ঘকাল যশোহর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান্ থাকিয়া অক্লান্তভাবে কার্য্য করিয়া সহরবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রসন্নবাবু অনেক দিন "যশোহর লোন কোম্পানী" এবং "যশোহর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কে"র অবৈতনিক অডিটর্ ছিলেন; উক্ত উভয়ই কোম্পানীরই তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। প্রসন্নবাবুর বিজ্ঞোচিত নিঃস্বার্থ উপদেশে কোম্পানীর অনেক উপকার হইয়াছে। বৈশ্য-বারুজীবি-সভার সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত প্রসন্ন বাবু সভার সম্পাদকরূপে স্বজাতির মঙ্গল-সাধন ও দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহা অতুলনীয়। বৈশ্য-পত্রিকার পরিচালন-ভার প্রথমাবধি তাঁহারই যোগ্যহস্তে ন্যস্ত ছিল। হিন্দু-পত্রিকার প্রথমপ্রকাশসময়ে প্রসন্ন বাবু, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যদুবাবুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। হিন্দু-পত্রিকার উন্নতিকল্পে তিনি উদ্যোগ আয়োজন চেষ্টাযত্ন শ্রমস্বীকার যথেষ্টই করিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া কখনও হিন্দু-পত্রিকার সৌষ্ঠব-সাধন করেন নাই বটে, কিন্তু পত্রিকার পরিচালন-ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য অপ্রচুর ছিল না। প্রসন্ন বাবুর পরলোকগমনে হিন্দু-পত্রিকা একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু হারাইয়াছে। তবে বিয়োগ ও মিলনের মূল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, ইহাতে বিশ্বাসী হিন্দুর শোক বা দুঃখের কারণ নাই। ভগবানের দান সবই উত্তম। ভগবান্ প্রসন্নবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তিদান করুন।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২২ বর্ষ, ২২ শ খণ্ড | শ্রাবণ। | ১৩২২ সাল।
৪র্থ সংখ্যা। | | ১৮৩৭ শকাব্দা।

ত্রিগুণ-অতীত পথে।

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,
পুণ্য পাপ মায়া মোহ বৃত্তিচয় বিরমে তখন,
ভেদাভেদ-বুদ্ধি তার সেই ক্ষণে হয় বিগলিত,
অসংশয়চিত্তে হয় শব্দাতীত তত্ত্ব বিকসিত,
নাহি রয় নিষেধ-বিধান।

(২)

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,
নেহারে সে—আত্মা তার পরিপূর্ণ করে ত্রিভুবন,
একমাত্র নভ যথা ঘট-মধ্যে ঘটের বাহিরে,
কার্য্য-কারণের পাশ পায় নাশ মানসে অচিরে,
ঘটে তার করম-বিরাম।

(৩)

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,—
সৈন্ধব হারায় যথা নীর মাঝে অস্তিত্ব আপন,—

ক্ষিতি-বারি-বহ্নি-বায়ু-নভরূপী পঞ্চভূত তার,
মিশে যায় মহাভূতে, ঘুচে যায় অহম-বিকার,
নাহি রয় নিষেধ-বিধান।

(৪)

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,—
অনল-পরশে যথা লভে নানা কনক-গঠন
একাত্মিকা কনকতা,—সেই মত বিচিত্র জগৎ
আত্ম-যোগে আপনাতে আত্মময় হয় যুগপৎ,
নাহি রয় ভিন্নতার স্থান।

(৫)

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,
অমনি জীবত্ব তার পরমাত্মে হ'য়ে নিমগন,
সচ্চিদ-আনন্দ-রূপ লভে মহাপরিপূর্ণতায়,
নদী যথা উদধিতে সামরসে সাগরত্ব পায়,
নাহি রয় নিষেধ-বিধান।

(৬)

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,
বাহ্য-অভ্যন্তরাতীত আপনারে জানে সে তখন,
বিদ্যার পরম পদ আপনার স্বরূপ-দর্শনে,
স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সমুদিত হয় শুদ্ধ মনে,
নাহি রয় ভিন্নতার স্থান।

(৭)

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,
কার্য্যাকার্য্যে আর তার নাহি রয় কর্ত্তৃত্ব কখন;
দগ্ধ বাসে রহে যথা কার্য্যহীন বসন-আভাষ,
কর্ম্মনাশে দেহে তার বন্ধহীন প্রাণের বিকাশ,
নাহি রয় নিষেধ-বিধান।

(৮)

ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ,
কেবা সে, আসিল কেন কোথা হ'তে—বুঝে সে তখন,

নির্ম্মল গগনসম পূর্ণতত্ত্ব করিয়া ধারণ,
লভে সে আপনা মাঝে চিদানন্দ সামরস-ঘন,
হয় জীব শিবের সমান।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং (ত্যাগং) (কথয়িত্বা) পুনশ্চ যোগং (কর্ম্মযোগং) শংসসি (কথয়সি) এতয়োঃ (কর্ম্ম-সন্ন্যাস—কর্ম্ম-যোগয়োঃ) যৎ মে (মম) শ্রেয়ঃ (প্রশস্যতরং,) (মোক্ষ-সাধনত্বেন ভবতা) সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি। ১

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়ই ব্যাখ্যা করিলে, কিন্তু এই দুয়ের যেটী আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। ১

আলোচনা। শ্রীভগবান্ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগকেই জ্ঞান-নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায় বলিয়াছেন। এই কর্ম্ম অর্থে "নিষ্কাম কর্ম্ম"। আত্মজ্ঞান-লাভ হইলে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহার নাম কর্ম্ম-সংন্যাস। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোক হইতে ৪১শ শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্মসংন্যাস ও জ্ঞানের প্রাধান্য বর্ণন করিয়া ৪২শ শ্লোকে বলিলেন যে "হে অর্জ্জুন, তুমি দেহ ও আত্মা-সম্বন্ধীয় সংশয়কে জ্ঞান-খড়গ দ্বারা ছেদন করিয়া আত্মজ্ঞানের উপায়ভুত কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর।" এবম্প্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে বিমিশ্র বিবিধ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন "হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম্ম, জ্ঞান ও কর্ম্ম-সংন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে মনে হয়, তোমার কথিত কর্ম্মযোগ ও সংন্যাস উভয়ই একসময় এক ব্যক্তি সাধন করিতে পারে না। অতএব আমার পক্ষে উহার যেটী শ্রেয়ঃ হয়, তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া উপদেশ কর"। ১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্ম্ম-সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। সন্ন্যাসঃ (কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ) কর্ম্মযোগশ্চ (কর্ম্মানুষ্ঠানংচ) উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (মোক্ষপ্রদৌ) তয়োস্তু (মধ্যে) কর্ম্ম-সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি)। ২

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, "কর্ম্ম-সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, তন্মধ্যে কর্ম্ম-সংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ"। ২

আলোচনা। শ্রীভগবান্ বলিলেন, তোমার "দেহে আত্মাভিমান" দূর হয় নাই। যাহার দেহে আত্মাভিমান দূর হইয়াছে, সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞই কর্ম্ম-সংন্যাস-সাধনের যোগ্য ব্যক্তি। তোমাকে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছি। এই কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তাহার পরিপাকার্থ জ্ঞান-নিষ্ঠার অঙ্গস্বরূপ কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বে বলিয়াছি। মূল ও তাহার অঙ্গ অভিন্ন বিধায় কর্ম্ম-সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষ-প্রদ। এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্ম-সংন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ তোমার পক্ষে উৎকৃষ্টতর।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসংন্যাস অভিন্ন। কর্ম্মযোগ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান। কর্ম্ম-সংন্যাস অর্থে কর্ম্মত্যাগ নয় কর্ম্মফল-ত্যাগ। ভগবান্ ৩য় অধ্যায়ে ২২–২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন, তিন লোকে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমি পাই নাই, যাহা পাইবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিব; তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। কারণ যদি আমি অবহিত হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে অপরে আমার অনুকরণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিবে এবং তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে।" জগতে ভগবান্ হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্মশীল। সাধনা দ্বারা যাঁহারা মানবদেহ অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ভগবদঙ্গরূপে জগতের স্থিতির জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া কেহ মনু, কেহ সপ্তর্ষি, কেহ ইন্দ্র, কেহ চন্দ্র, কেহ বায়ু, কেহ বরুণ প্রভৃতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্বস্ব কর্ত্তব্য করিতেছেন। ইঁহারা একাধারে কর্ম্মযোগী ও কর্ম্ম-সংন্যাসী। ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যোনদ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়। যঃ নদ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি (রাগ-দ্বেষ-রাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি

অনুতিষ্ঠতি) স নিত্যসংন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠান-কালেঽপি ফলানভিসন্ধানাৎ সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ। হি (যতঃ) হে মহাবাহো, নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখ-রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্যঃ শুদ্ধচিত্তঃ সঃ) (জ্ঞানদ্বারা) সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাত্ (সংসারবন্ধনাত্) প্রমুচ্যতে । ৩

বঙ্গানুবাদ। যিনি সুখ-দুঃখাদিতে আকাঙ্খা ও দ্বেষ করেন না, তিনি নিত্য সন্ন্যাসী। হে মহাবাহো, তিনি অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ৩

আলোচনা। কর্ম্ম-সংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগ শ্রেষ্ঠ কেন, ভগবান্ তাহাই বলিতেছেন। কর্ম্মী হইলেও যিনি আসক্তি ও বিদ্বেষ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনার্থই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সংন্যাসী। "আমি কর্ত্তা—আমার বস্তু" ইত্যাকার অভিমান-ত্যাগের নামই সংন্যাস। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম্মসাধন ও সংন্যাস একই পদার্থ। ৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

অন্বয়। বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ, সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সংন্যাসং লক্ষয়তি, যোগশ্চ কর্ম্মযোগ এব) পৃথক্ (স্বতন্ত্রৌ) ইতি প্রবদন্তি, নতু পণ্ডিতাঃ। (অনয়োঃ) উভয়োঃ একং অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (প্রাপ্নোতি) । ৪

বঙ্গানুবাদ। অজ্ঞেরাই কর্ম্ম ও সংন্যাসযোগকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা করেন না। এতদুভয়ের একটী সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায়। ৪

আলোচনা। মূল ও অঙ্গের অভেদ হেতু উভয় সাধন নামতঃ ভিন্ন, সাধনফল একই। সাংখ্যযোগ বলিতে জ্ঞাননিষ্ঠা-যোগ, কর্ম্ম-সংন্যাস তাহার অঙ্গ মাত্র ; কর্ম্মযোগ তাহার মূল। অজ্ঞানীরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করে, সংন্যাস ও কর্ম্মযোগের ফল পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, অধিকার অনুসারে কর্ম্মযোগ বা সংন্যাস যাহাই সাধন কর না কেন, সমান ফললাভ হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগও কর্ম্ম-সংন্যাসের নামান্তর মাত্র। ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

অন্বয়। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ) যৎ স্থানং (মোক্ষাখ্যং) প্রাপ্যতে যোগৈঃ (কর্ম্মযোগিভিঃ) অপি তৎ (এব) গম্যতে, যঃ সাংখ্যং যোগং চ একং পশ্যতি (স এব সম্যক্ পশ্যতি) । ৫

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ যে মোক্ষস্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; যিনি সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে এক দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

আলোচনা। কর্ম্মযোগী ও কর্ম্ম-সংন্যাসী উভয়েই মোক্ষ লাভ করেন। সন্ন্যাসী পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্মফলে চিত্ত-শুদ্ধি-লাভ করিয়া অনেক অগ্রসর হইয়াছেন, এক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভ দ্বারা মুক্তিপদ-প্রাপ্তির অধিকারী হইতে পারেন। আর কর্ম্মযোগী ফল-কামনাবর্জিত হইয়া ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিয়া জন্মান্তরে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিয়া মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইবেন। সুতরাং কর্ম্মী ও সংন্যাসী উভয়েই সমফলভাগী। ৫

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

অন্বয়। হে মহাবাহো অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং (দুঃখহেতু অশক্য ইত্যর্থঃ) (চিত্ত-শুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ) যোগযুক্তস্তু মুনিঃ (সংন্যাসী ভূত্বা) ন চিরেণ (স্বল্পেনৈব কালেন) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি। ৬

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সংন্যাস অসম্ভব, কেননা চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না। কর্ম্মযোগী মুনি সংন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ৬

আলোচনা। কর্ম্মযোগ ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ধি জন্মে না, চিত্ত-শুদ্ধি না জন্মিলে আত্মজ্ঞান বা জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভ হয় না। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি সংন্যাসী হন, তিনি সত্বর ব্রহ্মকে লাভ করেন। এই জন্য হিন্দু-শাস্ত্র-মতে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ বানপ্রস্থ ও সংন্যাস এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে সংন্যাসাশ্রমকে সর্ব্বপরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

অন্বয়। যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ) বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্তঃ) বিজিতাত্মা (বিজিতঃ আত্মা শরীরং যেন সঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মভূত আত্মা যস্য সঃ) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি) ন লিপ্যতে (তৈর্নবধ্যতে)। ৭

বঙ্গানুবাদ। যিনি কর্ম্মযোগযুক্ত বিশুদ্ধ-চিত্ত সংযত-দেহ জিতেন্দ্রিয় এবং

সর্ব্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মস্বরূপ, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম-বন্ধন প্রাপ্ত হন না। ৭

আলোচনা। কর্ম্মের দ্বারাই জীবের বন্ধন হয়, কিন্তু যে কর্ম্মযোগী ফল-কামনাবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ও মনোজয়ী এবং আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থেই যাঁহার আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, ঈদৃশ কর্ম্মযোগীর আত্মাভিমান না থাকায় কোন কর্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং বন্ধনের কারণ কর্ম্ম করিলেও নিষ্কামত্ব-হেতু তাঁহার বন্ধন হয় না। ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্। ৯

অন্বয়। যুক্তঃ (কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ পরমার্থদর্শী পুরুষঃ) (ক্রমেণ) তত্ত্ববিৎ (ভূত্বা) পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্) (অহং কিঞ্চিদপি) ন করোমি এব ইতি মন্যেত (মন্যতে) ৮।৯

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ তত্ত্ববিৎ হইয়া দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ঘ্রাণ আহার নিদ্রা শ্বাস কথন ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ করিয়াও মনে করেন "আমি কিছুই করি না, সমস্তই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য"। ৮।৯

আলোচনা। নিরুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগী, যিনি নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনি শারীরিক মানসিক কোন কর্ম্মেই "অহংকর্ত্তা" ইত্যাকার কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না। তিনি জানেন, সকলই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য; আত্মা অসঙ্গ নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের অনুষ্ঠানকালে তিনি এই ধারণা করেন যে, ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়াছে মাত্র। ৮। ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ১০

অন্বয়। ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) আধায় (সমর্প্য) (তৎফলে) সঙ্গং (আসক্তিং) ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অম্ভসা পদ্মপত্রমিব সঃ পাপেন ন লিপ্যতে। ১০

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন। ১০

আলোচনা। যেমন জল সকল বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের আর্দ্র করে, কেবল পদ্মপত্রকে আর্দ্র করিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্ম, কর্ম্মানুষ্ঠানকারী সকলকেই (সংসার-বন্ধনে) বন্ধন করিতে পারে, কেবল কামনাবর্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে বন্ধন করিতে পারে না। ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

অন্বয়। যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) সঙ্গং (কর্ম্মফলাসঙ্গং) ত্যক্ত্বা আত্ম-শুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধয়ে) কায়েন (স্নানাদি) মনসা (ধ্যানাদি) বুদ্ধ্যা (তত্ত্বনিশ্চয়াদি) কেবলৈঃ (কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (শ্রবণ—কীর্ত্তনাদি-লক্ষণং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (আচরন্তি)। ১১

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মযোগীগণ ফল-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত শরীর মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ১১

আলোচনা। যাঁহারা নিষ্কাম তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্য প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। তাঁহারা শরীর দ্বারা স্নানাদি, মনের দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ব-নিশ্চয়াদি এবং অন্য-কর্ম্মাভিনিবেশ-রহিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদ্‌গুণাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলকর্ম্মই ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১১

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

অন্বয়। যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ কর্ম্মযোগযুক্তঃ) কর্ম্ম-ফলং ত্যক্ত্বা (কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি) নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিকীং) শান্তিং (মোক্ষং) আপ্নোতি। অযুক্তঃ (বহির্মুখঃ সকামঃ) কাম-কারেণ (কামতঃ প্রবৃত্ত্যা) ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে (নিতরাং বন্ধমাপ্নোতি। ১২

বঙ্গানুবাদ। পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ ব্যক্তি ফলত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও আত্যন্তিকী শান্তি প্রাপ্ত হন। সকাম ব্যক্তি কামনাবশে প্রবৃত্তিহেতু ফলে আসক্ত হওয়ায় নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হন। ১২

আলোচনা। ভোগবাসনাই বন্ধনের কারণ, সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর বন্ধনের আশঙ্কা নাই। কামী পুরুষগণ নিজ নিজ ভোগ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১২

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা ।

প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক পঞ্চম সূক্ত ।

বষট্ তে পূষন্নস্মিন্ সূতাবর্য্যমা হোতা কৃণোতু বেধাঃ ।
সিস্রতাং নার্য্যৃতপ্রজাতা বি পর্ব্বাণি জিহতাং সূতবা উ ॥১

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে পূষণ্! তে (তুভ্যং) অস্মিন্ সূতৌ (সুখপ্রসব-কর্ম্মণি) হোতা (ঋত্বিক্) অর্য্যমা (প্রাণিজাতস্য প্রেরকোদেবঃ) বেধাঃ (ধাতা দেবঃ) (তদাত্মকো ভূত্বা) বষট্ করোতু (বষট্ কারেণ হবিঃ প্রযচ্ছতু) (যদ্বা অর্য্যমা বেধাশ্চ হোতা ভূত্বা তুভ্যং সুপ্রসব-ফলং দাতুং বষট্ করোতু) (তুষ্টস্য পুষ্ণঃ প্রসাদাৎ) নারী (গর্ব্বিণী) ঋতপ্রজাতা (জীবদপত্যা) সিস্রতাম্ (প্রসবক্লেশাদ্ বিনিঃসৃতা ভবতু অক্লেশেন প্রসূতা ভবতু ইতিভাবঃ) উ (অপিচ) সূতবে (সুখপ্রসবার্থং) পর্ব্বাণি (প্রসবনিরোধকাঃ সন্ধিবন্ধাঃ) বিজিহতাং (বিগচ্ছন্তু বিশ্লথা ভবন্তু ইত্যর্থঃ)

বঙ্গানুবাদ। হে পূষণ্ দেব! এই সুপ্রসব-কর্ম্মে 'অর্য্যমা' ও 'বেধা' 'হোতা' হইয়া আপনার উদ্দেশে 'বষট্' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হবিঃ প্রদান করুন্। (আপনার পরিতুষ্টির ফলে) এই প্রসূতি জীবিত সন্তান প্রসব করুক, প্রসূতি প্রসবে যেন ক্লেশ না পায়। অপিচ সুখ-প্রসবার্থে প্রসূতির সুপ্রসব-বাধক সন্ধিবন্ধসমূহ শ্লথ হউক্।

টিপ্পনী। এই মন্ত্রে পোষকদেব পূষার নিকট প্রসূতির সুখপ্রসব প্রার্থনা করা হইতেছে। পূষা পোষণ-দেবতা। পোষণ-দেবতার কৃপা ভিন্ন গর্ব্ভের পূর্ণতা ও প্রসূতির সুস্থতার সম্ভব নাই। যে প্রসূতির দৈহিক যন্ত্রাদি পুষ্ট হয় নাই, তাহার গর্ব্ভধারণ বিপজ্জনক। অপুষ্টদেহা প্রসূতির সন্তান গর্ব্ভে বিনষ্ট হইতে পারে, রোগী ও অল্পজীবী হইতেও পারে। সুতরাং পোষণ-দেবতার কৃপা চাই। অর্য্যমা প্রাণিজাতের প্রেরকদেব ও বেধা বিধাতৃদেব—আচার্য্যসায়ণের এইরূপ অভিপ্রায়। এই দুই দেব, হোতা নামক ঋত্বিকের দেহে (শক্তিরূপে) অধিষ্ঠিত হইয়া প্রসূতির কল্যাণার্থে পূষাকে মন্ত্রপূত হবিঃ প্রদান করিতেছেন। হোতা, অর্য্যমা ও বেধা হইয়া অর্থাৎ উভয় দেবতার শক্তি লাভ করিয়া (মন্ত্র-বলে) হবিঃ প্রদান দ্বারা 'পূষা' দেবতার তুষ্টি সাধন করুন এরূপ ভাবেও মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পূষার কৃপাবলে প্রসূতির ও গর্ব্ভের পুষ্টি ঘটিলে

স্বচ্ছন্দে জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, এই কথাও বলা হইতেছে। সন্তান অপত্যপথ দিয়া বহির্গত হইতে অনেক বেগ পায়; অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হয়। যন্ত্রের ছিদ্রপথ দিয়া বেগচালিত বাণ যেমন নির্গত হয়, সন্তানপ্রসবও অনেকটা সেইরূপ, একথা ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। প্রবল সূতিমারুতবেগে চালিত সন্তান পথে আসিতে অনেক সন্ধিবন্ধে বাধা পায়, সেই সকল সন্ধিস্থল শিথিল হইলে অক্লেশেই সে বহির্গত হইতে পারে। পূষা দেবতার কৃপায় তাহাই ঘটুক, একথা এখানে বলা হইতেছে।

চতস্রো দিবঃ প্রদিশশ্চতস্রো ভূম্যা উত।
দেবা গর্ভং সমৈরয়ন্ তং ব্যূর্ণুবন্তু সূতবে ॥ ২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। দিবঃ (দ্যুলোকসম্বন্ধিন্যঃ) চতস্রঃ (চতুঃসংখ্যাকাঃ) প্রদিশঃ (প্রকৃষ্টাঃ প্রাচ্যাদ্যাঃ প্রধানদিশঃ) সন্তি, উত (অপিচ) ভূম্যাঃ (ভূলোকস্য) যাঃ চতস্রঃ প্রদিশঃ সন্তি, (তাসামধিষ্ঠাতারঃ) দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) গর্ভং পূর্ব্বং সমৈরয়ন্ (সঙ্গতমকুর্ব্বন্ উদপাদয়ন্নিত্যর্থঃ) (ইদানীং তে দেবাঃ) সূতবে (প্রসবিতুং) (উদরস্থং গর্ভং) ব্যূর্ণুবন্তু (বিগতাচ্ছাদনং কুর্ব্বন্তু, জরায়োঃ সকাশাদ্ বিমুক্তং কুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। দ্যুলোকের যে চারিটী দিক্, আর ভূলোকের যে চারিটী দিক্ আছে, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবগণই পূর্ব্বে এই রমণীর গর্ভ উৎপাদন করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারাই প্রসবের জন্য উদরস্থ গর্ভকে জরায়ুযন্ত্র হইতে বিযুক্ত করুন।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে, প্রাকৃতিক দেবশক্তি গর্ভের উৎপাদনের প্রযোজক, আবার তাঁহারাই গর্ভের প্রসবেরও প্রযোজক। অন্তরীক্ষ দিগ্বোধের আলম্বন। মূর্ত্তবস্তু সমূহ যদি পরস্পর সংহত ও নিরবকাশ অবস্থায় অবস্থিত হইত, তবে আমরা দিগ্বিষয়ক জ্ঞানের দেখা পাইতাম না। এভাবে আমরা বলিতে পারি, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চতুর্দ্দিক্ সম্বন্ধীয় ধারণার নিদান দ্যুলোক। আমরা যে অগ্র, পশ্চাৎ, বাম, দক্ষিণ এই চতুর্ব্বিধ দিগ্‌বোধ লাভ করি, তাহার মূলে ভূলোকের সত্তা। জড় আধার বা অবলম্বন না লইয়া আমরা দৈশিক জ্ঞানকে ধরিতে পারি না। কাজেই অগ্র পশ্চাৎ ইত্যাদি বোধের মূল ভূলোকের স্থূল বস্তু। পূর্ব্বাদিদিকের অধিষ্ঠাতৃদেব ইন্দ্রাদি প্রসিদ্ধ। ভূলোকের সম্মুখ, পশ্চাৎ ইত্যাদির অধিষ্ঠাতৃদেবতা কাহারা, তাহা উপাসকের অজ্ঞাত নহে। উপাসনাকালে উপাসকগণ বামে দক্ষিণে সম্মুখে পৃষ্ঠে উপাসনা-প্রণালী-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন

দেবশক্তির অবস্থান ধারণা করিয়া থাকেন—এবং ঐ সকল শক্তি তাঁহাদের দেহকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য করিতে পারে এরূপও মনে করেন। দ্যুলোক ও ভূলোকের অধিবাসী দেবযোনির প্রসঙ্গ মনে করিলেও আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইব। জগদ্রক্ষিণীশক্তির বিকাশস্বরূপ প্রাকৃতিক ও দৈহিক দৈবশক্তিকে দ্যুলোকের ও ভূলোকের দিগধিষ্ঠাতৃদেবতা মনে করিলে তাঁহারা যে গর্ভোৎপাদনের মূল ইহা পূর্ণ সত্য। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নবনব মিলনে যে দেহে নবভাবের আবির্ভাব—স্বাস্থ্য রোগ গর্ভ প্রসব সবই হয়, এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। অন্যভাবে অন্তরীক্ষলোকবাসী ও ভূলোকস্থ দিক্‌পতি দেবযোনির অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের অধিকারের অধীনতায় জীব-কীটাণু গর্ভ-প্রবেশের সুযোগ পায় ও তাঁহাদের অলক্ষ্যশক্তির লীলাতরঙ্গে ভাসিতে ২ সংসারে আসে ও নানা খেলা খেলে। ফলতঃ যে শক্তি গর্ভধারণের যোগ্যতা দেয়, প্রসবও তাহারই কৃপায় ঘটে, ইহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নয়।

সূষা ব্যূর্ণোতু বি যোনিং হাপয়ামসি।
শ্রথয়া সূষণে ত্বমব ত্বং বিষ্কলে সৃজ ॥ ৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। সূষা (প্রজনয়িত্রী দেবতা) ব্যূর্ণোতু (গর্ভং বিগতাবরণং করোতু জরায়ুবন্ধনং বিশ্লেষয়তু ইত্যর্থঃ) বয়মপি যোনিং (গর্ভ-নির্গম-মার্গং) বিহাপয়ামসি (বিহাপয়ামঃ বিবৃতং কারয়াম ইত্যর্থঃ) হে সূষণে (সুখপ্রসবকারিণি দেবতে!) ত্বম্ (সুখপ্রসবকর্ম্মণা প্রীতা সতী) শ্রথয় (যোনিং বিশ্লেষয় যদ্বা গর্ভিণ্যাঃ সন্ধিবন্ধান্ বিমুঞ্চ) হে বিষ্কলে! (বিষ্কলিঃ সূতিমারুতঃ তথাভূতা, যদ্বা বিট্ ব্যাপ্তা সতী কলয়তি প্রেরয়তি ইতি বিষ্কলা, বিট্ চাসৌ কলা চেতি বিষ্কলা, হে তথাভূতে দেবতে!) ত্বম্ অবসৃজ (গর্ভং অবাঙ্মুখং প্রেরয়।)

বঙ্গানুবাদ। সূষা-দেবতা গর্ভকে জরায়ু-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করুন। আমরা অপত্যপথ বিবৃত করিতেছি। হে সুপ্রসবকারিণি দেবতে! আপনি প্রসবমার্গ অবাধ করুন, বাধা বিঘ্ন দূরীভূত করুন। হে বিষ্কলে! গর্ভকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করুন।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে প্রজনন-দেবতার নিকট প্রথমে গর্ভ-বেষ্টন আবরণের ছেদ কামনা করা হইতেছে। পরে বলা হইতেছে—"অপত্যপথ আমরা বিবৃত করি" পরে সুপ্রসবকারিণী দেবতাকে বলা হইতেছে "আপনি গর্ভ-নির্গম-পথের বাধাবিঘ্নস্বরূপ

সন্ধি-বন্ধন শিথিল করুন।" পরে বিষ্কলাকে বলা হইতেছে, যে "গর্ভকে নিম্নদিকে প্রেরণ করুন।" এখানকার 'সূষা' 'সূষণা' ও 'বিষ্কলা'কে আচার্য্য সায়ন 'দেবতা' বলিয়াছেন। গর্ভবেষ্টন-চর্ম্ম বা থলিয়া (সাধারণ কথায় এদেশে 'প'রো' বলে) ছিঁড়িয়া ফেলিতে দৈহিক দেব-শক্তির কার্য্যকারিতার প্রয়োজন হয়। গর্ভ অভ্যন্তরে থাকিতেই প্রায়শঃ ঐ জলযুক্ত থলিয়া বিদীর্ণ হইয়া থাকে। সময় সময় থলিয়া বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বহির্গত হয়, সন্তান উহার অভ্যন্তরে থাকে। ভূমিষ্ঠ থলিয়া ছিঁড়িলেই সন্তান পাওয়া যায়। দেবযোনি বা দৈহিক দেব-শক্তির ক্রিয়াবলে ইহা সহজপ্রসবস্থলে হইতে পারে, কিন্তু ধাত্রীর প্রক্রিয়ায় বা চেষ্টায়ই কষ্টকর প্রসবে ইহা হইতে দেখা যায়। অপত্যপথ বিবৃত করার ভার এখানে কর্ত্তৃপক্ষই লইয়াছেন। 'সূষণা' দেব-শক্তি বা দেবযোনি হইলে অলৌকিক-প্রভাবে সন্তান কোনও সন্ধি-বন্ধে বাধিয়া গেলে তাহাকে ছাড়াইতে পারেন সত্য, কিন্তু শিক্ষিতা ধাত্রী কর-কৌশলেই সন্ধি-বন্ধের বাধা ছাড়াইয়া দিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ। 'বিষ্কলা' যদি সূতিমারুতরূপা দেবতা হয়, ক্ষতি নাই, সূতিমারুত সন্তানকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করে ইহা সত্য, কিন্তু প্রধানতঃ ঐ কার্য্য প্রসূতির চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। বিট্ অর্থ মল, 'বিট্কলা' যদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'মলধরা কলা' হয়, তবে উক্তকলার আকুঞ্চন-প্রসারণ-সংবন্ধি-প্রবাহনযুক্তা প্রসূতিকে লক্ষণাদ্বারা বুঝাইলে প্রত্যক্ষ ধাত্রীবিদ্যা সম্মানিত হয়। এ বিষয়ে চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ চিন্তা করুন।

নেব মাংসে ন পীবসি নেব মজ্জস্বাহতম্।
অবৈতু পৃশ্নি শেবলং শুনে জরায়্বত্তবেঽব জরায়ু পদ্যতাম্॥ ৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে প্রসবিত্রি!) ত্বং মাংসেন (উদর-গতেন জরায়ুণা) ন পীবসি (স্থবীয়সী ন ভবসি) মজ্জসু (মজ্জোপলক্ষিতেষু ধাতুষু) (এতৎ জরায়ু) আহতম্ (আবদ্ধং স্নায়্বাদিকমিব) ন (ভবতি) (যদ্বা হে জরায়ু ত্বং মাংসেন শরীরগতেন সংবদ্ধং সৎ নেব পীবসি নৈব প্রবৃদ্ধং ভবসি, তথা ত্বং মজ্জসু নৈব সংবদ্ধং অসি) (অতঃ কারণাৎ) শেবলং (জলোপরিস্থ-শৈবালমিব) পৃশ্নি (শুভ্রবর্ণং) তৎ জরায়ু (গর্ভবেষ্টনম্) অবৈতু (অবাক্ পততু) শুনে (শুনঃ) অত্তবে (ভক্ষণায়) জরায়ু অবপদ্যতাম্ (অবাক্ পততু)।

বঙ্গানুবাদ। হে প্রসূতি! মাংসরূপ জরায়ু দ্বারা তুমি স্থূলতা প্রাপ্ত হইতেছ না; এই জরায়ু মজ্জার সংবদ্ধ নহে; অতএব জলোপরি ভাসমান শৈবালবৎ

শুভ্র এই জরায়ু নিম্নাভিমুখে পতিত হউক্, কুক্কুরের ভক্ষণার্থে (ব্যবহৃত হইবার জন্য) এই জরায়ু বাহিরে পতিত হউক্।

টিপ্পনী। এখানে 'জরায়ু প্রসূতির দেহের বৃদ্ধিকারণ নয়, শরীরে সংস্পৃষ্টও নয়, অতএব উহা নিম্নাভিমুখে পতিত হউক্' বলা হইতেছে। শুধু এইটুকু নয়, 'কুক্কুরের ভোজনে লাগিবার জন্য জরায়ু পতিত হউক্" এ কথাও বলা হইতেছে। ব্যাপার কি? জরায়ু স্ত্রীদেহের একটী প্রধান উপকরণ। অপত্য-লাভের সুবিধা একভাবে জরায়ুর উপর নির্ভর করে। যে অত্যাবশ্যক জরায়ু-যন্ত্র একটু স্থানচ্যুত হইলে নারীদেহ রোগে কাতর হয়, যে জরায়ুর কিয়দংশ প্রসব-সময়ে বহির্গত হইলে প্রসূতির প্রাণবিয়োগের আশঙ্কা ঘটে, যে জরায়ুকে তৎক্ষণাৎ যোগ্যস্থানে স্থাপন করিবার জন্য চিকিৎসকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করেন, সেই জরায়ু-যন্ত্র বাহির হইবে এবং কুক্কুরের ভক্ষণে লাগিবে—ইহা কিরূপ কথা! আমরা মনে করি, এখানে 'জরায়ু' অর্থ শারীর-বিজ্ঞান-শাস্ত্রোক্ত স্ত্রীদেহের অত্যাবশ্যক জরায়ু-যন্ত্র নহে। এখানে 'জরায়ু' অর্থ সন্তানবেষ্টক জলপূর্ণ চর্ম্মময় থলিয়া। উৎপত্তি-সময়ে উহা অভ্যন্তরে জলে ভাসমান শৈবা-লের মতই থাকে, বস্তুতই উহার সহিত নারীদেহের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। উহা জরায়ু-যন্ত্রের ন্যায় নারীদেহের স্থায়ী অবয়ব নহে, আগন্তুক পদার্থ। উহা প্রথমে শৈবালবৎ থাকে, পরে উহার একাংশ হইতে "অমরা" বা ফুল জন্মে, অন্য অংশ থলিয়ায় পরিণত হয়। শৈবালের দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, উহা প্রকৃত জরায়ু হইতে স্বতন্ত্র। শারীর-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ চিন্তা করুন। জরায়ুকে সম্বোধন করিয়া পরবর্ত্তি বক্তব্য বলা হইয়াছে, এরূপ ব্যাখ্যা সায়ণ করিয়াছেন। পদ-বোধিনীতে আমরা সায়ণের অনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু ঐ পক্ষ আমাদের অভিমত নয়। এই সামগ্রীকে বোধহয় তৎকালে কুক্কুরে ভক্ষণ করিত। এখন পুঁতিয়া রাখা হয়।

বি তে ভিনদ্মি মেহনং বি যোনিং বি গবীনিকে।
বি মাতরঞ্চ পুত্রঞ্চ বি কুমারং জরায়ুণাব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৫

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে গর্ব্বিণি!) তে (তব) মেহনং (মূত্রাবসেক-দ্বারং) বিভিনদ্মি (বিদারয়ামি) (ন কেবলং মেহনং) যোনিং চ বিভিনদ্মি (শিশুনির্গমন-যোগ্যাং করোমি) (তথা) গবীনিকে (যোনিপার্শ্ববর্ত্তিন্যৌ নির্গমন-প্রতিবন্ধিকে নাড্যৌ) বিভিনদ্মি (প্রয়োজনং দর্শয়তি) বি মাতরং চ পুত্রঞ্চ

ভিনদ্মি (উভৌ তৌ বিশ্লেষয়ামি গর্ব্ভাশয়াৎ পুত্রং নির্গময়ামীত্যর্থঃ) (তথা) জরায়ুণা (উল্বেন) কুমারং বিভিনদ্মি, (অনন্তরং) জরায়ু (অপি) অবপদ্যতাম্ (অবপততু।)

বঙ্গানুবাদ। হে গর্ব্ভিণি! তোমার মূত্রদ্বার বিদারণ করি, তোমার অপত্যপথ সন্তান-নিগমন-যোগ্য করিয়া দেই, তোমার গবীনিকাদ্বয় সন্তান-বহির্গমন-যোগ্য করি, মাতা তুমি এবং তোমার পুত্রকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেই। জরায়ু হইতে কুমারকে বিযুক্ত করি. অনন্তর জরায়ু পতিত হউক্।

টিপ্পনী। মেহন মূত্রদ্বার, যোনি অপত্য-নির্গম-দ্বার। 'গবীনিকা' যোনিপার্শ্ববর্ত্তি নাড়ীদ্বয়। ইহারা অবিশ্লিস্ট অবস্থায় সন্তান-নির্গমনের প্রবিন্ধক হয়, সায়ণ বলিয়াছেন। মাতা ও সন্তান পৃথক্ হইবার পরে জরায়ু হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলায় বুঝা যায়, জরায়ু এখানে গর্ব্ভবেষ্টন চর্ম্ম, উল্ব বা শ্বেতবর্ণ চর্ম্মযন্ত্র—অর্থাৎ সেই থলিয়া। ঐ থলিয়ার সহিতই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার পরে থলিয়া ছিঁড়িয়া সন্তানকে পৃথক্ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে 'জরায়ু' শব্দ দুইবার দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম ঐ থলিয়া অর্থে, শেষে 'অমরা' বা ফুল অর্থে। যখন 'প'রো' বা থলিয়া ছিঁড়িয়া সন্তান বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল সে জীবিত। সন্তানের ভাবনা ছাড়িয়া তখন প্রসূতির জন্য ভাবনা হইল। যথাকালে 'অমরা' বা ফুল (জরায়ু বলা হইয়াছে) না পড়িলে যথার্থ জরায়ু-যন্ত্রের সঙ্কুচিত হইবার সুবিধা হয় না, রক্তস্রাব অতিরিক্ত হয়, ফলে প্রসূতি মারা যাইতে পারে। ফুলের কিয়দংশও যদি উদরে থাকে, বাহির না হয়, তবে সান্নিপাতিক পীড়ায় প্রসূতির মরণ খুব সম্ভবই ঘটে, এ অবস্থায় অমরা-পতন-প্রার্থনার বিশেষ দরকার।

যথা বাতো যথা মনঃ যথা পতন্তি পক্ষিণঃ।
এবা ত্বং দশমাস্য সাকং জরায়ুণা পতাব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৬

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। যথা (যেন প্রকারেণ) বাতঃ (বায়ুঃ) পততি (শীঘ্রং গচ্ছতি) (যথাবা) মনঃ (অন্তঃকরণম্) পততি (শীঘ্রতরং গচ্ছতি) (যথাবা) পক্ষিণঃ পতন্তি (গগনে উড্ডীয়ন্তে) এব (এবম্) হে দশমাস্য! (দশসু মাসেষু মাত্রা পোষিত শিশো!) ত্বং জরায়ুণা সাকং (সহ) পত (গর্ব্ভাশয়াৎ শীঘ্রং নির্গচ্ছ) জরায়ু চ অবপদ্যতাম্ (অবাক্‌পততু)।

বঙ্গানুবাদ। হে দশমাস্য শিশো! যেমন বায়ু শীঘ্র গমন করে, যেমন

মন ততোধিক শীঘ্র গমন করে, যেমন পক্ষিগণ আকাশপথে বেগে গমন করে, তদ্রূপ শীঘ্রতা-সহকারে জরায়ু-সহিত তুমি নিস্ক্রান্ত হও। অনন্তর জরায়ু অধঃপতিত হউক্।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে গর্ব্তস্থ শিশুকে সবেগে বহির্গত হইতে অনুরোধ করা হইতেছে। "বায়ুর মত বেগে, মনের মত দ্রুতবেগে, পক্ষীর মত তীব্রবেগে হে দশমাস্য শিশো, তুমি বহির্গত হও" ইহাই ভাব। দশ মাস গর্ব্তে জননী কর্ত্তৃক ধৃত যে সে দশমাস্য। ভাবটা এই যে, দশ মাস কাল তুমি জননীর উদরে বাস করিয়াছ, আর কেন, এখন তীব্রবেগে বাহির হও। সঙ্কীর্ণ অপত্যপথ দিয়া সন্তান কিরূপে কতবেগে বহির্গত হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। প্রবল প্রবাহনে সঙ্কীর্ণ পথ বিস্তৃতি লাভ করে, ভগবানের অপূর্ব্ব কৌশলে নবনীতকোমল শিশুদের সেই প্রচণ্ডবেগ সহ্য করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে নিম্নে পতিত হয়। সন্তান প্রকৃতি-প্রেরিত হইয়া (কর্ম্মাধীনতায় স্বয়ংই) যথাকালে আসিতে চেষ্টাবান্ হয়, এ কথা বুঝাইবার জন্যই বৈদিক ঋষি সন্তানকে বহির্গত হইতে বলিতেছেন। এ মন্ত্রে সন্তানকে যে জরায়ুর সহিত নির্গত হইতে বলা হইতেছে, সে জরায়ু ঐ থলিয়া, আর যে 'জরায়ু' পরে পড়ুক্ বলা হইতেছে, সে 'জরায়ু' অমরা।

প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক পঞ্চমসূক্ত সমাপ্ত।

শ্রী————ভারতী

মনোবিজ্ঞান-বিষয়িনী নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২। নৈতিক বিচারের পদ্ধতি।

পরে, নৈতিক বিচারের পদ্ধতি বিষয়ে আমরা মনঃসংযোগ করিব এবং কিরূপে মনের আবেগ ও প্রবৃত্তিনিচয় নিরূপিত হইয়া থাকে তাহাও স্থির করিব। কোন-না-কোন পদ্ধতি অবশ্যই আছে। প্রত্যেক সিদ্ধান্তে অনুরাগ, প্রত্যেক অনুরাগেই উপমা, প্রত্যেক উপমাতেই উপমা-লক্ষিত বস্তু ও তাহাদিগের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের মূল কারণগুলি সূচিত হইয়া থাকে। এই-গুলির ব্যাখ্যা করিলেই আমাদিগের বিচার-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক) স্বয়ংসিদ্ধ জীবনকে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে (মনের) পরস্পরবিরোধী বলের যুগপৎ বিদ্যমানতা ও সংঘর্ষণ আবশ্যক। দেহ ব্যতীত স্বপ্নের অনুভূতি হইত না। অন্যের প্রতিকূল (answering) মুখমণ্ডল ব্যতীত ব্যক্তিগত সত্তানুভূতি অপরিস্ফুট রহিত। আমাদিগের অন্তঃকরণে বিপরীত ভাবের আবেগ যুগপৎ আসিয়া দেখা দেয় এবং একটী ভাব অন্যটী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে—এবম্বিধ ব্যাপার যদি না ঘটিত, তাহা হইলে নৈতিক আত্মজ্ঞান নিদ্রিত থাকিয়া যাইত। মাত্র পার্থক্যই যে ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, তাহা নহে। কেননা, এরূপ দেখা যায় যে, আমাদের সম্মুখে বস্তুনিচয়ের মধ্যে হয় ত পার্থক্য যুগপৎ অবস্থিত রহিয়াছে, অথচ তাহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া অনুভব হইতেছে না; যখন তাহাদের মধ্যে গতির সঞ্চার হওয়ায় তাহাদের নীরবতা-ভঙ্গ হইয়া যায়, কেবল তখনই তাহাদের পার্থক্যটুকু আমাদের চ'খে পড়ে। আবার এমতও হইয়া থাকে যে, হয় ত প্রগাঢ় আবেগচয় পর ২ আমাদিগকে চাপিয়া বসিতে পারে, অথচ তাহাদের পার্থক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। যখন একটী আবেগ মনের মধ্যে উদিত হইয়া আস্তে ২ বিলীন হইয়া যায় এবং পরক্ষণেই আর একটী আসিয়া আমাদিগকে বেমালুম দখল করিয়া বসে, তখন আবেগ দুটীর পার্থক্য আমাদের মনে আসে না। আমাদিগের প্রকৃতিগত একটী স্থায়ী "শান্তিভঙ্গ" ঘটিলে এবং আমাদিগের অধীর অনুরাগগুলি যুগপৎ মনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রবল হইবার ইচ্ছায় একটী অপরটীকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত গোলমাল আরম্ভ করিলেই আমাদিগের পূর্ব্বাবস্থার (অননুভূতি অবস্থার) ব্যতিক্রম হয়। "পার্থক্যটুকু যখন বিবাদে আসিয়া দাঁড়ায়," তখনই স্বতঃপ্রবৃত্তি ও আত্মজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী সরণি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহাই বোধ হয় হীরাক্লিটসের (Heracleitus এর) বিখ্যাত বিচার-বাক্য-নিহিত অর্থাংশ। সেই প্রসিদ্ধ বিচার-বাক্যটী এই :—"বিবাদই যাবতীয় বস্তুর জনক"। প্রতিকুল বস্তুর সংঘর্ষ না হইলে, কোন-কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না, এতদ্বাক্য-প্রয়োগ করিবার সময় মনে হয়, হীরাক্লিটস্ আধ্যাত্মিক জগৎ অপেক্ষা ব্যবহারিক জগতের দিকেই অধিকতর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ঐ মূল-বাক্যটী আমাদিগের নৈতিক জীবনের ঘটনাবলীর পক্ষে বেশ সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। যতক্ষণ না দুইটী বিসদৃশ প্রবৃত্তি আমাদিগের জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিরোধ আরম্ভ করে, ততক্ষণ আমরা উহাদের পার্থক্য পরিজ্ঞাত হইতে বা উহাদের মধ্যে একটী

বিচার করিয়া বসিতে পারি না। যাই আমরা এই বিবদমান অবস্থাটী উপলব্ধি করিতে পারি, অমনি উহাদের একটা তুলনা আমাদের মনে আসিয়া পড়ে। সে তুলনা মাত্র একটা আতিশয্য বা গুণানুযায়ী বৈচিত্র সম্বন্ধীয় নহে। উহা উচ্চ ও মৃদু কিম্বা লোহিত ও উগ্র শব্দগুলির পার্থক্য-সদৃশ নহে। ঐ তুলনা প্রকাশ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ পদাবলি আবশ্যক। সে পদাবলি এইরূপ হওয়া চাই ঃ—এটী অন্যটী অপেক্ষা "উচ্চতর," "যোগ্যতর"; তুলনায় আমরা এইটীরই সম্পূর্ণরূপ "পক্ষপাতী"। ঈদৃশী অনুভূতি (নৈতিক বিচার) যে আমাদিগের একটা পরোক্ষ আবিষ্কার (বিচার-বিতণ্ডা-প্রসূত ব্যাপার), তাহা নহে; আমরা উহার একটা বিবরণও দিতে পারি। উহা আমাদিগের আদি-শক্তিনিচয়ের অনুভবে পর্য্যন্ত সদ্যঃ অন্তর্নিরূঢ়, উহা আমাদিগের প্রবৃত্তিগুলি হইতে অবিশ্লেষ্য। রঙ্গ-ভূমিতে (অর্থাৎ মনের ভিতর) প্রবৃত্তিগুলি একত্র উদিত হইবা মাত্রই সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি উহাদের আপন ২ মূল্য ও নিদর্শন অবগত হইতে পারেন। উদাহরণ দেখ;—মনে কর, একটী বালকের খুব মোরব্বা খাইবার লোভ আছে। উহাকে যেন মোরব্বার ঘরে একাকী রাখা হইয়াছে। তখন সে ঐ পরীক্ষা-স্থানে কি করে? হয়ত প্রলুব্ধ হইয়া মোরব্বা খাইতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু খাওয়া হইবামাত্রই তাহার মনে হয় যে ক্ষুধা-শান্তি করিতে যাইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলা হইল। ইহা মনে হওয়ায় তাহার অনুতাপ আসিয়া পড়ে। তখন তাহার মনে হয় "পৃথিবী আমাকে গ্রাস করুক।" সদ্ভাব অপেক্ষা ক্ষুধা তখন হীনতর বলিয়া মনে হইতে থাকে। একটী ক্রোধী বালক ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া হয় ত অচেতন পদার্থের উপরও ক্রোধ ব্যক্ত করিয়া বসে। যাহাতে তাহার অভিপ্রায়-সিদ্ধির বাধা জন্মে, তাহার উপরেই ক্রোধ! হয়তো সে ঘুরিল না বলিয়া কন্দুকটী ভাঙ্গিয়া ফেলিল; হয়তো মাছধরা ছিপের সূতায় গাঁইট পড়ার দরুণ সে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। এ সব করিয়াও, "অন্যায় কাজ করিয়াছি" বলিয়া তাহার মনে হইল না। কিন্তু তাহার ঐ ক্রোধবেগ যদি তাহার ভগিনীর উপর যাইয়া পড়িত এবং যদি ঐ ভগিনী আহত হইয়া কাঁদিতে ২ তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইত, তবে তখনই অনুতাপ-প্রভাবে সে বুঝিতে পারিত যে ক্রোধ অপেক্ষা স্নেহ কত উচ্চতর সামগ্রী। মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই যে উৎসটী পাইল তাহারই জল পান করিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি এক জন সঙ্গী থাকিত এবং ঐ সঙ্গী যদি জ্বরে মূর্চ্ছিত ও মৃতপ্রায় হইত, তবে সে নিশ্চয়ই

নিজে ঐ শীতল জল পান না করিয়া সেই মুর্চ্ছিত সঙ্গীর মুখের কাছে উহা ধরিত। তখন নিশ্চয়ই পিপাসা অপেক্ষা সহানুভূতির শক্তি প্রকাশ পাইত। উদাহরণস্বরূপ যে কয়টী স্থলের নির্দ্দেশ করা হইল, আমার মতে ঐ গুলি নৈতিক অনুভবের প্রকৃষ্ট স্থল। ঐ সকল স্থলে মাত্র এক একটা প্রবৃত্তির অধীন হইলে মানুষ অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বিকই একটা কিছু করিয়া ফেলে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রবৃত্তি প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় প্রথম প্রবৃত্তি যথেচ্ছাচারিণী হইতে পারে না। প্রবৃত্তিগুলির সন্নিকর্ষ ও বৈসাদৃশ্য ঘটিলেই হইল; তাহা হইলে আর কিছুরই আবশ্যক নাই। এরূপক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও গবেষণার আর প্রয়োজন হয় না। উহারা রাজ-যোটক। (choice of Hercules.) এখানে বিচার-আচার নাই; উহাদিগকে দেখিবামাত্রই উহাদের দাবি স্থিরীকৃত হইয়া যায়। আমরা উহাদিগের প্রত্যেকটীরই অনুসরণ করিতে পারি না। আমরা কোনটীরই অধিকার ও স্থান সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারি না। উহাদিগের "যুগপৎ উপস্থিতি" হইতে উহাদের "নৈতিক নিরূপিত মূল্য" সহজেই আসিয়া পড়ে।

এখানে একটী যুক্তি-সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে যে, আমাদিগের বিবদমান কার্য্যোৎস-গুলির সম্বন্ধ যে সকল শব্দে বর্ণনা করা হয় তাহা সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে এবং অর্দ্ধ অস্পষ্ট। "উচ্চতর" ও "নিম্নতর" শব্দে উহাদের তুলনা করা হইয়া থাকে; ঐ শব্দ দুইটী আপেক্ষিক। উহাদের একটু বিশেষত্বও আছে। উহাদের স্বরূপ-ভাবার্থক "উচ্চ" ও "নিম্ন" শব্দ দুইটী "লোহিত" ও "কঠিন" শব্দ দু'টীর ন্যায় আমাদিগের মনে একটা বিজাতীয় ভাব আনয়ন করে না। উহাদের দ্বারা আমরা একই বস্তুর অল্পতা বা আধিক্য বুঝিয়া থাকি। উহাতে আমরা একই পর্য্যায়ে থাকি, কেবল আপেক্ষিকের বন্ধনটা ঘাড়ে করি মাত্র। ইহাই শব্দ দু'টীর বিশেষত্ব। যেন একটী প্রকাণ্ড চিহ্নিত বস্তু বিদ্যমান আছে। "উচ্চ" আমাদিগকে ঐ বস্তুর এক প্রান্তে এবং "নিম্ন" উহার অন্য প্রান্তে লইয়া যায়। তাহা হইলে ঐ বস্তুটীর কি নামকরণ হইতে পারে? ঐ বস্তুটীর গাত্রে পরিমাণ বা গুণের যে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, আমরা ঐ গুলির কি নাম নির্দ্দেশ করিতে পারি? ঐ উচ্চতা কোন ভৌতিক উচ্চতা নহে। উহা কাজেকাজেই আমাদিগের কার্য্যোৎস-গুলির অন্তর্নিহিত কোন-কিছুর উপর অবস্থিত। উচ্চতার পারম্পর্য্যের সহিত ঐ কোন-কিছুরও পরিবর্ত্তন ঘটে এবং আমাদিগকেও ভাবান্তরিত করে। ঐ কোন-কিছু জিনিসটী কি, যতক্ষণ তাহা

স্থিরীকৃত না হইবে, ততক্ষণ "অধিক" বা "ন্যূন" শব্দ দুটী নিরর্থক হইয়া থাকিবে।

আমি এই আপত্তি ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। ইহার খণ্ডন করা যে সুকঠিন, তাহাও অস্বীকার করি না। একটী বস্তুর "গুণ" সম্বন্ধে প্রশ্ন করা অর্থ উহা আমাদিগকে কিরূপ-ভাবে ভাবান্তরিত করে তাহাই জিজ্ঞাসা করা—অর্থাৎ ঐরূপ প্রশ্নে বুঝিতে হইবে যে ঐ বস্তুর বিদ্যমানতা বা ধারণা হইতে আমাদিগের নিজের হৃদ্‌গত ভাব কিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। "কার্য্যোৎস"ই এখানে আমাদিগের বস্তু। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, কার্য্যোৎস-গুলির পূর্ণমাত্রায় আমাদিগের কিরূপ ভাব হইলে আমরা প্রাগুক্ত বর্ণনায় ব্যবহৃত তুলনা-বাচক-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি? যদি আমি (ক)—প্রবৃত্তিটীর অনুসরণ করি, (খ)—প্রবৃত্তিটীর অনুসরণ না করি, আমার মনন তবে "উচ্চতর" হইবে—কোন্ গণনা-পদ্ধতি অনুসারে?—সুখের? তাহা নহে; কেননা, তাহা হইলে আমি নিঃসংকোচে অপহৃত মোরব্বা উপভোগ করিতে পারিতাম; তখন আমার লজ্জা আসিয়া দেখা দিত না। সৌন্দর্য্যের?—তাহাও নহে; কারণ, যদিও আমার ইচ্ছা হয় যে আমার নাকটী "খ্যাঁদা" না হইয়া বেশ পূর্ণায়ত হইলেই ভাল হইত, তবুও আমার খ্যাঁদা নাক্ বলিয়া আমার কোনরূপ অপ্রীতি-কর ভাব মনে আসে না। আমি কেবল বলিতে চাই যে, ঐ সকল জিনিস (সুখ ও সৌন্দর্য্য) ভাল হইলেও, ঐ ভাল অন্য প্রকারের; উহার পরিমাণেই আমাদের ভাবান্তর হইতে পারে, অন্য কিছুতে নহে। যদি উহাদের পরিমাণে কর্ত্তব্য-জ্ঞান, ন্যায়ান্যায়-বোধ, নৈতিক মূল্য-বোধ সূচিত হয় এবং উহাতে যদি এরূপ জ্ঞানের উদয় হয় যে আমি সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও (খ)—নামক প্রবৃত্তির অনুসরণ "স্বাধীনভাবে করিতে পারি না," তবে তাহাতেই আমাদের ভাবান্তর হইতে পারে। কিন্তু প্রাগুক্ত বস্তুর ঐ প্রকার কোন ইঙ্গিত নাই। তাই বলিতেছি যে, ডিগ্রী বা ক্রম বুঝিতে হইলে আমরা কর্ত্তব্য-পরায়ণতার, সরলতার ও রীত্যনুসারিতারই বুঝিয়া থাকি। এই শব্দগুলির উপলক্ষিত অর্থ সম্বন্ধে আমি অধ্যাপক সিজ্‌উইকের, (Sidg-wick) সঙ্গে একমত। তিনি তাঁহার "মন" নামক গ্রন্থের ২৮ অধ্যায়ে, ৫৮০—৮১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে ঐ সকল শব্দের উপলক্ষিত অর্থই—নৈতিক মূল্য। তাঁহার মতে এই "নৈতিক মূল্য" ন্যায়-অন্যায়-বিষয়িনী ধারণা ও চিন্তার প্রকৃষ্ট ফল এবং নৈতিক জ্ঞানের পক্ষে উহা "অদ্বিতীয় ও অবিশ্লেষ্য"। প্রাগুক্ত উপলক্ষিত অর্থটী ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, "নৈতিক মূল্য" শব্দই

সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়; কেননা, (১) উহাতে মূল্যের একটা ক্রম প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং (২) উহা অন্যায়-প্রবেশাত্মক ভাব-সমাবেশ-বর্জ্জিত। স্বতন্ত্র সমস্যা ও বিশেষ স্থলে দুইটী দিক্ আছে—একটী ভাল, অপরটী মন্দ। সেখানে "কর্ত্তব্যকর্ম্ম" ও "ন্যায়" শব্দ দুটী এমত অভ্যস্তভাবে ব্যবহৃত হয় যে তদ্দ্বারা প্রত্যেক পৃথক্ নৈতিক অনুভূতিটীর দুইটী বিরুদ্ধ ভাব অতি সহজেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং নৈতিক ভাব-সমাবেশের সমগ্র প্রণালীটীর মধ্যেও আপেক্ষিক উৎকর্ষাতিশয্য সহজে অভিব্যক্ত হয় না। 'সদ্গুণ' (Virtue) শব্দটী অতীব আকর্ষক; কেননা, উহাতে অগণিত ক্রম-সংখ্যা থাকিতে পারে। কিন্তু শব্দটীতে দুই প্রকার অসুবিধা ঘটেঃ—উহার ক্রম গুলি সমাবস্থাপন্ন (neutral) স্থল হইতে শুধুই উর্দ্ধদিকে হইতে থাকে। তখন উহাদিগের গৃহীত মূল্য—প্রকাশার্থ তামাদিগকে পৃথক্ ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; (২) উহাতে (সদ্গুণ শব্দে) একটী "স্বতন্ত্র গুণের" ধারণা আসিয়া পড়ে। অর্থটা তখন অনেকটা "বীরোচিত-ভাবের" কাছে আসে। যেখানে প্রলোভনের পরিমাণ মোটামুটি অপেক্ষা অধিক, সেই সকল বিশেষ ২ স্থলেই উহা প্রধানতঃ ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

কার্য্যাংসের গুণ (অধ্যাপক সিজউইক্ বলেন "কার্য্যের গুণ") অদ্বিতীয়, অবিশ্লেষ্য। যতক্ষণ একটী বস্তু অসংশ্লিষ্ট থাকে, ততক্ষণ ঐ গুণ প্রকাশ পায় না। অন্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা কি অসাধারণ ব্যাপার? আমাদিগের ভৌতিক জীবনেও ঈদৃশী অনুভূতি অপরিজ্ঞাত নহে। উদাহরণ দেখ—আমাদিগের দেহের ও বহির্দ্দেশের তাপ যদি সর্ব্বদাই এক প্রকার থাকে, তবে আমরা উত্তাপ বলিয়া একটী পদার্থের ধারণা করিতে পারি না। সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম হইলেই উত্তাপের অস্তিত্বানুভূতি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নৈতিক গুণও যে শুধু আমাদিগের সহিত বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ-সম্ভূত, তাহা নহে। উহা "দুইটী বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ-সাপেক্ষ"। সঙ্গিহীন ব্যক্তির কল্পনা ব্যতীত যেমন সমাজের কল্পনা হয় না, বক্রোদরের ধারণা ভিন্ন যেরূপ ন্যুব্জাকারের ধারণা হয় না, তদ্রূপ প্রাগুক্ত দুইটী বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত নৈতিক গুণ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ, যে গুণটী আমরা অন্বেষণ করি, তাহা বাস্তবিকই একটী দ্রব্যে থাকে না; তাহা জোড়ার মধ্যেই অবস্থান করে। উহা এরূপভাবে না থাকিলে শুধু যে উহাকে জানা যাইত না তাহা নহে, উহা থাকিতেই পারিত না।

(২) ইহা যদি আমাদিগের মৌলিক আত্মবিচারের প্রকৃত তথ্য হয়, তাহা হইলে নৈতিক মতের সমগ্র প্রণালীটি ইহাতে উপলব্ধি করা যাইবে। প্রথম প্রবৃত্তি-যুগল প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ উদিত হইয়া যদি তাহাদিগের আপেক্ষিক মূল্য প্রকাশ করে, তবে পরবর্ত্তী প্রবৃত্তিচয়ও তাহাই করিবে। প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে অসংশ্লিষ্টভাবে অনুভব করিলে তাহার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক ভাব পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যেকটীকে উহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহারও একটা আপেক্ষিক স্থান ও দাবি আছে। তখন উহাও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত হয়। যখন মৌলিক অনুভবের বৃত্তটী পর্য্যটন করিয়া আসা শেষ হয়, যখন যাবতীয় কার্য্যোৎসগুলির পরস্পরের ক্রিয়া-কলাপ অনুভূত হইয়া যায়, যখন উহাদের নৈতিক বিনিময় শেষ হইয়া যায়, তখন আমরা আমাদিগের অন্তঃকরণে কার্য্য-নিয়ামক বিধির একটা সম্পূর্ণ মাপ প্রস্তুত করিবার উপাদান প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ঐ মাপে নৈতিক মর্য্যাদার ক্রম পরিব্যক্ত হয়। আমাদিগকে কেবল বিশেষ ২ সমাবেশের বিক্ষিপ্ত ফল সংগ্রহ করিতে এবং সেই গুলিকে গুণানুসারে উচ্চ হইতে উচ্চতরভাবে সাজাইয়া রাখিতে হয়। দৈববাণীর বিক্ষিপ্ত পত্রগুলিকে এইরূপে যথাযথ সজ্জিত করিয়া আমরা সুব্যবস্থিত পারমার্থিক-সংহিতা প্রণয়ন করি। তাবৎ কার্য্যের উপাদান-পুঞ্জ সংগ্রহ করিতে যে বহুদিন আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ভাবে চলিলে তখন অনেকটা কার্য্যের নিকট আসা যায়; নচেৎ শুধুই অসম্পূর্ণ সঙ্কল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কারণ, মানুষের স্বভাবই এই যে জীবনের এক তৃতীয়াংশ কালেরও অধিক কাল পর্য্যন্ত তাহার অন্তঃকরণে নূতন ২ কার্য্যোৎস দেখা দেয় বা নূতন ২ ভাবে তাহার চরিত্র স্পষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গেও তাহার আধ্যাত্মিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহাতে তাহার আরও বিশুদ্ধতর ও কৃত্রিম অভাব-পুঞ্জ দেখা দেয়, সঙ্গে ২ জটিল প্রবৃত্তি-নিচয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন নানা প্রকার প্রক্ষেপ ও ব্যাপ্তিতে অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি, আমাদিগের প্রদর্শিত সূত্রানুসরণ করিলে এবং মানব-প্রবৃত্তির যথার্থ শাসন উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে একটা নৈতিক অবধারণ-সঙ্কল্পের সূত্রপাত হইতে পারে। কিন্তু এই সূত্রটী যদি একবার হস্তচ্যুত হইয়া যায়, যদি আমরা ভ্রমবশতঃ ধারণা করিয়া বসি যে আমাদিগের প্রকৃতি শক্তি-নিচয়ের সমষ্টি নহে কিন্তু উহা কতিপয় স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী প্রবৃত্তির অধীন, অথবা

যদি আমরা উহার (প্রকৃতির) আভ্যন্তরীণ কার্য্যোৎসগুলিকে প্রজা-তন্ত্রবৎ মনে করি, যদি মনে করি, ওখানে যাচব তন্ত্র-ব্যাপার আদৌ নাই, তাহা হইলে নৈতিক মতগুলির কৈফিয়ৎ দেওয়া বা বিশদভাবে উহাদের সমর্থন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। নৈতিক-কার্য্য-বিধির সমগ্র মূলটী এই কয়টী কথায় বিদ্যমান রহিয়াছে ঃ—আমাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে ক্রম-অঙ্কিত উৎকর্ষের একটা মাপ আছে ; তাহা আমরা অবগত আছি। ঐ মাপ উহাদিগের গুরুত্ব-বিধায়িনী প্রণালী হইতে সম্পূর্ণরূপ স্বতন্ত্র ; উহা ঐ প্রবৃত্তি-গুলির বাহ্য প্রভাব-সীমা সম্বন্ধেও নিরপেক্ষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীভগবৎ-করুণা।

কত ভালবাস তুমি থাকি অন্তরালে,
কভু নাহি ভাবি তাহা পড়ি মায়াজালে!
তব অপার করুণা যার নাহিক তুলনা-
মনে হ'লে ভাসি সদা নয়নের জলে,
এমন দয়াল ধনে আছি আমি ভুলে!

জননী-জঠরে যবে ছিলাম কঠোরে
হেট্ মুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে ঘোর অন্ধকারে,
তুমিই তখন হরি, কৃপাবলে রক্ষা করি
আনিলে এ ভব-ধামে অপূর্ব্ব কৌশলে ;
তব সম দয়া কা'র অবনীমণ্ডলে!

জনম হইলে পরে প্রাণ-রক্ষা-তরে
রাখিয়াছ সুধা তুমি মাতৃ-স্তন পূরে,
জনক-জননী-হৃদি মায়া দয়া স্নেহ আদি
রেখেছ প্রবল করি পালন-কারণ,
কে বুঝে এ খেলা তব জগৎ-জীবন!

ঘৃণা লজ্জা ভোগ-সুখ সব পরিহরি
পালিছেন মাতা সদা প্রাণপণ করি
সন্তান-মঙ্গল-তরে　　নানা কষ্ট সহ্য ক'রে ;—
দুঃখে সুখ-জ্ঞান মূল মায়ার বন্ধন,
তুমি যে তাহার মূল অনাদিকারণ !

ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে নরনারীগণ
প্রবৃত্তির পথে সদা করে বিচরণ ;
মায়া মোহ স্বার্থ স্মরি　　সদা উচ্চ আশা করি
পদে পদে পড়ে ঘোর বিপদ্ মাঝারে,
দয়া করি রক্ষ তুমি থাকি অগোচরে।

আধিব্যাধি নিরবধি, কতই যাতনা
পায় নর ভবধামে পাসরি আপনা—
তুমি করুণা বিতরি　　সদা তাহে রক্ষা করি
উপদেশ দাও হৃদে বিবেক-সঞ্চারে,
তবু নাহি বুঝে, তুমি হৃদয় মাঝারে !

সতত পালিছ তুমি দয়ার জলধি,
তোমার দয়ার প্রভু নাহিক অবধি,
যবে যাহা প্রয়োজন　　করি তাহা সংযোজন
যোগাইছ জীবগণে বিচিত্র বিধানে,
মনে তাহা নাহি ভাবি ডুবিয়' অজ্ঞানে।

(তাই)　এ মিনতি তব পদে ওহে দয়াময় !
জাগাও হৃদয়ে প্রেম, তুমি প্রেমময়,
তব নাম-সুধাপানে　　তব রূপ হেরি ধ্যানে
কাটাই জীবন যেন প্রেমের কাননে,
বাঁধিওনা আর হরি মায়ার বাঁধনে।

শ্রীবরদাকান্ত দে

ভিখারী।

আমি ভিখারী, ভিক্ষাই আমার সম্বল। এতকাল ধরিয়া প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা করিয়াছি, এখন দয়াময়! তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি; ভিক্ষা দিবে নাকি? মায়াবিনী প্রকৃতি এখনও ভিক্ষা দিতে চায়, কিন্তু, সে ভিক্ষায় ত এযাবৎ আশা মিটে নাই—পরিতৃপ্তি ঘটে নাই! অধিকন্তু অপূর্ণ বাসনার অরুন্তুদ পীড়ন ভোগ করিয়াছি। অন্ন মুষ্টিমেয়; ক্ষুধার সীমা নাই। বল দেখি প্রভো! ইহাতে কি ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে? যে খাণ্ডবানলে পুঞ্জ পুঞ্জ কাষ্ঠ দিলেও ভস্মীভূত হইয়া যায়, তুচ্ছ তৃণ-মুষ্টি তাহার কি করিবে? প্রকৃতির দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ক্ষুধা-পিপাসা মিটে না। পথে যত পথিক দেখিয়াছি, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, সকলেই এইরূপ অতৃপ্ত প্রাণে হতাশ মনে কাল কাটাইতেছে। এ রোগের ঔষধ কি, চিকিৎসক কে, কিছুই খুঁজিয়া পাই না। কত প্রলোভনের বস্তু দেখিয়াছি—ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আশা পূরে নাই, ক্ষুধা মিটে নাই। এতদিনে বুঝিয়াছি "নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং" সসীম জগৎ, ভোগ্য বস্তুও সসীম, একমাত্র তুমিই অসীম অনন্ত, আনন্দস্বরূপ। অল্পে সুখ নাই, এজগতে চিরদিন আশা অপূর্ণই থাকিবে। তাই, আজ তোমার নিকট ভিক্ষার্থী। তাড়াইয়া দাও সেও ভাল, ভিক্ষা দাও পরমলাভ। অল্পে আশা মিটে না—মিটিল না। শুনিয়াছি তুমি বিরাট্, তাই তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। সাধারণ ধনী, ভিখারীকে যে কিছু দান করে, প্রয়োজন-নির্ব্বাহে তাহা দু'দিনেই শেষ হইয়া যায়; পুনরায় ভিক্ষা ভিন্ন অন্য গতি থাকে না। কোন ধনীই চিরতরে অভাবের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে। শুনিয়াছি—তুমি তাহা পার, তাই তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। "যং লব্ধ্বা নাপরং লাভং মন্যতে চাধিকং ততঃ" এই কথা শুনিয়া আজ তোমার করুণাপূর্ণ দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। সাধারণ ধনীর মত তুচ্ছ ধন দিয়া ফিরাইয়া দিও না। যে ধন ফুরাইয়া যায়, তাহা আমি চাহি না। চিরদিন যাহা ভোগ করিতে পারি, তাহাই আমায় দাও; অকিঞ্চনে প্রবঞ্চনা করিও না। আমি দীন, শুনিয়াছি তুমি দীনবন্ধু, সেই আশাতেই আজ তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। দিলে তুমি অনেক দিতে পার, কেননা, তুমি ভূমা, তুমি মহান্, তুমি মুকুন্দ। অপুনরাবৃত্তিরূপ মুক্তি, সেও তোমার ইচ্ছাধীন। না না—তাহা চাহি না; চিনি,

চিনির আস্বাদ পায় না, সে জন্য চিনি হইতে চাহি না। আমি চাহি, তোমার সঙ্গজনিত প্রেমাস্বাদ। দিবে কি? যদি বল, "ভিখারীর যোগ্যতা কি? অযোগ্য ভিখারীকে দেই না।" তুমি বলিয়াছ,—

ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।

যাঁহারা সমদর্শী ও সাধু এবং আমার প্রতি আসক্তচিত্ত, তাঁহারা, সাধ্বী-স্ত্রী যেমন সৎপতিকে আয়ত্ত করেন, সেইরূপ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

এ কথায় বুঝা যায়, তোমার কৃপালাভ করিতে গেলে যোগ্যতা চাই। প্রেমিক হওয়া চাই, সাধু হওয়া চাই, সমদর্শী হওয়া চাই। আমি সে যোগ্যতার অধিকারী নই, তাহা জানি। আমার হৃদয় তোমার চরণ-সরোজে নিবদ্ধ নয়। আমি সাধু নই। আমি আজিও ইষ্টানিষ্ট-সম্পর্কে সুখ দুঃখ অনুভব করি। অভাব অভিযোগের তাড়নায় মুহ্যমান হই, সুতরাং সমদর্শী নই। কিন্তু প্রভো! তোমার ও কথা শুনিতে চাই না, কারণ আমি জানি ও মানি, তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, অগতির গতি। নাথ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি অজ্ঞ; তুমি পথ-প্রদর্শক আমি পথিক; তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি পিতা, আমি সন্তান; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি দয়ানিধি, আমি দয়াপ্রার্থী; তুমি সর্ব্বদ, আমি ভিখারী। তুমি দয়া না করিলে আর কে করিবে? তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, তুমি ভিক্ষা না দিলে কে দিবে? শুনিয়াছি, তৃণ হইতেও বিনত, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও নিজের মানে উদাসীন হইয়া অপরকে মান-দান করিতে পারিলে তোমার দ্বারে ভিক্ষা পাওয়া যায়, অজ্ঞ অক্ষম অধম আমি কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইব! ইন্দ্রিয়-বাজি-রাজি সহজে দুর্জ্জয়, আমার ক্ষীণ-শক্তি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি হৃষীকেশ—ইন্দ্রিয়াধিপতি, তুমি তাহাদিগকে সুপথে না ফিরাইলে কে ফিরাইবে? আমার কি সাধ্য যে ইন্দ্রিয়গণকে করায়ত্ত করিব, মনকে অধীন করিব, মান-অপমান সমান জ্ঞান করিব, পরোপকারে প্রাণ-দান করিব! আমি জানি—আমি অক্ষম, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত আমার উচ্ছাস-নিঃশ্বাসেও অধিকার নাই। আমাকে হাত ধরিয়া প্রকৃত পথে লইয়া চল; আমি তোমার কৃপায় কৃতার্থ হই। তুমি বলিয়াছ—"যাহারা অনন্যচিত্তে সতত আমার উপাসনা করে, আমি স্বয়ং তাহাদিগের যোগক্ষেম বহন করি—তোমার সেই কথা—অনন্যা-শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহা-ম্যহং—ইহাও আমার ভাল লাগে না। অনন্যচিত্ত নিত্যাভিযুক্ত ভক্তের প্রতি

কৃপা করিয়া তুমি নিজের 'দয়াময়' নামের মহিমা প্রচার কর না, ভক্তির জয়ই ঘোষণা কর। যে ভক্ত, সে ভক্তিগুণে তোমাকে বাঁধিবে। আমার মত অভক্তকে দয়া না করিলে তোমার 'দয়াময়' নাম অনর্থক।

ভক্ত হওয়া—সে ত তোমারই কৃপায়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ," তুমি নিজে ভক্তি না দিলে কেহ ভক্ত হইতে পারে না, তুমি ধরা না দিলে কেহ তোমাকে ধরিতেও পারে না। তুমি শান্তি-ধারা-বর্ষণে মরু-প্রাণ শীতল না করিলে শ্রান্ত অশক্ত জীবের আর কি উপায় আছে? তুমি ব্যতীত অবিচ্ছিন্ন-ধারে জীবের প্রতি আর কেহই করুণা-ধারা বর্ষণ করিতে পারে না। তুমি ব্যতীত জীবের অকারণ অকৈতব বন্ধু আর কে আছে? প্রভো! এই বিশ্বে যাহাদিগকে 'আপন' বলিয়া ভাবি, সকলেই কার্য্য-কারণ-সূত্রে হিতানুষ্ঠান করে। কিন্তু নাথ! তুমি, অবিরতধারে কারণ-নিরপেক্ষ হইয়া কৃপা-বারি-বর্ষণ করিয়া থাক। দয়াময়! তুমি পতিত-পাবন, তুমি এ পতিত জীবের উদ্ধার-সাধন না করিলে আর কে করিবে?

শুনিয়াছি, সর্ব্বত্যাগী না হইলে "ভিখারী" না হইলে তুমি দয়া কর না, তাই ভিখারী সাজিয়াছি। শুনিয়াছি, তুমি "ভিখারীর ধন" তাই আমি ভিখারী। যদি বল, "যুগ-যুগান্ত, ধ্যান, যাগ, যোগ, তপস্যা, যম, নিয়ম প্রত্যাহার, প্রাণা-য়াম প্রভৃতি দ্বারা মানব আমার দর্শন পায় না, আমি বাক্য-মনের অতীত, তর্কের অগম্য, বিনা সাধনায় তুমি সহজে কেমনে পাইবে?" সত্য কথা, কিন্তু নাথ! তুমি পরম দয়ালু, আমিও পরম ভিখারী। প্রকৃত দাতা প্রকৃত দরিদ্রকেই দান করেন। যাহারা যোগ-যাগে ধ্যান-জ্ঞানে ধনী, তাহারা ত যোগ-যাগ ধ্যান-জ্ঞানের বিনিময়ে তোমার কৃপা ক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ত তুমি ভিক্ষা দিবে না! ভিখারী আমার মত দরিদ্র তোমার দয়া-দানের পাত্র। তুমি বলিয়াছ—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থে আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি।" যদি তোমার এই কথাই সত্য হয়, তবে সাধু ভিন্ন অন্যের উপায় কি? অশিষ্ট সন্তানকে হিতার্থী পিতা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

তুমি বলিয়াছ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ!

অর্থাৎ "আমি বৈকুণ্ঠে, বা যোগি-হৃদয়ে বাস করি না, আমার ভক্তগণ যেখানে মদ্‌গুণ গান করেন, হে নারদ! আমি সেইখানে অবস্থান করি।" প্রভো! আমি ভক্ত নই, তোমার গুণ-গানও জানি না; তবে এ কথা ঠিক যে আকুল প্রাণে পুনঃ পুনঃ তোমাকে ডাকিয়া তোমার করুণা-ভিক্ষা করিতেছি। তুমি কি সাঁড়া দিবে না?

আমি ভিখারী, তুমি দাতা; কিসে আমার মঙ্গল হইবে, কি পাইলে আমি লাভবান্ হইব, তাহাও তুমিই জান। যাহা তোমার উচিত হয়, তাহাই কর। প্রার্থনা করা—ভিখারীর স্বধর্ম্ম। তুমি 'পরম কারুণিক' শুনিয়াই তোমার দ্বারে ছুটিয়া আসিয়াছি, দেখি তুমি কেমন দয়াময়। ভিখারীর আশা পূর্ণ না করু ক্ষতি নাই, ফিরিয়া যাইব,—আর বলিব, "তুমি দয়াম্বু নহ নিঠুর নির্ম্মম।" যদি বল "তোমার ভাগ্যে নাই, তা পাইবে কি?" বল প্রভো! সে ভাগ্যের নিয়ন্তা কে? আমার ভাগ্য আমি গড়িয়াছি—নিজ কর্ম্মফলে নিজে মজিয়াছি, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি কি তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না? আমি কে? তুমি ছাড়া 'আমি'র কার্য্যকারিতা কোথায়? তুমি কি 'আমি'র চালক নহ? আর যদি তুমি আমার ভাগ্যে এ দুর্ভোগের বিধান করিয়া থাক, তবে তুমি হয় পক্ষপাতী, নয় অবিবেচক। কেহ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে চামর-ব্যজনে প্রসুপ্ত, আমি দীন হীন ভূতলশায়ী,—এ পক্ষপাত তুমি করিতেই পার না; তুমি দয়াময়, তুমি পক্ষপাতী হইতে পার না। অবিবেচনাও তোমাতে নাই, কারণ তুমি সর্ব্বজ্ঞ। প্রভো! আমারই কর্ম্মফল যদি ইহার হেতু হয়, তবে এই ভীষণ কর্ম্মফলের কটুবিপাক হইতে নিরুপায় আমাকে হাত ধরিয়া উদ্ধার কর, রক্ষা কর। অন্য কেহ পারে না, পারিবে না। মাত্র তুমিই পার, তাই তোমার করুণা ভিক্ষা করিতেছি। অজামিলের বেলায় পারিয়াছ, রত্নাকরের বেলায় পারিয়াছ, জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছ, আর আমার বেলায় তোমার দয়ার সাগর শুষ্ক হইবে? অসম্ভব। তাই তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।

অশক্ত, অনুপায় অপরাধীর প্রতি ক্ষমা-প্রকাশই মহতের মহত্ব। তুমি সর্ব্বমহত্তম, তোমার অপার করুণা! তাহা না হইলে বিপদে পড়িয়া লোকে তোমাকে "বিপদ্‌ভঞ্জন" বলিয়া ডাকিবে কেন? ভয়ে অভয়, বিপদে ত্রাণ, নিরাশায় আশ্বাস, বিপদে উদ্ধার, আর্ত্তে করুণা এ সব তোমারই গুণ। তাই জগদ্বাসী বিপদে সম্পদে প্রাণখুলিয়া তোমায় ডাকে। তুমি প্রত্যক্ষভাবে

হউক্ বা অপ্রত্যক্ষভাবে হউক্, তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর। যাচক তোমার দ্বারদেশ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না, ব্যথিতচিত্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যায় না, যায় নাই, যাইবে না। তুমি বরদ, তুমি সর্ব্বদ, তুমি মুকুন্দ, তুমি কৃপা-কল্পতরু। তোমার চরণোপান্তে দীন-মনোভৃঙ্গ, মকরন্দ-নিঃস্যন্দ-বিন্দু-পানের দুরাশা লইয়া বিচরণ করে। ভিখারী বড় আশা লইয়া আসিয়াছে। আশা আছে, অবশ্যই একদিন ভিখারীর আশা পূর্ণ হইবে।

আসিবার দিন আসিয়াছি শূন্য হস্তে, যাইবার দিনেরও যদি সেই ব্যবস্থা হয়, তবে পথের সম্বল মিলিবে কোথায়? দীর্ঘ পথ, বিনা সম্বলে দুর্ব্বল-প্রাণে যাওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বে কিছু দিয়াছ কিনা মনে হয় না, যদি দিয়া থাক, তাহা অনবধানে হারাইয়া ফেলিয়াছি। তুমি দীননাথ! তাই আজ এ দীন ভিখারী তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে। প্রভো! এবার এমন কিছু দাও, যেন আর পুনরায় কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে না হয়। যাহা পাইলে অন্য প্রাপ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাই দাও; এমন করিয়া দাও, যাহাতে আর চাহিতে না হয়। আকুল প্রাণে তোমার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি অন্তর্যামী, কিসে আমার আশা পূর্ণ হইবে, তাহা তুমিই জান। যাহা "তোমার যোগ্য" হয়, তাহাই দাও, "আমার যোগ্য" দিও না। কারণ দাতার যোগ্য দানই প্রশংসার। আমি তোমার উপর নির্ভর করিলাম, কারণ আমি ভিখারী।

শ্রীআগুনাথ কাব্যতীর্থ।

প্রভাতে।

নীহার-জড়িত— অহো! ফুলরাশি
পড়িয়াছে কা'র চরণে?
পত্রনেত্র হ'তে ঝরে অশ্রুধারা—
প্রভাতে বা কা'র কারণে?
শাখি-শাখে বসি নির্ভর হরষে
মধুরে পাখী কি গাইছে?
কা'র স্তুতি-গীতি মানব-সমাজে
ধীর সমীর বহিছে?

কাহার চরণে　　দিতে পুষ্পাঞ্জলি
কাননে কুসুম ফুটিছে ?
প্রশান্ত তটিনী,　　কুলু কুলু নাদে,
কা'র বা চরণে ধাইছে ?
নৈশ স্বপন　　পাশরি মানব
কেন বা শয়ন ত্যজিছে ?
ফুল্ল পাদপ　　ফুল্ল লতিকা
কেন বা কাননে শোভিছে ?
কেন, কা'র্ তরে,　　সাজে নিতি নিতি
প্রকৃতি বিবিধ ভূষাতে ?
কোথা সেই জন ?　　কে জানে কেমন !
(তা) হৃদয় কেন সে তৃষাতে !

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

আর্য্যব্যবহার-নীতি।

(১)

প্রাচীন হিন্দু-জাতির ব্যবহার-নীতি ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ অপৌরুষেয় এবং স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র বেদমূলক।

বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমানত্বাৎ তৎপরিগ্রহ দার্ঢ্যতঃ।
সংভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং বেদমূলতা॥

অর্থাৎ শ্রুতিই স্মৃতির মূল, যে হেতু বৈদিকগণ স্মৃতি-সংরক্ষণ ও পরিগ্রহণ করিয়াছেন এবং স্মৃতি সকল বেদমূলক বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রকৃত পক্ষে স্মৃতিগ্রন্থ সকলের আদিসৃষ্টির কাল ও স্রষ্টার প্রকার নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ব্যবহারশাস্ত্রের জননী "রোমীয় ব্যবহার-নীতি" যেরূপ "টুয়েল্ভ্ টেবল্স্" বা দ্বাদশলিপি নামক কোনও মানব-রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ভূত, আর্য্য-ব্যবহার-শাস্ত্র সেরূপ কোনও ব্যক্তিবিশেষের কৃত গ্রন্থ-প্রসূত বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। প্রাচীনকালে রোমীয় নৃপতিগণ ও বিচারকগণ, আইনের প্রবর্ত্তক ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টির সহিত আইন্-নির্ম্মাণের জন্য 'কমিটিয়া' বা

সমিতির সৃষ্টি হয় এবং পরবর্ত্তীকালে সম্রাড়্গণ তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় প্রবর্ত্তিত ব্যবহার-নীতি সংগ্রহ করতঃ 'কোড্' বা বিধিবদ্ধ আইনগ্রন্থ আকারে প্রচার করিতেন। সম্ভবতঃ অস্মদ্দেশে এরূপ কোন 'কোড্' বা বিধিবদ্ধ আইনগ্রন্থ ছিল না। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ নৃপতির ন্যায় ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা ছিলেন। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, অপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রযোজক। ঋষিগণ একই গ্রন্থে উপাসনা, গুরুসেবা, প্রায়শ্চিত্ত-বিধান এবং শাসন-পদ্ধতি প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। এই জন্য স্মৃতিশাস্ত্র তিন অংশ বা খণ্ডে বিভক্ত, যথা, আচার অর্থাৎ অন্নাশন উপনয়ন বিবাহাদি, ব্যবহার অর্থাৎ লৌকিক শাসন-পদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপপ্রক্ষালনার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-বিধি। ঋষিগণ এ সমস্তেরই একত্র আলোচনা করিয়াছেন।

যে সকল স্মৃতিগ্রন্থ ইদানীং প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মনু-সংহিতা অতি প্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। মহর্ষি মনুর দ্বাদশ-অধ্যায়বিশিষ্ট স্মৃতিগ্রন্থে ঐ তিন বিষয়েরই সমাবেশ আছে। প্রথম অধ্যায়ে মুনিগণ মনুর নিকট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মনু তাহার প্রতিবচন করিতেছেন। তৎপর সৃষ্টি-প্রকরণ কথিত হইলে মহর্ষি মনুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহামুনি ভৃগু, মানব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পরে দৈবাদিকাল-নির্ণয়, বর্ণধর্ম্ম কথন ও গ্রন্থানুক্রমণিকা আছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিবাহ, ব্রাহ্মাদি ভেদে অষ্টপ্রকার বিবাহ ও তাহার লক্ষণ সকল, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার ও শ্রাদ্ধাদির কর্ত্তব্যতা বর্ণিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিলোঞ্ছাদি জীবনোপায়, গার্হস্থ্য-নিয়ম-বর্ণনা ও পঞ্চম অধ্যায়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিবেক, অশৌচনির্ণয়, দ্রব্য-শুদ্ধি এবং যোষিদ্ধর্ম্ম কি, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে আশ্রম-ধর্ম্মানুশাসন, সপ্তমে রাজ-ধর্ম্ম-কথন ও রাজ্য-রক্ষার্থ যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অষ্টম অধ্যায়ে ব্যবহারদর্শন-নিয়ম, অষ্টাদশ বিবাদ-পদাদি-কথন, সাক্ষি-বিবরণ, দণ্ডনির্ণয় ও রাজদণ্ডের পাপনাশকতা কথিত আছে। অতঃপর নবম অধ্যায়ে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্মবিবেচন, দায়-বিভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্যাদি-নিবারণের উপায়, বৈশ্য-শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দশম অধ্যায়ে সঙ্করজাতির উৎপত্তি, বর্ণ চতুষ্টয়ের বিপৎকালীন বৃত্তিবিধান, একাদশে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি এবং দ্বাদশে কর্ম্মের জন্মান্তর-কারণতা এবং জ্ঞানের মোক্ষসাধকতা বর্ণিত আছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধি আছে, তাহাও আচার, ব্যবহার ও

প্রায়শ্চিত্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইউরোপীয় পণ্ডিত মর্লি, উইলসন্ প্রভৃতি ইহার প্রকৃত বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থ খানিতে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই পৃথক্ তিন অধ্যায় যোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট। এই সংহিতা ও তাহার মিতাক্ষরা-নাম্নী টীকা ভারতবাসী বহু হিন্দুর নিকট বাধ্যকর আইনরূপে প্রচলিত আছে। বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, নারদ ও বৃহস্পতি-সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে আচার ও প্রায়শ্চিত্তের সহিত প্রকৃত ব্যবহারশাস্ত্রের আলোচনা আছে। হারীত, উশনা অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদিগের সংহিতায় আচার ও প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন ব্যবহার-খণ্ডের কোন আলোচনা নাই। স্মৃতিগ্রন্থ হইতে ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি যতদূর অবগত হইতে পারা যায়, তাহাতে প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে ইদানীন্তন সুসভ্যজাতিগণের প্রবর্ত্তিত আইন্ সকলের মূলসূত্র গুলি যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব।

ধর্ম্মাধিকরণ।

পুরাকালে নৃপতি স্বয়ং বিচারক ছিলেন। মনু বলেন, ব্যবহার-দর্শনেচ্ছু রাজা, ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণের সহিত বিনীত ভাবে "ধর্ম্মাধিকরণ" সভায় প্রবেশ করিবেন। নৃপতি স্বয়ং অপারগ হইলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য-দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, তিন জন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিত-ভাবে রাজকার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিবেন। আর্য্যগণের মধ্যে বিচারালয়েও বর্ণধর্ম্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। মনু বলেন, রাজা অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি-বর্ণক্রমে অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। স্বয়ং নৃপতির ধর্ম্মাধিকরণ সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় কুল, শ্রেণী ও পূগ এই তিন প্রকার গ্রাম্য বিচারালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কুল' শব্দের অর্থ জ্ঞাতি বা স্বশ্রেণীর লোক, 'শ্রেণী' অর্থাৎ বণিক্-সমিতি অথবা বিশিস্ট ব্যক্তিগণের সমিতি, পূগ অর্থাৎ নাগরিক-সমিতি। এই সকল সমিতি, নৃপতি কর্ত্তৃক সৃস্ট না হইলেও তাহাদিগের বিচার বাধ্যকর বিবেচিত হইত। এই সকল সমিতি "গ্রাম্য সালিশে"র কার্য্য করিত। ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়েও এরূপ সালিশের বিচার গ্রহণ করিবার বিধান আছে। এই সকল সমিতি, বিসম্বাদের উৎপত্তি-স্থলে বর্ত্তমান থাকায় অর্থিপ্রত্যর্থিগণের প্রকৃত বিসম্বাদের বিষয়, প্রকার ও অবস্থা সহজে ও সুচারুরূপে নির্ণয় করিতে পারিত, সে বিষয় অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে

পারে না। 'কুলে'র বিচারে অসন্তুষ্ট অর্থী অথবা প্রত্যর্থী 'শ্রেণী'র নিকট বিচার-প্রার্থনা করিতে পারিতেন, 'শ্রেণী'র বিচারে ভ্রম ঘটিলে 'পূগ' তাহার সংশোধন করিতেন, সর্ব্বোপরি স্বয়ং নৃপতির ধর্ম্মাধিকরণ বিদ্যমান ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, স্ত্রী-লোকের বিচার, সশঙ্ক বিচারকের বিচার, রাত্রিকালে আবদ্ধ-গৃহে অথবা গ্রামের বহির্ভাগে যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা নৃপতি রহিত করিতে পারিতেন।

নারদ-সংহিতায় 'কুল' 'শ্রেণী' 'গণ' এই তিন প্রকার গ্রাম্য বিচারালয়, নৃপতির ধর্ম্মাধিকরণের অধস্তন বিচারালয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন রাজ্য মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয় সকল বিদ্যমান ছিল। মহর্ষিবৃহস্পতির সংহিতায় চতুর্বিধ বিচারালয়ের নির্দ্দেশ আছে, যথা—

প্রতিষ্ঠিতাপ্রতিষ্ঠিতা মুদ্রিতা শাসিতা তথা।
চতুর্বিধা সভা প্রোক্তা সভ্যাশ্চৈব তথাবিধাঃ॥

প্রতিষ্ঠিতা, অপ্রতিষ্ঠিতা, মুদ্রিতা ও শাসিতা এই চতুর্বিধ বিচারালয় পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল। প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ নগরের স্থায়ী—বিচারালয় এবং অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ গতিশীল বিচারালয় বা Circuit courts. সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে ইহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। নৃপতির প্রধান-বিচারপতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বিচারালয়ের নাম মুদ্রিতা এবং স্বয়ং নৃপতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বিচারালয়—শাসিতা নামে অভিহিত। বর্ত্তমানকালে ভারতবাসীর পক্ষে হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিল্ শেষোক্ত দুই বিচারালয়ের স্থানীয় মনে করিলে দোষ হইবে না। কুলাদি শালিশের আদালত এবং প্রতিষ্ঠিতা প্রভৃতি নৃপতি নির্দ্দিষ্ট বিচারালয়ে সাহস অর্থাৎ গুরুতর অপরাধ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রকার অপরাধ ও বিসম্বাদের বিচার ও মীমাংসা হইতে পারিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, বি এল্.।

জন ও নির্জ্জন।

ভক্ত, পুত্র মিত্র প্রভৃতি 'জন'ও চা'ন্ না। তবে কি নির্জ্জন বনে না গেলে ভক্তের চলিবে না? ভগবান্ কি গাছে বৃথাই লতা-পাতা, ফুল-ফল, ডাল-পালা দিয়াছেন? গৃহস্থাশ্রম স্বজন-মিলনের ক্ষেত্র, যদি স্বজন চাহিতে গেলে ভক্ত

হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কি গৃহস্থেরা ভগবৎ-কৃপায় বঞ্চিত থাকিবে? চিন্তার কথা বটে! গৃহস্থই ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর আশ্রয়। ভগবান্ ব্যাস-দেব বলিয়াছেন, মাতৃস্তন্য-পানে যেমন জীবগণ জীবন ধারণ করে, তেমনি গৃহস্থের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়াই ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী প্রাণধারণ করে ও সাধন-তরুর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় কাল কাটায়। গৃহস্থ ভিন্ন অন্য সকলেই ভিক্ষাজীবী, কিন্তু ভিক্ষা দেয় কে? যে গৃহস্থ সকল আশ্রমীর আশ্রয়স্থল, যাহার অভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের সম্বল ফুরাইয়া যায়, সে গৃহস্থের প্রতি কি ভগবানের অকৃপা হইতে পারে? গৃহস্থ থাকিলে জনবৃদ্ধি অনিবার্য্য, কারণ গৃহস্থের পক্ষে পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্যকর্ম্ম। শাস্ত্র বলেন "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্ত ত্রায়তে পিতরং সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতিখ্যাতঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। 'পুং' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই সন্তানের নাম 'পুত্র'। যে পুত্র নরক-বারক, সে কি হিতকারক নয়? শাস্ত্র আরও বলেন "অপুত্রস্য গতির্নাস্তি অপুত্রস্যা-ফলং কুলম্। অধোগতিরপুত্রস্য ভবতীত্যনুশুশ্রুমঃ॥ পুত্রহীনের সদ্‌গতি হয় না; তাহার কুল নিষ্ফল, প্রত্যুত অপুত্রক লোকের অধোগতি হয়।" পুত্র-পৌত্রা-দির প্রদত্ত জলপিণ্ড পরলোকের সম্বল, ইহাও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভক্তি-শাস্ত্রে দেখা যায় "মোদন্তে দেবতা নৃত্যন্তি পিতরঃ সনাথাচেয়ং ভূর্ভবতি।" অর্থাৎ যদি কোথায়ও কৃষ্ণভক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে দেবগণ আনন্দ লাভ করেন, পিতৃ-পুরুষগণ প্রীতিভরে নৃত্য করিতে থাকেন, পৃথিবী নিজেকে সনাথা মনে করেন। পুত্র-পৌত্রাদি যখন প্রকৃতই উপকারক, তখন ত উপেক্ষার পাত্র নহে। সম্বন্ধি-স্বজনেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, পোষ্যবর্গ স্বর্গদ্বারের কুঞ্চিকা (চাবী)। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পোষ্য-পালনে স্বর্গলাভ হয়। যখন জনে এত প্রয়ো-জন, তখন জন চাই না কেন?

এই একদিকের কথা। অপরদিকে বিবেকীরা বলেন—নির্জ্জনেই ভজন জমে, পুত্র মিত্র স্বজন সবই বন্ধনের কারণ, বিশেষতঃ পুত্রের মত শত্রু আর নাই। বিরাগী কবি গাহিয়াছেন—"পুত্রঃ স্যাদিতি দুঃখিতঃ সতি সুতে তস্যাময়ে দুঃখিতঃ। তদ্দুঃখাদিকমার্জ্জনে তদনয়ে তন্মৌর্খ্যতো দুঃখিতঃ। জাতশ্চেৎ সগুণো-২থ তন্মৃতিভয়ং তস্মিন্ মৃতে দুঃখিতঃ। পুত্রব্যাজমুপাগতো রিপুরয়ং মা কস্য-চিজ্জায়তাম্।" অপুত্রক অবস্থায় নানা দুঃখ, কিসে পুত্র জন্মিবে এই চিন্তায় অপুত্রকের মন নিতান্ত ক্লান্ত থাকে। পুত্র জন্মিলে পরে পুত্রের পীড়ার দুশ্চিন্তায় দারুণ দুর্ভোগে দুঃখ। পুত্রের দুঃখ দূর করিতে শত ক্লেশ, সে

এক বিশেষ দুঃখ! অবিনীত পুত্রের দুর্ব্যবহারে প্রতিপদে দুঃখ। পুত্র মূর্খ হইলে দুঃখ-ক্ষোভের সীমা থাকে না। দৈবক্রমে যদি পুত্রটী জ্ঞানে গুণে উৎকৃষ্ট হয়, তখন তাহার মরণের ভয়ে অশান্তির সীমা থাকে না। যদি দুর্ভাগ্য-দোষে গুণবান্ পুত্র কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে পিতামাতার অসহ্য শোক-দুঃখ উপস্থিত হয়। সে ভীষণ শোক না মরিলে ফুরায় না, সে মর্ম্ম-জ্বালা অপেক্ষা বুঝি তুষানলও শীতল! হায়! যে পুত্রের জন্য এত দুঃখ, সে কি শত্রু না মিত্র? যখন পুত্রই দুঃখদায়ক, তখন আর স্বজনগণের কথা কি? এই সকল স্বজন-স্বগণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই মানুষ সংসারের সেবা করে; পরাৎপরকে বিস্মৃত হয়। সুতরাং 'জন' যখন সাধন-ভজনের উপকরণ নয়, পরন্তু উপসর্গস্বরূপ, তখন "জন চাই না" বলাইত ঠিক্।

দুই পক্ষের দুই মত ও দুই পথ। দুই মতের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সাধুদের ইঙ্গিত এইরূপ যে, অবস্থা-বিশেষে জন গ্রাহ্যও বটে, ত্যাজ্যও বটে। জন যদি একেবারেই চাই না, নির্জ্জনই চাই, তবে অমূল্য সাধু-সঙ্গও ত পাই না; আর গুরু-কৃপাই বা কিরূপে পাই? সাধু গুরু ইঁহারাও ত জন। তবে কিনা ইঁহারা সুজন, সুপথ দেখাইয়া দেন, আর যে সকল স্বজন মায়ামন্ত্রে ভুলাইয়া ভজনে বাধা দেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ দুর্জ্জন। সুজন-সঙ্গ-গ্রহণ ও দুর্জ্জন-সঙ্গ-ত্যাগ করিলেই গোল চুকিয়া যায়। সৎ পুত্র, সতী স্ত্রী, সাধু স্বজন ত সর্ব্বনাশের কারণ নয়! পুত্র মিত্র বন্ধনের কারণ নয়, পুত্রমিত্রাদিতে যে মমতা বা আসক্তি, তাহাই বন্ধনের সূত্র। পুত্রে মিত্রে মমতা হয়, শত্রুতে ত হয় না! স্বজনে মমতা ত্যাগ করিলে পুত্র, মিত্র, শত্রু সব সমান হইয়া যায়, তখন আর পুত্র প্রভৃতিতে ভজনের বাধা দেয় না। যাহার কাছে পক্ষপাতের স্থান নাই, শত্রু-মিত্রের সমান মান, আত্মীয় অনাত্মীয়ের তুল্য আদর, তাহার কাছে সবই স্বজন অথবা সবই পরজন। তিনি শত সন্তানের পিতা ও সহস্র সুহৃদের স্বজন হইয়াও ইষ্টবস্তু হইতে ভ্রষ্ট হন না। তিনি জন চান, কিন্তু মমতা চা'ন না। আর জ্ঞানী সাধক একেবারেই জন চান না। তিনি সমস্ত সংসার ভস্মমুষ্টির মত তুচ্ছ মনে করেন, আর ভক্তিকে মুক্তাহারের ন্যায় বহুমূল্য বিবেচনা করেন। সেই-ভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়াছেন "ধন জন চাই না, কেবলা ভক্তিই চাই।"

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

-০:*:০-

পরপারে।

(১)

ডাকিছ কে তুমি পুরুষ সুন্দর !
ব্যাকুল করিয়া আমার অন্তর,
শোনা যায় তব স্নেহ মাখা স্বর—
"আয় আয় তোরা পরপারে আয়।

(২)

কি এক নবীন ভাবে আত্মহারা
হৃদয়ে উঠিছে সুখের ফোয়ারা ;
মধু-স্বরে করি মন মাতোয়ারা
কে তুমি ডাকি'ছ যাইতে কোথায়

(৩)

কোন্ দূরদেশে তোমার আলয় ?
বীণার ঝঙ্কারে মাতাও হৃদয়
কিসের লাগিয়া যাইব সেথায়
ছাড়িয়া সুখের মরত-ভবন ?

(৪)

আছে কি সেথায় উজল তপন ?
প্রভাতে মধুর বিহগ-কূজন ?
আছে কি সেথায় মলয়-পবন
ধীরে ধীরে যাহা জুড়ায় জীবন ?

(৫)

আছে কি সেথায় সরসী সুন্দর
কেলি করে যেথা' চারু জলচর ?
কমলিনী-পাশে গুঞ্জরে ভ্রমর ?
কুঞ্জ-কাননে কোকিলের তান ?

(৬)

আছে কি সেথায় গিরি শোভাময় ?
শৈবলিনী শোভা-বৈভবে কি বয় ?
প্রকৃতি-বৈচিত্র্য আছে কি সেথায়
কবি-হৃদে যাহা শান্তি করে দান ?

(৭)

সাগর-তরঙ্গ-ভঙ্গ বিভীষণ,
তারকা-খচিত সুনীল গগন
প্রেমিক-ভুলান' শোভার সদন
ভাবুকের ভাব গভীর নিশীথে,—

(৮)

সুখে দুঃখে সঙ্গী আত্মীয় স্বজন,
স্নেহ-মাখা মোর মায়ের বচন,
প্রাণের সুহৃদ্ অমূল্য রতন,
পাব কি এ সব তোমার দেশেতে ?

(৯)

"বলি শুন তবে ভ্রান্ত তুমি নর ;—
এদেশে ওদেশে প্রভূত অন্তর ,
স্বপনে রচিত অতিমনোহর,
এ দেব-ললিত-লীলা-নিকেতন !

(১০)

বিরাজে হেথায় সতত বসন্ত ;
নন্দন-বিহগ বর্ষে স্বরানন্দ ;
মন্দাকিনী সুধা বহি মৃদু মন্দ
আনন্দে ভরে স্বরগ-ভবন !

(১১)

প্রেম-পুণ্যময় এদেশ সুন্দর ;
মায়ামোহশূন্য দিব্য মনোহর ;
কল্পনারো তব এ যে অগোচর
এ দেব-ললিত-লীলা-নিকেতন।

(১২)

যাঁর কৃপাবিন্দু জগৎ-জীবন,
অনন্ত-ইচ্ছায় শশী তারাগণ
বিকাশে আকাশে উজ্জল তপন
বিধিমতে কার্য্য করিছে সাধন !

(১৩)

চির শান্তি আহা ! বিরাজে হেথায় ;
হেথা এ'লে লোক দুঃখ নাহি পায় ;
বিষয়-বাসনা সব মিটে যায় ;
এমনি যে এই শান্তি-নিকেতন ।

(১৪)

নাহিক উদ্বেগ, নাহিক কামনা,
নাহি ব্যাকুলতা, নাহিক ভাবনা,
না আছে হেথায় বিচ্ছেদ-যাতনা,
নিরাশ-প্রেমের উদাস জীবন !

(১৫)

হেথায় আসিয়া পান করি' সুধা
রহিবে না আর ভব-তৃষ্ণা-ক্ষুধা ;
ঘুচে যাবে যত শত শত বাধা
পূজিতে দয়াল প্রভুর চরণ ।

(১৬)

তাই ! আসিবে যদি হে ভাবুক সুজন !
প্রেমিকের এই প্রেম-নিকেতন !
কর প্রেম-ভরে আত্ম-সমর্পণ
সেবিতে—লভিতে বিভুর চরণ ।”

(১৭)

“ধন্য তুমি আহা পুরুষ-প্রবর !
ভালবাস, তাই করুণা-সাগর !
দিব্য চক্ষু দিলে করিয়া আদর
ভক্তি-অর্ঘ্য দিতে বিভুর চরণে ।

(১৮)

হে দয়ালু হরি দীন-দয়াময় !
দিব্যজ্ঞান তব দাও হে আমায়,
দাও ভক্তি-শক্তি তব করুণায়
ধাইতে তোমার ঐ চরণ-পানে।

(১৯)

ত্যজিব সকল বিষয়-বাসনা,
ভুলিব সকল ভবের কামনা,
সহিব না আর হেথা প্রতারণা,
মন যে আমার তোমা পানে টানে।

(২০)

রহিব না আর সমাজ-শ্মশানে,
আকুল আবেশে প্রবেশি গহনে
মনের বেদনা ক'ব সমীরণে
ঊর্দ্ধমুখে চাহি তোমার পানে।

(২১)

সাগরের কূলে হেরিব বিরলে
কত শত ঊর্ম্মি মিশিতে অতলে ;
ভাসিব আপনি নয়নের জলে
পরাণ উঠিবে পুলকে ভরি'।

(২২)

তাই বলি, আয় প্রেমিক সুজন !
প্রেমিকের প্রেমে ভাসায়ে জীবন
লভিতে দয়াল বিভুর চরণ
মুখে একবার বল হরি হরি !!"

শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রথম ইংরাজ-পর্য্যাটক ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার।

[লণ্ডনের বণিক্ মাষ্টার রালফ্ ফীচ্ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপোলি, সিরিয়া, অর্ম্মাজ, গোয়া, কাম্বে এবং মহাপরাক্রান্ত মোগল-বাদশাহ জেলালুদ্দিন্ আকবরের রাজ্য ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে বঙ্গদেশ, বাকলা, রাজা চাঁদরায়ের রাজ্য, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা, সিংহল, কোচীন এবং পূর্ব্ব ভারতবর্ষের উপকূলভাগ পর্য্যটন করিয়া ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ফীচের পূর্ব্বে অন্য কোন ইংরাজ এই সকল স্থান পরিদর্শন করেন নাই। ফীচের বৃত্তান্ত হইতে আমরা এদেশের তাৎকালিক প্রচলিত আচার-ব্যবহার উদ্ধৃত করিলাম।]

"এতদ্দেশে অনেকগুলি অদ্ভুত আচার প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণগণই ইহাদের পুরোহিত। ইহারা জল মধ্যে আসিয়া নানারূপ আচার-সহকারে গলদেশে সূত্র-স্থাপন এবং উভয় হস্তে জল নিক্ষেপ করে। ঐ সূত্র প্রথমে দুই হস্ত দ্বারা এবং পরে এক হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করে। শীত—গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই ইহারা অবগাহন করে। এই সকল হিন্দুগণ কদাপি মাংসাহার বা প্রাণিহত্যা করে না। ইহারা তণ্ডুল, মাখন, দুগ্ধ ও ফল—ভক্ষণে জীবন-ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জলমধ্যে উলঙ্গাবস্থায় প্রার্থনা করে, এবং উলঙ্গ হইয়াই মাংস-রন্ধন ও আহার করে। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইহারা মৃত্তিকোপরি শয়ন করে, এবং গাত্রোত্থান করিয়া ৩০ কি ৪০ বার সূর্য্যের দিকে হস্তোত্তোলন করে, পরে হস্ত ও পদ বিস্তৃত করিয়া এবং বামপদের পূর্ব্বে দক্ষিণ পদ রাখিয়া পৃথিবীকে চুম্বন করে। যখনই ইহারা শয়ন করে, তখনই ইহারা সীমানির্দ্দেশার্থ অঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকায় চিহ্ন স্থাপন করে। ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কপোল-দেশে, কর্ণে এবং গলদেশে পীতবর্ণের মৃত্তিকা লেপন করে। ইহারা এই মৃত্তিকা চূর্ণ করে এবং প্রত্যহ প্রাতে ঐরূপ লেপন করে। ইহাদেরই কয়েকজন বৃদ্ধ ঐরূপ পীতবর্ণের মৃত্তিকা আধারে লইয়া রাজপথে গমন করে এবং যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের মস্তকে ও গলদেশে লেপন করে। ইহাদের পত্নীগণ, ১০, ২০, কি ৩০ জন একত্রে দলবদ্ধ হইয়া নদীতীরে গমন করে এবং তথায় স্নান ও অন্যান্য আচার-সমাপনান্তে কপালে এবং মুখে চিহ্ন করে এবং কিছু মৃত্তিকা সঙ্গে করিয়া গমন

করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের কন্যাগণ বিবাহিতা হয়। পুরুষগণের সাতটী স্ত্রী থাকিতে পারে। ইহারা ইহুদীগণ অপেক্ষাও ধূর্ত্ত। যখন একে অপরকে নমস্কার করে, তখন হস্তোত্তোলন করতঃ "রাম" "রাম" বলে।

আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসিবার কালে আমি যখন প্রয়াগে উপনীত হই, তখন দেখি, সেই স্থানে যমুনা, গঙ্গানাম্নী এক মহতী নদীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে। ইহার পরে আর যমুনার নাম শ্রুত হওয়া যায় না। গঙ্গা, উত্তর-পশ্চিম হইতে বহির্গতা হইয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে। এতদ্দেশে যথেষ্ট ব্যাঘ্র, তিত্তির, ঘুঘু ও নানা প্রকার কুক্কুট পাওয়া যায়। এই স্থানে অনেক উলঙ্গ ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা উহাদিগকে "সন্ন্যাসী" বলে এবং বিশেষরূপে সম্মান করে। আমি একটী সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলাম—সে অন্যান্যের ন্যায় একটী বিকটাকার জন্তুবিশেষ। সে অঙ্গে কিছুই পরিধান করিতে চাহিত না; তাহার দাড়ী অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং তাহার সুদীর্ঘ কেশদ্বারা সে তাহার শরীরের কতকাংশ আবৃত করিয়া রাখিত। তাহার অঙ্গুলীর দুই একখানি নখ দুই ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল; কারণ, সে তাহার নখের কোন অংশই ছেদন করিত না। তাহার সঙ্গে আট কি দশজন শিষ্য থাকিত এবং তাহারাই উহার হইয়া কথোপকথন করিত। যখন কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিত, তখন সে তাহার বক্ষস্থলে নিজ হস্ত স্থাপন করিত, কিন্তু কোন কথা কহিত না। এমন কি, সে রাজার সহিতও কথোপকথন করিত না। আমরা প্রয়াগ হইতে নৌকাপথে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, গঙ্গা এই স্থানে অত্যন্ত প্রশস্তা। এই স্থানে নানাবিধ মৎস্য, বন্য কুক্কুট, হংস, সারস এবং অন্যান্য পক্ষী পাওয়া যায়। এই প্রদেশ অত্যন্ত উর্ব্বর এবং জঙ্গলাকীর্ণ। এতদ্দেশীয় পুরুষগণের অধিকাংশেরই মুখমণ্ডল শ্মশ্রুশূন্য; ইহাদের অনেকেরই মস্তক দীর্ঘ। কাহারও কাহারও মস্তকের চূড়া ব্যতীত অন্যান্যাংশ মুণ্ডিত। এই গঙ্গা নদীতে অনেক দ্বীপ আছে। গঙ্গার জল সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল উর্ব্বর।

প্রয়াগ হইতে আমরা বারাণসীতে আগমন করি। ইহাও একটী বৃহৎ নগর এবং এই স্থানে কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই স্থানের সকল অধিবাসীই হিন্দু এবং আমি কদাপি ইহাদের মত পৌত্তলিক দেখি নাই। বহু দূর দেশ হইতে হিন্দুগণ এই স্থানে তীর্থ-দর্শনার্থ সমাগত হয়।

নদীতীরে বহু পরিমাণে সুন্দর সুন্দর গৃহ সকল দৃষ্ট হয় এবং সাধারণতঃ সকল গৃহেই দণ্ডায়মান দেব-মূর্ত্তি বিদ্যমান। মূর্ত্তিগুলি প্রস্তর বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। গৃহগুলির ন্যায় মূর্ত্তিগুলি কিন্তু সুন্দর নহে। সে গুলি সিংহ ব্যাঘ্র বা হনুমানের ন্যায় পশ্বাকার। কতকগুলি আবার পুরুষ, স্ত্রী বা ময়ূরের ন্যায়; কতকগুলি চারিহস্তবিশিষ্ট ভূতের ন্যায়। ইহাদের মস্তক যুগ্মাসনাসীন; কাহারও হস্তে এক দ্রব্য; অপরের হস্তে অন্য দ্রব্য। প্রাতঃকালে, এমন কি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেও স্ত্রী-পুরুষগণ নগর হইতে আসিয়া গঙ্গায় অবগাহন করে। অনেকগুলি বৃদ্ধ মৃত্তিকার উপর উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করে এবং যাত্রীদিগকে তিনটী কি চারিটী করিয়া খড় প্রদান করে। এই সকল যাত্রী ঐ খড়গুলি অঙ্গুলী-মধ্যে স্থাপন করিয়া গঙ্গায় অবগাহন করে। কেহ কেহ কপোলদেশ চিত্রিত করিবার জন্য উপবেশন করে। ইহারা বস্ত্র মধ্যে তণ্ডুল যব অথবা অর্থ রক্ষা করে ও স্নানান্তে প্রার্থনারত বৃদ্ধগণকে উহা দান করে। দানান্তে বৃদ্ধগণ ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করে এবং ইহাতেই সকলে পবিত্র হয়। পরে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির নিকট গমন করিয়া পূজা করে। নানা স্থানে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে, ইহারা তাহাদিগকে 'হর' বলে। বৃহৎ বৃহৎ নানারূপ খোদিত প্রস্তরের উপরে ইহারা জলদান করে এবং এই সকল প্রস্তরের উপরে ইহারা তণ্ডুল গম যব এবং অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করে। এই হর-দেবতার নখবিশিষ্ট চারিটী হস্ত আছে। এই সকল মূর্ত্তি ব্যতীত ইহাদের অবরোহণী-বিশিষ্ট একটী পবিত্র কূপ আছে। এই কূপের জল অত্যন্ত মলিন এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট, কারণ, ইহাতে অনবরত যে প্রচুর পুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতেই ইহার জল ঐরূপ দুর্গন্ধবিশিষ্ট না হইয়া পারে না, তথাপি সর্ব্বদাই ইহাতে লোক অবগাহন করে। কারণ, ইহারা বলে যে, ইহাতে স্বয়ং ভগবান্ স্নান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ইহাতে অবগাহন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহারা ঐ কূপ হইতে বালুকা সংগ্রহ করে। এই বালুকাকে ইহারা বড় পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহারা জলমধ্যে ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই প্রার্থনা করে না। ইহারা অবগাহন-কালে হস্ত দ্বারা মস্তকের উপরে জল প্রদান করে। স্নানান্তে ইহারা তিনবার সামান্য পরিমাণে জলপান করে এবং পরে স্বগৃহস্থ-দেবতার নিকট গমন করে।

কেহ কেহ নিজের দৈর্ঘ্যানুযায়ী স্থান ধৌত-করণান্তর তথায় হস্তপদবিস্তার করতঃ শয়ানাবস্থায় প্রার্থনা করে এবং গাত্রোত্থান না করিয়া সেই মৃত্তিকা ২০।৩০ বার চুম্বন করে। কেহ কেহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৫টী ১৬টী পাত্র সহ পূজা করে

এবং পূজাকালে ক্ষুদ্র-ঘণ্টা-ধ্বনি করে। ইহারা পাত্রের চতুর্দ্দিকে জলের গণ্ডী প্রদান করিয়া পূজা করে। অনেকে ইহাদের নিকট উপবেশন করিয়া থাকে এবং একজন ঐ পাত্রগুলি পূজকের নিকট পৌছাইয়া দেয়। পূজকগণ পাত্রের উদ্দেশে নানা কথা বারংবার উচ্চারণ করে। ইহারা ইহাদের দেবতাদের নিকট গমন করে এবং তাহাদিগকে পূজা করে। পূজান্তে ইহারা নিকটবর্ত্তী সকলের কপোলদেশ চিহ্নিত করে। ইহা বিশেষ গৌরবজনক মনে করা হয়। অনেক সময় পঞ্চাশ, কোন কোন সময় এক শত জনও এই কূপে স্নানার্থ সমাগত হইয়া এই সকল দেবমূর্ত্তিকে পূজা করে।

ইহাদের গৃহে যে সকল দণ্ডায়মান দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে উহাদিগকে ব্যজন করা হয়। যাত্রী সমাগত হইলে তাহারা একটী ক্ষুদ্র দোলায়মান ঘণ্টার ধ্বনি করিতে থাকে এবং অনেকে ইহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করে। যাহারা দূর দেশ হইতে আগমন করে, তাহারা নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল দেবমূর্ত্তির অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণের এবং ইহাদের পিত্তল-নির্ম্মিত নথ আছে। কোন কোন মূর্ত্তি ময়ূরের উপর উপবিষ্ট থাকে, কোন মূর্ত্তি দীর্ঘ নখবিশিষ্ট কদাকার অন্যান্য পক্ষীর উপরেও স্থাপিত হইয়া থাকে। দেখিতে কোন মূর্ত্তিই সুন্দর নহে। সকলগুলিই দেখিতে বিভিন্নাকারের। একটী মূর্ত্তিকে ইহারা অন্যগুলি অপেক্ষা অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। কারণ, ইহারা বলে যে এই দেবতাই ইহাদিগকে সকল প্রকার খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে। একজন সর্ব্বদাই উহাকে ব্যজনী-হস্তে বাতাস করিতে থাকে। এই প্রদেশে মৃত ব্যক্তিগণ কেহ ভস্মীভূত হয়, কেহ অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় নদীতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কুক্কুর ও শৃগালগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আহার করে। এদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীগণ সহমৃতা হয়। যদি স্ত্রী সহমৃতা না হয়, তবে তাহার মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং পরে আর তাহার কোন অনুসন্ধানই লওয়া হয় না। কটী-দেশে সামান্য একটু বস্ত্র বন্ধন ব্যতীত অধিবাসীরা আর কোনরূপ বস্ত্র পরিধান করে না। স্ত্রীলোকগণের গলদেশে, হস্তে ও কর্ণে রৌপ্য, তাম্র ও টীনের অলঙ্কার ও অঙ্গুলীতে প্রস্তরসুশোভিত হস্তীদন্তের অঙ্গুরীয় শোভা পায়। ইহাদের কপালের মধ্যদেশ হইতে মস্তকের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয়। শীত ঋতুতে (আমাদের মে মাসে) পুরুষেরা তুলাপূর্ণ অঙ্গাবরণ ও আমাদের দেশীয় মুদীদের হামামদিস্তার ন্যায় মস্তকাবরণ ব্যবহার করে। মস্তকাবরণে ছিদ্র থাকে এবং কর্ণের নিম্নে বাঁধিবার জন্য সূত্র থাকে। যদি

কোন পুরুষ বা স্ত্রী পীড়িত হয় এবং তাহার জীবনের আশা না থাকে, তবে তাহাকে সমস্ত রাত্রি দেবতার নিকট রাখা হয়। ইহাতে হয় সে রক্ষা পায়, নয় তাহার মৃত্যু হয়। যদি সেই রাত্রিতে সে সুস্থ না হয়, তবে তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ সমাগত হইয়া তথায় কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া ক্রন্দন করে এবং পরে নলনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ভেলায় তাহাকে স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহকালে উভয়ে নদীতীরে গমন করে। নদীতীরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গাভী ও গোবৎস রাখা হয়। সেই বর, কন্যা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গাভী ও বৎস একত্রে জল মধ্যে গমন করে। বর কন্যা ব্রাহ্মণকে চারি-গজ-পরিমিত শুভ্র একখণ্ড বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্যপূর্ণ এক করণ্ড প্রদান করে। ব্রাহ্মণ বস্ত্রখানি গাভীর উপরে স্থাপন ও গাভীর পুচ্ছ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করে। কন্যার হস্তে জলপূর্ণ তাম্র বা পিত্তলের একটী পাত্র থাকে এবং বর ব্রাহ্মণের ও কন্যার হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকে এবং সকলেই গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া থাকে। গাভীর পুচ্ছের উপরে পাত্রস্থিত জল নিক্ষেপ করা হয় এবং এবম্প্রকারে ঐ জল সকলের হস্ত স্পর্শ করে। তখন ব্রাহ্মণ, বর ও কন্যার বস্ত্র একত্র বন্ধন করে। পরে, তাহারা গাভী ও গো-বৎস প্রদক্ষিণ করিয়া দরিদ্রগণকে যথাসাধ্য দান করে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গাভী ও গো-বৎস দান করে। অবশেষে স্ত্রী ও পুরুষ তাহাদের বিভিন্ন দেবতার নিকট গমন করিয়া অর্থদান ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণানন্তর মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। ইহাদের প্রধান দেবতা গুলি কৃষ্ণবর্ণের এবং দেখিতে অত্যন্ত কদাকার; বিকটাকার-মুখবিশিষ্ট, কর্ণ মণিমুক্তাযুক্ত; দন্ত ও চক্ষু রৌপ্য ও কাচ-নির্ম্মিত এবং হস্ত নানা দ্রব্য-পূর্ণ। পাদুকা পরিধান করিয়া দেব-মন্দিরে গমন নিষিদ্ধ। দেবমন্দিরে সর্ব্বদাই দীপ প্রজ্বলিত থাকে।”

বারান্তরে আমরা অপর এক ইউরোপীয় পর্য্যাটকের বিবরণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ।



পাপিয়া।

কেনরে পাপিয়া, বিজনে থাকিয়া
কানন ছাপিয়া তুলিছ তান?
কিসের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
হৃদয় ভাঙ্গিয়া গাহিছ গান!

থাকিয়া থাকিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া
কিসের লাগিয়া বেড়াও তুমি?
কিসের লাগিয়া ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া
করিছ ধ্বনিত কানন-ভূমি?

অরে বিহঙ্গম! কিসের কারণ
বদন তোমার বিষাদ-ভরা?
কি দারুণ দুঃখে কাঁদ থেকে থেকে
—হইয়াছ যেন পাগল-পারা!

আমি জানি পাখি, তুমি বড় সুখী
অনন্ত আকাশ তোমার দেশ,
শশাঙ্ক-তপন— তারকা-পবন—
সহিত হয়েছে যেখানে শেষ।

পত্র পুষ্প ফল সুশীতল জল
সৃজিয়াছে ধাতা তোমার তরে,
নাহি অধীনতা নাহি কোন ব্যথা
পাঠায়েছে ধাতা স্বাধীন ক'রে।

সংসার-গঞ্জনা রোগের তাড়না
শোকের যাতনা নাহিক মনে,
নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া খেলিয়া
পার বেড়াইতে প্রকৃতি-সনে।

ওরে হে পাপিয়া,　　কহ কি লাগিয়া
আকুল তোমার কোমল প্রাণ ?
বিরলে বসিয়া　　পরাণ দহিয়া
কেন তুমি গাও বিষাদ-গান !

কেন—কেন তুমি　　কাঁপায়ে মেদিনী
কাঁপায়ে আকাশ, দিবস-নিশি
শ্রবণ-বিবর　　করিয়া বিদার—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসাও দিশি ।

তবে কিহে পাখি,　　অলক্ষিতে থাকি
প্রাণ ভরি ধরি বিষাদ-তান,
দিগন্ত ব্যাপিয়া　　ভ্রমিছ কাঁদিয়া—
গাহিয়া আমার দুঃখের গান !

ধন্য বিহঙ্গম,　　ধন্য তব মন
ধন্য হে তোমার গানের মহিমা—
পরের লাগিয়া　　ফাঁটে যার হিয়া
ধরায় না হয় তাহার তুলনা !

বড় দুঃখী আমি　　তাই বুঝি তুমি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হতেছ সারা,
করি কণ্ঠ-ধ্বনি　　ভাসায়ে মেদিনী
ভ্রমিতেছ হ'য়ে আপন-হারা !

ধর তবে তান　　করুণার গান
ছড়াও কাতর কণ্ঠের ধ্বনি—
বিষের দাহন　　কর হে হরণ,
লব্ধ হোক্ শান্তি অমল মণি ।

হে বিহগবর,　　গাও বার বার
শুনি গো তোমার করুণ-গান—

যে গান ধ'রলে যে সুরে গাহিলে
জুড়াতে পারি এ তাপিত প্রাণ!

সব গেছে দূরে ফেলিয়া আমারে
লইয়া উদ্যম ভরসা-চয়—
না জানি পাপিয়া, কেমন করিয়া
আঁখি-নীরে বুক ভাসিয়া যায়!

সব গেছে পাখি শুধু আছে বাঁকী
নিভিত হিয়ার চিতার ধূম
সকলি যে গেল সকলি ফুরাল—
স্মৃতির কেবল হ'ল না ঘুম।

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ঈশ্বরের উপাসনা। হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব দ্বিতীয় ভাগ। গৌহাটীর সনাতন-ধর্ম্ম-সভা হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি এল্ কর্ত্তৃক প্রণীত, ডবল-ক্রাউন্ ১৬ পেজী আকারের ৯৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থ। গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মূল্য।০ চারি আনা। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি এল্ মহাশয় গৌহাটীর গবর্ণমেণ্ট প্লীডার। গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার মস্তকে লইয়াও শ্রীযুক্ত কালীচরণ বাবু শাস্ত্রচর্চ্চায় ও সমাজ-সেবায় পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহার যোগ্যতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। তাঁহার এই গ্রন্থের অনেকাংশই পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনই আমরা ঐ অংশকে প্রীতির নয়নে দেখিয়াছিলাম। এই গ্রন্থে উপাসনার আবশ্যকতা ও উপাসনার প্রণালী-পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। জীব, কিরূপে ভগবৎসত্তায় নিজের সত্তা ডুবাইয়া দিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া বাসনা-কামনার কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অতিক্রম

করিয়া পরমানন্দ-রাজ্যে উপনীত হইতে পারে, সেই কথাই শাস্ত্রীয় পথ অনুসরণ-পূর্ব্বক এ গ্রন্থে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রানুগত উপাসনা-প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গ্রন্থকার উপাস্য ও উপাসকের মিলন-কথা, মন্ত্রতত্ত্ব, জপরহস্য, ভক্তিতত্ত্ব, নামমাহাত্ম্য, পূজাতত্ত্ব, প্রতিমাবিধি, বলিবিধান, সাত্ত্বিকাদি ভাব-পরিচয় আহার-নিয়ম, উপবাস, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের সমন্বয় সাধন প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই সমস্ত গভীর বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবৃতি সম্ভব নয়, তবে সংক্ষেপে গ্রন্থকার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক ধর্ম্ম-প্রাণ পাঠকই উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, গ্রন্থখানি হিন্দু-সমাজে সমাদৃত হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

চতুষ্পাঠীর সৌভাগ্য। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সম্প্রতি চট্টগ্রাম বাণ্ডেলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে উক্ত চতুষ্পাঠীর উন্নতি-কল্পে এককালীন ২৫০৲ টাকা এবং মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দান করিতে আদেশ দিয়াছেন। বঙ্গেশ্বরের এই অনুগ্রহদান চতুষ্পাঠীর সৌভাগ্য-সূচক সন্দেহ নাই।

বন্যাবিপত্তি। সংবাদপত্রে প্রকাশ—ভীষণ বন্যায় কাছাড় জলময় হইয়া গিয়াছে। হাইলাকান্দি জেলা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। রাজপথে পদব্রজে চলিবার উপায় নাই। রেল বন্ধ, ডাক বন্ধ। জনগণ স্থানাভাবে অর্থাভাবে অন্নাভাবে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে, অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে। দারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত। চীনের কোয়ানটুং প্রদেশও এইরূপ ভীষণ বন্যাবিপ্লবে বিপন্ন, তথায়ও শস্যনাশ আশ্রয়-বিনাশ প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। ভগবান্ রক্ষা করুন। প্রকৃতি এ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিহার করুন।

ভাণ্ডার-বার্ত্তা। ইম্পিরিয়াল্ সাহায্য-ভাণ্ডারে ৯৬,৫০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ভাণ্ডার পূর্ণ হউক্।

ঋণ-কথা। রুস-কর্তৃপক্ষ লণ্ডনে ৭৫০০০০০০০৲ টাকা ঋণ-গ্রহণের কল্পনা করিয়াছেন। "ঋণ অল্পকাল মধ্যেই পরিশোধিত হইবে" এইরূপ সময়-বন্ধন-পূর্ব্বক ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, ঋণ 'প্রাক্সুখং' কিন্তু "দুঃখ নির্গমম্"। ইহাতে ঋণ-দাতার সুবিধাই সূচিত হয়।

—o—

জাতি-পরিচয়। বর্ত্তমানে বিচারালয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ও সাক্ষিগণের জাতি-পরিচয়-গ্রহণ প্রয়োজনীয় কিনা ইহা লইয়া দেশে আলোচনা চলিতেছে। জাতি-পরিচয়েই এদেশের লোক সাধারণতঃ পরিচিত হয়। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মাধিকরণে জাতি-পরিচয় প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত, পূর্ব্বে জাতি-পরিচয় অনুসারে ব্যবহার-সমূহের পূর্ব্বাপর-কর্ত্তব্যতা ও গুরুত্ব স্থিরীকৃত হইত। বর্ত্তমানকালের ব্যবহার-পদ্ধতিতে জাতি-পরিচয়ের স্থান নাই। উহা যখন সম্প্রতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না, তখন যে উহার প্রয়োজন ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—o—

ভাবান্তর। পত্রান্তরে প্রকাশ—পুরীর মোহান্ত মহাশয়েরা কেহ কেহ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। মন্দ কি? মোহান্ত মহাশয়গণ শাসকের পদ গ্রহণ করিয়া নূতন কিছু করিলেন মনে হয় না। স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহারা সমাজের শিক্ষক স্বরূপে একভাবে সমাজ-শাসকই ছিলেন। তবে কালধর্ম্মের মাহাত্ম্যে ভাবান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। এই যা কথা!

—o—

পদ-প্রাপ্তি। সংবাদ-পত্রে প্রচার—আরার গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় জ্বালাপ্রসাদ বাহাদুর পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যোগ্যতার সমাদর ও যোগ্যজনের অধিকার-লাভ সুখের কথাই বটে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা।	ভাদ্র।	১৩২২ সাল। ১৮৩৭ শকাব্দা।

মোক্ষ-তত্ত্ব।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। এই মোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সাধ্য। সংসারের উচ্ছেদ, জন্মমৃত্যু-কারণ অবিদ্যার নাশ ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। স্বর্গভোগে সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি, মোক্ষে চিরদিনের জন্য দুঃখ-নিবৃত্তি—ইহাই স্বর্গমোক্ষের পার্থক্য। আত্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দলাভ, অজ্ঞাননাশ, ঈশ্বর-সাযুজ্য-সারূপ্যাদিই মোক্ষ। চিরবন্ধন-মোচনের নামই মোক্ষ। "মুচ" বন্ধনমোচনে। মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংসার, অনাদিবাসনাজন্য মায়া—মোহ অহঙ্কার, অবিদ্যাকার্য্য জন্ম-মৃত্যু-জ্বালাযন্ত্রণা হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে পারাকেই মোক্ষ, মুক্তি বা নির্ব্বাণ বলে।

স্বর্গাদি প্রাপ্তব্য লোভনীয় বস্তু। মোক্ষ, স্বর্গাদির মত প্রাপ্তব্য বা লোভনীয় বস্তু নহে। যাহার প্রাপ্তি, তাহারই অপ্রাপ্তি—যাহার সংযোগ, তাহারই বিভাগ, যাহারই জন্ম, তাহারই নাশ আছে। প্রাপ্তব্য বস্তু হইলে মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়ে। মোক্ষপ্রাপ্তি মানিলেই তাহার অপ্রাপ্তি মানিতে হইবে। অপ্রাপ্তি থাকিলে মোক্ষ আর মোক্ষ থাকিল না, মুক্তি আর মুক্তি হইল না। ঐহিক ও পারত্রিক সকলকামনার নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ, স্বর্গাদির মত কিয়ৎকালস্থায়ী হইতে

পারে না। ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির পুণ্যকর্ম্ম ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে মর্ত্তে আসিতে বাধ্য করিবে।

বুদ্ধি ও আত্মা আলোক ও ছায়ার মত সর্ব্বদাই অবিবিক্তরূপে অবস্থিত। আলোক হইতে ছায়াকে যেমন পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞ অধীর ব্যক্তি কখনই আত্মা ও বুদ্ধির পার্থক্য বুঝিতে পারে না। জলমিশ্র দুগ্ধ হইতে জলকে পৃথক্ করিয়া দুগ্ধ পান করা হংসেরই কার্য্য। ধীর বিবেকী ব্যক্তিই আত্মা ও বুদ্ধির পার্থক্য বুঝিতে পারেন; বুঝিয়া অনায়াসেই প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয় আয়ত্ত করিতে পারেন।

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক। মন সংকল্পাত্মক ও বিকল্পাত্মক। "ইহা করিব"—সংকল্প। "ইহা করিতে পারি, নাও পারি"–বিকল্প। "ইহা নিশ্চয়ই করিব"—ইহাই নিশ্চয়। বুদ্ধি ও মন কোন কোন স্থলে পৃথক্‌রূপে অভিহিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে অভিন্নভাবে উদাহৃত হইয়াছে। সংকল্পই প্রধানতঃ মনের বৃত্তি। শ্রদ্ধা সংশয় ভয় প্রভৃতিও মনের বৃত্তি বলিয়া উল্লিখিত।

বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠতম অন্তরঙ্গরূপে বর্ত্তমান যে, বুদ্ধির ধর্ম্ম আত্মায়, আত্মার ভাব বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া থাকে। মন ও বুদ্ধির গুণগুলি আত্মায় আরাপ করিয়াই আত্মাকে বদ্ধরূপে বুঝিয়া থাকি। শরীরে আত্মার আরোপ করিয়া "কৃশ স্থূল" ইন্দ্রিয়ে আরোপ করিয়া "কালা কাণা" মন-বুদ্ধিতে আত্মার আরোপ করিয়া "সুখী দুঃখী" বলিয়া ব্যবহার করি। শুভ্র কাচখণ্ডে রক্তবর্ণের পদ্ম রাখিয়া দিলে দেখা যায়, ঐ শুভ্র কাচখণ্ড রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আত্মায় বুদ্ধির গুণ বা ধর্ম্ম সহজেই অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়া থাকে। বহুজন্মপরিচিত অবিবেকোত্থ ভ্রান্তি, নিবিড় বাসনাময় মিথ্যাজ্ঞানই বুদ্ধির ধর্ম্ম বা গুণকে আত্মধর্ম্ম বা আত্মগুণ বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে।

ভ্রান্তি যতই কেননা সত্যের আকারে প্রতিভাত হউক্, মিথ্যাজ্ঞান যতই কেননা সত্য-আবরণে আবৃত হইয়া দাঁড়া'ক্, কিন্তু ঐ ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান কোন মতেই সত্য হইবে না, যাহা তাহাই থাকিবে। আমরা বৃক্ষকে মানুষ ভাবিলে বৃক্ষ মানুষ হইয়া যাইবে না; আমরা মরীচিতে জল-ভ্রম করিলে উহা সত্য সত্যই জল হইবে না। বুদ্ধিরই বন্ধন, বুদ্ধিরই সংসার। আত্মা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববন্ধনাতীত।

অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা উপহিত অখণ্ড আত্মারই জীবাত্মা নাম। ঐ আত্মাই

এখন বহুজন্মোপচিত সংস্কাররাশির আবেষ্টনে বদ্ধ, তখনই মন বা বুদ্ধি। অখণ্ড আত্মার জীবাত্মত্ব, আর জীবাত্মার মনস্ত্ব—সবই অবিবেকোত্থ ধারণা, ভাবনা বা কল্পনা মাত্র। ঐ ধারণা, কল্পনা বা ভাবনা ব্যবহারিক সত্য, পারমার্থিক অসত্য। আমরা ব্যবহার-দশায় আসীন, আমাদের নিকট ব্যবহারদশাই এক্ষণে বাস্তব ঘনিষ্টরূপে পরিচিত, কাজেই সত্যবৎ প্রতিভাসিত। পারমার্থিক দশায় আমরা অবস্থিত নহি। পারমার্থিক সত্য-মিথ্যার বিচার বা ধারণা ব্যবহারিক অবস্থায় সম্ভব নহে। ব্যবহারতঃ জীব-বুদ্ধির অত্যন্ত নিকট উপলব্ধ রূপে অবস্থিত আত্মার উপর বুদ্ধিগুণ যে সহজেই অধ্যস্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহু-জন্মপরিচিত সংস্কার ও নিবিড়বাসনাময়ী অবিবেকোত্থ ভ্রান্তির জন্যই বুদ্ধির ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বুঝি, তৎফলেই আত্মার সংসার-ভাব।

ভ্রান্তি যতই কেননা সত্যের সাজে বাহির হউক্, মিথ্যা যতই কেননা সত্য আকার ধারণ করুক্, মিথ্যা—ভ্রান্তি কখন সত্য হইয়া যাইবে না। বৃক্ষকে বৃক্ষ বলিয়া বুঝি বা নাই বুঝি, বৃক্ষ কখনও মানুষ হইয়া যাইবে না। বৃক্ষকে মানুষ ভাবিয়া ভ্রান্ত ব্যক্তি ভয়বশতঃ মূর্চ্ছিত হইতে পারেন; অজ্ঞ ভ্রান্ত জীবও বুদ্ধির খেলাকে আত্মার মনে করিয়া নিজে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যু-ভোগ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম হইয়া যাইবে না। মরুভূমে মরীচির মত এই ভ্রান্তি অনাদিকাল হইতে আছে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। মুক্তি-লাভ যতদিন না হইতেছে, তত দিন মরীচি সত্যরূপে প্রতিভাত হইবেই, কিন্তু মরীচি সত্য হইয়া যাইবে না। বলিয়াছি, অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা উপহিত অখণ্ড আত্মার "জীব" আখ্যা। জীবচৈতন্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত অখণ্ডচৈতন্যের অংশ মাত্র। তবে এ অংশ অন্যরূপ। কেন না স্ফুলিঙ্গ-ক্ষয়ে অগ্নির ক্ষয়, অগ্নি সাকার বলিয়া স্ফুলিঙ্গ অংশ। অখণ্ড আত্মা অগ্নির মত সাকার নহে যে স্ফুলিঙ্গবৎ তাহার অংশ সম্ভব। আত্মাই জীব, জীবই বুদ্ধি মন—ইহা ব্যবহারিক অবস্থার কথা নহে। আমাদের যখন ব্যবহারিক রাজ্যে বাস, তখন ব্যবহারিক নিয়ম মানিতে আমরা বাধ্য। কাজেই ব্যবহারিক সত্যাসত্যের ভিতরই আমাদের চিন্তা-শক্তির ক্রীড়া। পারমার্থিক দশার সংবাদ আমরা রাখি না। পারমার্থিক দশায় যাহা মিথ্যা—কল্পনা, তাহাই ব্যবহার দশার বাস্তব। ব্যবহারতঃ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সত্য। যতদিন এই অনাদি ভ্রান্তি-জন্য অজ্ঞান থাকিবে, ততদিন এ গুলির মিথ্যাত্ব কোন মতেই বুঝা যাইবে না। উপনিষন্মাতার সহস্র উপদেশ, দর্শনের শত শত তিরস্কার, পুরাণের মিষ্ট-মধুর ভৎসনা সকলই ভাসিয়া যাইবে।

আত্মচ্ছায়ায় প্রতিবিম্বিত বুদ্ধি আত্মসমা। আত্মার ছায়া বুদ্ধি গ্রহণ করে বলিয়া বুদ্ধিই আমাদের নিকট "আত্মা"রূপে দণ্ডায়মান হয়। আমরাও আত্মার প্রাপ্য রাজভোগ বুদ্ধিকে দিয়া থাকি। এই "আমরা"-"আমরা"ই যখন অহঙ্কারের খেলা, তখন বুদ্ধিকে আত্মা—আত্মাকে বুদ্ধি মনে করা বা বুদ্ধি ও আত্মার পার্থক্য না বুঝিতে পারা মানবের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। অগ্নির তেজ লৌহপিণ্ডে নাই, তবু লৌহপিণ্ডে সেই তেজের আরোপ করিয়া বলিয়া থাকি "লোহায় হাত পুড়িয়া গেল" আবার লৌহের গুরুত্ব অগ্নিতে আরোপ করতঃ "অগ্নিপিণ্ড কি ভারী" বলিয়া ব্যবহার করিতে ছাড়ি না। বুদ্ধি ও আত্মার এই যে পরস্পর আরোপ, ইহার নামই বেদান্তের অন্যোন্যাধ্যাস। ইহাই সংসার-বন্ধনের কারণ।

এই কারণটি দূর করার জন্যই তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। এই অন্যোন্যাধ্যাস মায়া অজ্ঞান বা অবিদ্যা-জন্য। এই অন্যোন্যাধ্যাসের কারণ অজ্ঞান। অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যনাশ হইলে পর সর্ব্বদা অবস্থিত স্বপ্রকাশ প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতিঃ আপনিই ফুটিয়া উঠিবে, আত্মা মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের মত অন্তরাকাশে উজ্জ্বল হইয়া সমুদিত হইবেন। আত্ম-স্বরূপ-জ্ঞান, অজ্ঞানের জন্য আমাদের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়াও দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে যে নিকটে, সেই নিকটে। ইহাই মুক্তি বা মোক্ষ।

প্রাপ্তি দুই প্রকার। এক, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি—যথা স্বর্গাদি লাভ, ইহা অনিত্য পরিণামী। অপর, যাহা অপ্রাপ্তবৎ হইয়াছিল তাহার প্রাপ্তি। অপ্রাপ্তবৎ থাকিবার দুষ্ট কারণটি অপগত হইলেই অপ্রাপ্তি-বোধ বা ভ্রান্তি দূরে যাইবে। নদীতীরে অবস্থিত দশজন ব্যক্তি প্রত্যেকেই আপনাকে ত্যাগ করিয়া গণনা করার জন্য একজন কম বোধ করিতেছিল; কাজেই সকলেই হা-হুতাশ রোদন অশ্রুপাত করিতে লাগিল। পরে কোন সদাশয় ব্যক্তি সেই ভুলটি ভাঙ্গিয়া দিলে তখন সকলের প্রকৃত ব্যাপারটির হৃদ্বোধ হইল; সকলের মুখে হাসি দেখা দিল। এস্থলে দেখ, ঐ যে একজন নাই বলিয়া বোধ—উহা ভ্রান্তি-জন্য হইলেও ফলে সত্যমতই দাঁড়াইয়াছিল। ঐ ভুলভাঙ্গার মতই এই সংসার-খেলার অনিত্যতা-বোধ, মায়ামোহের অলীক ধারণা। অজ্ঞান আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, আত্মাই বদ্ধ, আমরা সুখী দুঃখী, আমাদের জন্মমৃত্যু—এই দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারের এই জন্মান্তর-সিদ্ধ নিবিড়বাসনা-জন্য ভ্রান্তিধারার নাশের নামই মোক্ষ। এই সংসার—আমাদের বন্ধন-স্বরূপ হউক, আর মাত্র ব্যবহারিক দশায় সত্যরূপে

প্রতিভাতই হউক, বাস্তব মিথ্যা-জ্ঞান-জন্য অলীকই হউক, ফলতঃ কোন পার্থক্যই নাই। সত্য ভয় আর কল্পিত ভয়ের মানস-ধারণা একপ্রকারই হইয়া থাকে। মানসিক সত্য কষ্ট, আর দৃঢ়বদ্ধরূপে কল্পনা দ্বারা গ্রথিত কষ্টের অনুভবে প্রভেদ নাই। এই অজ্ঞান-জন্য বন্ধন পরমার্থতঃ মিথ্যা ও কল্পনা-প্রসূত একটি সংস্কার মাত্র। এই কল্পনা-প্রসূত সংস্কারের জন্যই আমাদের এই দুঃখ-জ্বালা অশান্তি অতৃপ্তি। ইহার উচ্ছেদেই আমাদের পরম সুখ।

অজ্ঞান-নাশের নাম জ্ঞান-লাভ। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে,—ইহাও যা, আর জ্ঞান ছিল, কিন্তু ছিল বলিয়া ধারণাই ছিল না, তাহা পাওয়া গিয়াছে—ইহাও তা। বরং "জ্ঞান ছিল না তাহা হইয়াছে" বলিলে জ্ঞানকে "জন্য" বলিতে হয়। জ্ঞান জন্য পদার্থ হইলে নাশশীল অনিত্য হইয়া পড়ে। জ্ঞান জন্য হইলে মোক্ষও জন্য। কারণ তত্ত্বজ্ঞান রূপ মোক্ষ বা তত্ত্বজ্ঞান-জন্য মোক্ষ—দুই পথেই জ্ঞান জন্য হইলে মোক্ষও জন্য।

মোক্ষে অলৌকিক আনন্দ অপার্থিব সুখ বিদ্যমান। লৌকিক আনন্দ পার্থিব-সুখ দুঃখ-শূন্য হয় না; আর এ সুখও চিরস্থায়ী নহে; আবার চিরস্থায়ী হইলে পরিণামে অবসাদ অতৃপ্তি অপরিহার্য্য; ফলে পার্থিবসুখ প্রকৃত চিরসুখ, লৌকিক আনন্দ, প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ হইতে পারে না। এই লৌকিক আনন্দ ও পার্থিব সুখ বাহ্যপদার্থের সম্পূর্ণ অধীন। বাহ্য পদার্থের অভাবে এই সুখ ও আনন্দ নাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিত্যসুখ-রূপ অলৌকিকানন্দ-স্বরূপ মোক্ষ, বাহ্য পদার্থের অধীন নহে। মোক্ষানন্দ স্বতঃপ্রকাশিত। বাহ্য পদার্থের সম্পূর্ণ বিলোপ না হইলে ব্রহ্মানন্দ-রসভোগ ঘটে না। বাহ্য পদার্থের অধীনতার নাম-গন্ধও ব্রহ্মানন্দে নাই। স্বহৃদয়মাত্রসম্বেদ্য স্বতঃ উদ্ভূত এই মোক্ষে যে আনন্দ, তাহা লৌকিক আনন্দের সমজাতীয় নহে। লৌকিক আনন্দ অপেক্ষা বহু শত গুণ অধিক আনন্দ এই মোক্ষানন্দ। পার্থিব সুখ, এই মোক্ষ-সুখের সহিত তুলিতই হয় না। অপার্থিব সুখ—যাহা দুঃখ-শূন্য অপবাদ-শূন্য, বাহ্যপদার্থসম্বন্ধ-শূন্য, স্বতঃ উদ্ভূত, তাহার কোন সাদৃশ্যই পার্থিব সুখে নাই। ব্রহ্মানন্দে যে আনন্দ, অপার্থিব মোক্ষসুখে যে সুখ, তাহা বুঝিবার জন্যই আনন্দ ও সুখ এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পার্থিব সুখ ও আনন্দের ভিতর দিয়া না যাইলে মোক্ষের ঐ আনন্দ ও সুখের একটি সামান্য ধারণাও হইবে না। যে মোক্ষে সংজ্ঞা নাই, নাম নাই, ভেদ-বোধ নাই, স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তথায় "আনন্দ ও সুখ"-নাম থাকিবে কি রূপে? ঐ নিত্য স্বরূপ অবস্থা যদি সংজ্ঞা

দ্বারা একান্তই নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে অলৌকিক আনন্দ, অপার্থিব সুখ, অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় রস ইত্যাদি নামে অভিহিত করা ব্যতীত উপায় কি ?

মোক্ষ আনন্দ-স্বরূপ সুখ-স্বরূপ। মোক্ষকে আনন্দ বা সুখের আধার বা অধিকরণ বুঝিলে চলিবে না। নিত্য সুখ নিত্য আনন্দ নিত্য রস—সকলই মোক্ষ। মোক্ষই "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং"। ব্রহ্ম-স্বরূপ যাহা, তাহা আবার আধার বা অধিকরণ হইবে কিরূপ ?

কাহারও অজ্ঞান-নাশের পরই মোক্ষ-লাভ হয়। কাহারও অজ্ঞান-নাশের পরও অজ্ঞানকার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষ-লাভার্থ বিলম্ব ঘটে। প্রারব্ধ-ভোগের জন্যই এই বর্ত্তমান জন্ম। প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে মোক্ষের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। অজ্ঞান-নাশ হইল বলিয়া আর কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম-জন্য বন্ধন-রচনা হইবে না বটে, কিন্তু যে প্রারব্ধ পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মফল, তাহার ভোগ হইবেই। জ্ঞান দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না। প্রারব্ধ পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মফল। তবেই দেখ, ইহজন্মে জ্ঞানলাভের ফলে পূর্ব্ব-জন্মের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রারব্ধ কাটিবে কেন ? পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম অবশ্য জ্ঞাননাশ্য। প্রারব্ধ—হাত হইতে বাণ ছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। অজ্ঞান-নাশের পরও পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞানের কার্য্য বা ফল কিয়ৎকাল বর্ত্তমান থাকে, কাজেই অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের নাশ না হইলে মোক্ষ হয় না। যতদিন অজ্ঞান থাকিবে, এবং অজ্ঞান-জন্য রাগদ্বেষ মায়ামোহ থাকিবে, ততদিন মোক্ষ সম্ভবই নহে। কারণ-নাশের পর পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের ফল যদি কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারে, তবে অজ্ঞান-কার্য্য থাকিতে প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হইতে মোক্ষের সম্ভাবনা কোথায় ?

শাস্ত্রের উপদেশ, সাধুগণের সেবা, গুরুর শুশ্রূষা, কর্ত্তব্যকর্ম্মের যথাযথ পালনাদির দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে—সেই বিশুদ্ধ চিত্তেই নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্বের মত আত্ম-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়। নির্ম্মলচিত্ত সাধুর বুদ্ধিই এই আত্মতত্ত্ব-গ্রহণে সমর্থ। ধান গাছ সমেত ধান গুলি আনিয়া পরে ধান লইয়া ধানগাছ গুলি ফেলিয়া দেও, কিন্তু ধানের জন্য ধান-গাছ প্রথম আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যক। শাস্ত্র হইতে তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ অবগত হইয়া পশ্চাৎ নির্ম্মল চিত্তে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সমাধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। অনন্যচিত্তে নিজের মনন—ধ্যান ব্যতীত জ্ঞানলাভ-যোগ্যতা কখনই জন্মে না। সমল সলিলে কখন পরিষ্কার চন্দ্র দেখা

যায় না। মন বুদ্ধিকে যদি বাহ্যবিষয়ক ভাবনা ত্যাগ করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সংসার-ভাবগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। জলোদ্ভূত তরঙ্গ উঠিয়া জলেই মিলাইয়া যায় বলিয়া তরঙ্গ জল ব্যতীত স্বতন্ত্র নহে। অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত আমরা পরিণামে সেই ব্রহ্মেই বিলীন হইব, অতএব আমরাও ব্রহ্ম স্বরূপ। নির্ম্মল শুদ্ধ ব্রহ্মই এই জীবাত্মা, এই জীবাত্মা প্রকৃত নির্ম্মল, শুদ্ধ অবিকৃত।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ"

সূর্য্য যেমন সর্ব্বলোকের চক্ষুঃ-স্বরূপ বলিয়া কখনই চাক্ষুষ বাহ্য-দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, পরমাত্মাও তদ্রূপ দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দৈহিক দোষের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। দুঃখময় দেহের সহিত কল্পিত সম্বন্ধের জন্য যে দোষ-স্পর্শের আশঙ্কা, তাহা আশঙ্কা মাত্র। পদ্মপত্রে জল থাকে, সে জল দ্বারা পদ্মপত্র সিক্ত থাকে না, সর্পের দন্তকোণে বিষ, সে বিষে সর্প আচ্ছন্ন থাকে না, আত্মাও তদ্রূপই জানিতে হইবে। পরমাত্মাই জীবাত্মা।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

এক অগ্নি যেমন কখন বৈদ্যুতাগ্নি, কখন দাবাগ্নি, কখন বাড়বাগ্নি, কখন বা জঠরাগ্নি, এই পরমাত্মাও তদ্রূপ এক। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এই একমাত্র আত্মা অসংখ্য জীবাত্মা রূপে বিরাজিত। দাঁড়াইল—জীবাত্মা পরমাত্মারই কল্পিত অংশ মাত্র, জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব-স্থানীয়। তাহা হইলে আত্মার জীবত্ব সংসার-বন্ধন, আত্মার স্বস্বরূপতা মুক্তি। জীবাত্মার জীবাত্মত্ব সংসার, জীবাত্মার পরমাত্মত্ব মোক্ষ। আত্মার কল্পিত অবস্থা সংসার, আত্মার প্রকৃত অবস্থা মোক্ষ। জীবাত্মা মন বুদ্ধি প্রাণ সংসারের রাজ্যে, একমাত্র পরমাত্মা মোক্ষ-রাজ্যে। জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তি সংসার-প্রচ্যুতিই মোক্ষ।

অখণ্ড পরমাত্মারই স্পন্দনাত্মক চলনস্বরূপা এই মায়া তাঁহার ইচ্ছা। এই মায়াই প্রতি অন্তঃকরণ-ভেদে অসংখ্য অবিদ্যা নামে ব্যবহৃত। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মায়ার কার্য্য বা পরমাত্মার আভাস। এই পরমাত্মাই অসংখ্যজীবাত্মারূপে—এই জীবাত্মাই বুদ্ধি, মন ও প্রাণ-রূপে। অনাদিকাল হইতে মরুভূমিতে

মরীচিকার মত এই আভাস-ব্যাপার চলিতেছে, এই ভ্রান্তি-জন্য মোহের বিরাম হইতেছে না। এই জীবাত্মত্ব, এই মনস্ত্ব, এই ইন্দ্রিয়ত্ব সবই বিলুপ্ত হইবে। থাকিবে "একমেবাদ্বিতীয়ং।"

যখন ইন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ জীবাত্মায় মিশিয়া যাইবে; জীবাত্মার স্বতন্ত্র-সত্তাও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে, তখন নির্ব্বাণ বা মোক্ষ। ঐহিক বাসনার নির্ব্বাণ, বাগাদি ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা-লোপ মোক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

মন যতই অন্তর্লীন হইবে, ততই বাহ্য বিষয়াসক্তি কমিয়া যাইবে, ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া আসিবে। কিছুদিন ইন্দ্রিয়ের মনের সহিত একতানতা না থাকিলে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উপনীত হইবে। যতই ইন্দ্রিয়ের বাহ্য বিষয়াসক্তি কমিবে, মানসিক শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের বিলোপ।

মনঃ-শক্তি যখন বর্দ্ধিত হইয়া পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহার সংকল্প-বিকল্প-বৃত্তি আর দেখা দিবে না। যতই মন স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ ও আত্মতত্ত্বে বিলীন রহিবে, ততই মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের ও বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ থাকিবে না। আত্মতত্ত্বে চিরবিলীন থাকার ফলে এবং ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবিষয়ের বিলোপ হওয়ার ফলে মনের ধর্ম্ম সংকল্প ও বিকল্প লোপ পাইবে। এইরূপ সংকল্প ও বিকল্প-রূপ ধর্ম্ম লুপ্ত হইলে মনের আর মনস্ত্ব থাকে না, তখন মন প্রাণে বিলীন হয় বা জীবাত্মার সহিত এক হইয়া যায়—অর্থাৎ জীবাত্মার মনস্ত্ব আর থাকে না। বাসনার লোপ হইলেই সংস্কারের নাশ। সংস্কার-নাশেই চিত্তের নাশ। মোক্ষে চিত্তের নাশই বল, চিত্তের সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ ভাবই বল, আর জীবাত্মার পরিণতিই বল—ফল একই, তারপর দেহাত্মত্ব-বোধ লুপ্ত হইলে পর প্রারব্ধ-ভোগান্তেই শরীর-পতন। তাহার পর বিদেহ-মুক্তি বা মোক্ষ।

মোক্ষে ভেদ-বুদ্ধি নাই, মোক্ষে ইন্দ্রিয়, মন ও জীবাত্মার স্বতন্ত্রসত্তা থাকেনা। মোক্ষ-সুখকে অনির্ব্বচনীয় না বলিয়া থাকা যায় না।

ব্রহ্মৈব ভূমা। ভূমৈব সুখং। ব্রহ্মই পরম সুখ। ভূমা—নিরতিশয় বৃহৎ, অরিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতা। এই ভূমাই প্রকৃত সুখ। এই ভূমাই আত্মা, ইহাই মোক্ষ।

তেজঃ-স্বভাব বহ্নিতে জলের কল্পনা বরং সম্ভব, তথাপি মোক্ষে ভেদভাবের লেশ, দুঃখের কণা, বাহ্যভাবের অস্তিত্ব মাত্র সম্ভব নয়। জীবাত্মা ব্রহ্মই হউক, ব্রহ্মভূতই হউক, ব্রহ্মতুল্যই হউক আর পরমেশ্বরদাসবৎই হউক—সর্ব্বত্রই

মোক্ষ সংসার-বন্ধনের আত্যন্তিক নাশক। আত্যন্তিক সংসার-দুঃখের নিবৃত্তির জন্যই মোক্ষ পরমপ্রিয়, পরমধর্ম্ম, পরম আকাঙ্ক্ষিত। মোক্ষ ধর্ম্ম নহে, তবে "পরমধর্ম্ম" বলিতে পারা যায়। "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" "জীবপরয়োরৈক্যং মোক্ষঃ।"

রামানুজ বলেন, পরমেশ্বর-কৈঙ্কর্য্য মুক্তি। পরমেশ্বর-দাসত্ব—এ দাসত্ব নহে। আর সে দাসত্ব বা সেবা অলৌকিক, মধুর, অপূর্ব্ব আনন্দকর। সংসার-ভাব নাই, জন্ম-মৃত্যু-গ্রন্থি নাই, মায়া-মোহ-মমতা নাই—ইহা পরম সুখ ত হইবেই। এ মোক্ষ কাহার না আকাঙ্ক্ষিত?

মোক্ষ সুখ-দুঃখহীন অবস্থা—ইহা ন্যায়দর্শনকার গোতমের মত। এই সুখ-দুঃখহীন অবস্থা লাভের জন্য কোন্ মনোবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা হইবে? কাষ্ঠলোষ্ট্রতুল্য এই জড়তাময় অবস্থাই যদি মোক্ষের সর্ব্বস্ব হয়, তবে সে মোক্ষ অপেক্ষা জগতের সুখ-দুঃখ মন্দ কি?

বেদান্ত বলেন—মোক্ষে অলৌকিক আনন্দ বিদ্যমান। সুতরাং সেই মোক্ষের জন্য লোক সহজেই লালায়িত হইবে। উভয় দর্শনেই যুক্তি দ্বারা মোক্ষ-স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করার যথোচিত চেষ্টা হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনে যুক্তির সহিত উপনিষৎ প্রমাণও যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে।

সমন্বয়ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে আমাদের মনে হয়, এই সুখ-দুঃখ-শূন্য অবস্থা, আর অলৌকিক আনন্দ অবস্থা—একই। কারণ গোতম যে মোক্ষকে সুখহীন বলিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই সুখহীন। ঐন্দ্রিয়িক মানস ও পার্থিব সুখের নামই সুখ, তাহা যখন মোক্ষে নাই, তখন মোক্ষ সুখ-হীন নহে কেন? পরমসুখ "সুখ" নহে। যেখানে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, জীবাত্মা নাই, সেখানে অনুভব কোথায়? কর্ত্তা কে? কাজেই গোতমের সুখ-দুঃখ-হীন অবস্থার মোক্ষের সহিত বেদান্তের অলৌকিক আনন্দময় অবস্থার প্রকৃত বিরোধ নাই। যখন মুক্ত-পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, তখন মুক্ত-পুরুষের মনোধর্ম্ম আনন্দ কোথায়? ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, মায়াযোগে সগুণ সক্রিয়, আনন্দময়; ব্রহ্মভূত মুক্তও সেইরূপ। তাহা হইলে এই অলৌকিক আনন্দ আর সুখদুঃখ-রাহিত্য মোটের উপর একই বস্তু।

আত্যন্তিক দুঃখের উচ্ছেদই যে মুক্তি—এ বিষয়ে কোন বিসংবাদই নাই। জন্ম-মৃত্যুময় সংসারের উচ্ছেদ বড় শক্ত ব্যাপার। কত জন্মের সাধনার ফলে যে ইহা সাধিত হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

মুক্তি-পথে দেবতারা প্রতিবন্ধক ইহা সত্য। যে মানব সৃষ্টির খেলা হইতে

চিরতরে বিদায় চাহিতেছে, যে মানব প্রকৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ কাটিতে চাহিতেছে, সৃষ্টির রক্ষক লোকপাল দেবতারা ও প্রকৃতি তাহার বিঘ্নাচরণ করিতে বাধ্য। অগ্নি বায়ু যম সূর্য্য আদি দেবতা—সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি তাহার পথে অর্গল স্বরূপ দাঁড়ায়, ইহা অস্বাভাবিক নহে। আর সেই মুমুক্ষু প্রকৃতই বৈরাগ্য-পথের পথিক কিনা, ভয়-লোভ-ক্রোধের বশীভূত কিনা, তাহার ঐকান্তিক একাগ্রতা, দৃঢ় সাধনা আছে কিনা—এ সকল পরীক্ষিত হওয়াও আবশ্যক। মুমুক্ষু যখন অনেক উর্দ্ধে উঠেন, তখন দেবতারা বশীভূত স্নেহপরায়ণ ও উপকারী হইয়া থাকেন, প্রকৃতি দাসীর কার্য্য করেন। অতএব মানবের মোক্ষলাভ বা আত্য-ন্তিক অজ্ঞান-নাশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে। যাহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে, তাহা সৃষ্টি-কর্ত্তার সেরূপ অভিপ্রেতও নহে। সকলেই যদি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তবে সৃষ্টি-লোপ হইবে যে! সকলেই যদি অন্ততঃ মুক্তির পথে দাঁড়ায়, তাহা হইলে জীবোৎপত্তি হয় কিরূপে? তবে দুই একটি মহাপুরুষ প্রকৃত বহুজন্মসাধনার ফলে মোক্ষ-ধনের অধিকারী হয়েন। তাহা লক্ষের মধ্যে যে একটীও নহে, তাহা উপনিষদ্ই বলিয়া দিয়াছেন—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী (কাব্যতীর্থ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তা।)

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩

অন্বয়। বশী (সংযতচিত্তঃ) দেহী (পুরুষঃ) সর্ব্বকর্ম্মাণি (বিবেক-যুক্তেন) মনসা সংন্যস্য সুখং (যথাস্যাৎ তথা) নবদ্বারে পুরে (পুরবদহং-ভাব-শূন্যে দেহে) নৈব কুর্ব্বন্ নৈব কারয়ন্ (সাক্ষাৎ কর্তৃত্বাভিমানং প্রয়োজক-ত্বাভিমানঞ্চ ত্যক্ত্বা) আস্তে। ১৩

বঙ্গানুবাদ। জিতেন্দ্রিয় দেহী, মন দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখে নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া বাস করেন।১৩

আলোচনা। সংযতচিত্ত আত্মদর্শী ব্যক্তি "অহং কর্ত্তা" এই বুদ্ধি পরিহার করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে (চক্ষু ২ কর্ণ ২ নাসিকা ২ মুখ ১ এই সাতটী ঊর্দ্ধদ্বার এবং পায়ু ১ (মল-নির্গমন-পথ) এবং উপস্থ ১ (মূত্র-শুক্র-নির্গমন-পথ) এই নবদ্বারযুক্ত স্থূলশরীররূপ পুর মধ্যে) বিরাজ করেন। দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র— এই জ্ঞান থাকায়, প্রবাসীর বাসাবাটীর ন্যায় কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি-স্থান মনে করিয়া, গৃহের বিকার, পতন বা উন্নতিতে তিনি বিষণ্ণ বা প্রসন্ন হন না। কিন্তু বিষয়ী ব্যক্তি "দেহই আমি" এই ভ্রম-বুদ্ধি-বশতঃ আপনাকে পুরবাসী পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে না।১৩

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪

অন্বয়। প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি ন (সৃজতি) তথা কর্ম্মফলং ন (সৃজতি) তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (জীবস্য স্বভাবঃ অবিদ্যৈব) (কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ) প্রবর্ত্ততে।১৪

বঙ্গানুবাদ। ঈশ্বর, জীবের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মফল সৃষ্টি করেন না এবং কর্ম্মফল-সংযোগ ও সৃষ্টি করেন না। স্বভাবই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হয়।১৪

আলোচনা। আত্মা নির্লিপ্ত, তিনি কোন কার্য্যই করেন না—একথা বহুবার বলা হইয়াছে। দেহ জড় পদার্থ, তাহার কোন কার্য্য করিবার শক্তিই নাই। ঈশ্বর জীবের কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের সৃষ্টি করেন না। তবে এই সমস্ত করে কে? উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, অনাদি প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল। প্রকৃতিই জীবকে পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্ম-সঙ্কল্পানুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করে।১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫

অন্বয়। বিভুঃ (পরমেশ্বরঃ) কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে (ন চ গৃহ্লাতি) সুকৃতং পুণ্যং নৈব আদত্তে, অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি (মোহং প্রাপ্নুবন্তি)।১৫

বঙ্গানুবাদ। পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ অথবা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান জীবগণের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতেই জীবগণ মোহিত হইয়া আছে।১৫

আলোচনা। ঈশ্বর নিরবয়ব নিষ্ক্রিয়, আত্মা নির্লিপ্ত, দেহ জড়, অতএব কেহ জীবের পাপ-পুণ্যের দাতা বা গ্রহীতা নহে। কেবল অনাদি প্রকৃতির গুণেই পাপ-পুণ্য ঘটে। জীবের সত্যজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত বলিয়া মুগ্ধজীব তাহা বুঝিতে পারে না, শ্রীভগবানে বৈষম্য দর্শন করে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে "প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ" শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন "প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ" পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান ও ইচ্ছার যে সংস্কার, তাহা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, এই অভিব্যক্ত সংস্কারের নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে জীব পরিচালিত। সুতরাং আত্ম-জ্ঞানবিরহিত জীব, আত্মকর্ম্মজন্য ফল ভোগ করে মাত্র। ভগবান্‌কে দায়ী করা অন্যায়। ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

অন্বয়। যেষাং তু তৎ অজ্ঞানং আত্মজ্ঞানেন (ভগবদ্‌জ্ঞানেন আত্ম-বিচারেণ) নাশিতং তেষাং তৎ জ্ঞানং (অজ্ঞানং নাশয়িত্বা) আদিত্যবৎ পরং (পরব্রহ্ম) প্রকাশয়তি। ১৬

বঙ্গানুবাদ। ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা যাহাদের সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদেরই সেই জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় পরব্রহ্মকে প্রকাশ করে। ১৬

আলোচনা। ব্রহ্ম-দর্শন হইলে জীবের সমস্ত প্রকার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যায়। ব্রহ্ম-দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত পাপ-পুণ্য কর্ত্তা-কর্ম্ম আমি-তুমি ইত্যাদি পৃথক্ ভাব থাকে। আত্মতত্ত্ব-বিচার দ্বারা মোহান্ধকার দূর হইয়া জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হয় ও পরব্রহ্ম সুপ্রকাশিত হন। ১৬

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠা তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞান-নির্দ্ধূত কল্মষাঃ। ১৭

অন্বয়। তদ্বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্নেব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্যেষাং তে) তদাত্মানঃ (তস্মিন্নেব আত্মা মনো যেষাং তে) তন্নিষ্ঠাঃ (তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং তে) তৎপরায়ণাঃ (তদেব পরং অয়নম্ আশ্রয়োযেষাং তে) জ্ঞান-নির্দ্ধূত-কল্মষাঃ (তৎ-প্রসাদলব্ধেন জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং নিরস্তং কল্মষং পাপং যেষাং তে) অপুনরাবৃত্তিং (মোক্ষং) গচ্ছন্তি। ১৭

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, পরব্রহ্মে যাঁহাদের আত্মভাব, যাঁহারা

ব্রহ্ম-নিষ্ঠাযুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্ম-পরায়ণ এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারাই মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। ১৭

আলোচনা। জ্ঞান-বিচারের দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি বাহ্য-বিষয়-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ব্রহ্মপদার্থেই স্থির হইয়াছে, যাঁহাদের আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, একমাত্র আত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা একমাত্র ব্রহ্ম-লাভে তৎপর, তাঁহাদের আর জন্ম-মরণ হয় না।১৭

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

অন্বয়। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে (চণ্ডালে) গবি হস্তিনি শুনিচৈব পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) সমদর্শিনঃ। ১৮

বঙ্গানুবাদ। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে হস্তীতে ও কুকুরে (অর্থাৎ সর্ব্বজীবে) জ্ঞানিগণ সমদর্শী। ১৮

আলোচনা। ব্রহ্ম-বিদ্যাবান্ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানী ব্রহ্মদর্শন-হেতু সকলকেই তুল্য-চক্ষে দর্শন করেন; শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-ভেদ-জ্ঞান তাঁহার থাকে না। (ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মের নাম "সম,") তিনি সর্ব্বজীবে পরব্রহ্ম দেখেন, সুতরাং সর্ব্বত্র তাঁহার সমদর্শন হয়। ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯

অন্বয়। যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং ইহ এব (জীবদ্ভিরেব) তৈঃ সর্গঃ (সংসারঃ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) হি যতঃ ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্ম-ভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ১৯

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াও সংসার জয় করেন; যে হেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

আলোচনা। কাহারও মতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই বিভিন্নগুণবিশিষ্ট বৈষম্য-ময় পঞ্চভূতাত্মক বস্তুকে সমচক্ষে দেখা নিষিদ্ধ বা দোষাবহ। যেহেতু তাহাতে দোষ-গুণ পাপ-পুণ্যের ইতর-বিশেষ থাকে না। কিন্তু, ব্রহ্মজ্ঞানী তত্ত্ব-দর্শীর পক্ষে তাহা খাটে না। কারণ তিনি সংসারজয়ী, সংসারের দোষ-গুণে তিনি লিপ্ত ন'ন। তিনি সর্ব্বভূতেই আত্মাকে দর্শন করেন। দোষ-গুণ পাপ-পুণ্যের প্রভেদ-বিচার আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বপর্য্যন্ত থাকে। যেমন পর্ব্বতারোহণ

করিলে নিম্নস্থ ভূমি বৃক্ষ অট্টালিকাদির উচ্চ-নীচতা-জ্ঞান হয় না, সকলই সমশীর্ষ দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

অন্বয়। ব্রহ্মণি (সর্ব্বত্র ব্রহ্মমাত্রদর্শনে সমাধৌ) স্থিতঃ স্থির-বুদ্ধিঃ (নিশ্চল-বুদ্ধিঃ) অসংমূঢ়ঃ (নিবৃত্তমোহঃ) ব্রহ্মবিৎ (যতিঃ) প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (ন বিসীদতি) ২০

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মে অবস্থিত স্থির-বুদ্ধি মোহহীন ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি, প্রিয়বস্তু পাইয়াও সন্তুষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও দুঃখিত হন না। ২০

আলোচনা। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সুতরাং তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, ভাল-মন্দ ছোট-বড়—বিচার নাই, সকলেই তাঁহার কাছে সমান, সুতরাং তাঁহার প্রিয়-লাভে সন্তুষ্টি ও অপ্রিয়-লাভে অসন্তুষ্টি জন্মে না। ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১

অন্বয়। বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষু স্পর্শেষু) অসক্তাত্মা (অনাসক্ত-চিত্তঃ) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ (উপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং) সুখং বিন্দতি (লভতে) স (উপশম-সুখং লব্ধ্বা) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয্যং সুখং অশ্নুতে। ২১

বঙ্গানুবাদ। বাহ্যেন্দ্রিয়-বিষয় সকলে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে উপশম-সুখ লাভ করেন। তৎপরে তিনি ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয়-সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ২১

আলোচনা। সংসারে বাহ্য-বিষয়ে আসক্তি থাকিলে মন সদাই বহির্মুখ হয় ও বিচলিত হইতে থাকে। মন যখন বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া প্রত্যাহৃত ও নিশ্চল হয়, সে সময় তাহার শান্তি-সুখের সীমা থাকে না। কারণ, কামনা-যুক্ত চিত্ত সদা অসুখী। বাহ্য-বিষয়-চিন্তাবর্জ্জিত চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হইলে যে অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগ-ফলে "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের একত্ব উপলব্ধ হয়। তখন সর্ব্বত্র অভেদ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় ও যোগী পরমানন্দ লাভ করেন। ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

অন্বয়। সংস্পর্শজা (সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যঃ জাতা) যে ভোগাঃ (সুখানি)

তে হি দুঃখ-যোনয় (দুঃখস্যৈব কারণভূতাঃ) এব আদ্যন্তবন্তশ্চ (আদিমন্ত অন্ত-বন্তশ্চ) (অতএব) বুধঃ (বিবেকী) তেষু ন রমতে। ২২

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! বিবেকী মনুষ্য, ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমুৎপন্ন ভোগ-সুখে আসক্ত হন না। কারণ তাহা সসীম অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী। ২২

আলোচনা। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-জন্য সুখকে দুঃখজনক ও অন্তবন্ত বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ অনুরাগবশতই স্বস্ব ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হয়। ভোগ্য-বিষয়-লাভে যেমন সুখ জন্মে, লাভের বাধা জন্মিলে তেমনি দুঃখ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ ইন্দ্রিয়ভোগসুখলাভের চেষ্টায় অন্যবিধ দুঃখ আছে। আবার ভোগের সুখ ফুরাইয়া গেলে তদভাবে দুঃখ বোধ হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখকে দুঃখ-জনক ও অন্তবন্ত অর্থাৎ অচিরস্থায়ী বলা হইয়াছে। বিবেকীগণ ঈদৃশ সুখ-ভোগে কখন আসক্ত হইবেন না। ২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কাম-ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩

অন্বয়। যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (প্রাক্‌দেহপাতাৎ) কাম-ক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং (প্রতিরোদ্ধুং উদ্ভব-সময়ে এব) শক্নোতি স এব যুক্তঃ (সমাহিতঃ) স এব নরঃ সুখী।২৩

বঙ্গানুবাদ। যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন কাম-ক্রোধ-জাত বেগ উৎপত্তি-মাত্র রোধ করিত পারেন, তিনি সমাহিত এবং সুখী।২৩

আলোচনা। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয় লাভ করিবার জন্য যে লোভ তাহার নাম কাম। কামনা-পূরণের বাধা হইলে তজ্জন্য মনের যে উত্তেজনা হয় তাহার নাম ক্রোধ। এই উভয় বৃত্তিই জ্ঞান-সাধনের বিরোধী। যিনি বিচার-শক্তি দ্বারা ভোগ-সুখের অনিত্যতা ও ব্রহ্মানন্দ-লাভের প্রতিবন্ধকতা বুঝিতে পারিয়া তন্নিগ্রহে সমর্থ হন, তিনিই সমাহিত এবং সুখী হইতে পারেন। মৃত দেহ যেমন কোন প্রকার ভোগ-সুখ-লাভের কামনা করে না, তেমনি যিনি জীবিতকালে অকাম অক্রোধ হইতে পারেন, তিনি কৈবল্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখ-দুঃখে ন বিন্দতি,
তথাচেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ।" ২৩

(যোগবাশিষ্ঠ)

যোঽন্তঃ-সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভুতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪

অন্বয়। যঃ অন্তঃসুখঃ (অন্তরাত্মনি এব নতু বিষয়েষু সুখং যস্য সঃ) অন্তরারামঃ (অন্তরের নতু বহিঃ আরামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ (অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য নতু গীতনৃত্যাদিষু সঃ) স এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি স্থিতঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (পরম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ২৪

বঙ্গানুবাদ। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আমোদ, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২৪

আলোচনা। কেবল কাম-ক্রোধ-বেগ সম্বরণ করিলেই যে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় এমন নহে। কাম-ক্রোধ-সম্বরণ উপায় মাত্র। কাম-ক্রোধ-সম্বরণ করিয়া আত্মাতেই রত হইয়া আত্মাতেই সর্ব্বসুখ অনুভব করিলে মোক্ষ-লাভ হয়।২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্ন-দ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

অন্বয়। ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণ-পাপাঃ) ছিন্ন-দ্বৈধাঃ (ছিন্নসংশয়াঃ) যতাত্মানঃ (সংযত-চিত্তাঃ) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (অহিংসকাঃ কৃপালবঃ) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষং) লভন্তে। ২৫

বঙ্গানুবাদ। নিষ্পাপ সংশয়-হীন সংযত-চিত্ত সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সম্যগ্‌দর্শী ঋষিগণ মোক্ষলাভ করেন। ২৫

আলোচনা। মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অনেক সাধনার কথা বলিয়াছেন। সম্প্রতি বলিতেছেন, যাঁহারা নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়াছেন, বিবেক-বিচার দ্বারা সংশয়হীন হইয়াছেন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী সমকৃপাবান্ হইয়াছেন, তাঁহারাই মোক্ষ-লাভ করেন। ২৫

কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং যতীনাং যত-চেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং॥ ২৬

অন্বয়। কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং যতচেতসাম্ (সংযতচিত্তানাং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাং (সংন্যাসিনাং) অভিতঃ (উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাং চ নতু দেহান্তে এব) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষং) বর্ত্ততে। ২৬

বঙ্গানুবাদ। কাম-ক্রোধ-হীন সংযত-চিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসিগণ ইহ-পর উভয়লোকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। জীবনে জীবন্মুক্তি। ২৬

আলোচনা। কাম-ক্রোধ-হীন সংযত-চিত্ত আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ ইহ ও

পরকালে অর্থাৎ জীবিত অথবা মৃত সর্ব্বাবস্থায় তাঁহারা মুক্ত। তাঁহারা জীবিত থাকিয়াই মুক্ত—জীবন্মুক্ত। ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ। ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনির্মোক্ষ-পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

অন্বয়। বাহ্যান্ স্পর্শান্ (স্পর্শাঃ রূপরসাদয়ো বিষয়াঃ তাংস্তচ্চিন্তা-ত্যাগেন, মনস্থৈর্যেন) বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (কৃত্বা) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ) প্রাণাপানৌ (উর্দ্ধাধোগতি-রোধেন) সমৌ কৃত্বা (কুম্ভয়িত্বা ইত্যর্থঃ) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ যঃ (এবম্ভূতঃ) মুনিঃ স সদা (জীবন্নপি) মুক্ত এব। ২৭।২৮

বঙ্গানুবাদ। রূপ রসাদি বাহ্য বিষয় সকল বাহিরে রাখিয়া চক্ষুকে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া নাসাভ্যন্তর-চারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-সংযমকারী মোক্ষ-পরায়ণ ইচ্ছাভয়-ক্রোধ-শূন্য যে মুনি তিনি জীবিত থাকিয়াও মুক্ত। ২৭।২৮

আলোচনা। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ চঞ্চল, বাহ্য বিষয়ে নিয়ত; ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই মনোমধ্যে বাহ্যভাব রাশি প্রবেশ করে এবং তত্তাবৎ মনোমধ্যে সংস্কার-বৎ থাকিয়া যায়। এই সংস্কারে আচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তির বিদ্যমানতায় আত্ম-জ্ঞানের উদয় হওয়া কঠিন। এই জন্য শ্রীভগবান্ এই স্থানে ধ্যান-যোগের কথা বলিতে-ছেন। স্থির দৃষ্টিতে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি-সংস্থাপন করিতে পারিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। কুম্ভক অভ্যাস পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতাসাধন করিতে পারিলে চিত্তবৃত্তি সংযত হয়। কুম্ভক সম্বন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ২৯শ শ্লোকে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। প্রাণায়াম দ্বারা ধীরে ধীরে ধ্যানযোগী পুরুষের ইচ্ছা ভয় ক্রোধ তিরোহিত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক জীবিত থাকিয়াও মুক্ত-ভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। ২৭। ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

অন্বয়। যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং (সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তং ঈশ্বরং) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং (মোক্ষং) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ২৯

বঙ্গানুবাদ। আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের সুহৃদ্ জানিয়া তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২৯

আলোচনা। অর্জ্জুন মনে করিতে পারেন যে এবম্প্রকার যোগ-ধ্যান-ব্রত করিলেই ত মুক্তি পাওয়া যায়, তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, উক্তপ্রকার যোগ ধ্যান ব্রত তপস্যা সকলেরই ভোক্তা আমি; আমিই সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সকল লোকের সুহৃদ্, ইহা জ্ঞাত হইয়া, যিনি ঐ সকল করেন, তিনিই আমার প্রসাদে মুক্তি-লাভ করেন। ২৯

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অনুবাক প্রথম সূক্ত।)

জরায়ুজঃ প্রথম উস্রিয়ো বৃষা বাতভ্রজা স্তনয়ন্নেতি বৃষ্ট্যা।
স নো মৃড়াতি তন্ব ঋজুগো রুজন্ য একমোজস্ত্রেধা বিচক্রমে ॥১

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। জরায়ুজঃ (দিবি জরায়ুস্থানীয়ানি নক্ষত্রাণি অভিভূয় উদ্ভূতত্বাৎ জরায়ুজঃ) প্রথমঃ (সর্ব্বস্মাৎ জগতঃ পূর্ব্বম্ উদ্ভূতঃ) উস্রিয়ঃ (উস্রাঃ কিরণাঃ অস্য সন্তিইতি কিরণশালী) বাতভ্রজাঃ (বাতবদ্ ভ্রজতিইতি) বৃষা (বর্ষণপ্রদঃ) (ঈদৃশঃ সূর্য্যঃ) স্তনয়ন্ (মেঘান্ গর্জ্জয়ন্) বৃষ্ট্যা (বর্ষণেন) (সহ) এতি (আগচ্ছতি) স (আদিত্যঃ) ন (অস্মাকম্) তন্বে (তনূম্) মৃড়য়তু সুখয়তু) কিং কুর্ব্বন্ ?) রুজন্ (রোগাদিকং নিবর্ত্তয়ন্) (তমেত-মাদিত্যং বিশিনষ্টি) ঋজুগঃ (অকুটিলগামী) যঃ (আদিত্যঃ) একং ওজঃ (তেজঃ) ত্রেধা (অগ্নিবায়ুসূর্য্যাত্মনা—ত্রিপ্রকারেণ) বিচক্রমে (বিবিধ-মাক্রান্তবান্ পৃথিব্যাদিলোকত্রয়মাক্রম্য অধিপতিত্বেন স্থিতবান্ ইত্যর্থঃ) (যদ্বা য একং তেজঃ বায়ুগ্নিচন্দ্রাত্মনা বিচক্রমে কৃৎস্নশরীরাণি আক্রম্য বর্ত্ততে বাতপিত্ত-শ্লেষ্মকারিদেবতাত্মনা সর্ব্বত্র অয়মেব বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) স মৃড়াতি ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।)

বঙ্গানুবাদ। যে আদিত্য জরায়ুজ ও সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত, যিনি কিরণমালী বৃষ্টিকারক ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্, যিনি মেঘগর্জ্জন উৎপাদন পূর্ব্বক বৃষ্টি লইয়া আসিতেছেন, যে সরলগামী আদিত্য স্বীয় এক তেজঃ ত্রিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া

ত্রিলোক আক্রমণ পূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন, তিনি রোগনাশ করিয়া আমাদিগের শরীর সুখযুক্ত (সুস্থ) করুন।

টিপ্পনী। এই মন্ত্রে ঋত্বিক্ সূর্য্যদেবের নিকট যজমানের রোগনাশ ও স্বাস্থ্য প্রার্থনা করিতেছেন। সূর্য্যদেবের বর্ণনায় ঋত্বিক্ প্রথমে বলিতেছেন—সূর্য্য জরায়ুজ। সূর্য্য আদিত্য, অদিতিদেবীর গর্ব্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে সূর্য্যদেবের জন্ম—এ কথা পুরাণে আছে, সে তৈজসশরীরী অধিকারিজীব সূর্য্যের কথা। আকাশের দিবাকর সূর্য্য যে কশ্যপ বা কচ্ছপাকৃতি মহাকাশের ও অদিতি বা অখণ্ডনীয়া কেন্দ্রাপসারিণী মহাশক্তির বিকাশস্থল "দ্যৌ" দেবতার সন্তান, তাত্ত্বিকগণ তাহাও অবগত আছেন। অদিতিদেবীর জরায়ুস্থানীয় নক্ষত্রলোক অভিভূত করিয়া সূর্য্যদেব উদ্ভূত হন বলিয়াই তিনি জরায়ুজ—আচার্য্যসায়ণ ইহা বলিয়াছেন, আমরা পদবোধিনীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। সূর্য্য যে বিশ্বের আদিতে আবির্ভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই ; সূর্য্য না থাকিলে চরাচরাত্মক বিচিত্র জগতের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব হইত। আমাদের এই পৃথিবী যে সূর্য্যের পরবর্ত্তী, একথা তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। সূর্য্য বাতব্রজা বা বায়ুতুল্যবেগবান্ একথা বলায় বুঝা যায়, বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যের বেগ বা গতির সংবাদ অবগত ছিলেন। সম্প্রতি অনেকে মনে করেন—"আচার্য্য বরাহমিহিরাদি যে পৃথিবীকে স্থিরা এবং সূর্য্যকে গতিশীল বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। এতত্ত্ব আচার্য্য আর্য্যভট অবগত ছিলেন। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণও প্রচুর প্রমাণে অবগত হইয়াছেন, সূর্য্যের গতিশীলতার কথা মিথ্যা। সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন, এ মন্ত্রে তাহাই প্রকট।" আমরা বলিতে চাই, দিন রাত্রি অয়ন বৎসরাদির পরিকল্পনা সূর্য্যের গতি হইতে না হউক্, পৃথিবীর গতি হইতে হউক্, কিন্তু সূর্য্য যে তাহার সৌর-জগৎ লইয়া কোনও একটী মহাসূর্য্যরূপ নক্ষত্রের উদ্দেশে ছুটিতেছেন, একথা পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন, বৈদিক ঋষি সেই গতির কথাই বলিয়াছেন। সূর্য্য যে মেঘ-বৃষ্টির কারণ এ কথাও এই মন্ত্রে ঋষি স্পষ্টই বলিতেছেন। সূর্য্য যে রোগনাশক ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। সূর্য্যরশ্মি রোগবীজাণু নাশ করিতে অদ্বিতীয়। জল বিভিন্ন বর্ণের পাত্রে রাখিয়া রৌদ্রপূত করিয়া ব্যবহার করিলেও রোগনাশ হয় ইহা প্রসিদ্ধ। সূর্য্যরশ্মিতে সপ্ত বর্ণের অধিষ্ঠান, বর্ণ-ব্যতিক্রমের প্রতীকার-সাধন একজাতীয় প্রাকৃতিক চিকিৎসা। স্বাস্থ্যের জন্য আমরা যে সকলের সাহায্য পাই, তাহারা প্রধানতঃ সূর্য্যকৃপা-প্রসূত। জল, বায়ু ও রৌদ্র এই তিনটী আরোগ্যকর বা জীবনপ্রদ, তিনটীর মূলেই সূর্য্য বা

সৌরতাপ। শাস্ত্রে সূর্য্যকে আরোগ্য-দেবতা বলা হইয়াছে, 'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ।' সূর্য্যার্ঘ্য-প্রদান, সূর্য্যস্তব-কবচাদি পাঠ বা শ্রবণ, সূর্য্যবারে (রবিবারে) উপবাস প্রভৃতি দ্বারা যে অনেক সময় দুরারোগ্য জটিল রোগ সারিয়া থাকে, তাহার মধ্যে কি কিছুই সত্য নিহিত নাই? 'সূর্য্য নিজের এক তেজ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন' এই কথাটীর নানারূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। অগ্নি, রৌদ্র ও বাড়বানল এই তিন স্থানে একই সৌর তেজঃ—এ কথা কেহ বলেন। আচার্য্য-সায়ণ বলেন অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য এই তিনরূপে ভূলোক দ্যুলোক ও স্বর্লোকে আদিত্য বিরাজমান। সায়ণ আরও বলিয়াছেন, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা এই তিনের উৎপাদক বা রক্ষক বায়ুদেবতা অগ্নিদেবতা ও সোমদেবতা-রূপে আদিত্য সমস্ত প্রাণিশরীর ব্যাপিয়া বিদ্যমান। সংসারের সমস্ত তেজের মূল উৎস আদিত্য, চন্দ্রের তেজ সূর্য্যতেজই। বায়ুপ্রবাহের মূলে স্পন্দনে তাপেরই প্রকাশ, তাহাতেও তৈজস উৎসের ক্রিয়াশীলতা। অগ্নি ত স্পষ্ট তেজোমূর্ত্তি। যে ভাবেই হউক, সূর্য্যের ত্রিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণত্ব বায়ুপিত্তশ্লেষ্মাধিষ্ঠাতৃত্ব চিন্তা করিলে এ মন্ত্রে উৎকট রূপকের অবতারণার দরকার হয় না।

অঙ্গে অঙ্গে শোচিষা শিশ্রিয়াণং নমস্যন্তস্থা হবিষা বিধেম।

অঙ্কান্ সমঙ্কান্ হবিষা বিধেম যো অগ্রভীৎ পর্ব্বাস্যা গ্রভীতা ॥২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। অঙ্গে অঙ্গে (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু) শোচিষা (দীপ্ত্যা) শিশ্রিয়াণং (ব্যাপ্য বর্ত্তমানম্) (হে সূর্য্য! ঈদৃশং) ত্বা (ত্বাম্) নমস্যন্তঃ (নমঃ-কুর্ব্বন্তঃ) হবিষা (আজ্যাদিনা) বিধেম (পরিচরেম) (তথা) অঙ্কান্ (গমন-শীলান্ সূর্য্যানুচরান্) সমঙ্কান্ (সমীপে বর্ত্তমানান্ পরিবারভূতান্ দেবান্) হবিষা বিধেম। (হবিঃ-প্রদানস্য প্রয়োজনমাহ) গ্রভীতা (গ্রহীতা গ্রাহকঃ বাতব্যাধাতি রূপঃ) যঃ (রোগঃ) অস্য (পুরুষস্য) পর্ব্ব (পর্ব্বাণি) অগ্রভীৎ (অগ্রহীৎ ব্যাপ্য বাধতে ইত্যর্থঃ) (তস্য রোগস্য নিবৃত্তয়ে হবিষা বিধেম ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে সূর্য্য! আপনি দীপ্তি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, আপনাকে আমরা নমস্কার করিতেছি ও হবিঃ প্রদান দ্বারা আপনার পরিচর্য্যা করিতেছি। আপনার অনুচর ও পরিবারভূত দেবগণকেও হবিঃ প্রদান করিতেছি। যে বাতাদি রোগ যজমানের পর্ব্বস্থানসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া কষ্টদায়ক হইয়াছে, তাহার নিবৃত্তির জন্য আপনাকে ও আপনার অনুচর সহচরগণকে হবিঃ প্রদান করিতেছি।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে সূর্য্যদেবের নিকট বলা হইতেছে, হে সূর্য্যদেব! বাতব্যাধি

সারিয়া দি'ন্, আপনাকে ও আপনার অনুচর সহচরগণকে নমস্কার করিতেছি ও হবিঃ প্রদান করিতেছি। এ মন্ত্রে সূর্য্যের বর্ণনায় বলা হইতেছে, "সূর্য্য দীপ্তিদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান" আচার্য্য সায়ণ বলিয়াছেন 'প্রাণাত্মনা' অর্থাৎ প্রাণরূপে। সূর্য্য জীবদেহে প্রাণরূপে বিদ্যমান থাকিয়া অঙ্গের দীপ্তিরক্ষা করেন, এ কথা একভাবে সত্য। কারণ, প্রাণের বিয়োগ ঘটিলে দীপ্তিকান্তি সকলেরই অপগম হয়। আবার দীপ্তিকান্তির মূল সোমগুণাত্মক ওজোধাতু; সোমও যখন সূর্য্যমূর্ত্তি, তখন সে ভাবেও ইহা ভিত্তিহীন নহে। যাঁহারা দেবগণকে 'মানুষ' মনে করেন, তাঁহারা অবশ্য এ সব মন্ত্রে সূর্য্যনামক চিকিৎসকের নিকট রোগার্ত্তের পীড়াপ্রশমনার্থে প্রার্থনা ও ঘৃতাদি উপহার দান এবং সম্মাননার কথা বুঝিবেন। সেভাবেও সূক্তটীর ব্যাখ্যা হইতে পারে; সকলগুলি বিশেষণ সেপক্ষেও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আমরা সেরূপ সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যাকে আর্যমতানুমোদিত মনে না করায় সেরূপ ব্যাখ্যা হইতে বিরত হইলাম। পর্ব্ব অর্থাৎ গ্রন্থিতে যে রোগ প্রকাশ পায়, সে বাতব্যাধি-শ্রেণীর হওয়া সম্ভব। বাতব্যাধিতে রবিবার-পালন উপকারী। এ মন্ত্রে আদিত্যের অনুচর ও সহচরগণের কথা বলা হইয়াছে। দিবাকর সূর্য্যের অনুচর এবং পরিবার প্রচুর। অধিকারী জীব দেব-সূর্য্যের অনুচরাদি শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। আদিত্যদেবের কেন, সকল অধিকারিদেবতারই পরিবার-দেবতা আবারণ-দেবতা অঙ্গ-দেবতার কথা শুনা যায়। আদিত্য ত স্বগণেই দ্বাদশ, তারপর আবার অসংখ্য পরিবারাদি আছে।

মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা উত কাস এনং পরুষ্পরুরাবিবেশা যো অস্য।
যো অভ্রজা বাতজা যশ্চ শুষ্মো বনস্পতীন্ সচতাং পর্ব্বতাংশ্চ ॥৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে সূর্য্য!) শীর্ষক্ত্যাঃ (শিরোরোগাৎ) এনং (পুরুষং) মুঞ্চ (মোচয়) উত (অপিচ) যঃ কাসঃ (কাসরোগঃ) এনং আবিবেশ (প্রবিষ্টবান্) (অপরঞ্চ) পরুঃপরুঃ (সর্ব্বান্ সন্ধিবন্ধান্) (য আবিবেশ তস্মাৎ মোচয় ইতি সম্বন্ধঃ) যো (রোগঃ) অভ্রজা (প্রবর্ষণোদক-সংসর্গেণ জাতঃ শ্লেষ্মরোগঃ) বাতজাঃ (কৌষ্ঠবায়ুজাত-রোগঃ) যশ্চ শুষ্মঃ (শোষকঃ পিত্ত-বিকারজঃ রোগঃ) (সসর্ব্বোঽপি রোগ এনং বিহায়) বনস্পতীন্ পর্ব্বতাংশ্চ সচতাং (সমবৈতু আশ্রয়তু ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে সূর্য্য! আপনি এই যজমানকে শিরোরোগ হইতে মুক্ত করুন, আর যে কাসরোগ ইহার দেহে প্রবেশ করিয়াছে, অপর যে রোগ পর্ব্ব সমূহে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত করুন। যে সকল রোগ,

জল লাগিয়া শ্লেষ্মবৃদ্ধি হওয়ায় জন্মিয়াছে, যে সকল রোগ (কোষ্ঠাশ্রিত) বায়ু-প্রকোপ হইতে জন্মিয়াছে, আর যে সকল রোগ পিত্তদোষ হইতে জন্মিয়াছে, তাহারা সকলেই এই রোগী যজমানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনস্পতিদলে ও পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করুক্।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে শিরোরোগ, কাসরোগ ও সন্ধি-স্থানের রোগ হইতে রোগীকে মুক্ত করিবার জন্য প্রথমে আদিত্যের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। পরে বলা হইতেছে, শ্লৈষ্মিকরোগ, বাতিকরোগ ও পৈত্তিকরোগ, রোগীর দেহ ছাড়িয়া গাছে পাহাড়ে চলিয়া যাউক্। রোগ সকলকে পাহাড়ে ও বনে বিতাড়িত করার কথা বলায় বোধ হয়, পর্ব্বত ও অরণ্যজাত বৃক্ষ-লতাদি দ্বারা রোগীকে চিকিৎসা করা হইত। হয়ত মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক বৃক্ষশাখা বা লতাদি রোগীর গায়ে বুলাইয়া চিকিৎসা করা হইত, শেষে "তোমার রোগ এই লতাদির সঙ্গে গিয়াছে, তুমি সুস্থ হইয়াছ" ইত্যাদি কথা রোগীকে বলিয়া লতাদি ফেলাইয়া দেওয়া হইত। অদ্যাপি মান্ত্রিক চিকিৎসার স্থলে এইভাবে উদ্ভিদের ব্যবহার দেখা যায়। যদি প্রকৃত ভৈষজ্য-বিধানানুসারে দ্রব্য-সাধ্য চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলেও রোগীর সাহস উৎপাদনের জন্য "তোমার রোগ সূর্য্যদেব বনে পর্ব্বতে তাড়াইয়া দিলেন" বলা অসঙ্গত হয় না। এখনও এদেশে "ভাঁটী" "হলুদ" প্রভৃতি পিত্ত-নাশক ওষধি ব্যবহার করিয়াও অনেকে 'খোঁস পাঁচ্ড়াকে' দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উচ্চৈঃস্বরে অনুমতি করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি, যে সকল রোগকে বনে তাড়াইবার কথা হইতেছে, সেই সকল রোগের কারণভূত দূষিত জল, বায়ু প্রভৃতিকে বনে পর্ব্বতে পাঠাইবার জন্য প্রচুর রৌদ্রগ্রহণরূপ শোধনের ব্যবস্থাই এখানকার রহস্য। চিন্তাশীলগণ চিন্তা করিবেন।

শং মে পরস্মৈ গাত্রায় শমস্ত্ববরায় মে।
শং মে চতুর্ভ্যো অঙ্গেভ্যঃ শমস্তু তন্বে ত মম ॥ ৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (রোগার্ত্তঃ স্বয়মাশাস্তে) মে (মম) পরস্মৈ (উপরি-বর্ত্তমানায় শিরোরূপায়) গাত্রায় (শরীরাবয়বায়) শং (রোগশমনজং সুখং) অস্তু (ভবতু) তথা মে অবরায় (অবরস্তাদ্বর্ত্তমানায় চরণরূপায় অঙ্গায়) শম্ অস্তু। মে (মম) চতুর্ভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (হস্তদ্বয়-পদদ্বয়রূপেভ্যঃ) শম্ অস্তু। মে (মম) তন্বে (মধ্যশরীরায়, সর্ব্বসমষ্টিরূপায় শরীরায় বা) শম্ অস্তু।

বঙ্গানুবাদ। আমার শিরোদেশ, আরোগ্যজনিত সুখ বা মঙ্গল লাভ করুক্। আমার চরণ, আরোগ্যসুখ প্রাপ্ত হউক্, আমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সুস্থ হউক্, আর আমার মধ্যদেশাদি অথবা সমগ্র দেহ সুস্থ মঙ্গলযুক্ত হউক্।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে রোগী (যজমান) নিজেই সূর্য্যদেবতার নিকট বলিতেছে যে, আমার ঊর্দ্ধাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ, মধ্যাঙ্গ,—সর্ব্বাঙ্গ সুস্থ হউক্। শরীরের কোনও অংশে যাহাতে রোগের আক্রমণ না থাকে, সর্ব্ব শরীর রোগমুক্ত হয়, তাহাই হউক্—এই আরোগ্য-কামনাই এ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। রোগনাশের জন্য দেবতার উদ্দেশে হবিঃপ্রদানরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান এদেশে বৈদিককালে প্রচলিত ছিল। জলোদর-রোগের বিনাশের জন্য বরুণযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, পূর্ব্বে আমরা অথর্ব্ব-বেদের অন্য সূক্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। বিভিন্ন রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই-বার জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত, বেদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্যাপি রোগনাশার্থে স্বস্ত্যয়ন দেব-পূজাদির অনুষ্ঠান হয়। বিশেষ-ভাবে বসন্তে শীতলা-পূজা, কলেরাদিতে কালী-পূজা হরি-পূজা প্রভৃতি এখনও হিন্দুপল্লীতে প্রতিবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যথাবিধি দৈব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে ফল-লাভ হয়, এই শাস্ত্রীয় সত্যে আমরা অবিশ্বাস করিতে অধিকারী নহি—বহুস্থলে ইহা বুঝিতে অবকাশ পাইয়াছি।

প্রথমকাণ্ড তৃতীয় অনুবাক প্রথম সূক্ত সমাপ্ত।



দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪) দেবগণের পদ ও শ্রেণী-বিভাগ।

এই সকল জীবের পদ ও শ্রেণী-বিষয়িনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে পাই যে, হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থ উহাদিগকে দুইটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—দেব ও দেবযোনি। দেবযোনিগণ আবার অষ্টভাগে বিভক্ত, যথা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর, পিশাচ, গুহক, ও বিদ্যাধর। ইহা-রাই মধ্যযুগের ইউরোপীয় দেবতা বা মুসলমানদের পরী প্রভৃতি। মধ্য-যুগের ইউরোপীয়গণ অগ্নিচারী কৃকলাস, পরী, পিশাচ, বনদেবী, সলোম শৃঙ্গালু বনদেবতা (Satyr), সমুদ্র-কন্যা প্রভৃতি দেবযোনিতে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। গ্রিক্ ও লাটীন ভাষায় লিখিত পুরাণ-শাস্ত্রেও উহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের পুস্তকেও পরী ও জিনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধেরা এই

সকল জীবকে 'কামদেব' বলেন। স্বর্লোকে যে সকল নিম্নশ্রেণীর দেবতা বাস করেন, বৌদ্ধেরা তাঁহাদিগকে 'রূপদেব' বলিয়া থাকেন। আর যে সকল উচ্চশ্রেণীর দেবতার নাম বৈদিক শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাই বৌদ্ধদিগের "অরূপদেব"। আদিত্য, বসু ও রুদ্র, প্রজাপতি এবং সিদ্ধ ইহাঁরা জনঃ ও উচ্চতর লোকে বাস করেন। ইহাঁরা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। ইহাঁদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—লোকপাল, লিপিকা (ইহাঁরা কর্ম্মের হিসাব রাখেন,) মহারাজা এবং ধ্যানচোহান—(সি, ডব্লিউ, লেড্‌বিটার সাহেবের 'কাম্যস্তর' (Astral Plane) নামক গ্রন্থ ৩২-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যেমন ঊর্দ্ধে তেমনি অধোদেশে; যেমন অধোদেশে তেমনি ঊর্দ্ধে। যে সকল জীব এই স্থূল জগতে বাস করিতেছে, তাহাদের গণ ও পরাপরজাতি একরূপ অসংখ্য বলিলেও হয়। কিরূপ অসংখ্য তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। দেবগণের সংখ্যা—যে সকল জীব কাম্য (Astral) বা অন্যান্য উচ্চতর স্তরে বাস করেন, তাঁহাদের পদ ও শ্রেণীও উপর্য্যুক্তপ্রকার অসংখ্য। উহাঁরা যে অসংখ্য তাহা আমরা স্বীকার করিয়া লইলেও দোষ হয় না। অতএব যেরূপ ব্যাপার, তাহাতে দেবগণের সংখ্যা ৩৩ কোটি বলিলে বরং কম বলাই হইল।

শুধু আমি যে বলিতেছি তাহা নহে। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞ-বল্ক্য ও শাকল্যের একটী বিখ্যাত কথোপকথন আছে। তাহাতে দেবের সংখ্যা কমাইয়া দেড় করা হইয়াছে;—(৯ম কাণ্ড, ৩-৬ শ্লোক)। কথোপকথনটী এই :—

"যাজ্ঞ-বল্ক্য! কতটী দেবতা আছেন? বাস্তবিকই কি ৩৩ কোটি?"

"তেত্রিশটী"।

"হাঁ, তাই বটে"। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাস্তবিক কতটী দেবতা আছেন?"

"তিনটী"।

"হাঁ, তাই বটে"। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতটী দেবতা বাস্তবিক আছেন?"

"দুইটি"।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্যই কতটী দেবতা আছেন?

"দেড় জন"।

তিনি বলিলেন—"হাঁ তাই বটে"।

"ঐ তেত্রিশটী কাহারা?"

৮ জন বসু, ১১ জন রুদ্র, ১২ জন আদিত্য, এই ৩১ জন, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, সর্ব্ব শুদ্ধ ৩৩ জন।

"তিন জন কাহারা ?"

এই ত্রিলোক—কেননা সমস্ত দেবতাই এখানে বাস করেন।

"দুই জন কাহারা ?"

খাদ্য ও নিশ্বাস (প্রাণ)।

"দেড় জন কাহারা ?"

যিনি এখানে বহমান আছেন অর্থাৎ বায়ু।

"এক ঈশ্বর কে ?"—নিশ্বাস বা প্রাণ।

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন ঃ—"আপনি আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা দেবতত্ত্বের অতীত—ঐ বিষয়ের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না।" (এই কথার সহিত বৃহদারণ্যক, ১৪—৬—৬—১ তুলনা করিয়া দেখ)। যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে এই উদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে যে, একই সত্তা হইতে প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের উদ্ভব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগৎ, সগুণ ব্রহ্মকেই "লোগাস্" আখ্যা দিয়া থাকেন। তারপর, প্রকৃতি ও পুরুষ দেখা দিলেন। ইহাদিগকেই খাদ্য ও প্রাণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি-পুরুষের যোগেই ত্রিলোক এবং তৎসংশ্লিষ্ট ৩৩টি দেবতার আবির্ভাব হইল। উহা যে একটা চূড়ান্ত হিসাব তাহা নহে ; কিম্বা ত্রিলোক-বিহারী দেবতাদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, উহা দ্বারা যে তাহার সংশোধন করিয়া লইতে হইবে, তাহাও নহে। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বৈদিক সাহিত্যে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর দেবতার প্রসঙ্গ দেখা যায়। ইঁহারা যথাক্রমে ভৌতিক, কাম্য ও মানসস্তরে বিহার করিয়া থাকেন। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। বাক্যটী এই ঃ—"দেবগণ ত্রিগুণিত" (অর্থাৎ গগনবিহারী, বায়ুবিহারী ও পৃথিবীবিহারী,—বৃহদারণ্যক, ৬—৫—৩—১)। দেবতাদিগের শ্রেণী তিনটী (অর্থাৎ বসু, আদিত্য ও রুদ্র) কিম্বা গগন, বায়ু, পৃথিবী এই ত্রিস্থলচারী দেবতা—সূর্য্য, বায়ু অগ্নি ইঁহারাই ঐ ত্রিস্থলে যথাক্রমে আধিপত্য করেন—বৃহদারণ্যক ১৩-১-৭-২)।

শাস্ত্র-সমর্থন—এতদ্বিষয়ে মিসেস্ অ্যানি বেশান্তের "জ্ঞানালোচনা" (A study of conciousness) পুস্তকের ৪০-১ পৃষ্ঠা হইতে একটী ভাস্বর স্থল উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"সগুণ ঈশ্বর সামগ্রী-সমষ্টিকে গুণ প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত,

তাঁহার কার্য্যকালে নানা প্রকার বস্তুর ক্রম-বিকাশ হইয়া থাকে। এই ক্রম-বিকাশেরও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এই ক্রম-বিকাশযুক্ত বস্তুগুলি ত্রিলোকের স্বাভাবিক ও আদর্শস্থানীয় সম্পত্তি। সগুণ ঈশ্বর, উহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমোন্নতি হইতে আনয়ন করেন। তাঁহারই প্রাণাগার হইতে প্রেরিত হইয়া তাঁহারা আপন ২ বিকাশোপযোগী স্তরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন; হইয়া, প্রথমে তাঁহার সঙ্গে, পরে মানবের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহারই বিবর্ত্ত-বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। ভিন্ন ২ ধর্ম্মে উঁহারা ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সকল ধর্ম্মই উঁহাদিগের অস্তিত্ব ও উঁহাদিগের কার্য্য স্বীকার করেন। সংস্কৃতভাষায় উহাদিগকে "দেব" বলা হয়। 'দেব' অর্থ দীপ্তিশালী জীব। এই শব্দটী সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে উঁহাদের আকার খুব সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হয়। উঁহারা একটী উজ্জ্বল, ভাস্বর জ্যোতিঃস্বরূপ।* হিব্রু, খৃষ্টীয় ও মুসলমান্ ধর্ম্মে উহাদিগকে ঈশ্বরের দূত বলা হইয়া থাকে। দিব্য-জ্ঞানসেবী সম্প্রদায় (Theosophist) সাম্প্রদায়িক গুণ-নির্দ্দেশ-পরিহারার্থ উঁহাদিগকে এলিমেণ্ট্যাল্ বা ভৌতিক আখ্যা দেন। উহাদিগের বাসস্থলকে লক্ষ্য করিয়াই এতদাখ্যার সৃষ্টি। ইহাতে একটু সুবিধাও আছে। প্রাচীন কালে লোকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চভূত মানিত। এই পঞ্চভূতের সঙ্গে যে উহারা সংশ্লিষ্ট, তাহা উপর্যুক্ত আখ্যাতে বেশ বুঝা যায়। কারণ ঠিক ঐরূপ জীব অথচ উচ্চগুণসম্পন্ন তাঁহারা আত্মিক ও বুদ্ধিক স্তরে বাস করেন। তা'ছাড়া মানস ও কাম্য স্তরেও তেজ ও অপ্-ভৌতিক আছে। ভূর্লোকেও ব্যোম-ভৌতিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল জীব যে যে স্তরে বাস করেন, সেই ২ স্তরের উপাদানের সার দ্বারা উঁহাদের দেহ গঠিত। উঁহারা ইচ্ছানুসারে নানা বর্ণের ও নানা প্রকারের দেহ ধারণ করিতে পারেন। উঁহাদের সংখ্যা অনেক। উঁহারা সতত তৎপরতা-সহকারে কার্য্য করিতেছেন; ভৌতিক-পদার্থের গুণোৎকর্ষের নিমিত্ত সতত পরিশ্রম করিতেছেন; কখন একটা দ্বারা স্বীয় শরীর গঠন করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই সেটী পরিত্যাগ করিয়া আর একটা অধিকতর কার্য্যোপযোগী ভৌতিকসারোদ্ভূত দেহ ধারণ করিতেছেন। মানবের জীবাত্মা

---

* "দেব" এই বর্ণনাত্মক শব্দটীর অনুবাদ পাঠ করিয়া অনেকে প্রাচ্যচিন্তার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসেন। পাশ্চাত্যগণ 'দেবগণ' বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, "তেত্রিশ কোটী দেবতা" এ কথার অর্থ সেরূপ নহে। দেবতা অর্থে উজ্জ্বল জীব।

মৃত্যুর পর পুনরায় কিরূপভাবে, কিরূপ নূতন দেহে জন্ম গ্রহণ করিবে, সতত তাঁহারা তাহার আয়োজন করিতেছেন, সেই নূতন দেহের আবশ্যকীয় উপাদানাদি-সংগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খলায় রক্ষা করিতেছেন। কোন কিছুর আকারের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সে তাঁহাদেরই কার্য্য। এবম্বিধ ব্যাপারে তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীবাত্মা যত অনুন্নত, দেবগণের কার্য্য তত মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। উঁহারা প্রাণীদিগের একরূপ সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন। উদ্ভিদ্‌ ও খনিজ বস্তুর সকল কার্য্যই উঁহারা করেন। উঁহারা ঈশ্বরের পরিশ্রমী কার্য্য-কারক; উঁহারা তাঁহার জগৎ-কল্পনার যাবতীয় সূক্ষ্মাংশগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। অসংখ্য বিবর্ত্তনশীল জীব স্ব২ দেহোপযোগী উপাদান-সংগ্রহে ব্যস্ত। উঁহারা ঐ সংগ্রহ কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। উঁহারা যে জগতে অত্যাবশ্যক কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা প্রাচীনকালের লোকেরাও স্বীকার করিতেন। চীন, মিসর, ভারত, পারস্য, গ্রীস, রোম সকল দেশই ঐ কথা বলিয়া থাকে। সকলেরই বিশ্বাস যে, উঁহাদিগের মধ্যেও উচ্চশ্রেণীর জীব আছেন। যাবতীয় ধর্ম্মেই এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, কিন্তু কাম্য ও ব্যোম-স্তর-সুলভ স্থূল দেহীদিগের স্মৃতি আজ পর্য্যন্তও লৌকিক চলিত গল্পে; ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতির কাহিনীতে পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যে সময়ে লোকের মন জড়-জগত লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতনা, যে সময়ে সূক্ষ্ম জগতের প্রভাব তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম ছিল। সেই সময়ের স্মৃতি উপর্য্যুক্ত কাহিনীতে আজও চলিয়া আসিতেছে। মানুষ অত্যন্ত জড়াসক্ত হইয়া পড়ায় ঐ সকল "ভৌতিক" এখন আর উহাদিগের গোচরীভূত হয় না। আবার বিবর্ত্তনের পক্ষেও জড়াসক্তি প্রয়োজনীয়। গোচরীভূত না হইলেও, উহাদের কার্য্যের বিরতি নাই। পূর্ব্বে যেমন তাঁহাদের কার্য্য বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত, স্থূল-জগতে এখন আর সেরূপ বুঝা যায় না।"

ঐশ যাজক-তন্ত্র শাসন—আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে বিশ্বের সপ্ত প্রদেশের প্রত্যেকটীতে একজন করিয়া অধীশ্বর আছেন। অতএব, এই অধীশ্বরের সংখ্যাও সাতটী। ইহাঁরা "ত্রিমূর্ত্তির" নিম্নপদে অধিষ্ঠিত। ইহাঁরাই খৃষ্টান-কথিত ঈশ্বরের সিংহাসন-সম্মুখস্থ সপ্ত দেব। ইঁহারাই জোরোয়াস্ট্রিয়ান্ দিগের "আমশাস্পেন্দ"। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে সাধারণতঃ পাঁচটী প্রধানদেবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এই ঃ—আকাশের দেবতা—ইন্দ্র, মরুৎ-দেবতা—বায়ু, তেজের দেবতা—অগ্নি, জল-দেবতা—বরুণ এবং পৃথিবীর দেবতা—কুবের। কিন্তু কখনও ২

সাতটী দেবতার উল্লেখও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রধানদেবতাগুলির প্রত্যেকের অধীনেই অনেকগুলি করিয়া নিম্নশ্রেণীর দেবতা আছেন। তাঁহারা উঁহাদের দল-পতির আদেশ পালন করেন। (অ্যানিবেশান্তের "প্রাণ ও দেহের বিবর্ত্তন" নামক পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মানব-রাজ্যের সহিত জগতের ঐশ রাজ্যের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠ করিলে সেই সাদৃশ্যটুকু বুঝা যায়। যেমন সকলের উপরে একজন শ্রেষ্ঠ শাসন-কর্ত্তা আছেন; তাঁহার অধীনে ভিন্ন ২ দেশে রাজপ্রতিনিধি রহিয়াছেন; প্রত্যেক রাজপ্রতিনিধির অধীনে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা আছেন; ইঁহাদের অধীনে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, আবার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট, তদ্রূপ সকলের উপরে "মহেশ্বর", তাঁহার অধীনে ঈশ্বর, এই ঈশ্বরগণের এক একজন এক একটী সৌর জগতের অধীশ্বর। প্রত্যেক ঈশ্বরের অধীনে প্রাগুক্ত সাতটী করিয়া প্রধান দেবতা। এই দেবতাগণ দলপতির আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে দেবযোনিদিগের মধ্যেও যাজকতন্ত্র শাসন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পদের পর পদ, শ্রেণীর উপর শ্রেণী, সুন্দর ভাবে সুব্যবস্থিত রহিয়াছে। নিম্নতম দেবতা হইতে সর্ব্বোচ্চ গ্রহদেবতা পর্য্যন্ত সকলেই সুবিন্যস্ত। অতএব দেবতাদিগের রাজ্য-ব্যবস্থাই পৃথিবীস্থ মানব-রাজ্যের যথার্থ মুল আদর্শ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

সংসার।

রে সংসার, একদিন নেহারি তোমায়
অপার আনন্দ-নীরে হৃদয় ভাসিত,
ছিলে তুমি সুখ-শান্তি-আনন্দ-জড়িত,
ভাবিতাম তোমা হেরি ধরা শান্তিময়।

কম কলেবর তব করি দরশন
বিস্ময়ে হইত প্রাণ মুগ্ধ অভাগার,

ভাবিতাম তুমি বুঝি স্বরগের দ্বার,
তোমার আশ্রম বুঝি নন্দন-কানন!

অনন্ত—অতল সিন্ধু করি সন্তরণ—
সুখের সম্পদ্ রাশি হেরিবার তরে
সুকৃতির ফলে বুঝি আসে পরপারে
জুড়াইতে জীবনের জ্বালা, জীবগণ!

নাহি পাপ, পরুষতা, দ্বেষ, হিংসা-লেশ,—
তুমি মাত্র অবিশ্রান্ত সুখের কারণ—
নিদারুণ শোক, তাপ, অভাব-তাড়ন-
বিরহিত, বিধাতার শান্তিময় দেশ।

শাশ্বত, সংসারে তব করুণা বিম্বিত,
অনন্তেও ক্রিয়া তব অচিন্ত্য অক্ষয়,
সুখের সম্পদ্‌রাশি ওহে দয়াময়!
স্বপ্নসম রহিয়াছে তোমাতে সঞ্চিত।

শৈশবের সুবিমল সুকোমল চিতে
ভাসিতাম ক্রীড়ারত সঙ্গী দল সনে,
জননীর মমতার সোহাগ চুম্বনে
যোগাইত কত আশা অভাগায় দিতে।

মায়ের স্নেহের নেত্র—প্রেম-প্রস্রবণ—
উরসে পীযুষ-সিন্ধু করুণার কণা—
ভাবিতাম তোমা হেরি তোমারি রচনা-
নৃত্য করি সুখে, নিত্য কাটাব জীবন।

সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর কোলে
অসংখ্য সুখের ঢেউ উঠিত অন্তরে,
হাসি-মাখা তারা-দল শশধর হেরে
ঝরিত নির্ঝর কত নয়ন-কমলে।

আনন্দের শত উৎস ছুটিত মরমে,
বাজিত হৃদয়তন্ত্রী ভবিষ্য আশায়,
এ রহস্য অবশ্যই তোমারি কৃপায়
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ নেত্রে ভাবিতাম মনে।

জনক-জননী পুত্র স্বজন-নিকরে
ভাবিতাম, ভুলাইতে প্রবাসের জ্বালা
গড়িয়া রেখেছ তুমি মুকুতার মালা
উপহার দিতে ক্ষুদ্র মানবের করে।

কিন্তু হায় রে সংসার, সব প্রতারণা—
সকলি শঠতা তব সকলি যে ছল!
ফেলিয়া মোহের বশে নাচায়ে কেবল
বিস্তারিলে মায়া-জাল করিতে বঞ্চনা।

কেমনে বুঝিব তব এ বিচিত্র লীলা?
পদে পদে চক্র শুধু পূর্ণ বক্রতায়!
সুদূরে সাহারা হেরি মুগ্ধ হিয়া হায়
সকাশে বিনাশে শেষে দুরন্ত তৃষায়!

এখন নেহারি তোমা গরল-জড়িত
যে দিকে ফিরাই আঁখি শশঙ্কিত প্রাণ—
পদে পদে বিঘ্নরাশি দুঃখ নির্য্যাতন
অনন্ত অনলকুণ্ড তোমাতে ব্যাপৃত।

বিষম বিষাদ-বিষে অবিচ্ছিন্ন লেখা
শোক-তাপ-শঙ্কটের কঠোর ভাষায়
তোমার জঘন্য মূর্ত্তি, অঙ্কিত তাহায়
বিড়ম্বনা-পরিপূর্ণ যাতনার রেখা।

নাহি প্রাণ করে আর তোমার কামনা,
অমর-সিঞ্চিত সুধা স্বর্গের সম্পদ,

বিদাও সংসার মোরে, করি প্রণিপাত,
আঘাতে আঘাতে আর দিওনা বেদনা।

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

।রাম-গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাংস্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহচ বাজিনাং শ্রুতিঃ
জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্॥ ২১।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি সম্যক্‌রূপে সকল কর্ম্ম-ত্যাগকেই সাদরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বাজসনেয়শ্রুতিও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানই মুক্তির সাধক, কর্ম্ম সে বিষয়ে অসমর্থ॥ ২১।

বিদ্যাসমত্বেনতু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ।
ফলৈঃ পৃথক্ত্বাদ্বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ
সং সাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ম্॥ ২২।

যদি বল, কর্ম্মাদি দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিলে মানবগণ সিদ্ধিলাভ করে—এইরূপ বাক্য যখন নানাশাস্ত্রে দেখা যায়, তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ তুমিই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলকে বিদ্যার ন্যায় মুক্তিসাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছ, এক্ষণে একমাত্র জ্ঞানকেই মুক্তির হেতু বলিতেছ কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমি কর্ম্মকে কখনও জ্ঞানের সমান বলি নাই, কেবল "পদ্মের ন্যায় নয়ন" এইরূপ দৃষ্টান্ত ভাবে বর্ণন করিয়াছি মাত্র। বস্তুবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে সমান ফল প্রসব করে না, জ্ঞান দ্বারা মুক্তি ও যজ্ঞাদি দ্বারা পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তি হয়, বিশেষতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ মানসিক ও দেশ-কালনিয়মাদিরূপ বাহ্য কারণ-সাপেক্ষ। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই অহং-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে সম্পূর্ণ

বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন হওয়ায় কখন উভয়ে একত্রিত ভাবে বা কর্ম্ম, স্বতন্ত্র-ভাবে মুক্তির হেতু হইতে পারে না ॥ ২২।

সপ্রত্যবায়োঽহমিত্যনাত্মধী
রজ্ঞপ্রসিদ্ধা নতু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্ বুধৈ স্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি
র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধি-প্রকাশিতম্ ॥ ২৩।

যদি কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমতা না থাকিলেও বেদবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান-জন্য প্রত্যবায় হয়, সুতরাং তৎ-পরিহারের নিমিত্ত কর্ম্ম করা আবশ্যক, তাহাতে বক্তব্য এই যে, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বিমূঢ় মনুষ্যগণকে ঈদৃশ প্রত্যবায় (পাপ) স্পর্শ করিয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিকট তাহা কার্য্যকর হয় না, অতএব ক্রিয়াফলে আসক্তচিত্ত পণ্ডিতগণ অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে বিধিবাক্যোদিত কর্ম্ম নিশ্চয় পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২৩।

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো
গুরোঃ সকাশাদপি শুদ্ধমানবঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ ॥ ২৪।

শ্রদ্ধাবান্ বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ, সুমেরু গিরির ন্যায় স্থির ও অক্ষুব্ধ মানসে গুরুর শুশ্রূষাকরতঃ তাঁহার অনুগ্রহে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-বিচার দ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ অপরোক্ষ অর্থাত্ প্রত্যক্ষ করিয়া পরমসুখী হইয়া থাকেন ॥ ২৪।

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থবিজ্ঞান-বিধৌবিধানতঃ।
তত্ত্বং পদার্থৌ পরমাত্ম-জীবকা-
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়ো র্ভবেত্ ॥ ২৫।

মহাবাক্য-বিচার দ্বারা কিরূপে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য স্থির হইতে পারে তাহারই সদ্‌যুক্তি কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ বেদান্তবোধিত বিধি দ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের প্রকৃতার্থ বিদিত হইতে হইবে, কেন না পদের অর্থ-বোধ না হইলে বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধ হয় না। সেই জন্য কথিত হইতেছে যে "তত্" পদের অর্থ পরমাত্মা, "ত্বং" পদ জীবাত্মবোধক এবং "তৎ" ও "ত্বং" অর্থাত্ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এতদুভয়ের যে একত্ব তাহাই "অসি" পদের দ্বারা সূচিত হয় ॥ ২৫।

প্রত্যক্ পরোক্ষাদি-বিরোধমাত্মনো
বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্।
সংশোধিতাং লক্ষণয়াচ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়োভবেত্ ॥ ২৬।

এখানে এরূপ সংশয় হয় যে, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, অতএব এই উভয়ের ঐক্য কখনই সম্ভব হয় না। এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য "তত্" ও "ত্বং" এই পদ দ্বয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করতঃ লক্ষণা দ্বারা যে ঐক্য সম্ভব, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পরোক্ষত্ব এবং জীবের অল্পজ্ঞত্ব ও অপরোক্ষত্বাদি বিরুদ্ধাংশ পরিহার-পূর্ব্বক লক্ষণা দ্বারা "তৎ" ও "ত্বং" অর্থাত্ ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশস্বরূপ চিদ্রূপকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাকে স্ব-স্বরূপে উপলব্ধি করিলেই ঐক্য হইবে ॥ ২৬।

একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবে-
ত্তথা হ জহল্লক্ষণতাবিরোধতঃ।
সোঽয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তত্ত্বং পদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭।

কিরূপ লক্ষণা দ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের বিচারে ঐক্য সম্পাদিত হইবে, তাহারই বিশেষ বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। লক্ষণা তিন প্রকার—১ম জহতী, ২য় অজহতী, ৩য় ভাগ। নিজ বাক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যার্থ-গ্রহণকে "জহতী লক্ষণা" কহে, যথা "গঙ্গায় ঘোষ বাস করিতেছে" এখানে প্রবাহপদার্থরূপ গঙ্গায় ঘোষের বাসের অসঙ্গতি হেতু প্রবাহ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার তীরে বাস করিতেছে এই অর্থের প্রতীতি হয়। চিদংশে "তত্" ও "ত্বং" পদের একত্ব থাকা হেতু জহতী লক্ষণা সম্ভব নহে, কেন না অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বরূপ বিরোধ উক্ত পদার্থদ্বয়ে দৃষ্ট হইলেও চৈতন্যস্বরূপ অবিরুদ্ধ বলিয়া অন্যার্থের গ্রহণ হয় না। নিজ বাক্যার্থের পরিত্যাগ না করিয়া অন্যার্থের গ্রহণ করাকে অজহতী লক্ষণা কহে, যথা "কৃষ্ণবর্ণ গমন করিতেছে" এই বাক্যে চেতনাশূন্য কৃষ্ণবর্ণের গমনরূপ বাক্যার্থে বিরোধ থাকায় "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়াও লক্ষণাক্রমে "কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের গমন" অর্থ করিতে হইবে। কিন্তু "তত্" ও "ত্বং" এই পদদ্বয়ের পরোক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের ঐক্যরূপ বাক্যার্থে বিরোধ বশতঃ বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্যার্থ লক্ষিত হইলেও সেই বিরোধ বিদ্যমান থাকায় "অজহতী লক্ষণা"ও সঙ্গত হইল না।

বাক্যার্থের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একদেশ গ্রহণ করাকে "ভাগ

লক্ষণা” কহে। যথা “ইহা সেই ভারতবর্ষ” বাস্তবিক পূর্ব্বকাল ও বর্ত্তমান-কাল-দৃষ্ট ভারতবর্ষ স্বরূপ বাক্যার্থের অংশে বিরোধ রহিয়াছে অর্থাৎ তেজঃ বীর্য্য অবস্থাদিতে ইহা সেই ভারতবর্ষ বলিয়া বিশ্বাস হয় না; কিন্তু এই বিরুদ্ধাংশ অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন ও বর্ত্তমানকালীন অবস্থাদি পরিত্যাগ করিলেই অবিরুদ্ধ “ভারতবর্ষ” মাত্র গৃহীত হয়; সেইরূপ “তত্ত্বমসি” বাক্যে পরোক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্যের ঐক্য বিষয়ক বিরোধ আছে সত্য, কিন্তু সেই বিরুদ্ধাংশ (পরোক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব) পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধাংশ অখণ্ড চৈতন্য মাত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে॥ ২৭।

রসাদি-পঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখ-সুখাদি-কর্ম্মণাম্।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ॥ ২৮।

এক্ষণ স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীর-ভেদে আত্মার উপাধি সকল বর্ণিত হইতেছে। পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন ও সুখ-দুঃখাদির মূল কর্ম্মজালের ভোগ-নিকেতন এবং প্রারব্ধকর্ম্মজাত ও বিনাশোত্পত্তিবিশিষ্ট মায়াবিরচিত এই অন্নময় কোষকে জ্ঞানিগণ আত্মার স্থূল উপাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন॥২৮

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃত ভূত সম্ভবম্।
ভোক্তুঃ সুখাদেরনুসাধনং ভবেত্
শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনোবুধাঃ॥ ২৯।

অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, মনঃ, বুদ্ধি, এবং শ্রোত্র, নেত্র, জিহ্বা, ত্বক্, ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ সর্ব্ব-সমেত সপ্তদশাবয়বযুক্ত লিঙ্গদেহ, চিদাভাসস্বরূপ কর্ম্মফলভোক্তা জীবাত্মার সুখ-দুঃখাদি অনুভবের সাধন স্বরূপ। এই লিঙ্গদেহকে জ্ঞানিগণ আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ২৯।

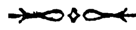
অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধি-ভেদাত্তু যতঃ পৃথক্‌স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েত্ ক্রমাত্॥ ৩০।

স্থূল শরীর ও সূক্ষ্মশরীর হইতে বিভিন্ন, অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় এবং

মায়ামাত্রকে আশ্রয় করিয়া যাহা বর্ত্তমান থাকে সেই আশ্রয়কে কারণ-শরীর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব আত্মাকে সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর হইতে পৃথগ্‌রূপে অবগত হইতে হইবে, অর্থাৎ "আত্মা" স্থূল শরীরের, সূক্ষ্মশরীরের, মায়াস্বরূপ কারণ-শরীরের অতীত॥ ৩০।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।



যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ।

যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ,
জানিতাম যাহা জানি অন্থ,
নির্ভীক নয়নে দেখিতাম জীবনে,
না হ'তেম ভীত অদৃষ্টের ভয়ে,
দিতাম বিশ্বকে বিশ্ব যাহা চাহে—
মনুষ্যত্ব—জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-বিভূষিত,
বীরত্ব—সতত দুষ্ট ভীত যা'র দর্পে,
বিশ্বাস—যাহার নয়নে দেখিতাম
চিত্তের গভীরতম অতল প্রদেশে,
যথায় বিশ্বের আরাধিত দেব
নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত নররূপে।
যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ—
জানিতাম যাহা জানি অদ্য,
গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া
নূতন নূতন উপাদান দিয়া।

যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ—
জানিতাম যাহা জানি অদ্য,

ভাবিতাম নিজেকে স্বরাট্—ভূমা—
স্বরাট্-কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—
উপাধি-বর্জ্জিত কারণ নিরাকার,
অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে আকার লইয়া,
অনন্তশকতি—কালদেশ-বিবর্জ্জিত
নররূপী সুবিচিত্র দেব নারায়ণ।
সাধিতাম সাধুকার্য্য ত্যজি অহঙ্কার,
দুঃখের অপূর্ব্ব রজ্জু বুনিতাম আমি,
ধরিয়া সে রজ্জু উঠিতাম আমি
বিভুর উত্তুঙ্গ সুন্দর মন্দিরে।
কালকে আমি করিয়া কিঙ্কর,
ভাসাতাম মোর জীবন-তরি,
চিত্তরূপ সুগভীর পারাবারে ;
উঠাতাম মূল্যবান্ কত মুক্তা।
দেখিতাম কত সুখের স্বপ্ন—
ভাবিতাম কত সুখের ভাবনা—
করিতাম কর্ম্ম কর্ত্তব্যের তরে,
নমিতাম সদা বিভুর চরণে—
বিশ্বকে ভালবাসিবার তরে।
স্বপ্ন সব মম হ'ত ফলবান্
চিন্তা করিতাম পরিণত কার্য্যে
যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ
জানিতাম যাহা জানি অদ্য,
গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া
নূতন নূতন উপাদান দিয়া।

যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ
জানিতাম যাহা জানি অদ্য,
রিপুগণে রাখিতাম বশে
রাখে নৃপগণ যথা কোষে

জানি রিপুগণ বলবান্ সদা।
　কিন্তু ইচ্ছাশক্তি বলবত্তরা,
নারীগণে ভাবিতাম আমি
　মাতা—দুহিতা—ভগিনী-সমা,
নরগণে ভাবিতাম সদা
　পুত্র—ভ্রাতা বা পিতার তুল্য।
যেমন শকতি-সামর্থ্য মোর,
　করিতাম সকলের উপকার।
এইরূপে মম অন্তিমদশায়
　হইত সম্পন্ন জীবনের ব্রত।
হইতাম কৃতার্থ আত্মজ্ঞানে,
　লভিতাম ব্রহ্মানন্দ এ জীবনে।
যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ
　জানিতাম যাহা জানি অদ্য,
গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া
　নূতন নূতন উপাদান দিয়া।

যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ
　জানিতাম যাহা জানি অদ্য,
আমি সেরে নিতাম সব ভুল,
　কভু না করিতাম ক্রোধ,
বুঝা'তাম সবে সুমিষ্ট বচনে
　মানব যে ভ্রমান্ধ জীব।
দুষ্টে শাসিতাম,
　শিষ্টে পালিতাম,
পরিহরি অহঙ্কার,
　দিতাম আলিঙ্গন
পরিতপ্ত জনে
　মানব যে ভ্রমান্ধ জীব!
অঙ্গার লইতাম,
　শর্করা করিতাম,

বিষকে করিয়া অমৃত
অসাধুকে করি সাধু,
করিতাম আপনাকে ধন্য।
যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ
জানিতাম যাহা জানি অদ্য।
গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া
নূতন নূতন উপাদান দিয়া।

শ্রীযদুনাথ।

আর্য্য-ব্যবহার-নীতি।

(২)

ধর্ম্মাধিকরণ।

স্মৃতিশাস্ত্রে আদর্শ-বিচার-সভাকে ব্রহ্ম-সভা বলা হইয়াছে।* মনু বলেন, যে সভায় ঋক্-যজুঃ-সামবেত্তা তিন জন ব্রাহ্মণ এবং রাজ-প্রতিনিধি একজন ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠান করেন, তাহাকে ব্রহ্ম-সভা বলে। এই রাজ-প্রতিনিধি বা প্রধান বিচারপতির অপর নাম প্রাড়্বিবাক। বৃহস্পতি-সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে প্রাড়্বিবাক সংজ্ঞার উৎপত্তি-কারণ উল্লিখিত আছে। ‡ মিত্রমিশ্র উহার বিবৃতি এইরূপ করেন,—(ক) 'পৃচ্ছতি' জিজ্ঞাসা বা পরীক্ষা করেন এবং পরে "বদতি" অর্থাৎ বিচার প্রকাশ করেন, অথবা "প্রাক্ বদতি"। (খ) যিনি প্রথমেই বাঙ্নিষ্পত্তি করেন।¶ যতদূর অবগত হইতে পারা যায়, প্রাড়্বিবাক্ বিচার-কার্য্য করিতেন, অপর তিন জন সভ্য বিচার-কার্য্যের সহায়তা, বর্ত্তমান কালের 'এসেসর' বা 'জুরীর' কার্য্য করিতেন। বিচারগৃহে কর্ম্মচারী, পুস্তকাগার, এবং বিচার-কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির সমাবেশ থাকিত। মহর্ষি বৃহস্পতি † বলেন, নৃপতি, তৎপ্রতিনিধি, বিচারকগণ, স্মৃতিশাস্ত্র, হিসাব-রক্ষক,

* মনু ৮ম অধ্যায়। ১১শ শ্লোক।
‡ বীর মিত্রোদয় পৃঃ ৩৭।
¶ বৃহস্পতি ১ম অঃ। ৬ শ্লোক।
† বৃহস্পতি ১ম অঃ। ৪ শ্লোক।

লেখক, সুবর্ণ, অগ্নি ও উদক্ এই দশটী ব্যবহার-প্রয়োগের অঙ্গ। বিচারালয়ে বিচারকগণের অনুবর্ত্তী রাজ-কর্ম্মচারী পদাতিক বা 'বেলিফ্' থাকিত। † বর্ত্তমান কালের ন্যায় অর্থি প্রত্যর্থিগণের উপর সমন জারি, পক্ষ ও সাক্ষিগণকে বিচারালয়ে উপস্থিত রাখা প্রভৃতি কার্য্য, ঐ কর্ম্মচারী করিতেন।

বৃহস্পতি, বিচার-গৃহের স্থান ও প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। নগর-প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য গৃহাদি হইতে দূরবর্ত্তী সজল সবৃক্ষ স্থলবিশেষ পূর্ব্বদ্বারবিশিষ্ট সুরম্য অট্টালিকা, গৃহাভ্যন্তরে মণি-মাণিক্য মাল্যাদি-বিভূষিত দেবমূর্ত্তি ও চিত্র-পটে সমাবৃত রাজ-সিংহাসন তৎকালে ধর্ম্মাধিকরণের গৌরব পরিস্ফুট করিত।

বিবাদপদ।

সংহিতা গ্রন্থ সমূহে ব্যবহার-নীতি (Substantive Law) ও ব্যবহার-মাতৃকা বা প্রয়োগবিধি (Adjective Law or Law of Procedure) উভয়ই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কুত্রাপি পৃথগ্‌ভাবে আলোচিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য নারদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি সংহিতাকারগণ এবং পরবর্ত্তীকালে মিত্রমিশ্র, দেবানন্দভট্ট নীলকণ্ঠ প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ বহুল পরিমাণে প্রয়োগবিধি বা ব্যবহার-মাতৃকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা যাইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টাদশ-প্রকার ব্যবহার-প্রবৃত্তির স্থান (Forms of Action) লিপিবদ্ধ আছে। তদন্তর্গত চতুর্দ্দশ প্রকার ধনবিষয়ক (Civil) এবং চতুর্ব্বিধ হানিমূলক (Criminal)। উক্ত ব্যবহার-পদাদি উল্লেখ করিয়া মনু বলিয়াছেন—

তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ॥
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ড-বাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেবচ॥

৮ম অধ্যায় ২-৬ শ্লোক।

অর্থাৎ, বিবাদ-বিষয়ের মধ্যে ঋণাদান (Recovery of debt), নিক্ষেপ (Deposit), অস্বামি-বিক্রয় (Sale without ownership), সম্ভূয় সমুত্থান (Partnership,) দত্তাপ্রদানিক (Non-delivery of sold chattel)

† বৃহস্পতি ১ম অঃ ১৫ শ্লোক।

বেতনাদান (Nonpayment of wages), সংবিদ্ব্যতিক্রম (Transgression of Compact), ক্রয়-বিক্রয়ানুশয় (Rescission of Sale and purchase) স্বামিপাল-বিবাদ (Disputes between owners of cattle), সীমাবিবাদ (Boundary disputes), বাক্‌পারুষ্য (abuse), দণ্ডপারুষ্য (assault) স্তেয় (Resumption of gifts), সাহস (Heinous offences), স্ত্রীসংগ্রহণ (Adultery), স্ত্রীপুরুষধর্ম্ম (Mutual duties of husband and wife), বিভাগ (Inheritance and Partition) দ্যূত এবং আহ্বয় (Dice and Gambling) এই অষ্টাদশ প্রকার পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিপাদো ব্যবহারঃ স্যাৎ ধনহিংসা-সমুদ্ভবঃ।
দ্বিসপ্তকো হ্‌র্থমূলস্তু হিংসামূলাশ্চতুর্বিধাঃ॥

* * * *

পারুষ্যে দ্বে সাহসাশ্চ পরস্ত্রী সংগ্রহস্তথা।
হিংসোদ্ভবপদাণ্যেবং চত্বার্য্যাহ বৃহস্পতিঃ॥ স্মৃতিচন্দ্রিকা।

অর্থাৎ ব্যবহার দ্বিপাদ, যথা—ধন-সমুদ্ভব ও হিংসা-সমুদ্ভব। অর্থসমুদ্ভব ব্যবহার চতুর্দ্দশ সংখ্যক এবং হিংসামূলক ব্যবহার চতুর্বিধ। উপরোক্ত অষ্টাদশ বিবাদপদ একশত দ্বাত্রিংশ শাখায় বিভক্ত করিয়া শাস্ত্রকারগণ আর্য্য-ব্যবহার-নীতির সীমার পরিচয় দিয়াছেন। নারদসংহিতার টীকাকার অসহায় উপরোক্ত অষ্টাদশ ব্যবহারপদ ও তাহার বিভাগ যেরূপ প্রদান করিয়াছেন তাহারই মর্ম্ম আমরা প্রদান করিলাম।

১। ঋণাদান ঃ—যে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং যে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না—তন্নির্ণয়াদি, ঋণ; সম্পত্তি; দুঃসময়ে ব্রাহ্মণের উপজীবিকা-নির্ণয়; প্রমাণাদি; ঋণদান; কুসীদজীব; প্রতিভূ; বন্ধক; দলীল পত্র; অনুপ-যোগী সাক্ষী; অর্থীর সাক্ষিগণ; প্রত্যর্থীর সাক্ষিগণ; যে সকল বিষয়ে সাক্ষীর অপ্রয়োজন তাহা নির্ণয়; সাক্ষ্যের বলবত্তার স্থায়িত্বের কাল; মিথ্যাসাক্ষী; সাক্ষিগণকে উপদেশ প্রদান; সঙ্গত সাক্ষ্য; অসঙ্গত প্রমাণ; সাক্ষ্য ও লেখ্যের অভাব-বিষয়ক তত্ত্ব; তুলা-পরীক্ষা; অগ্নি-পরীক্ষা; বারি-পরীক্ষা; বিষ-প্রয়োগ-পরীক্ষা; তর্পণ পরীক্ষা।

২। নিক্ষেপ ঃ—ন্যাস (Common deposits); ঔপনিধিক (Sealed deposits); যাচিতক (loans for use); অন্বাহিতক (deposits for delivery); শিল্পিহস্ত গত (failments with an artizan); পোগণ্ড-ধন (property of a minor)

৩। সম্ভূয় সমুত্থান ঃ—অংশিগণের দায়িত্ব ; বলি ; শুল্ক।

৪। স্তেয় ঃ—দেয় ; অদেয় ; সিদ্ধদান ; অসিদ্ধ দান।

৫। চুক্তিভঙ্গ বিষয়ক ঃ—সেবা ; অকরণীয় কার্য্য ; শিষ্যের আচার ; শিক্ষার্থীর আচরণীয় কার্য্য ; কার্য্যপরিচালকের কর্ত্তব্য ; পঞ্চদশ প্রকার দাস নিরূপণ ; দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার উপায় ; দাসগণের অধিকারাদি ; প্রভু কর্ত্তৃক দাসত্ব-মুক্তির প্রকরণ।

৬। বেতনাদান ঃ—ভৃত্যের বেতন ; গোপালক প্রভৃতি ; গণিকা বেতন ; আবাস-গৃহের জন্য দেয় শুল্কাদি।

৭। অস্বামি-বিক্রয় ঃ—স্বত্বহীন ব্যক্তির বিক্রয় ; নিধি (গুপ্তধন)।

৮। দত্তাপ্রদানিক।

৯। ক্রয়-বিক্রয়ানুশয় ঃ—কাল ; পরিহিত বস্ত্রাদি ; ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবহার-জনিত ক্ষয় ; বস্ত্রবয়ন।

১০। সংবিদ্ ব্যতিক্রম।

১১। সীমা-বিবাদ ঃ—ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় বিবাদ ; আবাস গৃহ সম্বন্ধীয় বিবাদ, উদ্যান সম্বন্ধীয় বিবাদ ; কূপ সম্বন্ধীয় বিবাদ ; দেবালয় সম্বন্ধীয় বিবাদ ; পল্লীর সীমাবিবাদ ; পথরোধ সম্বন্ধীয় বিবাদ (disputs regarding obstruction to thoroughfares etc.) ; পরীক্ষা-বিবাদ ; পতিত ভূমি ; শস্য-রক্ষা ; শস্যহানির ক্ষতি-পূরণ ; গৃহস্থের গৃহাদি রক্ষা।

১২। স্ত্রীপুরুষধর্ম্ম ঃ—পুরুষত্ব-পরীক্ষা ; বিবাহপ্রকরণ ; পুরোহিতের প্রতি অপমান-বিষয়ক অপরাধ ; কন্যার বিবাহদান-কাল নির্ণয় ; বর কিম্বা কন্যার অযশ-ঘোষণা-জনিত অপরাধ ; অষ্টপ্রকার বিবাহ নির্ণয় ; অসতী স্ত্রী-বিষয়ক ব্যবহার ; বৈধ সন্তান ; অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ ; তজ্জনিত পাপ ; ব্যভিচার ; পশুসংসর্গাদি ; পতিহীনার সন্তানোৎপাদন ; অবৈধসংসর্গজনিত সন্তান ; পত্নীতর ব্যক্তির সহিত বৈধ ও অবৈধ সংসর্গ ; অসৎ স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারবিধি ; প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার পালনীয় বিধি ; সমাগম-স্থান।

১৩। দায়ভাগ ঃ—পরিভাষা ; দায়বিভাগ ; অবিভাজ্য দায় ; স্ত্রীধন ; স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিত্ব ; ভ্রাতৃগণের সম্পত্তি-বিষয়ক বিধি ; পিতাপুত্রের সম্পত্তি-বিভাগ ; অজ্ঞাত পিতার কন্যা ; অবৈধসংসর্গজনিত পুত্র সম্বন্ধীয় বিধি ; উত্তরাধিকারী হওয়ায় অনুপযুক্ত পুত্র ও তাহার অংশ ; পুনর্মিলিত দায়াদের পুত্রগণের উত্তরাধিকারিত্ব ; রোগী বা বিদেশগত ভ্রাতার সম্পত্তি-সংরক্ষণ ;

ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের কার্য্য সম্বন্ধীয় বিধি; দায়মীমাংসা; বিভিন্ন প্রকার পুত্র নির্ণয়।

১৪। সাহস :—সাহস-পরিভাষা; শাস্তি-নির্ণয়; দস্যুবৃত্তি; মূল্যভেদে দ্রব্যভেদ নির্ণয়; দ্বিবিধ দস্যু; দস্যুধৃতি; পরস্বাপহারকের আহার ও আশ্রয়-দান; তস্কর; সাহস ও চৌর্য্যের শাস্তিপ্রদান; পদচিহ্ন দ্বারা তস্করধৃতি; অপহৃত বস্তুর অপ্রাপ্তিবশতঃ তস্করের দ্রব্যাদি রাজকোষভুক্ত-করণ।

১৫,১৬। বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য :—পরিভাষা ও শাস্তি-প্রদানাদি।

১৭। দ্যূতাহ্বয়।

১৮। বিবিধ :—চতুর্ব্বর্ণরক্ষা, নৃপতির পদ-গৌরব; নৃপতি কর্ত্তৃক বিপ্ররক্ষা, সম্পত্তি বিপ্রে দান জন্য নৃপতির অনুজ্ঞাগ্রহণ; ব্রাহ্মণের উপজীবিকা-প্রণালী-সমূহ; ভক্তির বস্তু।

হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রের উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে শ্রেষ্ঠ-সভ্যতা-গৌরব-মণ্ডিত জাতির উপযোগী ব্যবহারবিধি আর্য্যগণের মধ্যে যে প্রচলিত ছিল, তাহা আধুনিক ভাস্বর সভ্যতাদীপ্ত জাতিগণ অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। স্যার হেনরি সাম্‌সার মেন্ বর্ত্তমানকালোচিত প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক কোন বিধি হিন্দুব্যবহারশাস্ত্রে অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায় আর্য্য-ব্যবহার-নীতির অসম্পূর্ণতা-মূলক যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসমীচীন। পুরাকালের রাজা-প্রজা সম্বন্ধ, ইদানীন্তন ভূস্বামী ও কৃষকের সম্বন্ধের অনুরূপ ছিল না, তাহা সার হেন্‌রি মেন্ লক্ষ্য করেন নাই। রাজা বলি বা ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তৎকালে ভূসম্পত্তিতে সম্পূর্ণস্বত্বযুক্ত করগ্রাহী ভূস্বামী বিদ্যমান ছিল না। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-বিষয়ক আইন দ্বারা ইদানীং প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, পুরাকালে তাহাও বিদ্যমান ছিল না। এ সকল বিচারের এ স্থান নহে। হিন্দু আইনের প্রাচীন বিধি সকল আর প্রচলিত নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের মতে হিন্দুগণ উত্তরাধিকারিত্ব, বিবাহ, ধর্ম্মমূলক ক্রিয়াদি ও বর্ণাশ্রমসম্পর্কীয় বিষয় ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধির বশবর্ত্তী নহেন। তবে জাতীয়তার হিসাবে আমাদিগের পুরাতন কথা সকলের আলোচনা নিতান্ত নিষ্ফল নহে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, বি, এল্।

সন্ধান।

উন্নত শির তুলিয়া ভূধর
বক্ষ বিথারি সুনীল অম্বর
উছলি উঠে চপল সাগর,—
কাহার সন্ধানে ফেরে ?

ওই যে হোথায় ব্যগ্র নরনারী
মন্দির সমাজ মঠ গির্জ্জা ভরি
যুগ হইতে যুগান্তর ধরি,—
ডাকিয়া আকুল কা'রে ?

ওই যে সন্ন্যাসী ভস্ম মাখি
ধ্যান-মগ্ন কাহার লাগি ?
কে সে বাঞ্ছিত সর্ব্বত্যাগী,—
কোথায় তাহার ভূমি ?

যার সন্ধানে রবি শশী তারা
ঘুরে ঘুরে সদা হতেছে সারা
যার লাগি বিশ্ব পাগলপারা,—
কেবা সে বিশ্ব-স্বামী ?

আছে কি সে জন মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনমোদিত ত্রিদিবের পুরে
রত্ন-খচিত সিংহাসন পরে,—
অপ্সরী বেষ্টিত হয়ে ?

অথবা কি আছে মানবের প্রাণে
তরুর মর্ম্মরে বিহগের গানে
বিশ্ব-প্রকৃতি ধূলিকণা সনে,—
আপনার তনু মিলায়ে ?

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

কলিকাতা মহানগরীতে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়, তখন যশোহরজেলাবাসী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, আর্য্যাবর্ত্ত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জমিদার প্রভৃতি, যশোহরে সাহিত্য-সম্মিলনকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরকে অনুরোধ করেন। তখন রায় বাহাদুর সম্মিলনকে আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ উহা সমর্থন করেন।

তখন শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর জানিতেন না যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনকে আহ্বান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। পরে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ঐ কথা সম্মিলনে প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন বর্দ্ধমানে হওয়ায় সম্মত হইয়া স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, অষ্টম সম্মিলন বর্দ্ধমানে এবং নবম সম্মিলন যশোহরে হইবে। তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর প্রত্যাগমন করিয়া যশোহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা এই শুভ অনুষ্ঠানে সম্মতিপ্রদানপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করেন। পরে বর্দ্ধমানে অষ্টমসম্মিলনের সময় শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর, যশোহরের অনেক প্রধান ২ ব্যক্তি দ্বারা বর্দ্ধমানে নিজে যাইয়া যশোহরে সম্মিলনকে আহ্বান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বর্দ্ধমানে যান, কিন্তু বিশেষ কার্য্যবশতঃ সভার শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে না পারায় সভা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিদিগের অনুমতি লইয়া সমাগত সাহিত্যিকমহোদয়দিগকে নবম অধিবেশনের জন্য যশোহরে আগমন করিতে নিমন্ত্রণ করেন। সভার শেষ সময়ে চৌবেড়িয়ানিবাসী কবিবর ৺ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোহরের পক্ষ হইতে সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বঙ্গের সাহিত্যিকদিগের যেরূপ যত্ন ও সমাদর করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেরূপ অকাতরে অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতে কতিপয় প্রধান ব্যক্তি মহারাজাধিরাজকে নবম সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি করা সঙ্গত মনে করেন। তাঁহারা বলেন, বর্দ্ধমানের

মহারাজাধিরাজ শুধু "রাজা" নহেন, তিনি সুযোগ্য সাহিত্যসেবীও বটেন। আর সাধারণ সভাপতি যে কেবল প্রবীণ সাহিত্যিকই হইবেন, এরূপ নিয়ম নাই। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন, সুতরাং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সাধারণ সভাপতি হওয়া অসঙ্গত বা অশোভন নহে। অতএব বর্দ্ধমানাধিপতিকে সভাপতি করাই সঙ্গত। এই বিষয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের নিকট ব্যক্ত হইলে, তিনি "অভ্যর্থনা-সমিতি যদি তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করেন, তাহা হইলে তাঁহার অসম্মতি হইবে না," এরূপ প্রকাশ করেন।

পরে যশোহরে অভ্যর্থনা-সমিতি-গঠন এবং সম্মিলনের কার্য্য-ব্যবস্থার জন্য যশোহরবাসীদিগের যে সাধারণ সভা হয়, তাহাতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে নবম সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি মনোনীত করা হয়।

তৎপরে সম্মিলনের কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর, বর্দ্ধমানে গমন করেন। তখন তাঁহার সহিত বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের ঐ বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়। তৎকালে মহারাজাধিরাজ সম্মিলনের সভাপতিত্বগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে সম্মিলনের প্রথম দিনে যশোহরে আগমন করিবেন—বলেন।

তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুরকে ইংরেজীতে যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রিয় রায় বাহাদুর,—আগামী ডিসেম্বর মাসে যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনে আমি কেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিব না, তাহা আপনাকে মৌখিক বলিয়াছি, এখন তাহা লিখিয়া জানাইতেছি। আপনি ও যশোহরের ভদ্র মহোদয়গণ আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নানা কারণে আমি আপনাদের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করিতে অপারগ। কয়েকটী কারণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি ;—

(১) আমার মতে যিনি বাঙ্গালাদেশে সারা জীবন সাহিত্যচর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ং একজন সিদ্ধ সাহিত্যিক তাঁহাকেই সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত। আমি সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং আমার পক্ষে সভাপতির পদ গ্রহণ শোভনীয় নহে। (২) দ্বিতীয়তঃ গত দুইবার সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আমি যে অভিজ্ঞতাটুকু অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে সম্মিলনের সভাপতির পক্ষে শুধু বহুল

অধ্যয়নশীল হইলেই চলে না, পরন্তু তাঁহাকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে অভিনিবিষ্ট রাখিতে হয় এবং আপন অভিভাষণে নীরস ঘটনাবলীর সঙ্গে গবেষণামূলক অনেক মনোরম তথ্যের অবতারণা করিতে হয়। এক্ষেত্রেও আমার ক্ষুদ্রজ্ঞান আপনাদের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণের অন্যতম অন্তরায়। (৩) তৃতীয়তঃ যেহেতু সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত অধিবেশন বর্দ্ধমানে হইয়াছিল, তজ্জন্য এবং অন্যান্য অনেক কারণে আমি এবার সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইতে পারিব না—তা সে যশোহরে হউক্ কি অন্যত্রই হউক্।

অভ্যর্থনা-সমিতি এখনও সম্মিলনের সাধারণ-সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই। শীঘ্রই সভাপতি মনোনীত হইবেন। অভ্যর্থনা-সমিতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে দর্শন-শাখার, শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি; এফ্ জি এস্ মহাশয়কে বিজ্ঞান-শাখার এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়কে ইতিহাস-শাখার সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন। ইঁহারা তিনজনেই পদগ্রহণে সম্মতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। সাহিত্য-শাখার সভাপতি অদ্যাপি মনোনীত হন নাই; শীঘ্রই হইবেন।

প্রাচীন ও আধুনিক যশোহরের সাহিত্য-সেবিগণের গ্রন্থ, রচনা ও ছায়াচিত্রাদি এবং ঐতিহাসিক উপকরণ, সম্মিলনে প্রদর্শিত ও রক্ষিত হইবার জন্য সংগৃহীত হইতেছে।

জেলা ও সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তালিকা পরে প্রকাশিত হইবে।

সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়াছেন।

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।

রায় বাহাদুর রাধিকাচরণ দত্ত, বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী, বাবু অম্বিকাচরণ বসু, বাবু সুখময় দাসগুপ্ত, পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী, খোন্দকার তোফেলুদ্দীন। —সম্পাদক।

বাবু বরদাকান্ত রায়, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী, বাবু কালিদাস মিত্র, বাবু বিজয়গোপাল বসু, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মিত্র। —সহকারী সম্পাদক।

বাবু দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ।

উপর্য্যুক্ত কর্ম্মচারীগণ এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, বাবু সুরেশচন্দ্র রায়,

বাবু গগনচন্দ্র রায়, বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষাল, বাবু বসন্তলাল সরকার, বাবু শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামদাস স্মৃতিতীর্থ, বাবু নগেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু শ্যামলাল বন্দোপাধ্যায়, বাবু নবকুমার চৌধুরী, বাবু প্রিয়নাথ সেন, বাবু কুমারপরাক্রম মজুমদার, বাবু কুমার অধিক্রম মজুমদার, বাবু হরিলাল মিত্র, বাবু দ্বারকানাথ রায়, বাবু হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু শিরিশচন্দ্র বসু, বাবু দুর্গাচরণ সেন, বাবু শিশিরকুমার বসু, বাবু বসন্তকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাবু সুরেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কেদারনাথ চন্দ্র, বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত, বাবু বেণীমাধব মিশ্র, বাবু আনন্দমোহন চৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

অশোক অনুশাসন। পালিগ্রন্থ ধর্ম্মপদের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ। অশোকের জীবনী ও মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীচারুচন্দ্র বসু ও শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম্, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পুস্তকখানিতে মহারাজা অশোকের সমগ্র অনুশাসন, উহার সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ, অনুশাসনাবলীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, ভৌগোলিক বিবরণ, উৎকীর্ণ অনুশাসনের কাল এবং সম্পাদকের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত অশোকের অনুশাসন এবং তাহার অনুবাদ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। মহারাজ অশোকের লিপিমালা, ইংরাজী ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় সমগ্র অনুশাসন প্রকাশিত হয় নাই। চারু বাবুর অধ্যবসায় এবং যত্ন দ্বারা এই বহু দিনের অভাব তিরোহিত হইয়াছে।

মহারাজ অশোকের ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্যক্‌রূপ বুঝিতে হইলে, অশোকের গিরিলিপি, স্তম্ভলিপি গুলি বিশেষ রূপে জানা চাই। অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের হিতসাধনার্থে অনেক মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি এই দুই নীতির সামঞ্জস্য করিয়া এক নূতন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করাই মহারাজ অশোকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের ন্যায় প্রজা-বৎসল রাজা, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে খুব কমই দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত জিনিষের ঐতিহাসিক বিবরণ জানিতে হইলে অশোকের লিপিমালার সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

চারু বাবু অনুশাসন গুলিকে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া এবং বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া অশোক-চরিত্র এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্যক্ রূপে বুঝিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

দান। শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল ক্ষেত্রী মহাশয় সম্প্রতি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি সদুদ্দেশ্যে দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। যাহাদের জল আচরণীয়, সেই সমস্ত জাতির বালকগণের জন্য একটী বিদ্যালয়ের, অনাথাশ্রমের এবং হিন্দু-বিধবাগণের সাহায্যের নিমিত্ত ক্ষেত্রী মহাশয়ের এই দান। শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা, অনাথ ও অনাথাগণের আশ্রয়-প্রদান ও সাহায্য-ব্যবস্থা চিরদিনই সৎকর্ম্ম। দাতার জয় হউক্।

মায়ের খেলা। গত ১৩ই আগষ্টের ষ্টেটস্‌ম্যান্ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ফ্রান্সের নবসাপেলের যুদ্ধক্ষেত্রে একদল শিখ-সৈন্য, জার্ম্মাণ-সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। অকস্মাৎ তাহারা দেখিল, বিমানপথে কৃপাণহস্তে রণরঙ্গিণী কালী-মূর্ত্তি! করালী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে জার্ম্মাণগণ পলায়ন করিল; শিখ-বীরগণ মহাপরাক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। জগজ্জননীর কৃপায় তাহারা সঙ্কটে উদ্ধার পাইল, জয়যুক্ত হইল। মায়ের খেলা ভিন্ন এ আর কি?

চুরি। ১৬।১নং আলিপুর লেনে সন্তোষের রাজা বাহাদুর বাস করেন, এই বাড়ী হইতে সম্প্রতি রাজা বাহাদুরের পাঁচ হাজার পঞ্চাশ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার ও হীরকালঙ্কার চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর সমাজের কণ্টক, ভগবান্ করুন, চোর ধৃত ও দণ্ডিত হউক্।

খেলায় মৃত্যু। [illegible]ন্তরে প্রকাশ—কিছুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহের সুশীলকুমার বসু ফুটবল খেলিতে গিয়া সাংঘাতিক ভাবে আঘাত পায়, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আঘাতেই তাহার প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। হায়! খেলার কল্যাণে যে ভবের খেলা সাঙ্গ হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল! দুর্দ্দৈব!

ওস্তাদের মহাপ্রস্থান। গত ১৭ই আগষ্ট রাত্রিকালে সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ 'বেঞ্জো'বাদক ওস্তাদ আসাদুল্লা খা কৌকব মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। ইঁহার ন্যায় সূক্ষ্ম সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বর্ত্তমানে এ প্রদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীত-তত্ত্বের কূট প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি কলিকাতার "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার স্থান পূরণ সহজে হইবে না।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন।

১৩২২ সাল।
১৮৩৭ শকাব্দা।

ছায়া ও মায়া।

ছায়া—মায়া অভিন্ন স্বভাব;
আছে কায়া তাই ছায়া, আছে সত্য তাই মায়া;
ভাব-জাতা, আপনি অভাব।
কাছে রহে নিরবধি, ধরিতে বাসনা যদি,
যত ধাই করে পলায়ন;
আবার বিরাগ ভরে যদি যাই দূরে স'রে,
পিছে পিছে করে আগমন।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।



জীবে দয়া—নামে রুচি।

(রাজসাহী বৈষ্ণব-সভায় পঠিত)

জীবে দয়া—নামে রুচিই বৈষ্ণবের সার-সম্বল—মুক্তি-মন্ত্র। বৈষ্ণব দলাদলি চাহেন না—হিংসাদ্বেষের আধিপত্য স্বীকার করেন না—প্রকৃত বৈষ্ণব একত্বের

উপাসক। একত্বের উপাসনা আছে বলিয়াই আজ বৈষ্ণব-সমাজ পূজা পাইতেছেন, একত্বের আরাধনা করেন বলিয়াই বৈষ্ণব সর্ব্বত্র সমাদৃত। পরকে "আপনার জন" বলিয়া কোলে টানিয়া লইতে—পতিতকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য হস্ত-প্রসারণ করিতে—ভেদ-জ্ঞানের তুমুল-তুফানকে উপেক্ষা করতঃ আপনার ভাই বলিয়া—বন্ধু বলিয়া,—স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিতে বৈষ্ণবই পারেন। বিভিন্নশ্রেণীর শক্তি-উপাসক পরস্পর এক হইতে পারেন না, বিভিন্নজাতীয় সৌরবৃন্দ কেন্দ্রীভূত হইতে পারেন না, কারণ সেখানে ছোট বড়, ধনি-নির্দ্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ এই ভেদ ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।* কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি, তাঁহার নিকট ভেদ-জ্ঞান নাই, ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই; তাঁহার নিকট সব সমান। এই সমতা আছে বলিয়াই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব, এই সমতা রক্ষা করিয়া চলিবার শক্তিই বৈষ্ণবের বিশেষত্ব। ফলতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িকতার সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ।

দেশের শাক্ত—সৌরাদি ভেদ-বুদ্ধি যেন চীন দেশের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় গর্ব্বোন্নতবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরস্পরকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এই রূপ সংকীর্ণতা এখন হিন্দু-সমাজশরীরের অস্থি মজ্জায় বিজড়িত, সুতরাং সেখানে ভ্রাতৃভাব তিষ্ঠিতে পারে না। তাই বলি, যদি ভ্রাতৃ-প্রেম দেখিতে চাও, তবে সমজ্ঞান-সম্পন্ন বৈষ্ণবের নিকট গমন কর; যদি উদারতা শিক্ষা করিতে চাও; তবে প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবায় বিনিযুক্ত হও; যদি মনের ময়লা ঘুচাইতে ও সমাজকে শান্ত করিতে চাও, তবে দিবানিশি শ্রীহরির চরণ চিন্তা কর।

তুমি বলিবে "আমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ, আমি বৈদ্য, আমি কৈবর্ত্ত, আমি ধোপা; আমি শ্রেষ্ঠ, সে নিকৃষ্ট, আমি উত্তম, সে অধম, তিনি মধ্যম; এই "দাবার চাল" অবিরত চলিতেছে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহার কোনও দিন অন্ত পাইয়াছ কি? পাও নাই—পাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ কোন দিনই জীবে দয়া—নামে রুচির মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর নাই। এই জীবে দয়া—নামে রুচির মধ্যে যে কি বিশালত্ব, কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি নিহিত আছে, তাহা সাধারণে বুঝিবে কেমন করিয়া? ভেদ-জ্ঞানের ঠুসী খুলিয়া ফেল, দেখিবে, সম্মুখে কি মহিম-মণ্ডিত অপার্থিব বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। দেখিলে

* সর্ব্বমার্গেই প্রকৃত সাধুরা ভেদ-জ্ঞানশূন্য। যাঁহারা ভেদদর্শী, তাঁহারা যে মার্গীই হউন, ভগবদ্দর্শন হইতে বহু দূরে। সকল মার্গেই উদারতা—সমদর্শন আছে, কোনও ধর্ম্মমার্গ মন্দ নহে, তবে যোগ্য অধিকারী হওয়া চাই। হিঃ পঃ সঃ

সংকীর্ণতা ঘুচিবে, পার্থক্য পলাইবে, দীনের প্রতি ঘৃণা অন্তর্হিত হইবে। তখন বুঝিবে—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি প্রভাবান্বিত, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিরূপ পতিত-পাবন!

দেখিতে পাই, বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কোন মার্গাবলম্বীই "অহং-জ্ঞান"কে নাশ করিতে চাহেন না। কেন চাহেন না জানি না—তবে প্রতিনিয়ত চক্ষুর সম্মুখে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয়, অন্য কোন মার্গই "দীনতা" দান করিতে পারে না। এই দীনতাই বৈষ্ণবত্ব-লাভের একমাত্র উপায়। দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অহং-জ্ঞান দূরে পলায়ন করে—তখন মানব জগৎকে প্রেম-ভক্তি-প্রীতিপূর্ণ আনন্দ-নিকেতন জ্ঞান করিয়া আত্মহারা হয়। সুতরাং বৈষ্ণবত্ব-লাভের দীনতাই প্রথম ও প্রশস্ত উপায়। দীনতাই বৈষ্ণব-জগতের মরকত-মন্দির।

বৈষ্ণব হইতে হইলে ত্যাগী হওয়া চাই। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি রাখিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। ধন-জন-যৌবন মায়া-মোহ-মমতা হিংসা-দ্বেষ অভিমান প্রভৃতি গন্তব্যপথের জঞ্জাল গুলিকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে; নতুবা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইবে। ত্যাগ-স্বীকারের অপূর্ব্ব আদর্শ জ্ঞানগুরু চৈতন্য-দেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে বিষয়ের প্রয়োজন হয় না—পুত্র কলত্রের প্রয়োজন হয় না—সংসারের আনুগত্য অনুরক্তিও কার্য্যকরী হয় না। চাই ভক্তি—ভালবাসা, চাই প্রেম—প্রীতি, চাই আন্তরিকতা—একাগ্রতা, চাই সংযম—সৎশিক্ষা, আর সর্ব্বোপরি জীবে দয়া—নামে রুচি। এই গুলি যিনি সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি ধনে দীন হইলেও জ্ঞানে ধনী—সংসারী হইলেও সন্ন্যাসী, ক্ষুদ্র হইলেও মহৎ এবং জন্মে হীন হইলেও কার্য্যে জগৎপূজ্য।

শোক-তাপ-জন্ম-মৃত্যু-সংক্ষুব্ধ নির্ম্মম সংসারের কঠোর বক্ষে বিচরণ করিয়া যিনি হতাশার অবসাদে অবসন্ন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ তাঁহাকে স্বর্গীয় আনন্দ প্রদান করিবে। রোগী, শোকী, জ্ঞানী গুণীর হৃদয়, হা হুতাশে পূর্ণ হইলে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মই তাঁহাদের স্বর্গীয় শান্তি প্রদান করিবে। এ ধর্ম্মে নিরাবিল আনন্দ, নিরঙ্কুশ সুখ-সম্ভোগ। ইহা অহর্নিশ প্রেমতুফানে হৃদয়ের জ্বালামালা ভাসাইয়া দেয়, সংকীর্ণতা দূর করে, প্রাণে প্রেমের মন্দাকিনী বহাইয়া দেয়; তাই বলি যে যেখানে আছ এস ভাই! নাম সুধা-পান করিয়া কল্মষনাশ কর—আর বাহু তুলিয়া অবিরাম বল "হরি বোল হরি!"

যে ধর্ম্ম "আমি" "আমার" ভুলাইয়া দেয়, যে ধর্ম্ম জীবের মঙ্গলের জ

অবিরত বক্ষ পাতিয়া আছে, যে ধর্ম্ম অনৃত ফেলিয়া অমৃতে আস্থা স্থাপিত করিতে উপদেশ দেয়, যে ধর্ম্ম অতি সহজে পরকে আপনার করিবার জ্ঞান দান করে, আর যে ধর্ম্ম যবনকেও "হরিদাসে" পরিণত করাইতে পারে, এস ভাই! সেই পরতর ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ লাভ করিবার জন্য একমন একপ্রাণ হইয়া হৃদয় ভরিয়া বলি "হরি বোল! হরি বোল!! হরি বোল!!!"

ভক্ত সাধকেরা বলিয়াছেন "তন্‌কি ভুখ তনক হ্যায় তিন পাও কি সের, মনকি ভুখ্ বহুৎ হ্যায় মেরু সুমের" অর্থাৎ শরীরের ক্ষুধা কম—তিন পোয়া কি একসের হইলেই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু মনের ক্ষুধা এত বেশী যে মেরু-সুমেরু-প্রমাণ আহার্য্য পাইলেও নিবৃত্ত হয় না। তাই বলি ভাই! মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য হরিনামামৃত পান কর। হরি-নামামৃত পানে ভবের ক্ষুধা দূরে যাইবে—আর তোমাকে "খাই খাই" করিতে হইবে না—আর তোমাকে জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না—আর তোমাকে আসা যাওয়ার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। হরি-নামের গুণে—কৃষ্ণ-নামের গুণে তোমার সকল ব্যাধির অবসান হইবে। সুতরাং শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, রোগে শোকে, সুখে দুঃখে নিরন্তর বদন ভরিয়া কৃষ্ণপ্রীতে বল "হরিবোল হরি!"

ভবনদী পার হইবার সার্ব্বভৌম উপায়—পাপী তাপী রোগী শোকীর সহজে তরিবার উপায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অভিমান-শূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরি-নাম করিলেই জীব ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। কলিতে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধনা। এমন সহজ উপায়—এমন পবিত্র ভাব—এমন সর্ব্বজীবের তরিবার সমান উপায় অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। জ্ঞানগুরু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই পাপী তাপী মানবের মুক্তির জন্য অতিসরল অতিসহজ পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "কলির জীব! যদি তরিতে চাও, তবে প্রাণ ভরিয়া বল "হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!" মুগ্ধ মানব! যদি মরণের পর সুখ চাও, শান্তি চাও, তবে প্রাণ ভরিয়া নামামৃত পান কর—নাম-সংকীর্ত্তনে মত্ত হও! অবিরাম "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া মরণতরণের পথ প্রশস্ত কর!

হরিনাম সকল নামের সেরা। এমন সুন্দর নাম আর নাই। এ নামের এমনই গুণ যে,—

পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে ॥

হায় হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে, এমন নাম উচ্চারণ করিতেও অবহেলা করি! ভবসাগরের পারের কাণ্ডারী কৃষ্ণকে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেও চেষ্টা করি না! জীব, একবার চেষ্টা করিয়া দেখ, তোমার জড় জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় কিনা! একবার প্রাণ ভরিয়া বল ভাই—

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কলিতে হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই! এ নামের এমনই গুণ যে, হেলা করিয়াও যদি এই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায়, তাহাতেও জীবের উদ্ধার হয়। নামের গুণে ম্লেচ্ছও ভবনদী পার হইতে পারে

মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞাভাবেতে।
কৃষ্ণ-রাম বলে হেলা নামাভাস তাতে ॥
এই সব নামাভাসে ম্লেচ্ছগণ তরে।
বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে ॥

"কৃষ্ণনাম" ভক্তিতেই বল, আর অভক্তিতেই বল, হেলা করিয়াই বল, আর শ্রদ্ধা করিয়াই বল, নামের গুণে—নামের মাহাত্ম্যে তুমি ভব-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেই পাইবে। এই নামের এত শক্তি যে, মায়াবদ্ধ পাপে তাপে জর্জ্জরিত আমাদের অবশ রসনা যদি একবার ভক্তিভরে এ নাম উচ্চারণ করিতে পারে, তবে আর ভাবনা ভাবিতে হয় না; কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আপনি আসিয়া তাঁহার সেই ভক্তকে কোলে তুলিয়া লয়েন। তখনই ভক্ত কৃতার্থ, তখনই ভক্তের মানব-জীবন সার্থক। তাই বলি ভাই! যখন দুর্লভ মানব-জীবন লাভ করিয়াছ, তখন অন্তিমের ভাবনা ভাবিয়া লও—ভব পারের কর্ণধারকে ডাকিয়া লও! যাহাতে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন বৃথায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহারই জন্য ভক্তিভরে হরিনাম-সংকীর্ত্তন কর; আর চিন্তা কর :—

শ্রীহরির নাম করিতে কীর্ত্তন
মনেতে বাসনা যার,
তৃণের চেয়েও সুনীচ হইয়া
থাকাই সুযুক্তি তার।

মিথ্যা অভিমান করি পরিহার
ধূলায় মিশিয়া যাও।
ক্ষুদ্র তৃণ যথা জীব-পদতলে
তেমনি সদা লুটাও ॥
ছেদনকারীরে ছায়াদান করি
তরু যথা তুষ্ট করে।
তুমিও তেমনি নিজ শত্রু-জনে
মান দাও তুষ্টি তরে ॥
এরূপে তোমার মলিনতা যাবে
প্রশান্ত হইবে প্রাণ।
পাইবে আনন্দ ঘুচে যাবে ধন্দ
করি হরিনাম-গান ॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মা।

হরিনাম।

গাও হরিনাম জপ হরিনাম,
ডাক "হরি হরি" ব'লে
নামে যাবে দুঃখ পাবে চির সুখ;
ডুব নাম-সিন্ধু-জলে।
নামে আছে সুধা যাবে ভব-ক্ষুধা
পান কর অবিরাম;
এই কলিকালে যোগ-যাগ-বলে
নাহি পাবে শান্তিধাম।
এক মাত্র নাম সুখ-মোক্ষধাম
জপ ভাই ভক্তিভরে,
পাপতাপ আদি যত ভব-ব্যাধি
নামে সব লবে হ'রে।

নামে চিত্তশুদ্ধি　　　নামে সাধ-সিদ্ধি
রিপুগণ হবে বশ,
নাহি কালাকাল　　　জপ সদাকাল
ছাড়ি বৃথা রঙ্গ রস।
নাম ব্রহ্মময়,　　　ব্রহ্মানন্দময়
হবে শুধু নাম-বলে
না রবে বিকার　　　হবে নির্ব্বিকার
নাম-রস-পান-ফলে।
নামে সর্ব্ব শক্তি　　　নামে গতি মুক্তি
প্রেম-ভক্তি আছে মাখা,
নামে হ'লে রতি　　　পাইবে পিরীতি
ঘুচে যাবে সব ধোকা।
মাতি প্রেম ভরে　　　রস-সরোবরে
যাবে ডুবে ভাবে মিশি—
প্রাণধন পাবে　　　ভাবময় হবে
ম'জে রবে দিবানিশি।
আর কেন তবে　　　মায়াময় ভবে
কর বৃথা কাল-ক্ষয়,
বল "হরি হরি"　　　দিবা বিভাবরী
পাবে সেই রসময়।

শ্রীবরদাকান্ত দে।

দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫) দেবগণ কি নিরাকার ?

এখন বিচার্য্য, দেবগণ নিরাকার কি সাকার ? তাঁহারা যে স্বভাবতঃ স্থূলদেহী নহেন, তাহা স্পষ্টই জানা যায়। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের যে যে লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন, তত্তল্লোকসুলভ জড়-উপাদান আশ্রয় করিয়া এক একটা দেহ

ধারণ করেন—এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ২ প্রমাণ আছে, আমরা সেই সকল প্রমাণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। দেবগণের যে শরীর আছে, সে সংবাদ বিস্তর বৈদিকস্তোত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদান্তও ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র "সাকার"। তিনি বলিয়াছেন ঃ--"ইন্দ্রনামা কশ্চিৎ বিগ্রহবান্ দেবঃ" (১-২-২৯)

বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে তিনি অন্যত্র (৩-১-২৭) দেবতাদিগের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা একই সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে সমর্থ। ঐ শরীরকে "কায়-ব্যূহ" বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেবগণের নিজস্ব বিশেষ আকার আছে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সেই আকার পরিবর্ত্তিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ দেহ গ্রহণ করিতে পারেন। ইন্দ্রকে কেন যে "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে" অর্থাৎ "একই ইন্দ্র বহুবিধ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন" এইরূপ বলা হয়, আমরা এক্ষণে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে হয় যে, ঐ কথাটী মীমাংসাদর্শনকারের মতবিরুদ্ধ। জৈমিনি ঐ দর্শনের প্রবর্ত্তক। তিনি বলেন "মন্ত্রাত্মিকা দেবতা" অর্থাৎ মন্ত্র ও দেবতা পৃথক্ নহে। ইহাতে আমি এইটুকু বুঝি যে, যখন কোন বিশেষ দেবতার উদ্দেশে কোন বিশেষ মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, তখন সেই উচ্চারণ-প্রসূত ব্যোম-কম্পনে উচ্চতর লোকে বিশেষপ্রকার মূর্ত্তি গঠিত হয়। উদ্দিষ্ট দেবতা সেই মূর্ত্তিতে তৎকালে আবিষ্ট হইয়া থাকেন।

(৬) মন্ত্র কি ?

এতৎ-প্রসঙ্গে মন্ত্র ও তাহার ফল সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিলে তাহা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মন্ত্রের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয় যে, উহা "বিশেষপ্রকারে উচ্চারিত ও বিশেষপ্রকারে সজ্জিত শব্দ-রাশির নিরূপিত ফল।" শব্দ-রাশি হইতে কম্পন উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিম্বা, এরূপও বলা যাইতে পারে যে শব্দ নিজেই কম্পন-বিশেষ। মন্ত্রোচ্চারণ করিবা মাত্রই বিশেষ প্রকার কম্পন-ধারা উদ্ভূত হয়। আমরা শুনিয়াছি যে, এই কম্পন-ধারা যদি নিয়মিত ও নির্দ্দোষ হয়, তবে উহা কোষ-মধ্যস্থ কম্পনকে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিয়া থাকে এবং তাহাকে নিয়মিত ছন্দঃ ও সুরে পরিণত করে। মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সাধকেরও উপকার হইয়া থাকে। উহাতে তাঁহার প্রার্থিত দেব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। উহাতে তাঁহার হৃদয় দ্বেষ-শূন্য হয়, হৃদয়ে অসদ্ভাব আর তে...পারে না; সুতরাং মন্ত্রোচ্চারণ-প্রভাবে সাধকের পারিপার্শ্বিক

উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই গুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে বিষয়ি-সংশ্লিষ্ট; অর্থাৎ, ইহা সাধকের সহিত জড়িত, কিন্তু মন্ত্রের অপর একটী দিক্‌ও আছে, সেটা বিষয়-ঘটিত। আমরা এই শেষোক্ত দিক্‌টারই এক্ষণে আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কম্পনই শব্দ। উহার প্রভাবে নির্দ্দিষ্টপ্রকার আকা-রও সৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক শব্দই সূক্ষ্মজগতে একটী করিয়া আকার উৎপাদন করে। শব্দনিচয়ের সমাবেশ হইতেই জটিল মূর্ত্তির উদ্ভব হয়। স্কুল-পাঠ্য বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক গুলিতে একপ্রকার পরীক্ষার বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার বিবরণ দেখা যায় যে, যন্ত্র-বিশেষের শব্দ হইলে বালুকা-স্তীর্ণ ভূমির উপর তাহার একটা চিহ্ন রহিয়া যায়। সেই চিহ্নগুলি জ্যামিতিক চিত্রবৎ। প্রাগুক্ত পুস্তকে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ছন্দো ঘটিত ব্যোম-কম্পন হই-লেই তাহাতে রীতিমত জ্যামিতিকচিত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে; হিন্দুদিগের সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরের (রাগ-রাগিণীর) বিশেষ ২ মূর্ত্তি আছে। সেই সকল মূর্ত্তির বর্ণনা অতি সুন্দর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—"মেঘ" রাগের মূর্ত্তিটী উদাত্ত-গম্ভীর এবং হস্তীর পৃষ্ঠে উহার অব-স্থান। বসন্ত রাগকে পুষ্পদামশোভিত সুন্দর যুবকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের 'কুপিৎ' নামক দেবতার ন্যায় উহার মূর্ত্তি। এতাবদ্ব্যাপারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিশেষ কোন রাগ বা রাগিণীর যথার্থরূপ আলাপ হইলে তাহাতে এক প্রকার বিমানচারী ব্যোমকম্পন হয়। ঐ কম্পনের ফলে সেই রাগ বা রাগিণীর বিশেষ ২ লক্ষণাত্মিকা মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সব তথ্য প্রথমে নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু সম্প্রতি মিসেস্ ওয়াটস্ হগ্‌স্ নাম্নী প্রতিভাশালিনী রমণী পরীক্ষা দ্বারা উহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইনি "শব্দ-মূর্ত্তি" পুস্তকের রচয়িত্রী। ইনি বহুকাল ধরিয়া যত্নসহকারে বিজ্ঞানা-লোচনা করেন। তাহার ফলে যে সমুদয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়, তাহা সাধারণের সমক্ষে ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে ইনি লর্ড লিটনের পাঠাগারে বিচক্ষণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সম্মুখে সম্প্রতি "শব্দ-মূর্ত্তি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। শুধু বক্তৃতা নহে, পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণ করিয়াছেন। সম্বাদপত্র সমূহে তদীয় বক্তৃতার যে মর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। মনে হয়, উহা চিত্তাকর্ষক হইবে। মিসেস্ হগ্‌স্ সংক্ষেপে তাঁহার আবিষ্কৃত সত্যের বর্ণনা করিয়া ছিলেন। যাহাতে নাম জাহির হইয়া পড়ে, এরূপ ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিলনা। কিন্তু তিনি যাহা ২ বলিলেন, আলোকচিত্রেও যখন তাহা চিত্রিত হইতে লাগিল, তখন

দর্শকমণ্ডলী মহোল্লাসে অধীর হইয়া পড়িলেন। 'শব্দ-মূর্ত্তি' সম্বন্ধে বক্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, তিনি এতদ্ব্যাপার অধ্যাপব টুান্‌ড্যাল্ সাহেবকে দেখাইয়াছিলেন। অধ্যাপকও উহা অবগত হইয়া আনন্দি হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে ঐ আবিষ্কৃত সত্যকে প্রণালীবদ্ধ করিতে এখনও সময় লাগিবে। মিসেস্ হগ্‌স্ই প্রথমে উপর্য্যুক্ত সত্য আবিষ্কার করিং ছিলেন কিনা তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। কিন্তু তিনিই যে উহাবে প্রণালীবদ্ধ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতন্নিমিত্ত তিনি প্রশংসার্হ।

সংবাদপত্রে এইরূপ বিবরণ বাহির হইয়াছিল:—"মিসেস্ হগ্‌স্ 'ইজেফোন্' নামক একটী অমিশ্র যন্ত্রে গান করেন। এই যন্ত্রটীতে একটী নল, একটী শব্দাধার, ও একটী নমনীয় আবরণ আছে। এই যন্ত্রে গান হইলেই দেখা যায় যে প্রত্যেক স্বরটী একটী নির্দ্দিষ্ট সুন্দর স্থায়ী আকার ধারণ করে। একটী সহজ-বিকার্য্য, সচল মিডিয়মের মধ্যে স্বরের উপর্য্যুক্ত আকার প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে তিনি নমনীয় আবরণের উপর ক্ষুদ্র ২ শস্য-বীজ রাখিয়া গান ধরিলেন। তখন গানের স্বরে যাই ব্যোমকম্পন আরব্ধ হইল, অমনি বীজ গুলি নৃত্য করিতে লাগিল। এই নৃত্য বিশৃঙ্খল নহে; উহাতে জ্যামিতির নির্দ্দিষ্ট নক্‌শা প্রকটিত হইয়াছিল। পরে, তিনি নানাপ্রকার "চূর্ণ" ব্যবহার করিয়াছিলেন। লাইকো-পডিয়ম্ (Lyco-podium) নামক স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঔষধ দ্রব্য হইতে সংগৃহীত চূর্ণই বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছিল। "রঙের লেই" (Colour-paste) পদার্থটী সম্যক্ প্রকারে সহজ-বিকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। একটী পরদা খাটাইয়া এবং অন্য প্রকারেও স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল।

"স্বরের মূর্ত্তিগুলি কিরূপ আকারে আকারিত হইয়াছিল, আমরা এক্ষণে তাহা-রই বর্ণনা করিব। ঐ সকল আকার জ্যামিতি, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা, বর্ণ-বিন্যাস প্রভৃতির সহিত এমনই সুসংগত যে উহার বর্ণনা করা কঠিন। অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, তুষার-কণিকা ও পুষ্প-রেণুকেও ঐ সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা অধিকতর পরি-ষ্কৃত এবং মসৃণ দেখায় না। নক্ষত্র, আবর্ত্তিত বস্তু (Spirals), সর্প, চক্রজনিত আশ্চর্য্য ব্যাপার, উচ্ছৃঙ্খল-কল্পনা-প্রসূত সুব্যবস্থিত মনোহারিণী নক্‌শা প্রভৃতি প্রথমেই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। একদা যখন মিসেস্ হগ্‌স্ একটী স্বরের আলাপ করিতে ছিলেন, তখন একটী দিনাক্ষী-পুষ্পের (Daisy নামক এক প্রকার বাস-ন্তিক পুষ্পের) আকার প্রকটিত ও তিরোহিত হইতে ছিল। তিনি বলিয়া ছিলেন যে, "এই পুষ্পের আকারটী প্রকটিত করিতে আমাকে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া স্বরের

সাধনা করিতে হইয়াছে"। এক্ষণে তিনি ঐ পুষ্পপ্রসবিনী স্বর-লহরী উত্তমরূপে অবগত আছেন। অদ্ভুত প্রকারে স্বরের আলাপ করিয়া অর্থাৎ সা—রে—গা—মা অনুসারে স্বর-লহরীর কখন উচ্চ গ্রামে আরোহণ কখন বা নিম্ন গ্রামে অবতরণ দেখাইয়া, তিনি ঐ দিনাঙ্কী পুষ্পটীকে নিখুঁত ও স্থায়ী করিতে পারিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই দিনাঙ্কী-পুষ্পদাম নিরীক্ষণ করিলেন। কতকগুলি পুষ্পের দল "শ্রেণীর পর শ্রেণী" ভাবে সজ্জিত, আবার কতকগুলির দল উপাদেয়ভাবে রেখাঙ্কিত। এই গুলি দেখান হইলে পর, অন্যান্য স্বর-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। এই শেষোক্ত মূর্ত্তিগুলি নানা বর্ণের উদ্যান-পুষ্পের মূর্ত্তি। এ গুলি বড়ই সুন্দর। যখন পরদার উপরে পর পর মনোহারিণী মূর্ত্তি প্রকটিত হইতে লাগিল, তখন সেই ভূতপূর্ব্ব লর্ড-লিটনের পাঠাগারে শ্রোতৃবর্গ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "কি সুন্দর—কি চমৎকার!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

দূর্ব্বা।

ক্ষুদ্র তুমি চুম্বিত-ভুমি বিমথিত পশু-কুলে।
তুচ্ছ প্রাণ করেছ দান লোটায়ে ধরণী-তলে।
কাঙ্ক্ষিত চির রয়েছ বধির উচ্চ আশা পরিহরি
তোমায় দলি যেতেছে চলি জগতের নরনারী।
জানে না তারা পাষাণ-পারা, পদতলে কার স্থান,
দেববাঞ্ছিত হে চিরদলিত তুমি যে বিধির দান!
তুমি গো ধন্য পরমমান্য কেবা তব সম উচ্চ
চরণ-তলে পতিত বলে তুমিত নহ গো তুচ্ছ ॥

মহিমা নব কেবলি তব বুঝেছিল ওগো হিন্দু,
তাই তারা নিলে তোমায় তুলে হাতে পায় যেন ইন্দু।
দেবতার তরে পূজার সম্ভারে রেখেছে তোমার স্থান
ধরম-করমে অতিথি-চরণে তুমি যে প্রথম দান।*

* মতান্তরে "পাদ্য অর্ঘ্যে"র স্থলে "অর্ঘ্য পাদ্য" লিখিত হইয়াছে

সাধুর শিরে আশীষ-আকারে শোভিত সুন্দর তুমি
মঙ্গল-নিদান তব গুণ-গান কি আর গাহিব আমি !
ওগো চিরত্যাগী অমর-সোহাগী সুর-আশীর্ব্বাদ-গুচ্ছ
চরণ-তলে পতিত বলে তুমিত নহ গো তুচ্ছ ॥

হে মহামান্য ভবে বরেণ্য নিখিল দাতার সেরা
ত্যজিয়া তোমায় অপরে চায় জগতে পাগল তারা।
মুক্তি-মঙ্গল দীন-সম্বল পূজকের প্রীতি-দান,
কি ছার মানব, ভুবনে তব আরাধ্য-মস্তকে স্থান।
হলেও পতিত বিশ্ব-পূজিত, পতনে মহত্ব শুধু—
দেখাতে ধরায় ধরেন তোমায় চরণে স্বয়ং বধু।
নহ ত দীন নহ গো হীন ভক্তি-ভরা তুমি স্বচ্ছ
চরণ-তলে পতিত বলে তুমি ত নহ গো তুচ্ছ ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ভূ-দেব।

মনুষ্যজন্ম সকল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেক জন্মের পর মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

শ্রীভাগবতে ১১। ৯। ২৯

ভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, যে, "জ্ঞানী ব্যক্তি, অনেক জন্মের পর, যদিও অনিত্য তাহা হইলেও পুরুষার্থ-প্রাপক দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশ্বাদি-যোনিতে পুনঃ পুনঃ পতিত হইতে না হয়—সেইরূপে নিজমঙ্গলের জন্য শীঘ্র যত্ন করিবেন ; কারণ বিষয়-ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াই হইতে পারে।" সুতরাং, ভোগের জন্য মনুষ্য-জন্ম নহে ; পশ্বাদি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভোগ হইতে পারে।

কত জন্মের পর যে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও শাস্ত্র কহিয়াছেন, যথা—

স্থাবরং লক্ষবিংশত্যা জলজা নবলক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ॥
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
তত্রৈব মানবং জন্ম কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে॥
শূদ্রাদীনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণস্তদনন্তরম্।
উত্তমং চোত্তমং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাম্॥

জীব, কুড়িলক্ষ স্থাবরজন্ম, নবলক্ষ জলজজন্ম, একাদশলক্ষ ক্রিমিজন্ম, পঞ্চলক্ষ বানরজন্ম, নবলক্ষ পশুজন্ম, ত্রিশলক্ষ পক্ষিজন্ম, তৎপরে দ্বিলক্ষ কুৎসিত-মানব-জন্ম, তৎপরে শত জন্ম শূদ্রাদি-দেহ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এইরূপে উত্তরোত্তর উত্তমগতি লাভ করিয়াও যিনি আত্মাকে ত্রাণ না করেন, তিনি আত্মঘাতী হইয়া পুনরায় যমযাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে "আত্মঘাতী" শব্দের অর্থ উদ্বন্ধনে কিম্বা বিষ-প্রয়োগে মৃত নহে, কিন্তু যিনি গুরুরূপ কর্ণধার লইয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ না হন, তিনিই আত্মঘাতী।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

শ্রীভাগবতে ১১। ২০। ১৭

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন যে, এই সুদুর্লভ (কারণ বহু লক্ষ জন্মের পর মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়) অথচ সুলভ (মনুষ্যের করায়ত্ত, কারণ তিনি সুপথে কিম্বা কুপথেও যাইতে পারেন) মনুষ্য-দেহরূপ পটুতর তরি লাভ করিয়া ও গুরুরূপ কর্ণধার আশ্রয় করিয়া অনুকূল-বায়ুরূপ আমার কর্তৃক চালিত হইয়া যে ব্যক্তি এই ভব-সাগর উত্তীর্ণ না হন, তিনি আত্মহা। ব্রাহ্মণ যে সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ, তাহা বেদেও কথিত হইয়াছে, যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ॥
উরূতদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮ অষ্টকে ৪ অনুবাক্ ১৯ বর্গে।
শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায়াং ৩১।১১।
অথর্ব্ববেদ সংহিতায়াং ১৯।৬।৬।

সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥

পরমেশ্বর প্রজা-বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অন্যত্র—

বক্ত্রাদ্ যস্য ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ
যদ্ বক্ষতঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোরোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ ॥

বায়ুপুরাণে ৯।১১৩।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য যথা—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

মানবে ১ অধ্যায়ে

ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম কল্পনা করিলেন।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্‌ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে উদ্ভব হওয়া বশতঃ, জ্যেষ্ঠতা-হেতুক, এবং ব্যাখ্যান, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি বিষয়ে বেদসকলের ধারণবশতঃ ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণই সমস্ত সংসারের প্রভু হইয়া থাকেন।

তং হি স্বয়ম্ভুঃ স্বাদাস্যাৎ তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে ॥

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের হব্যকব্য-বহনের জন্য এবং সংসারের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মুখ হইতে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের উৎপাদন করিলেন।

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥

দেবতারা যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করেন, পিতৃলোকের

যাঁহাদিগের মুখে শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ

সমুদায় ভূতগণের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহাদের সুখ-দুঃখ-বোধ আছে; তাদৃশ প্রাণীগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী জীব শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবি-জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগাধিকারী বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ বিদ্বানের মধ্যে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, আর শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী লোকেরাই শ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

ব্রাহ্মণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন-মূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র।

ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্ম-কোষস্য গুপ্তয়ে॥

ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবা মাত্রই পৃথিবীর সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন; যেহেতু সমুদায় মনুষ্যের ধর্ম্ম সকলের রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥

মনুঃ প্রথমাধ্যায়ে

এই সংসারে যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সমুদায়ই ব্রাহ্মণের নিজধনের তুল্য; ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমুদায়সম্পত্তির প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন। ব্রাহ্মণেরা যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরের বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করিয়া অন্যকে প্রদান করেন, সে সমুদায়ই তাঁহাদের

আপনার ; যেহেতু ব্রাহ্মণের দয়াতেই ইতর যাবতীয় লোক ভোজন-পরিধানাদি করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোক বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়া গুরু-কুলে বাস করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আজীবন যাগ যজ্ঞ করিবেন ; কারণ যজ্ঞের দ্বারা ধূম, ধূম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য উৎপন্ন হইলে মানবগণ জীবিত থাকিবেন, সুতরাং সমস্তই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। তাঁহার নিজের স্বার্থ কিছুই নাই, কেবল সংসার-রক্ষার ভার তাঁহার উপর।

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১৭।৪২।

ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্রকামনার জন্য নহে, তাহা ইহলোকে কর্ম্মসাধ্য তপস্যার জন্য ও পরলোকে অনন্তসুখের নিমিত্ত।

ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য-বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া চাকরি করিবেন না।

———ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥

মনুঃ ৪।৪।

ব্রাহ্মণ কখনও কুক্কুরের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন না।

এ কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ৭ম স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

পুনশ্চ অন্যত্র—

সেবাং লাঘব-কারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে শ্ববৃত্তিং বিদুঃ ॥

মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে।

এখানে সেবাধর্ম্মকে শ্ববৃত্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন ; কিন্তু পরম-ভাগবত শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি প্রভুপাদ তাহা অপেক্ষাও হীন কহিয়াছিলেন—

সেবা শ্ববৃত্তিঃ যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতম্।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শ্বা বিক্রীতাসুঃ ক্ব সেবকঃ ॥

যাঁহারা সেবাকে শ্ববৃত্তি কহিয়াছেন, তাঁহাদের উদাহরণ ঠিক হয় নাই ; কারণ আপনার ইচ্ছার বশবর্ত্তী কুক্কুরই বা কোথায়, আর যে সেবক নিজের জীবন প্রভুকে বিক্রয় করিয়াছেন, তিনিই বা কোথায় ? অর্থাৎ কুক্কুরের যে স্বাধীনতা আছে, সেবকের সে স্বাধীনতাও নাই। অবিরত বৃষ্টিতে কুকুর কোথাও নিজের ইচ্ছায় শুইয়া থাকে, কিন্তু ভৃত্যকে প্রভুর আদেশে গন্তব্য স্থানে গমন করিতেই হইবে। এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান যথা—

একদিন বর্ষাকালে রাত্রিতে আহারের পর প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী, পত্নীর সহিত শয়ন করিয়া ছিলেন, এমন সময়ে গৃহের অঙ্গনে পদ-শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া গোস্বামীপাদ কহিয়াছিলেন যে "বাড়ীতে কুকুর আসিয়াছে।" তাহাতে তাঁহার পত্নী কহিয়াছিলেন যে "এত বৃষ্টিতে কুকুর কখনই আসে না। কাহারও বাড়ীর চাকর আসিয়াছে।" তাহাতে গোস্বামীপাদ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে "আমিও ত নবাবের উজির, চাকরের শ্রেণীতে ত বটি; অর্থের দাস হইয়া জঘন্য দাসত্ব ত করিতেছি! অর্থের জন্য সেবক প্রাণ দিতে পারে—

কোঽর্থ-তৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্॥

শ্রীভাগবতে ৭।৬।১০।

ভক্ত প্রহ্লাদ দৈত্য-বালকগণকে উপদেশ দিতে গিয়া কহিয়াছেন যে, প্রাণ অপেক্ষাও যাহা প্রিয়তম, সেই অর্থতৃষ্ণাকে কোন ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে? কারণ তস্কর, সেবক ও বণিক্, প্রিয়-প্রাণ দিয়াও অর্থকে ক্রয় করিয়া থাকে।"

গোস্বামীপাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, "এরূপ ঘৃণিত বৃত্তিতে জীবন বিক্রয় করিব না।" ইহা স্থির করিয়া নবাবকে না কহিয়া উজিরি পদ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনোদ্দেশে চলিলেন। ক্রমে এ বিষয় নবাবের কর্ণ-গোচর হইলে, তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন; কারণ গোস্বামীপাদ রাজ্য-সংরক্ষণে তাঁহার দক্ষিণবাহু-স্বরূপ ছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যগণ প্রত্যাগমন করিয়া নবাবকে সংবাদ দিল যে, গোস্বামীপাদের দর্শন-লাভ হয় নাই। কেবল যে সৈন্য দক্ষিণ-দিকে গিয়াছিল, সে আসিয়া কহিল যে "উজির দক্ষিণদিকে যাইতেছেন। অনেক বিনয় অনুনয়েও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না।" ইহা শ্রবণ করিয়া নবাব নিজে অশ্বারোহণে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলেন। সন্ধ্যাকালে গিয়া দেখিলেন যে, গোস্বামীপাদ এক বৃক্ষতলে সামান্য দরিদ্রের বেশে শয়ন করিয়া আছেন। নবাব অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া গোস্বামীপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া গোস্বামীপাদ ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাহাতে নবাব কহিলেন যে "আপনি কি বায়ুগ্রস্ত হইয়াছেন? নচেৎ আমি আপনার প্রভু; আপনাকে লইতে আসিয়াছি; আপনি আমায় দেখিয়া হাস্য করিলেন কেন?" ইহা শ্রবণ করিয়া গোস্বামীপাদ কহিলেন যে "আমার হাস্যের কারণ এই যে,

প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন উদ্দেশে যাইতেছি (এখনও তাঁহার দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই) ইতোমধ্যেই দেখিতেছি যে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা—এই তিন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আমার পদতলে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন ; যখন প্রভুর দর্শন ভাগ্যে ঘটিবে, তখন না জানি কি অভিনব দৃশ্য দর্শন করিব—কি অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইব ! আমি বায়ুরোগ-গ্রস্ত হই নাই।” নবাবের অনেক অনুনয়ের পরও গোস্বামীপাদ প্রত্যাগমন না করিয়া কহিলেন যে “জঘন্য দাসত্ববৃত্তি আর করিব না—আপনি রাজ্যে গমন করুন।” ঐ সময়েই তিনি পূর্ব্বোক্তের পূর্ব্ব শ্লোক কহিয়াছিলেন।

মহর্ষি মনু কহিয়াছেন—

সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪।৬।

সেবাকে “শ্ববৃত্তি” বলে, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

কিন্তু হায়! কালের কি পরিণাম! সেই শ্ববৃত্তির জন্য আজ ভূদেবগণ লালায়িত! অধ্যাপনা-বৃত্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার একজন উচ্চ-রাজ-কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণের যে মান, একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সে মান আছে কি ? আমাদের দেশে এক্ষণকার সাধারণ ব্রাহ্মণের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যই সেবা !

ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পন্ন হইবেন—

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥

মনুঃ ১ অধ্যায়ে।

আচার যে পরম ধর্ম্ম ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই উক্ত আছে, তজ্জন্য আত্মহিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ, শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ হইবেন।

অন্যত্র—

আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ ॥

দেবী-ভাগবতে ১১।১।৯।

পুনশ্চ—

আচারাদ্ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥

মনুঃ ১ অধ্যায়ে।

ব্রাহ্মণ আচারহীন হইলে বেদের ফলভাগী হন না, কিন্তু যদি সদাচারযুক্ত হন, তাহা হইলে বেদের সম্পূর্ণফলভাগী হন।

অপরঞ্চ—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ
যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥

দেবীভাগবতে ১১।২।১।

শিক্ষা, কল্প, ছন্দঃ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ এই ষড়ঙ্গসহিত বেদ সকল পঠিত হইলেও আচারহীনকে পবিত্র করিতে পারেন না; পক্ষীর পক্ষ উৎপন্ন হইলে সে যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আচারহীনকে মৃত্যুকালে বেদ সকলও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ব্রাহ্মণ ক্রোধশূন্য হইবেন—

ন ক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

যিনি সম্মানিত হইলেও আনন্দিত হন না এবং অবমানিত হইলেও ক্রোধ করেন না; যিনি সকল জীবকে অভয় দান করেন, দেবতাগণ তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানেন।

অন্যত্র—

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধ-মোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২০৫ অধ্যায়ে।

কৌশিক নামে কোন ব্রাহ্মণকে কোন পতিব্রতা রমণী কহিয়াছিলেন যে "হে দ্বিজোত্তম! ক্রোধ মনুষ্যগণের শরীরস্থ শত্রু; যিনি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেন, দেবগণ তাঁহাকেই "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানেন।" ব্রাহ্মণ ভূতলে দেবতা, তাই ব্রাহ্মণের আদর। ব্রাহ্মণের দুর্গতি ঘটায় বর্ণাশ্রম-সমাজের দুর্গতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণের দুর্গতি-মোচন চিন্তনীয় বিষয়।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

গড়োয়ালে হিন্দু-তীর্থ।

(১)

গড়োয়াল বলিলে অধুনা "বৃটীশ গড়োয়াল" ও "তেহরী গড়োয়াল" বুঝায়। তেহরী গড়োয়াল—দেশীয় রাজার রাজ্য। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় কমায়ুনে তিনটী জেলা; তন্মধ্যে গড়োয়াল অন্যতম। গড়োয়াল পাহাড়ী দেশ।

যাত্রী।

যাত্রীগণ লছমনঝোলা পার হইয়া গড়োয়ালে প্রবেশ করেন। পরে গঙ্গা-খাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন; অবশেষে দেব-প্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্র প্রয়াগ এবং গুপ্তকাশী হইয়া কেদারনাথে গমন করেন। প্রত্যাগমন-সময়ে মন্দাকিনীর খাত দিয়া উখীমঠে আগমন করেন, তথা হইতে তুঙ্গনাথের পাহাড় দিয়া অলকানন্দা-খাতের উপরিস্থ চামোলী উপনীত হন। এইস্থানে গোঁড়া বৈষ্ণবগণ বাস করেন; তাঁহারা কেদারনাথের উপাসনা করেন না। তাঁহারা গঙ্গাখাতের উপরিস্থ রুদ্র-প্রয়াগ হইতে গমন না করিয়া অলকানন্দার উপরস্থ কর্ণপ্রয়াগ দিয়া গমন করেন। চামোলী হইতে যাত্রীগণ যোশীমঠ অতিক্রম করিয়া বদ্রীনাথে উপনীত হন এবং কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথা হইতে লোহাবার পথ ধরিয়া পাণ্ডোখলে এই গড়োয়াল পরিত্যাগ করেন। গড়োয়ালের তীর্থ সমূহ পর্য্যটন করিতে যাত্রীগণের এক মাসকাল অতীত হয়। যাত্রী সংখ্যা প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজার হইতে ষাট্ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পর্য্যটনের সময় মে মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত। নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে অতিরিক্ত বরফ পড়ে; পথ সমুদয় বন্ধ হইয়া যায়। খাদ্য দ্রব্যের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। এক সের আটার মূল্য আট আনা। কাষ্ঠ, দুগ্ধ, তরকারি প্রভৃতি সমস্তই দুর্ম্মূল্য। মে মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত গড়োয়ালীগণ যাত্রীগণের নিকট অধিক মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মুটে ভাড়া আছে। একজন কুলী বা মুটে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য ২৫৲ টাকা লইবে। যদি একজন মুটে এক ব্যক্তির বাহক নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৪০৲ টাকা দিতে হইবে। ধনীগণ ঝাম্পানে আরোহণ-পূর্ব্বক গমন করেন। ঝাম্পানের বাহক চারিজন; প্রত্যেক বাহকের ৩০৲ টাকা হিসাবে চারিজন বাহকের বেতন ১২০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত কুলীগণকে আহার দিতে হয়। তৎপরে দেবা-লয়ে প্রণামী ও পাণ্ডাগণের দক্ষিণা আছে। এক্ষণে পাঠকগণ অনুমান করিতে

পারেন যে, গড়োয়ালে তীর্থ-দর্শন সাধারণের পক্ষে কত ব্যয়-সাধ্য! যদি কেহ আপন মোট আপনি বহিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে কেবল মুটের ব্যয় বাঁচিবে, কিন্তু অপর সমুদয় ব্যয় আছেই।

বদ্রীনাথ।

মাল্লাপৈনখণ্ড পরগণায় অলকানন্দা—নদীর দক্ষিণতীরে মন্দির অবস্থিত। এই স্থান শ্রীনগর হইতে ১০৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ও মানা-গিরিবর্ত্ম হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে। অলকানন্দার খাত দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল ও বিস্তারে এক মাইল। এই খাতের মধ্যস্থলে এবং নর ও নারায়ণ নামক সুউচ্চ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে মন্দির স্থাপিত। মন্দির হইতে নর ও নারায়ণ পর্ব্বতদ্বয় সমদূরবর্ত্তী। একটি পর্ব্বত মন্দিরের পূর্ব্বে ও অপরটী মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। যে নদী-তটে মন্দির আছে, সেই তট ক্রম-নিম্ন এবং অপর তীর দুরারোহ। মন্দির, সাধারণ বাসভূমি হইতে ৪০।৫০ ফিট্ উচ্চস্থানে নির্ম্মিত এবং সমুদ্র হইতে ১০২৮৪ ফিট্ উচ্চ। আদি মন্দির অষ্টম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে প্রথিতনামা মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান মন্দির দর্শন করিলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। চুণ ও সুরকীর মসল্লা দিয়া পাথর গাঁথিয়া মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে। ছাদ দেবদারু-কাষ্ঠে নির্ম্মিত। মন্দিরের কিছু দূরে এক সরোবর—নাম তপ্তকুণ্ড। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার যথাক্রমে ১৬৷৷০ ও ১৪৷৷০ ফিট্। সরোবরের উপর তক্তা দিয়া আঁটা এবং তক্তাগুলি খুঁটির উপর আছে। প্রস্রবণ হইতে জল আসিয়া সরোবর পূর্ণ করে এবং অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত অপর এক প্রস্রবণ হইতে জল আসিয়া এই জলের উষ্ণতা হ্রাস করে। গন্ধকের গন্ধযুক্ত ঘন ধূম বা বাষ্প ঐ জল হইতে নির্গত হয় এবং উহার উত্তাপ এত অধিক যে, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায় না।* এই সরোবরে নর ও নারীগণ স্নাত হইয়া বিগত-পাপ হন; তৎপরে বদ্রীনাথের পূজা করেন। প্রতি দ্বাদশ বর্ষে কুম্ভ-মেলার সময় যাত্রী-সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্রথমতঃ যাত্রীগণ হরিদ্বারে সমবেত হন। হরিদ্বারের মেলা শেষ হইলে এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে পর্ব্বতের উপরিস্থ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কেদার-নাথ ও বদ্রীনাথ তীর্থ-সমূহ পর্য্যটনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে মেল-চৌরীর মধ্য দিয়া নন্দ-প্রয়াগ ও কর্ণ-প্রয়াগ দর্শন করিয়া রামনগর হইয়া

* On the 26th May at about 11 A. M. the temperature of the hot spring water was 120 fahzen heit,
Gorwal Gazetteer,

ভারতের সমতল ভূমিতে আগমন করেন। পাঞ্জাবের যাত্রীগণ সাধারণতঃ পৌরীর মধ্য দিয়া কোটদোয়ারা আগমন করেন; তথায় নাজিবাবাদ হইতে এক্ষণে যে রেল-পথের শাখা বাহির হইয়াছে, সেই পথে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হন।

বদ্রীনাথে চতুপার্শ্বস্থ ভূভাগ 'বৈষ্ণবক্ষেত্র' নামে আখ্যাত। এই বৈষ্ণবক্ষেত্রের মধ্যে "পঞ্চ বদ্রী" আছেন। পঞ্চবদ্রী যথা; বদ্রীনারায়ণ (বিশালবদ্রী), যোগবদ্রী (পাণ্ডুকেশ্বর), ভবিষ্যবদ্রী (তপোবনের নিকট), বৃদ্ধবদ্রী (অণিমঠ) ও ধ্যানবদ্রী (সিলাঙ্গের নিকট)। বিষ্ণুর আদেশে তপ্তকুণ্ডে অগ্নি বিদ্যমান আছেন। নদী-গর্ভে এক গহ্বর আছে—এই গহ্বর জল-পূর্ণ ও 'নারদ-কুণ্ড' নামে খ্যাত। পাহাড়ের কিয়দংশ নদীর উপর এরূপ ভাবে বহির্গত হইয়াছে যে, তাহাতে নদীর প্রবলস্রোতকেও সুস্থির রাখিয়া যাত্রীগণের স্নানের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ইহার বামভাগে 'সূর্য্য-কুণ্ড'। নদী-তটের নিকট এক উৎস হইতে উষ্ণ জল নির্গত হইতেছে। এই জল কোন স্থানে একত্রিত না হওয়ায় স্নানের সুবিধা নাই। যাত্রীগণ হস্তে জল-ধারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিয়া থাকেন। 'ব্রহ্মকপাল' নামক স্থানে যাত্রীগণ পিতৃ-পুরুষোদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া থাকেন। প্রধান মন্দিরের বিগ্রহ, কৃষ্ণবর্ণ-পাষাণে নির্ম্মিত। দিবসে বিগ্রহ, মূল্যবান্ সুবর্ণসূত্র-গ্রথিত পট্টবস্ত্রে সজ্জিত থাকেন; বিগ্রহের সমস্ত দেহ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত থাকে। মস্তকের উপরিভাগে স্বর্ণছত্র ও একখানি উজ্জ্বল দর্পণ থাকে। সম্মুখে প্রতিনিয়ত অসংখ্য দীপ জ্বলিতে থাকে। বিগ্রহের মস্তকে স্বর্ণ-মুকুট; মুকুটের মধ্যস্থানে একখানি সাধারণ আকারের হীরক দেদীপ্যমান। বিগ্রহের বস্ত্রালঙ্কারাদির মূল্যের পরিমাণ দশ সহস্র মুদ্রার অধিক হইবে। বিগ্রহের দক্ষিণভাগে নর ও নারায়ণের এবং বাম-ভাগে কুবের ও নারদের মূর্ত্তি স্থাপিত।

যোশীমঠের নৃসিংহ-মূর্ত্তির এক হস্ত। এই হস্ত দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ-তর হইতেছে। যে কালে এই হস্ত স্খলিত হইয়া পতিত হইবে, তৎকালে পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া পতিত হওয়ায় বদ্রীনাথ-গমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তপোবনের নিকট ভবিষ্যবদ্রী পূজিত হইবেন। অনেকে বলেন যে, চাঁদপুরের আদি-বদ্রীতে বদ্রী প্রকট হইবেন। সনৎকুমার-সংহিতায় আছে—

যতদিন জ্যোতিতে (যোশীমঠে) বিষ্ণু রহিবেন, ততকাল বদ্রী-গমনের পথ রুদ্ধ হইবে না, কিন্তু যখন ভগবান্ অন্তর্হিত হইবেন, তখনই মানবের পক্ষে বদ্রীর পথ রুদ্ধ হইবে।

বিগ্রহের সেবার জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত আছে। দিবসে দুইবার ভোগ হয়—প্রাতে ও বৈকালে। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিগ্রহের সম্মুখে রক্ষিত হয় এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী থালা ও রেকাবীপূর্ণ করিয়া বিগ্রহের সম্মুখস্থ গৃহে রক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, ভোগের সময় দ্বার রুদ্ধ থাকে। অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে দ্বার উন্মুক্ত ও প্রসাদ বিতরিত হয়। ভোগের পাত্রসকল স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত। সেবার জন্য অনেক নরনারী নিযুক্ত আছে। মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট নর্ত্তকীগণ সময়মত নৃত্য ও গীতে দেবতার মনোরঞ্জন করে। কেবল পূজারিগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং রাবলগণ মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পারেন। নবেম্বর মাসের কোন সুদিনে মন্দির রুদ্ধ হয়। কতক বাসন মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ধনাদি যোশীমঠে প্রেরিত হয়। যোশীমঠ শীতকালের নিবাসস্থল। নবেম্বর হইতে মে মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মন্দির বরফে আচ্ছন্ন থাকে। মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ আলমোড়া জেলায় ৪৫ খানি সম্পূর্ণ গ্রাম এবং ২৬ খানি গ্রামের অংশ দেবত্র (গুন্থ); রাজস্ব ১৭৫০৲ টাকা। গড়োয়াল জেলায় ১৪৬ খানি সম্পূর্ণ ও ১১১ খানি গ্রামের অংশের উপস্বত্ব ৫৪২৯৲ টাকা দেব-সেবায় নিয়োজিত। রাবল বা মন্দিরের মোহান্ত, তেহরীগড়োয়ালের রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে। রাবলের অন্তিমকালে যদি রাবল আপন উত্তরাধিকারীর কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে না পারেন, তাহা হইলে তেহরীর রাজা, মোহান্তের মৃত্যুর পর তৎপদে অপর মোহান্ত নিযুক্ত করেন। রাবলগণ দাক্ষিণাত্যের নম্বুরী ব্রাহ্মণ হওয়া চাই; অপর কোন ব্রাহ্মণ রাবল হইতে পারেন না। মন্দিরে যাত্রীগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থাদি ত্রিবিধ নামে গৃহীত হয়; যথা;—'থালিভেট', 'আট্‌কা ভোগ' ও 'গদ্দী ভেট'। যাত্রীগণ দেব-দর্শন-কালে দেবতার সম্মুখস্থ পাত্রে (থালীতে) যে দর্শনী প্রদান করেন তাহার নাম 'থালীভেট'। এই দর্শনী যাত্রীগণ আপনাপন ইচ্ছামত নগদ টাকা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গাত্রবস্ত্র (শাল ইত্যাদি) ইত্যাদিতে প্রদান করেন। এই আমদানী মন্দিরের সর্ব্বপ্রধান আয়-মধ্যে গণ্য। দ্বিতীয় প্রকার আমদানী 'আট্‌কাভোগ'। 'আট্‌কাভোগ' বা দেবতার প্রসাদ। যদি যাত্রীর ভৃত্যসহ ভোজন করিতে ১৲ এক টাকা ব্যয় হয়, তাঁহাকে সেইস্থলে প্রসাদের নিমিত্ত দুই টাকা দিতে হয়। তৃতীয় প্রকার আমদানী 'গদ্দীভেট'। যাত্রীগণ রাবলের প্রণামীর জন্য যে অর্থ প্রদান করেন, তাহাই 'গদ্দীভেট' নামে অভিহিত হয়। অবশ্য এই অর্থ রাবলের নিজস্ব নহে—ইহা মন্দিরের ধনাগারে সঞ্চিত হয়।

রাবল প্রাতে ও সন্ধ্যায় দেবার্চ্চনা করেন, কিন্তু অপর সময় কাছারীতে বসিয়া 'আটকাভোগ' ও 'গদ্দীভেটে'র অর্থ সংগ্রহ করেন। যাত্রীগণ যখন অর্থ প্রদান করেন, এক ব্যক্তি লিখিয়া লয়; এই ব্যক্তির নাম 'লিখোয়ার' বা সম্পাদক। সমস্ত দিবস অর্থ সংগৃহীত হইলে সন্ধ্যার সময় ধনাগারে রক্ষিত হয়। ভাণ্ডারী বা কোষাধ্যক্ষ পাণ্ডুকেশ্বরের রাজপুতগণ।

শ্রীআশুতোষ তরফদার।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথম কাণ্ড—তৃতীয় অনুবাক্—দ্বিতীয় সূক্ত)

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে অস্ত্বশ্মনে যেনা দূড়াশে অস্যসি ॥ ১

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে পর্জ্জন্য !) তে (তব সম্বন্ধিন্যৈ) বিদ্যুতে নমঃ অস্তু। (তথা) তে (তব সম্বন্ধিনে) স্তনয়িত্নবে (অশনয়ে) নমঃ অস্তু। (তথা) তে (তব সম্বন্ধিনে) অশ্মনে (মেঘায়) নমঃ অস্তু। (কুতোহেতোর্নমস্কার ইত্যাহ) যেন (কারণেন) দূড়াশে (লুব্ধে হবিরাদীনামদাতরি পুরুষে) অস্যসি (অশনিং প্রক্ষিপসি) (অতোনমস্করোমি ইতিভাবঃ)।

বঙ্গানুবাদ। হে পর্জ্জন্যদেব! আপনার বিদ্যুৎকে নমস্কার, আপনার অশনিকে নমস্কার, আপনার মেঘকে নমস্কার। কারণ আপনি, লুব্ধ হবির্দানবিমুখ পুরুষের উদ্দেশে আপনার অশনি নিঃক্ষেপ করেন।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে যজমান পর্জ্জন্যদেবতার বিদ্যুৎ, অশনি ও মেঘকে নমস্কার করিতেছেন। নমস্কারের কারণ-উল্লেখে বলিতেছেন, যে "যাহারা পর্জ্জন্য-দেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করে না, হবিঃ-প্রদান করে না, সেই সকল ব্যক্তির প্রতি পর্জ্জন্যদেব অশনি নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন।" এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা পর্জ্জন্যদেবের কোপ হইতে—অশনিপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাঁহার বিদ্যুৎ বজ্র ও মেঘকে নমস্কার করিতেছি। মেঘোদয়—বিজলীবিকাশ—অশনিপাত সকলই পর্জ্জন্যদেবতার লীলাখেলা। পর্জ্জন্য হবির্ভাগ পাইলে—স্তুতি-নমস্কারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইলে আর যজমানের বজ্রাঘাতের শঙ্কা থাকিতে পারে না—ইহাই মনোগত ভাব।

নমস্তে প্রবতোনপাৎ যতস্তপঃ সমূহসি।
মৃড়য়া নস্তনুভ্যো ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে প্রবতোনপাৎ (প্রবতঃ স্বস্মাৎ চ্যুতস্য স্তুতিনমস্কারাদ্যকর্ত্তুঃ পুরুষস্য নপাৎ ন পাতঃ অপালক! অস্যেবকস্য অশনিভয়প্রদাতঃ। যদ্বা প্রগতস্য ভুবঃ সকাশাৎ প্রচণ্ডৈঃ সূর্য্য-কিরণৈঃ উদ্ধৃতস্য উদকস্য নপাৎ ন পাতয়িতঃ! অকালে উদকং যথা নাধঃ পততি তথা মেঘমণ্ডলে ধারয়িতঃ!) (হে পর্জ্জন্য) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু। যতঃ (যস্মাৎ কারণাৎ) তপঃ (পাতকদাহকং তেজঃ) সমূহসি (সংহতং করোষি, অশনিরূপেণ প্রক্ষিপসি ইত্যর্থঃ) নঃ (অস্মাকং) তনুভ্যঃ (শরীরেভ্যঃ) মৃড়য় (সুখং জনয়) (তথা) তোকেভ্যঃ (অপত্যেভ্যঃ) ময়ঃ (সুখং) কৃধি (কুরু)

বঙ্গানুবাদ। হে প্রবতোনপাৎ পর্জ্জন্যদেব! আপনাকে নমস্কার, কারণ আপনি স্বীয় দাহক তেজঃ সংহত করিয়া অশনিরূপে (অযাজ্ঞিকের উদ্দেশে) নিঃক্ষেপ করেন। আপনি আমাদিগের শরীরে সুখ দান করুন, আর আমাদিগের অপত্যবর্গের সুখ-বিধান করুন।

টিপ্পনী। পূর্ব্বমন্ত্রে মেঘ বিদ্যুৎ বজ্র এই ত্রিমূর্ত্তিকে নমস্কার করিয়াছেন; এখানে যজমান পর্জ্জন্যদেবকেই নমস্কার করিতেছেন। এ মন্ত্রে পর্জ্জন্যদেবকে "প্রবতোনপাৎ" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রবতোনপাৎ—যিনি স্তুতি-পূজাদিহীন অসেবক জনকে পালন করেন না তিনি। অন্য প্রকার অর্থ এই যে, যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্যকর দ্বারা উদ্ধৃত জল সমূহকে অকালে ভূমিতে পড়িতে দেন না, মেঘমণ্ডলে ধারণ করেন, তিনি। যে অর্থই গ্রহণ করি না কেন, পর্জ্জন্যদেবের দুষ্ট-দমন শিষ্ট-পালন-সংবাদ ইহার মধ্যে নিহিত। দেবযজ্ঞবিহীন অধার্ম্মিককে যিনি পালন করেন না, তিনি যথার্থই দুষ্টদমনে দীক্ষিত। আর অকাল-বর্ষণ-হেতু শস্যহানি ও স্বাস্থ্যহানি-নিবারণের জন্য যিনি মেঘমণ্ডলে জলসমূহ ধরিয়া থাকেন, তাৎপর্য্যতঃ যথাকালে বর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্য ও শস্যসম্পৎ প্রদান করেন, তিনি শিষ্টপালনে বদ্ধপরিকর। এই বিশেষণ-প্রয়োগের অভিপ্রায় মন্ত্রের অপরাংশেও পরিস্ফুট। যাহারা দুষ্ট, তাহাদিগকে যে পর্জ্জন্য কেবল পালন করেন না তাহা নহে, প্রত্যুত অশনি-নিঃক্ষেপে শাসন করেন। "আমরা তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, আমরা তাহার সেবক, তিনিও সেবক-রক্ষক. সুতরাং তিনি আমাদের শরীরে স্বাস্থ্য-সুখ দান করুন এবং আমাদের সন্তানগণকে সুখী করুন"—এই প্রার্থনা 'প্রবতোনপাৎ' পর্জ্জন্যদেবের নিকট সুসঙ্গতই হইতেছে।

প্রবতোনপাৎ নমএবাস্তু তুভ্যং নমস্তে হেতয়ে তপুষেচ কৃন্মঃ।

বিদ্ম তে ধাম পরমং গুহা যৎ সমুদ্রে অন্তর্নিহিতাসি নাভিঃ ॥৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে প্রবতোনপাৎ তুভ্যং নমঃ (নমস্কারঃ) এব (নিশ্চিতং) অস্তু। (তথাচ) তে (তব) তপুষে (তাপকারিণ্যৈ) হেতয়ে (আয়ুধায়) নমঃ কৃন্মঃ (কুর্ম্মঃ) (পর্জ্জন্যস্য নিবাসস্থানাজ্ঞানে নমস্কারাযোগমাশঙ্ক্য তদপি জানীমইত্যাহ) (হে পর্জ্জন্য!) তে (তব সম্বন্ধি) গুহা (গুহায়াং পরৈরগম্যে প্রদেশে) যৎ পরমং (উৎকৃষ্টং) ধাম (বাসস্থানং অস্তি) তদ্ বিদ্মঃ (জানীমঃ) (কিং পুনস্তৎ ইত্যাহ) সমুদ্রে (অন্তরিক্ষে) অন্তঃ (মধ্যে) নিহিতা (স্থাপিতা) নাভিঃ (যথা দেহমধ্যে নাভিচক্রে সর্ব্বানাড্যো বদ্ধা ভবন্তি এবং পর্জ্জন্যে কৃৎস্নং মেঘমণ্ডলং বদ্ধমিতি নাভিত্বব্যপদেশঃ) অসি (ভবসি) (নাভিচক্রবৎ কৃৎস্নস্য মেঘমণ্ডলস্য ধারকত্বেন অন্তরিক্ষমধ্যে অবস্থিতোঽভবসীত্যর্থঃ)

বঙ্গানুবাদ। হে প্রবতোনপাৎ পর্জ্জন্যদেব! আপনাকে নমস্কার করি, আপনার শত্রুতাপক হেতিকে নমস্কার করি। অন্যের অগম্যস্থানে আপনার যে পরমধাম আছে, তাহা আমরা জানি। আপনি অন্তরিক্ষে সমগ্র মেঘমণ্ডলের ধারক নাভি-স্বরূপে বিদ্যমান আছেন, (ইহা জানি।)

টিপ্পনী। এখানে পর্জ্জন্যদেবকে এবং তাঁহার পরতাপসাধন আয়ুধকে নমস্কার করা হইতেছে। বলা হইতেছে, পর্জ্জন্যদেব যে অন্তরিক্ষে নাভিরূপে বিদ্যমান আছেন এ কথা—পর্জ্জন্যদেবের এই অন্যের অজ্ঞাত উৎকৃষ্ট-বাসস্থানের কথা, আমরা জানি। পর্জ্জন্যদেবের বাসস্থান বলবীর্য্য আমাদের পরিজ্ঞাত। তাঁহার মহিমা জানি বলিয়াই কল্যাণ-লাভের প্রত্যাশায় তাঁহাকে আমরা নমস্কার করিতেছি, ইহাই তাৎপর্য্য। পর্জ্জন্যদেবকে অন্তরিক্ষে নাভিরূপে বিদ্যমান বলা হইতেছে। আচার্য্য সায়ণ বলেন—শরীরস্থ নাভিচক্রে যেমন সর্ব্বশরীরস্থ নাড়ীসকল বদ্ধ থাকে, অন্তরিক্ষস্থ পর্জ্জন্যদেবে তেমনি সমগ্র মেঘমণ্ডল বদ্ধ থাকে—ইহাই "নাভি" বলিবার তাৎপর্য্য। আমরা জানি, নাভিস্থান শরীরের প্রধান রক্ষাকেন্দ্র, পর্জ্জন্যদেবও সংসারের রক্ষাকেন্দ্র-স্বরূপ, সুতরাং তিনি বিশ্বের নাভি। শস্য-স্বাস্থ্য যাঁহার কৃপাপ্রসূত, তিনি যে রক্ষামূর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাং ত্বা দেবা অসৃজন্ত বিশ্ব ইষুং কৃণ্বানা অসনায় ধৃষ্ণুম্।

সা নো মৃড় বিদথে গৃণানা তস্যৈতে নমো অস্তু দেবি ॥ ৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে অশনে!) যাং ত্বা (ত্বাম্) বিশ্বে (সর্ব্বে

দেবাঃ অসনায় (প্রক্ষেপ্তুম্) ধৃষ্ণুং (ধর্ষিকাং শত্রুহিংসনে প্রগল্ভাং) ইষুং (শরং) কৃণ্বানাঃ (কুর্ব্বাণাঃ) অসৃজন্তঃ (সৃষ্টবন্তঃ) সা (তথাবিধা) ত্বম্ বিদথে (যজ্ঞে) গৃণানা (স্তূয়মানা) (যদ্বা বিন্তন্তে জ্ঞায়ন্তে নক্ষত্রাণি অস্মিন্ ইতি বিদথমন্তরিক্ষং তস্মিন্ গৃণানা শব্দায়মানা গর্জ্জন্তীত্যর্থঃ) নঃ (অস্মান্) মৃড় (মৃড়য় সুখয়) হে দেবি ! (অন্তরিক্ষে বিদ্যোতমানে অশনে !) তস্যৈ (তাদৃশ্যৈ মহিমোপেতায়ৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু।

বঙ্গানুবাদ। হে অশনিদেবি ! সকল দেবতারা শত্রুনাশনে প্রগল্ভা যে তোমাকে প্রক্ষেপের জন্য শর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই তুমি যজ্ঞে স্তূয়মানা হইয়া আমাদিগকে সুখী কর। হে দেবি ! পূর্ব্বোক্তমহিমান্বিতা তোমাকে নমস্কার।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে যজমান অশনিদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণন-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট সুখ প্রার্থনা করিতেছেন। মহিমার কথায় বলিতেছেন যে, দেবতারা (শত্রুগণের প্রতি) প্রক্ষেপের জন্য অশনি-দেবীকে 'শর' করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ! দেবাসুর-যুদ্ধের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যায় অশনি-দেবীকে দেবদল (জ্যোতিঃ-সম্পৎ) অসুরবর্গের (মেঘমালার) উদ্দেশে প্রেরণ করিবার জন্য সৃজন করিতেছেন এই তথ্যের সমাবেশ অশোভন নহে। বৃত্র অর্থ মেঘ, ইহা নিরুক্ত-কারের মত। সূর্য্য ইন্দ্র—রশ্মিবর্গ দেবগণ—ইহা নূতন কথা নয়। ইন্দ্রকে অন্ত-রিক্ষও বলা হয়। 'বিদথ' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ—যজ্ঞ ও অন্তরিক্ষ। "গৃণানা" শব্দের অর্থ স্তূয়মানা ও গর্জ্জন্তী। অশনি-দেবী অন্তরিক্ষে গর্জ্জন করিয়া যজ-মানের সুখ প্রদান করুন, অথবা যজ্ঞে স্তূয়মানা হইয়া যজমানের কল্যাণ-সাধন করুন—দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত। অশনি-গর্জ্জন জগতের কোনও এক অংশের কল্যাণ-প্রয়োজন সম্পাদন করে, ইহা স্থির। "ইউটিলিটি" মতবাদে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের কাছে ইহার ব্যাখ্যা অসুলভ নহে। বজ্রগর্জ্জন শুনিয়া ভীতচিত্ত আর্য্যসন্তানের মুখে অশনি-দেবীর যে স্তুতি-গীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নিরর্থক নহে। এখনও আমরা বজ্রবারক মন্ত্র লিখিয়া গৃহে রাখি, পাঠও করি। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছুই অশোভন নহে।

প্রথমকাণ্ড তৃতীয় অনুবাক দ্বিতীয় সূক্ত সমাপ্ত।

শ্রীঃ——

দ্বিজিহ্ব-দ্বাদশকম্।

(সপদ্যানুবাদম্।)

একয়া জিহ্বয়া প্রাহ্বয়ামো হরিং
কীর্ত্তয়ামোঽন্যয়া সংশয়োত্থাং গিরম্।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্॥১

একটী জিহ্বাতে করি হরির আহ্বান;
অন্যে নানাতর্ক করি হ'য়ে সন্দিহান॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে॥১

একয়াচক্ষ্মহে ধর্ম্মমেবাচর
ক্রমহে চান্যয়া দূরয়ামূদৃশম্।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্॥২

এক রসনাতে বলি "ধর্ম্ম কর ভাই"
অন্যে বলি "দূর কর এসব বালাই॥"
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবরে॥২

একয়া ক্রমহে স্বীয়ধর্ম্মং বরম্
ঘোষয়ামোঽন্যয়া সাধু ধর্ম্মান্তরম্
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্॥৩

এক রসনার দ্বারা স্বধর্ম্মে বাখানি।
অন্যেতে অন্যের ধর্ম্মে ভাল ব'লে মানি॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে॥৩

একয়া নির্দ্দয়ান্ গর্হয়ামো নরান্
অর্হয়ামোঽন্যয়া হন্ত বীরা ইতি।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণাভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥৪

নিন্দি এক রসনাতে নিরদয় নরে।
বন্দি তারে "বীর" ব'লে সাদরে অপরে
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভবপারাবারে ॥৪

একয়া শিক্ষয়ামো দরিদ্রং ভর
তাড়য়ামোঽন্যয়া কোন্বয়ং পামরঃ।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥৫

একে শিক্ষা দেই "দীনে করহ পালন"
অন্য রসনাতে করি তাহারে তাড়ন ॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥৫

একয়া ভর্ৎসয়ামোঽতিমন্দাত্মনঃ
হন্ত সম্ভাবয়ামোঽন্যয়া তান্ পুনঃ।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥৬

মন্দজনে নিন্দা করি এক রসনায়।
অন্যে তারে ধন্যবাদে মান্য করি হায় ॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥৬

মদ্যমাচক্ষ্মহেঽবদ্যমেবৈকয়া
স্বাদয়ামস্তদেবাগ্রহাদন্যয়া।

সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥৭

এক জিহ্বা দিয়ে বলি "মন্ত অতি ঘৃণ্য"
সাগ্রহে আস্বাদি তারে দিয়ে জিহ্বা অন্য
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥৭

একয়াচক্ষ্মহে হেম-নারীং ত্যজ
ক্রমহে চান্যয়া তে সদা সন্তুজ।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং।
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥৮

এক রসনাতে বারি কামিনী-কাঞ্চন।
অন্যে তার ভোগ-জন্যে বিরচি বচন ॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥৮

একয়া দূষয়ামো ধনং নশ্বরং
তোষয়ামোঽন্যয়া লিপ্সয়ার্থেশ্বরম্।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥৯

বিনশ্বর ধনে এক রসনাতে দূষি।
ধনের আশায় অন্যে ধনেশ্বরে তুষি ॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিছেছি মোরা ভবপারাবারে ॥৯

একয়া যস্য কুর্ম্মঃ প্রশংসাবচঃ
দোষমুদ্‌ঘোষয়ামোঽন্যয়াস্যৈব চ।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং।
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥১০

যাহার প্রশংসা করি এক রসনাতে।
দোষ বিঘোষণা করি তাহারি অন্যেতে ॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভবপারাবারে ॥১০

একয়া ব্রূমহে কেঽস্মদেবাস্তিকাঃ
অন্যয়াখ্যাপয়ামো বয়ং নাস্তিকাঃ।
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥১১

একে বলি আমাদের চেয়ে কে আস্তিক ?
অন্য রসনাতে বলি আমরা নাস্তিক ॥
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভবপারাবারে ॥১১

ব্যাহরামো হরেরামকৃষ্ণেকয়া
সংগিরামো হরেরামমুষ্যান্যয়া। ৭
সংভ্রমামো ভবাম্ভোনিধৌ সন্ততং
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্বা বয়ম্ ॥১২

"হরে রাম কৃষ্ণ" বলি এক রসনায়।
অন্যে বলি "হর পর-ভূমিখণ্ড" হায় !
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-আকারে।
সদা ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥১২

এষ বৈদ্যোঽনবদ্যং বদত্যর্ভকঃ
হে হৃষীকেশ বিশ্বেশ কেশার্চ্চিত।
ঈদৃশীং নো দ্বিজিহ্ব-প্রবৃত্তিং হর
ত্বং নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি-প্রদো হি প্রভো ॥

---

৭ একয়া (জিহ্বয়া) হরে রাম কৃষ্ণ (ইতি) ব্যাহরামঃ-কথয়াম ইত্যর্থঃ। অন্যয়া (জিহ্বয়া) অমুষ্য (জনস্য) ইরাম্-ভূখণ্ডং হর-অপহর (ইতি) সংগিরামো-ব্রূমঃ ইত্যর্থঃ। "ইরা ভূবাক্‌সুরাপ্সু স্যাৎ" ইত্যমরঃ। লেখক।

"ভোলানাথ" বৈদ্য বলে ওহে হৃষীকেশ।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-দাতা তুমিই বিশ্বেশ॥
দ্বিজিহ্ব-প্রবৃত্তি হেন মোদের ঘুচাও।
দয়া ক'রে দয়াময়! সুপথে চালাও॥

শ্রীভোলানাথ দাশ গুপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগীচ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ (কর্ম্মফল-তৃষ্ণা-রহিত ইত্যর্থঃ) কার্য্যং (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম করোতি স সন্ন্যাসী চ যোগীচ, ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্যেষ্ট-কর্ম্মত্যাগী) নচ অক্রিয়ঃ (অনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তকর্ম্মাদিত্যাগী)।১

বঙ্গানুবাদ। যিনি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে নিত্য-নৈমিত্তিক বিহিত কার্য্য করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও সন্ন্যাসী এবং যোগী, আর যিনি ফলকামী অথচ যজ্ঞানুষ্ঠান ও পূর্ত্ত-কার্য্যাদি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ত্যাগী হইলেও সংসারী, তিনি সন্ন্যাসী নহেন। ১

আলোচনা। শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগে আত্মতত্ত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে আত্মার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম-যোগের ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কামকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে নিষ্কামকর্ম্মকে জ্ঞান-লাভের উপায়-স্বরূপ বর্ণন করিয়া জ্ঞান-যোগের প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্ম-সংন্যাস অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাই ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমে বলিতেছেন যে, যিনি সংন্যাসী যোগী, তিনি কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানাদি অগ্নিসাধ্যক্রিয়া ও পূর্ত্ত-কার্য্যাদি লোকহিতকর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই "সংন্যাসী" পদ-বাচ্য নহেন। যিনি প্রকৃত সংন্যাসী, তিনি উক্ত কার্য্য করিয়া ঈশ্বরে কর্ম্ম-ফল সমর্পণ করিবেন; ফল-ত্যাগী হইলেই "সংন্যাসী—যোগী"-পদ-বাচ্য হইবেন।

যোগী ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া মুক্তি-লাভের উপায়-স্বরূপ ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইবেন। ভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লোকে সেই ধ্যান-যোগের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। ১

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
নহ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

অন্বয়। হে পাণ্ডব! যং সংন্যাসং ইতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি। হি (যতঃ) অসংন্যস্তসংকল্পঃ (অপরিত্যক্ত-সংকল্পঃ) কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন ভবতি। ২

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব, যাহাকে সংন্যাস বলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে যোগ। কারণ সংকল্প সংন্যাস (ত্যাগ) না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না। ২

আলোচনা। কামনা-ত্যাগই সংন্যাসের প্রধান লক্ষণ। কর্ম্ম ও ফল উভয়ই যিনি ত্যাগ করিয়াছেন তিনি মুখ্যতঃ সংন্যাসী, কিন্তু কর্ম্ম-ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম-ফল-বাসনা-ত্যাগই পরমার্থতঃ শ্রেষ্ঠ। রাজর্ষি জনকাদি এই জন্যই সংসারে থাকিয়া যোগীর শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়। যোগং (জ্ঞানযোগং) আরুরুক্ষোঃ (আরোঢ়ুমিচ্ছোঃ) মুনেঃ কর্ম্ম কারণং উচ্যতে (কর্ম্মণঃ চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ) যোগারূঢ়স্য (ধ্যান-নিষ্ঠস্য) তস্যৈব শমঃ (উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মেভ্যঃ নিবৃত্তিঃ) কারণং উচ্যতে। ৩

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞান-যোগে আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষে নিষ্কামকর্ম্মই যোগের কারণ-স্বরূপ হয়। আর যিনি জ্ঞান-যোগে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্ম-সংন্যাস অর্থাৎ ত্যাগই তাঁহার পক্ষে যোগের কারণ বলিয়া উক্ত হয়। ৩

আলোচনা। বেদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক চিত্ত-শুদ্ধি হইলে তবে সাধু যোগারূঢ় হয়েন। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞান-নিষ্ঠায় পরিপক্ক হইলে তাঁহাকে আর কর্ম্ম করিতে হয় না। কিন্তু বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যাঁহাদের চিত্ত-শুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উদয় না হয়, তাঁহাদের যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে নাই। ফল-কামনা-ত্যাগী যোগেপ্সুকে এখানে "মুনি" বলা হইয়াছে। ৩

যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্প-সংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

অন্বয়। যদা হি ন (পুরুষঃ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগেযু তৎসাধনেষু)

কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) তদা সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী (সর্ব্বান্ সংকল্পান্ সংন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ) যোগারূঢ় ইতি উচ্যতে। ৪

বঙ্গানুবাদ। যখন সাধক সকল বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সমস্ত-সংকল্প-রহিত হয়েন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।

আলোচনা। যে সাধক সাধনগুণে "জগৎ মিথ্যা" এই জ্ঞান লাভ করেন, রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যাঁহার মন ধাবিত হয় না, বৈধ নিষিদ্ধ কোন কর্ম্মেই যাঁহার চিত্ত-বৃত্তির উন্মেষ হয় না, যিনি বাহ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট, সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকেন, তখন সেই সাধককে যোগারূঢ় বলে। ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

অন্বয়। আত্মনা (মনসা) আত্মানং (সংসারাৎ) উদ্ধরেৎ নতু আত্মানম্ অবসাদয়েৎ (অধোনয়েৎ) হি (যতঃ) আত্মা এব আত্মনঃ (স্বস্য) বন্ধুঃ (উপকারকঃ) আত্মা (বিষয়াসক্তঃ) এব আত্মনঃ রিপুঃ (অপকারকঃ) ৫

বঙ্গানুবাদ। বিবেকযুক্ত আত্মা আপনি আপনাকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। কেননা ; আত্মাই নিজে নিজের উপকারক এবং নিজে নিজের অপকারক। ৫

আলোচনা। পৃথিবীতে মানব-জন্ম লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব-শিক্ষা, আত্মোন্নতি-সাধন বা মোক্ষ-লাভই জীবের লক্ষ্য। সংসার দুঃখময়। সংসারে সুখ আদৌ নাই তাহা নহে, তবে কদাচিত কাহার ভাগ্যে সুখ মিলে। সে সুখ অল্প ও দুঃখ-সংভিন্ন, তাহাও আবার স্থায়ী হয় না ; অতএব সে সুখ দুঃখ-পক্ষেই ধর্ত্তব্য। সুতরাং আর্য্য ঋষিগণ আত্মোৎকর্ষ-সাধন দ্বারা মোক্ষলাভেই ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন। ধন-সম্পত্তি—ঐশ্বর্য্য—সুন্দরীস্ত্রী-লাভ, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের আনুকুল্যে হইতে পারে, কিন্তু আত্মোন্নতি-লাভ অপরের সাহায্যে হইতে পারে না। সামান্য অর্থকরী বিদ্যা—যাহা দ্বারা আমরা লোক-সমাজে প্রতি-পন্ন হইতে চেষ্টা করি, তাহা পাইবার জন্য পিতামাতা উপযুক্ত বিদ্যালয়ে দিতে পারেন, সুশিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন ; স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু আত্ম-চেষ্টা ভিন্ন তাহার সম্যক্ ফল-লাভ কদাচ সম্ভব হয় না। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, দুঃখময় সংসার-সমুদ্র পার হই-বার সহায় জীবের আর কেহই নাই। আপনি বিবেকযুক্ত হইয়া আপনাকে উদ্ধার করিবে। আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার শত্রু। "অপরের কুপরামর্শে আমি নরকে ডুবিলাম" ইত্যাকারে অপরের প্রতি দোষারোপ করা বৃথা। ৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

অন্বয়। যেন আত্মনা এব আত্মা (মনঃ) জিতঃ (বশীকৃতং) আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনস্তু (অজিতাত্মনস্তু) আত্মা এব শত্রুত্বে (অপকারিত্বে) শত্রুবৎ বর্ত্ততে। ৬

বঙ্গানুবাদ। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু; যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বহিঃশত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারী হয়। ৬

আলোচনা। আমরা বাল্যকালে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান্ ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের রচিত "মিত্রতা" প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম "তুমি এমন লোকের সহিত বন্ধুতা করিও না, যিনি আপনি আপনার বন্ধু নহেন"। গীতার এই শ্লোকটীর আভাস অক্ষয় বাবুর রচনায় বিদ্যমান। যে আত্মা বিবেকবুদ্ধি-বলে আত্মজয়ী, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু বা আত্মবন্ধু। আর অনাত্মজয়ী আত্মা আত্মার বহিঃশত্রু ুল্য অনিষ্টকারী। ৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অন্বয়। জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য) প্রশান্তস্য (রাগাদিরহিতস্য) পরং (কেবলং) আত্মা (মনঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠং) (ভবতি)।

বঙ্গানুবাদ। জিতেন্দ্রিয় প্রশান্ত-চিত্ত ব্যক্তির আত্মাই শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ মানাপমানে নিশ্চলরূপে অবস্থান করে। ৭

আলোচনা। যাহার চিত্ত, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ মান অপমানে রাগ-দ্বেষ শূন্য হইয়া প্রশান্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়েই পরমাত্মার অনুভূতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮

অন্বয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞানং ঔপদেশিকং বিজ্ঞানং তু অপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং জ্ঞান-বিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়-বুদ্ধিশূন্যঃ) যোগী (যোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তঃ যতিঃ) যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) ইতি উচ্যতে। ৮

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার চিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য, মৃত্তিকা পাষাণ সুবর্ণে যাঁহার সমদৃষ্টি, তাদৃশ যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। ৮

আলোচনা। গুরূপদেশগ্রাহিণী বুদ্ধির নাম জ্ঞান, বিবেক-বিচার দ্বারা এই শাস্ত্রার্থের অনুভূতির নাম বিজ্ঞান; এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্ত আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ অবিচলিত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সম্মুখে রাখিয়াও যিনি নিস্পৃহ এবং রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত জিতেন্দ্রিয়, মৃত্তিকা-পাষাণ-সুবর্ণে হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধিশূন্য, ঈদৃশ পুরুষই যোগযুক্ত বা যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ৮

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯

অন্বয়। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু (সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী মিত্রং স্নেহবান্ অরিঃ শত্রুঃ উদাসীনঃ বিবদ মানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োর্হিতৈষী দ্বেষ্যঃ আত্মনোঽপ্রিয়ঃ বন্ধুঃ সম্বন্ধবিশিষ্টঃ তেষু) সাধুষু (সদাচারানুবর্ত্তিষু) পাপেষু (দুরাচারানুবর্ত্তিষু) (এতেষু সর্ব্বেষু) সমবুদ্ধিঃ (সমারাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু) বিশিষ্যতে যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়মুত্তম ইত্যর্থঃ। ৯

বঙ্গানুবাদ। যিনি সুহৃদ্ মিত্র শত্রু উদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধু সাধু অসাধু সকলকেই সমান জ্ঞান করেন, তিনিই যোগারূঢ়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৯

আলোচনা। যিনি প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া উপকার করেন, তাঁহাকে সুহৃদ্ কহে। যিনি স্নেহবশতঃ বা উপকারপ্রত্যাশী হইয়া উপকার করেন, তিনি মিত্র। অরি-শত্রু। যিনি বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষাবলম্বী নহেন তিনি উদাসীন। যিনি বাদী বিবাদী উভয়ের হিতৈষী তিনি মধ্যস্থ। যিনি প্রকৃতিবৈষম্যে অপরের দ্বেষ্য, যাহার সহিত কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ হেতু বন্ধুত্ব আছে, যিনি সাধু এবং যিনি অসাধু পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব ঈদৃশ ব্যক্তিগণকে যিনি সমান জ্ঞান করেন তিনিই যোগারূঢ়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৯

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।



মায়ের আগমন।

এক বৎসরের পর বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিকর্ত্রী পালয়িত্রী চৈতন্যময়ী জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ারূপিণী মহাশক্তি দশভূজা জগদম্বা, আবার দীনদুঃখী সন্তানের কুটীরে আসিতেছেন। তাই দেখ, ধরণী উল্লাসে প্রোল্লাসিত হইয়া শুভ্রকাশ-কুসুমরূপ কৌষেয়-বসন পরিধান করিতেছেন! সুনীল গগন হাস্যময়, নীল অরণ্যানী হাস্যময়ী এবং সুনীল-সলিলা তটিনী কুমুদ-কহ্লারদলে শোভাময়ী হইতেছে! ঐ দেখ, নির্গলিতাম্বু লঘু শারদমেঘমালা কণ্ঠে পরিধান করিয়া সুপ্রসন্না দিগঙ্গনাগণ নির্ম্মলেন্দু-দ্যুতি-পরিচ্ছিন্ন ব্যোমমার্গের স্থানে স্থানে প্রজ্জ্বলিত হীরকখণ্ডবৎ তারকার বর্ত্তিকা সমগ্র রজনী জ্বালিয়া রাখিতেছে! ঐ দেখ, মায়ের আগমনে শস্য-ক্ষেত্রের প্রসবোন্মুখশালিনী, শালিধান্যময়ী কেশরাজি হইতে বারিবিন্দুপাতের ন্যায় শিশির-বিন্দু পতিত হইতেছে! ঐ দেখ, মায়ের আগমন-সংবাদে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র সকলের অন্তঃকরণে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে। ঐ দেখ, সুনির্ম্মল নভোমণ্ডল আজ এই সুখের শারদীয় মহোৎসবে স্থির-গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া ভবিষ্যৎ শুভ ঘোষণা করিতেছে। সুগন্ধবহ সমীরণ এই শুভ যোগে শারদফুল্লকুসুমাবলীর সৌরভরাশি দশদিকে বিকীর্ণ করিয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে! সকলেই এই বৎসরান্তের শুভদিনে দুর্গোৎসব—মহানন্দে মাতোয়ারা হইয়া দুর্গতিহারিণী দুর্গামাতার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান-মানসে হর্ষোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন মহানন্দের দিনে ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গের গৃহে গৃহে আজ দুর্গোৎসবের মহানন্দ উৎসে সহস্র মঙ্গল-ধারা ছুটিতেছে। আজ এই পুণ্য মুহূর্ত্তে বঙ্গবাসী হিন্দুগণের আনন্দের সীমা নাই। কর্ম্মজ্ঞান-ধর্ম্ম-পরায়ণ বঙ্গবাসী আজ অতীত বৎসরের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনা বিস্মৃতির অতলতলে বিসর্জ্জন দিয়া বর্ত্তমানের আনন্দময় দুর্গোৎসব-পূজানন্দে, ব্যবহারে সৌজন্যের পূর্ণ আদর্শ হইয়া, আচারে ধার্ম্মিকের অতুল-সৌসাদৃশ্য-প্রদর্শন-পূর্ব্বক, কুল-পরম্পরাগত রীতি-পদ্ধতি-গুণে ভদ্রতার সংযত কেন্দ্রে উপনীত হইয়াছে।

মা আসিতেছেন। সিংহবাহিনী মা আমার দশভূজা-রূপে সিদ্ধিদাতা গণেশ, সুরসেনানী কার্ত্তিকেয়, সর্ব্ব সম্পদ্-রূপিণী লক্ষ্মী এবং সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী সরস্বতীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। তাই গৃহে বসিয়াই আজ আমরা সর্ব্বশক্তিময়ী, চিন্ময়ী দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তির আরাধনা করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেছি এবং সকলেই একমনে, একপ্রাণে ও একসুরে বলিতেছি—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে॥"

বলিতেছি বটে, কিন্তু আমরা কয়জনে এই পূজোৎসবের তত্ত্বকথা জানি? শাস্ত্রে কথিত আছে, কলিযুগে দুর্গাদেবীর আরাধনা করিলে অশ্বমেধের তুল্য ফললাভ হয়। "দুর্গা" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে দেবী-ভাগবত বলিয়াছেন,—

"দুর্গাত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গতি-নাশিনী।
দুর্জ্জেয়া সর্ব্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্॥"

অর্থাৎ যিনি ভক্তকে দুর্গ বা দুর্গম অবস্থা হইতে ত্রাণ করেন, তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। যিনি সর্ব্বদেবতাগণেরও দুর্জ্জেয়া, সেই দুর্গাকে আমি পূজা করি। "দুর্গ" অর্থ সঙ্কটাবস্থা; দুর্গ দৈত্যের নাম; দুর্গ শব্দে মহাবিঘ্ন, মহাবন্ধ, কুকার্য্য, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মৃত্যু এবং অতিরোগাদি বুঝা যায়, যিনি এই সকলের হননকর্ত্রী, সেই দেবী "দুর্গা" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন—

"দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্নে মহাবন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চ দুর্গ-শব্দোঽস্তি বাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥"

আহা! দুর্গা নামের কি অপারমহিমা! যে একবার ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে প্রভাতকালে "দুর্গা" নাম উচ্চারণ করে, সে পাপী হউক্, তাপী হউক্, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় অমনি তাহার বিপদ্‌রাশি দূরীভূত হয়।

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

দুর্গাপূজা আমাদের পক্ষে নূতন নহে। ভারতীয় আর্য্য-বংশের চৈত্র-কুলোদ্ভব মহারাজ সুরথ স্বারোচিষ মন্বন্তরে প্রবলপ্রতাপ বৈরিগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান সমস্ত হারাইয়া একাকী বনে বনে পর্য্যটন করিতে করিতে মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। সমাধি নামক বৈশ্য ও স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ স্থানে উপনীত হন। এবং তাঁহার নিকট আপনাদের মনোদুঃখ ব্যক্ত করেন। ঋষিবর মেধস রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন, আপনারা মোহ-কূপে নিপতিত হইয়া বৃথা রাজ্য, ধন, দারা-পুত্রাদির

জন্য ক্ষোভ করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীহরির যোগ-নিদ্রারূপিণী মহামায়াতেই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত হইয়া রহিয়াছে। সেই দেবী মহামায়া, তিনি জ্ঞানিগণেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মহামোহ-গর্ত্তে পাতিত করেন। সেই মহামায়া কর্ত্তৃকই এই চরাচর বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনিই প্রসন্না হইয়া মানুষের মুক্তির জন্য বরদান করিয়া থাকেন। সেই মহামায়া দেবীই সংসার-হেতু আর তিনিই পরমা বিদ্যা ও মোক্ষের সনাতন-হেতু-স্বরূপা।”

ইহা শুনিয়া মহারাজ সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাত্মন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হইলেন? তাঁহার কর্ম্মই বা কি?”

মেধস্ উত্তর করিলেন,—“সেই দেবী নিত্যা এবং বিশ্বরূপা। এই জগৎ সেই মহামায়া হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি নিত্যা বটে, কিন্তু দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধি-নিমিত্ত যখন আবির্ভূতা হইয়া থাকেন, তখনই তিনি লোক-সমাজে “উৎপন্না” বলিয়া অভিহিতা হন। তিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াশক্তি এবং সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপিণী সেই বৈষ্ণবী মায়াতেই আপনি ও বৈশ্য এবং অন্যান্য বিবেকীগণ মোহিত হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ! আপনি সেই পরমেশ্বরী দেবীরই স্মরণ লউন। তিনি প্রসন্না হইলে মনুষ্যাদির সমস্ত ভোগ এবং মোক্ষ দান করিয়া থাকেন।”

মহর্ষি মেধসের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামায়ার তপস্যার্থে নদী-পুলিনে যাইয়া রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য সেই চিন্ময়ীদেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পুষ্প-ধূপাগ্নি-তর্পণাদি উপচার দ্বারা তাঁহার পূজারম্ভ করিলেন। এই ভাবে সুরথ ও সমাধি তিন বৎসর যাবৎ দেবীর আরাধনা করিলে পর দেবী স্বয়ং তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে ঈপ্সিত বর দান করিতে চাহিলেন। রাজা সুরথ রাজ্য-সুখ-ভোগ বর প্রার্থনা করায় পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সমাধি বৈশ্য “জ্ঞান” প্রার্থনা করায় কালে তিনি জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানবলে মুক্তিলাভ করিলেন।

তদবধি শারদীয়া পূজা আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে ব্যক্তি শক্তিমান্ হইয়াও মোহ বা আলস্য-বশতঃ কিংবা দ্বেষ-বশতঃ শারদীয় মহোৎসবে দুর্গাদেবীর পূজা না করে, মা ভগবতী তাঁহার সমস্ত অভীষ্ট নিষ্ফল করিয়া থাকেন। সুতরাং কামনা-সিদ্ধি-হেতু দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা যেরূপ কাম্য বলা যায়, সেইরূপ নিত্যও বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে,—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
শারদীয়া মহাপূজা চতুঃ কর্ম্মময়ী শুভা ॥
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ ॥"

অর্থাৎ প্রতিবর্ষে শরৎকালে যে মহাপূজা করা হয়, সেই পূজাই চতুঃ-কর্ম্মময়ী শারদীয়া মহাপূজা; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন তিথিতেই ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি এই চতুঃ-কর্ম্মময়ী শারদীয়া মহাপূজা প্রতিবর্ষেই আশ্বিন শুক্লপক্ষে করা উচিত। চতুঃ কর্ম্ম বলিতে স্নান, পূজা, বলি এবং হোমকার্য্যই বুঝায়। হিন্দু-জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্রেই যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে তিন প্রকার, তখন এই শারদীয়া মহাপূজাও যে তিন প্রকার হইতে পারে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ সাত্ত্বিকী, রাজসিকী এবং তামসিকী-পূজাভেদে হিন্দু মাত্রেরই এই দুর্গাপূজার অধিকার আছে,—

"শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ ॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরণাদিষু কীর্ত্তিতম্।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা।
দেবীসূক্ত-জপশ্চৈব যজ্ঞো বহ্নিষু তর্পণম্ ॥"

জপযজ্ঞাদি এবং নিরামিষ-নৈবেদ্যাদি উপকরণ দ্বারা যে পূজানুষ্ঠান হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিকী পূজা বলে। পুরাণাদিতে এইরূপ দুর্গাদেবীর সাত্ত্বিকী পূজারই মাহাত্ম্য অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবী-মাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডী-পাঠই জপ, এই হেতু দেবী-মনা হইয়া দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডী পাঠ করিবে এবং দেবী-সূক্ত জপ করিবে ও সুসংস্কৃত বহ্নিতে তর্পণ করিবে। এই প্রকার জপ-যজ্ঞাদি-রহিত পূজাই রাজসিকী পূজা বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

রাজসী বলি-দানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপ যজ্ঞৈর্বিনাতু যা ॥

অর্থাৎ যে পূজা উক্তরূপ জপ-যজ্ঞ-বিহীন হইয়া বলিদান, আমিষ-নৈবেদ্য এবং সুরামাংসাদি উপহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজসিকী পূজা বলে। আর তামসিকী পূজা মন্ত্রবিহীন হইবে। এই তামসিকী পূজা কিরাতাদির করণীয়া—

"বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা"।

এইরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণ-ভেদে স্ব স্ব অধিকারানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য সেবকগণ এমন কি ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও এই মহামায়া দুর্গার পূজা করিতে অধিকারী। অধিকার-বিচারে নিজে কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারাও এই দেবীর পূজা করিতে পারা যায়। পূজক ভাল হইলে অর্থাৎ তপঃ-পরায়ণ হইলে পূজা যথাবিধি সৌষ্ঠবসহকারে অনুষ্ঠিত হইলে ও পূজিত প্রতিমূর্ত্তির আভিরূপ্য থাকিলে অভীষ্ট দেবতা আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। যথা—

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চায়াশ্চাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি ॥"

আজ কাল নিরীশ্বরবাদী, স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়, হিন্দুর দেব-দেবী-পূজাকে "পৌত্তলিকতা" বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু-জাতি যে প্রতিমা গড়াইয়া দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, উহাও হিন্দুদিগের পুতুলপূজা নহে, উহা বাস্তবিকই উপাসনা। প্রকৃতপক্ষে সেই এক শুদ্ধ নিত্য চৈতন্যময় আত্মার বিকাশই যাবতীয় দেব-দেবীগণ। প্রথম হইতে শুদ্ধ নিরা-কার চৈতন্যের উপাসনা করিতে পারা যায় না—অদৃশ্যে ভাবনা সম্ভবে না—বলিয়াই চিদ্রূপের প্রতিরূপস্থানীয় প্রতিমাতে দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রে উপাসনামাত্রেই প্রত্যক্ষে যে কোন দেব-দেবীরই হউক্ না কেন, পরোক্ষে তাহা এক সেই শুদ্ধ চৈতন্যেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব এস পাঠকগণ, হিন্দু-ধর্ম্মের দেব-দেবী-উপাসনের একমাত্র সার লক্ষ্য যে ব্রহ্মোপাসনায়—দেবোপাসনার পরিণতি যে শুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনায়—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই শারদীয় মহোৎসবের মহানন্দের দিনে একবার মনঃ-প্রাণ খুলিয়া বলি,—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

জয় ভারতেশ্বর।

ভগবান্ বিশ্বরাজ, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের অখণ্ড অধীশ্বর। তিনি এই বিশ্বসাম্রাজ্যের পালক পোষক; শাসক ও নাশকও তিনি; অর্থাৎ হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। বিশ্বরাজারই অনুকৃতি বা আভাস এই মর্ত্ত্যধামের পার্থিব রাজা। বিশ্বরাজ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। মর্ত্ত্য পার্থিব রাজাও চরের সাহায্যে সর্ব্বজ্ঞ, রাজ্যের সর্ব্ব অবস্থা-তত্ত্বজ্ঞ। চরের সাহায্যে তিনি সর্ব্বদর্শী। "রাজা কর্ণেন পশ্যতি" বাক্যের তাহাই তাৎপর্য্য। এই জন্য শাস্ত্রে রাজার "চারচক্ষু" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর পার্থিব রাজাও ভাবান্তরে সর্ব্বব্যাপী। সমষ্টি রাজ-শক্তির ক্ষুদ্রতম ব্যষ্টি-শক্তিরূপে যে নগণ্য জঘন্য জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র পল্লীতে আর কিছু রাজ-চিহ্ন নাই, সেখানেও অন্ততঃ চৌকিদার আছে। উহাও সমষ্টি-রাজ-শক্তিরূপ বিপুল বৈশ্বানরের স্ফুলিঙ্গ-স্বরূপ। আর "সর্ব্ব" শব্দের আধিক্য অর্থে পার্থিব রাজাতেও তাঁহার নিজরাজ্যান্তর্গত সর্ব্বশক্তিমত্তা দৃষ্ট হয়।

বিস্তৃত উদাহরণাদি-প্রয়োগের অবসরাভাব চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিবেন যে, প্রায় সর্ব্ববিষয়ে অনন্ত ও সান্তভাব-ভেদে বিশ্বরাজ ও পার্থিব-রাজ-সাদৃশ্য কীদৃশ সুস্পষ্ট ও অকষ্টকল্পিত। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্র তাই বলেন—"মহতী দেবতা রাজা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, হিন্দুর পক্ষে স্বয়ং সেই বিশ্বরাজ শ্রীহরিই সর্ব্বসারতম শাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—"নরাণাঞ্চ নরাধিপম্"—অর্থাৎ নরগণের মধ্যে আমাকে নরাধিপ (রাজা) বলিয়া জানিও। হিন্দুর পক্ষে আর অন্য যুক্তি-তর্ক অনাবশ্যক। যে "গীতা" লইয়া আজ হিন্দু অহিন্দু জগতের সর্ব্বশ্রেণীর জ্ঞানী, বিদ্বান্, সুধী ও সাধু-সমাজে বিস্ময়ানন্দের অতুল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, সেই গীতাতেই ভগবদুক্তিতে সান্ত ক্ষুদ্র পার্থিব রাজাতেই সেই অনন্ত মহৎ মহেশ্বরের বিভূতি ব্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র আরো অনেক কথাই রাজার ঐশীশক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। সব কথার অবতারণার এস্থলে অনবসর ও অনাবশ্যক। রাজদণ্ডে বিষ্ণুর চক্র, শিবের শূল, শক্তির খড়গ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, কুবেরের গদা, কার্ত্তিকের বাণ, যমের দণ্ড এই শাস্ত্রোক্ত অষ্টবজ্রের সমাবেশ। "অষ্টবজ্রবলী রাজা স্বরাষ্ট্রে সর্ব্বশক্তিধৃক্" সুতরাং স্বরাজ্যে রাজার "সর্ব্বশক্তিমান্" বিশেষণের বিশেষত্ব বা সার্থকত্ব শাস্ত্র-যুক্তি উভয়তঃই সুপ্রমাণিত। মর্ত্ত্য-মহেশ্বর রাজা, তাঁহার প্রতি রাজভক্তির অভাব বা উপেক্ষা

হিন্দু-হৃদয়ের চির অপরাধ। তবে এ সমাদৃত সত্যের যে ব্যভিচার, তাহা হিন্দু-কুলাঙ্গার-কল্পিত ব্যতিরেক স্থল (Exceptional case) মাত্র। এক জালা দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র পড়িলে সমস্ত দুগ্ধ বিকৃত হয় বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড অগ্নিতে জল-বিন্দুর সামান্য ছিটা পড়িতে না পড়িতেই শুকাইয়া লুকাইয়া যায়। অস্মদ্দেশে রাজভক্তির ব্যভিচার এই দ্বিতীয় উদাহরণের অনুরূপ। এই হিন্দুস্থান ভারতবর্ষে যে কেবল হিন্দু-রাজাই হিন্দু-শাস্ত্র-মতে ঐশ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন; তাহা নহে; সেই বিশ্বরাজার বিধানে সর্ব্বজাতি—সর্ব্ব ধর্ম্মী নির্বিবশেষে যিনিই যখন রাজ-সিংহাসন আরোহণে অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই রাজ-ধর্ম্ম-পালনে প্রজার হৃদয়-সিংহাসনেও ঐশী-বিভূতি বিকাশ করিয়া সাদরে সমাসীন হইয়াছেন। হিন্দুর পর মুসলমান্ রাজা হইলেন, তিনিও "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া হিন্দুর শাস্ত্রসাক্ষ্য সপ্রমাণ করিলেন। অধুনা সেই মঙ্গলালয় জগৎপতির মঙ্গল-ইচ্ছায় ইংরাজ-রাজ ভারত-পতি হইয়াছেন, এখনও সেই ভাব, সেই স্বভাব ও সেই প্রভাবের অণুমাত্রও অভাব হয় নাই; বরং বহুবিধ পাশ্চাত্য গুণগণে অলঙ্কৃত হওয়াতে ও শক্তি-সম্প্রসারণে সুদৃঢ়ীভূত বর্ত্তমান বৃটিশ-রাজত্ব ভারতের দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী ঐশ-বিধানরূপে সাদরাভিনন্দিত—সন্দেহ নাই।

যে ভারতবর্ষকে ভগবান্ মানবজাতির মুক্তিক্ষেত্র বা ধর্ম্মসাধনরূপ কর্ম্মভূমিরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষকে গুণে জ্ঞানে, ধর্ম্মে সৎকর্ম্মে, বিচক্ষণতায় সকল বর্ষের আদর্শরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষ ভগবানের পূর্ণাদর্শ ও ভক্তের পদধূলিতে পবিত্রীকৃত, যে ভারতের ভক্তি-নিমন্ত্রণে ভগবান্ স্বয়ং অবতাররূপে ধরাবক্ষে ধরা দিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের শাসক, পালক, শোধক ও শিক্ষকরূপে যে রাজশক্তি—তিনি স্বীয় মঙ্গল-হস্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, চির-ভগবদ্ভক্ত অদৃষ্ট বা ঈশ্বরেচ্ছাবাদী ভারতবাসীর তাহাতে আপত্তি, অনাস্থা, অবিশ্বাস ও উপেক্ষার অণুমাত্র অবকাশ নাই। অতএব বৃটিশরাজ-শক্তির অভ্যুদয় ও বিজয়—ভগবদ্ভক্ত ও রাজভক্ত ভারতবর্ষের আন্তরিক একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা সেই অন্তর্যামী ভক্ত-বাঞ্ছাধন ভগবান্ই জানেন।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে এই অদৃষ্ট অশ্রুত ও বিশ্ব-ইতিহাসের অজ্ঞাতপূর্ব্ব অদ্ভুত অসাধারণ লোমহর্ষণ বিভীষণ ব্যাপারে আমাদের বৃটিশ-রাজ যে অংশ গ্রহণ করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে ভগবদনুগৃহীত ভারতাধীশ্বরের পক্ষে পরিণামে বিজয়-লক্ষ্মীর কৃপা-লাভ অবশ্যম্ভাবী

বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। ন্যায়-যুদ্ধ ও ধর্ম্ম-যুদ্ধ রাজন্যগণের পক্ষে না করাই বরং দোষের বিষয় এবং করাই গুণের, শুভের ও সুখের বিষয়। ধর্ম্ম-যুদ্ধের আবশ্যকতা গীতশাস্ত্রে ভগবান্ সুস্পষ্ট বুঝাইয়াছেন। "যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং। সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥"

দৈবে এ যুটেছে যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গ-দ্বার প্রায়।
সুখী ক্ষত্র তারা পার্থ যারা হেন রণ পায়॥

গীতার এই বাক্যে ধর্ম্ম-যুদ্ধের গুণ-শ্রুতি বুঝাইয়া আবার উপেক্ষার দোষ-শ্রুতি বলিতেছেন—

"অথচেৎ ত্বমিমংধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥"

অর্থাৎ

এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ যদি নাহি কর, তবে—
হারায়ে স্বধর্ম্ম-কীর্ত্তি, পাপ-ভাগী হবে।

আমাদের মনে হয়, বৃটিশ্ পররাষ্ট্র-সচিব মহাশয় স্বীয় বিবেকবলে ভগবানের ঐ গীতোক্তি সত্যই যেন শ্রবণ করিয়াছিলেন—"ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।" তিনি এই বর্ত্তমান যুদ্ধ-কর্ত্তব্যে বাস্তবিক এইভাবেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই যুদ্ধে লিপ্ত না হইলে, নানা কারণে বৃটিশ্-পক্ষের অধর্ম্ম, অন্যায়, অকর্ত্তব্যশীলতা, আত্মহিতে অনবধান, পরদ্রোহ এবং প্রবলের দুর্ব্বল-পীড়নে সহায়-প্রদান প্রভৃতি বিবিধ অনিবার্য্য অপরিহার্য্য দোষও অনিষ্টের নিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া এই রণরঙ্গে অঙ্গ ঢালিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই তথ্য সত্য হওয়ায় আমাদের জয়ের আশাও ধ্রুব সত্য হউক্, সেই সত্যস্বরূপের চরণে এই প্রার্থনা।

আজ এক বর্ষ পূর্ণ হইল, আমাদের ইংরাজরাজ রণঘোষণা করিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আজ তাহারই বার্ষিকস্মৃতি-সভার অধিবেশন উপলক্ষে আমরা এ স্থলে সমবেত হইয়াছি। (১) এখানে আমরা সমবেতহৃদয়ে সেই বিশ্বহৃদয়েশ্বর শ্রীভগবানের শ্রীচরণে এই সমর-বিজয় প্রার্থনা করিতেছি। মা সর্ব্বমঙ্গলা মহাশক্তি জগদ্ধাত্রীর জগদ্বন্দিত পদারবিন্দে প্রার্থনা জানাইতেছি—

"শুভং দেহি জয়ং দেহিং যশো দেহি দ্বিষোজহি।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥"

(১) মহনীয় সম্রাটের জয়কামনয় যে সংগ্রামের বার্ষিক উৎসব হয়, তদুপলক্ষে এই প্রবন্ধ রচিত হয়।

আমাদের দুর্গোৎসবের এই প্রার্থনা-মন্ত্রপাঠ "কন্যা হ'তে হিমবান্ আব্রহ্ম বেলুচিস্থান" ভারতাকাশে ধ্বনিত ও ভারতবায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত ও উচ্ছ্বাসিত হউক্—সংগ্রামে বিজয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি।

সর্ব্বশেষ কথা—এই সময়ে আমাদের একান্তপ্রাণে ভগবদ্ভজন আবশ্যক। এ ভজন কৃপাময় ভগবান্ কলির কলুষ-কাতর জীবের জন্য কৃপা করিয়া অতি সহজ করিয়া দিয়াছেন। শুধু কেবল ভগবানের নাম-কীর্ত্তনেই কলিতে ভগবদ্ভজন সুসিদ্ধ হইবে। সকল সাধনাতেই দৈব ও পুরুষকার, দুইই চাই। দৃষ্টান্ত ধরুন, কোন কঠিন ব্যাধি জন্মিলে, যেমন ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়, তেমনি আবার দেবতার কাছে মানসা, নারায়ণকে তুলসী-দান, দেব-স্থানে মাথাকোটা, হরি-সংকীর্ত্তন, কালীপূজা প্রভৃতি বিবিধ দৈব-প্রতীকার করিতে হয়। আমাদের এই ঘোর সমর-সঙ্কটে Men, mony, material, এই তিন M যেমন দরকারী, তেমনি এই সঙ্কট-মোচনার্থে দৈব-প্রতীকার রূপ ভগবন্নাম-কীর্ত্তন দ্বারা "কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" বাক্যের সার্থকতা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ ভগবানের প্রিয় ভক্ত-পূর্ণ প্রধানতম ভজনস্থান, এই স্থানের রাজার মঙ্গলেই প্রজার মঙ্গল সেই মঙ্গলময় বিধান করিবেন, এই বিশ্বাসে, এই আশ্বাসে আশার বাণী শুনুন—

"যতোধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণোযতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।"

যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। অথবা আরও সংক্ষেপোক্তি "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।" রাজা বৃটিশের এই ধর্ম্ম-যুদ্ধের বিশ্বাস এবং প্রজা আমাদের এই প্রার্থনা ও ভগবান্‌কে ডাকার আশ্বাস, উভয়ে মিলিত হইয়া গগন-ভেদী জয়ধ্বনি উঠুক্—

"জয়! ভারতেশ্বরের জয়!" বল, পঞ্চমস্বরে "জয়! পঞ্চমজর্জের জয়!" সর্ব্বশেষে এই জয়ের সর্ব্বশেষ-সাফল্যের প্রার্থনা কলির সাধন ভগবানের নাম-ধ্বনি—এবং হিন্দু ভারতের জাতীয় আনন্দ-ধ্বনির উচ্চ উচ্ছ্বাস ছুটুক্—

"হরি হরি বোল্! হরিবোল্ হরি!"

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

আবাহন।

আজি,—

শিশির-স্নিগ্ধ শ্যামল কানন
শুষ্ক বরষাপঙ্ক,
শরৎ আগত এসগো জননী
উজলি ধরণী-অঙ্ক।
উঠিছে শেফালি-কমল-গন্ধ
ছুটিছে সমীর মন্দ মন্দ
দিগ্‌দিগন্তে আগমনী রবে,
বাজিছে বোধন-শঙ্খ।
এস মা ভবানী শক্তি-দায়িনী
দশভূজা রূপ ধরিয়া,
মুছাতে মোদের মোহের কালিমা
শান্তির বারি ঢালিয়া।
মাতুক উৎসবে যত পুরবাসী
অধরে ফুটুক মিলনের হাসি
যাক্ দূরে ত্যজি নিরাশা আঁধার
নিমেষের মাঝে সরিয়া।
পূজিতে তোমার চরণ-কমল
ভক্তি-কুসুম-দলে,
সন্তান তব মন্দির-তলে
দাঁড়ায়েছে দলে দলে।
আজি এ শারদ পুণ্য-লগনে
পূজা-আয়োজন ভবনে ভবনে
বাজিছে শঙ্খ বাজিছে ঘণ্টা
তোমারি চরণ-তলে।
এস চিন্ময়ি, চিত্তে মোদের
জাগাতে সূক্ষ্ম চেতনা,
এস মা অভয়ে, ঘুচাতে মোদের
বিগ্রহ-দৈন্য-বেদনা।

এস গো জননী আনন্দ-দায়িনী
পুলক-উৎসে ভাসাতে ধরণী
এস তুমি মাগো ভকতবৎসলা,
পূরাতে ভক্ত-কামনা ॥

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মহীয়সী মহিলার মহনীয় গুণ
কাহারো মানস-পটে হয়নি অঙ্কিত।
বিধবার বেদনার প্রখর তাগুণ
কাহারও মর্ম্মস্থল করেনি শঙ্কিত।
বঙ্গ সুন্দরীর দুঃখে ব্যথিত হৃদয়ে
আসেনি ত্রিদিব-লভ্য অমরার সুখ।
কল্পনা মর্ম্মরস্পর্শি নিভৃত নিলয়ে
আনেনা টানিয়া কভু সংসারের দুঃখ।
উপেক্ষিতা রমণীর প্রীতি-মাখা গান
মর্ম্মাহত অনাদর—গভীর বেদনা ;—
হে কবি ! মথিত করি মনুজের প্রাণ
কি ঝঙ্কারে কোন্ সুরে তুলিলে মোহনা !
যশোহর ধন্য, ধরি তব পুণ্য-ছবি—
অমর জগতে বঙ্গ "মহিলা"র কবি ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্‌যোগ আয়োজন দ্রুতবেগে চলিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিতসেবী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় নবমসম্মিলনের সাধারণ সভাপতি ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় স্বাস্থ্য-বৈকল্য

সত্বেও সোৎসাহে সানন্দে গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শাখা-সমিতি গঠিত হইতেছে। অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। এই সদনুষ্ঠানে যশোহরবাসী প্রত্যেকের যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যশোহর দরিদ্র, বাণীসেবকগণের সমুচিত অভ্যর্থনা সাধ্যায়ত্ত নহে, তবে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে "বিদুরের ক্ষুদ্" লইয়া যশোহর-সন্তানের প্রস্তুত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বন্যাবিপত্তি। বঙ্গের নানাস্থান এবার বন্যাবিপত্তিতে অবসন্ন। টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, শিলচর প্রভৃতি স্থানে বন্যাবিপ্লবে শস্য-হানি ও অন্যবিধ ক্ষতি হইয়াছে। যশোহরের ঝিনাইদহ জলে ডুবু ডুবু! ঢাকা ও ফরিদপুরের অনেক স্থানে এবং যশোহরের নড়াইল মহকুমার বহুস্থানে লোকের বাড়ীর উপর জলস্রোত বহিতেছে। জনগণের বিশেষতঃ গবাদি পশুর প্রচুর কষ্ট হইতেছে। ভগবদিচ্ছার জয় হউক!

স্বাধীনতা। সংবাদপত্রে প্রকাশ—কুমিল্লা সহরের নানাস্থানে সন্ধ্যার পর কে বা কাহারা 'লিবার্টি' বা স্বাধীনতা-নাম্নী পুস্তিকা ছড়াইয়াছে। ফরিদপুরে বার-লাইব্রেরীর বহিঃপ্রাচীরেও নাকি কাহারা ইংরেজীতে লিখিত রাজদ্রোহাত্মক রচনা লাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। যশোহরেও কতিপয় স্থানে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে রাজদ্রোহ-সূচক কাগজ কাহারা আঁটিয়া দিয়াছিল। ভগবান্ এই সকল অশান্ত জনের ঘটে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন।

কারাদণ্ড। পত্রান্তরে প্রকাশ—বহুসংখ্যক টোটা-রাখা অপরাধে অভিযুক্ত শ্রীহরিদাস দত্ত পুনর্ব্বিচারে দুই বর্ষ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভাগ্য! ফল—কর্ম্মেরই পরিণতি।

বিচারফল। লাহোরের বিরাট্ ষড়যন্ত্র-মোকর্দ্দমার বিচার-ফলে ৬১ জন অভিযুক্তের মধ্যে ২৪ জনের প্রাণদণ্ড, ২৭ জনের আজীবন দ্বীপান্তর-বাস-দণ্ড, ৬ জনের বিভিন্নরূপ সশ্রম কারাবাস-দণ্ড বিহিত হইয়াছে। ৪ জন অভিযুক্ত মুক্তিলাভ করিয়াছে। বিধিলিপি!

জল কষ্ট। কালীপাহাড়ীতে বৃষ্টির অভাবে ধান্ রোওয়া হইতেছে না। চাউল ক্রমে দুর্মূল্য হইতেছে। আসান্‌সোলেও বৃষ্টির অভাবে চাষের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে; চাউলের দর বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে পূর্ব্ববঙ্গে মধ্যবঙ্গে জলের আতিশয্যে কষ্ট, আর পশ্চিমভাগে জলের অভাবে কষ্ট, আকার-প্রকার ভিন্ন হইলেও দুইই জল-কষ্ট।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত

হিন্দু-পত্রিকা।

২২ বর্ষ, ২২শ খ

৭ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক

১৩২২ সাল

ভক্তি-প্রবাহ।

(প্রথম লহরী)

শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি-মহাবাক্য-বিচারে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হয়। আবার "আত্মাবারে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ সাক্ষাৎ-কর্ত্তব্যশ্চেতি" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে জীব ও ব্রহ্মে উপাস্য-উপাসক-ভাব স্থিরীকৃত হয়। ভারতের উপাসকসম্প্রদায়—মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। একশ্রেণী সগুণ-ব্রহ্মবাদী, অপরশ্রেণী নির্গুণ-ব্রহ্মবাদী। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যাদি নির্গুণব্রহ্মবাদী ও অদ্বৈত-বাদী। রামানুজস্বামী প্রভৃতি সগুণ-ব্রহ্মবাদী। একদল অভেদবাদী, অপরদল ভেদবাদী।

একশ্রেণীর আচার্য্যেরা বলেন যে, "মায়া বা প্রকৃতি, ঈশ্বরেরই শক্তি; শক্তি বা গুণ ধর্ম্মীকে ছাড়িয়া থাকে না; সুতরাং ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বা গুণগুণি-ভাব মানিলে ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করিতে হইবে। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে বা জড় প্রকৃতি হইতে কখনই বিচিত্র কৌশলপূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। শ্রুতিও ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞান প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন।" অপর কেহ বলেন "বিশ্বের সূক্ষ্ম বীজ প্রকৃতিতে অদৃশ্যভাবে

থাকে, পুনরায় প্রকৃতি তাহা প্রসব করেন, সুতরাং স্থষ্টিকর্ত্তার গুণ-ক্রিয়া-শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই।" এই কথায় মন তৃপ্ত হয় না, যেহেতু চৈতন্য-শক্তির প্রেরণা ব্যতীত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা, জড়ের ক্রিয়ায় হওয়া অসম্ভব। প্রয়োজ্য-প্রয়োজক-ভাবে, নিয়ম্য-নিয়ন্তা-ভাবে জীব-ঈশ্বর-ভাবে স্বতই জীব, ঈশ্বরের করুণা-প্রার্থী। বদ্ধাবস্থার সেবাজনিত লব্ধ প্রেম, মুক্তাবস্থায়ও জীব বিস্মৃত হইতে পারে না। এজন্য মনস্বীগণ বলেন যে, সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত জীবও শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

জ্ঞান ও ভক্তি তুল্যজাতীয় হইলেও ভক্তির জলবদ্বশীকারিণী শক্তি আছে, জ্ঞানের তাহা নাই, এই জন্যই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। "চিনি হওয়া" ও "চিনি খাওয়া" দুইটী পৃথক্ ব্যাপার। জ্ঞান "চিনি হইতে দেয়" ভক্তি "চিনি খাইতে দেয়।" রস নিজে রসাস্বাদ লাভ করিতে পারে না, কিন্তু পরমহংসগণ রসাস্বাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, জ্ঞান হইতে প্রেম-ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন আমরা কোনও ব্যক্তিকে প্রথমে জানি, পরে গুণ-গরিমার আলোচনায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হই, সেইরূপ স্থূলতঃ বা সূক্ষ্মতঃ ব্রহ্মকে জানিলে তাঁহার অপার মহিমার অনন্তশক্তির পরিচয় হইলে সহজেই হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। নাস্তিকের কুযুক্তি, লীলাময়ের লীলা-বিলাসের লেশমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রথমে অন্ধবিশ্বাসেই পদার্থাশ্রয় করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার গুণ-পরিচয় লাভ করা যায়। বস্তুশক্তি স্বতই প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা তর্ক-সাপেক্ষ নহে। প্রথমে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্র-বাক্যে আস্থাস্থাপনকরতঃ ক্রমশঃ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই সিদ্ধি-লাভ হইবে। আদরের ধনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলে কখনই সিদ্ধি-লাভ হয় না, সুখ-শান্তিও পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইলে অবশ্যই জীব জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু, ইচ্ছা প্রবল হইতেও শত শত জন্ম গত হইয়া যায়। মনের অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার বলে মন, যুক্তি-তর্কের অগোচর বস্তুও অনুভব করিতে পারে। মনেই ঐশভাব প্রতিফলিত হয়। সময় হইলে কৃপাসিদ্ধি-বশে বিমল চিত্ত-দর্পণে ঐশ-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন প্রেমিক পুরুষ অন্যের অগোচরে তাহাতে প্রাণ মিশাইয়া দেয়। অমৃত-লাভ সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। যে ভাগ্যশালী, সেই সে ধনে ধনী হয়; অন্যে অবিশ্বাস-মরুভূমে পড়িয়া দারুণ পিপাসায় প্রাণ হারায়।

বস্তুবিশ্লেষণ করিলে বিশ্বের অভ্যন্তরে জড় ও চৈতন্য এই উভয়ের সত্তার উপলব্ধি হয়। সেই চৈতন্যাংশ বিরাট্ পুরুষের অংশ মাত্র। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও তাঁহার করুণাভিখারী। তাঁহার করুণা ব্যতীত জীবের মায়া-মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। তাঁহার প্রতি অনুরক্তি 'ভক্তি'পদ-বাচ্য। ভক্তির গুণে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলে তিনি স্বাংশভূত জীব-হৃদয়ে স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া জীবকে চরিতার্থ করেন এবং মায়া-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বসমীপে টানিয়া ল'ন। জীবের প্রতি তিনি বিমুখ নহেন। জীবই কর্ম্মবশে হৃদয়-নিধিকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির বিকাশের জন্য চিত্ত-শুদ্ধির আবশ্যক। তজ্জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্মের ভক্তিতে অপেক্ষা আছে। তবে ভক্তানুগৃহীত অথবা ভগবদনুগৃহীত ব্যক্তির সাধনান্তরের প্রয়োজন হয় না। উত্তমা ভক্তির লক্ষণে শাস্ত্র বলিয়াছেন।

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অন্য-অভিলাষশূন্য, জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত, কায়িক, বাচিক, মানসিক কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক পরিচর্য্যাদি "উত্তমা ভক্তি" বলিয়া কথিত হয়। উক্ত উত্তমা ভক্তি ছয় প্রকার, যথা,—ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মুক্তিলঘুতাকারিণী, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দ-স্বরূপা, এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা এই তিনটিকে ক্লেশ কহে। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ-ভেদে পাপ দুই প্রকার হয়; যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত আছে, যাহার ভোগ-কাল উপস্থিত হয় নাই, তাহাকেই অপ্রারব্ধ কহে। আর সে পাপ ফলোম্মুখ, যাহার ফলে জন্ম-গ্রহণাদি করিতে হয়, তাহাই প্রারব্ধ বলিয়া খ্যাত হয়। ভক্তির উক্ত উভয়বিধ-পাপনাশকত্ব-শক্তি আছে। অপ্রারব্ধ-পাপ-নাশকত্বের উদাহরণ যথাঃ—

ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোক।

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।

হে উদ্ধব! যেমন প্রদীপ্তশিখ অগ্নি কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়া ভক্তি, নিখিল পাপ বিনষ্ট করে। প্রারব্ধ-পাপ-নাশকতা-শক্তির উদাহরণ, যথা :—

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ-প্রহ্বনাৎ যৎ-স্মরণাদপি ক্বচিৎ,

শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥

দেবহূতি কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার নাম-শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি, যে কোন একটী করিলে কুক্কুর-ভোজী চাণ্ডালও শীঘ্রই যাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে। যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যে পবিত্র না হইবে ইহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

পদ্মপুরাণ হইতে ভক্তির পাপ-বীজ-নাশকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে, তপোদান-ব্রতাদিভিঃ,
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া।

তপস্যা, দান, প্রায়শ্চিত্তাদি করিলে পাপের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু, হৃদয়লগ্ন পাপবীজ কিছুতেই হৃদয় হইতে যায় না; তজ্জন্য পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি জন্মে। ঐ হৃদয়-সংলগ্ন পাপবীজ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বিনষ্ট হইবে না।

ভক্তির অবিদ্যানাশকতা প্রদর্শিত হইতেছে।

যৎপাদ-পঙ্কজপলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা,
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুৎপ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং।

সনৎকুমার বলিলেন, "হে রাজন্! মনুষ্যদিগের অহঙ্কাররূপ হৃদয়-গ্রন্থি কর্ম্ম-রজ্জুতে গ্রথিত, উহা সাধুগণ, শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দ-সেবা-প্রভাবে, যেমন মোচন করিতে সমর্থ হন্, বাসুদেব-ধ্যান-বিহীন নির্ব্বিষয়-মতি যতিগণ, ইন্দ্রিয়-নিচয়ের নিগ্রহ করিয়াও তেমন সমর্থ হন্ না। অতএব আপনি আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের ভজনা করুন।" শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে সাধুদিগের হৃদয়স্থ অমঙ্গল অর্থাৎ মায়াদি দূরীভূত হয়। ভগবৎসেবা-প্রভাবে অমঙ্গল নষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মে। তখন তমোরজো-গুণোৎপন্ন কাম-লোভাদি, আর চিত্তকে আয়ত্ত করিতে পারে না; তখন চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে মুক্তসঙ্গ মহাত্মা ব্যক্তির ভগবৎতত্ত্ব-বিজ্ঞান স্বতই প্রকাশ-গোচর হয়। তাহা হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় ও সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। অতঃপর ভক্তির শুভজনকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। সমুদায় জগতের

প্রীতি-বিধান, সকলের অনুরাগ, সদ্‌গুণ এবং সুখ ইত্যাদিকে পণ্ডিতগণ "শুভ" নাম প্রদান করেন। ভক্তির সর্ব্বজগতের প্রীতি-সাধনত্ব ও অনুরাগ-জনকত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

পদ্মপুরাণ—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি।

যে ব্যক্তি হরির অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনি সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; এমন কি, স্থাবর-জঙ্গমও তাঁহার গুণে অনুরক্ত হয়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাহার নিষ্কাম ভক্তি হয়, সমস্ত গুণের সহিত দেবতারা তাহার দেহে বাস করেন। আর যে অভক্ত এবং যাহার চিত্ত অসৎ বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহার মহদ্‌গুণ কোথা হইতে হইবে—অর্থাৎ তাহার কোন বিষয়েই সিদ্ধি-লাভ ঘটে না। এই শ্লোকে ভক্তির সদ্‌গুণপ্রদত্ব দর্শিত হইয়াছে। ভক্তি-শাস্ত্রে সুখ তিন প্রকার কথিত হইয়াছে, বৈষয়িক, ব্রাহ্ম, এবং ঐশ্বরিক। ভক্তির সুখ-দায়কত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

যথাতন্ত্রে—

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্ গোবিন্দ-ভক্তিতঃ।

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! যে ব্যক্তির গোবিন্দচরণারবিন্দে ভক্তির উদয় হয়, তাহাকে ঐ ভক্তি, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, বিষয়-স্বরূপ—শাশ্বত ব্রাহ্ম ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইয়া থাকে। ভক্তির উদয়ে মুক্তি হীন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই এখন দেখান হইতেছে।

যাহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্‌রতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ, তৃণবৎ প্রতীত হয়। রাজমহিষী গমন করিতে থাকিলে, দাসীরা যেমন ভীত-চিত্তে তাঁহার অনুগমন করে, সেইরূপ ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি—সকলে হরি-ভক্তি মহাদেবীর পশ্চাৎ ভীত-চিত্তে গমন করে। সুদুর্লভা

ভক্তি দ্বিবিধ। নিষ্কাম কর্ম্ম সমূহ দ্বারা চিরকালেও অলভ্যা এবং কামনা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আশু অদেয়া। ভক্তির সুদুর্ল্লভত্বের প্রমাণ—

যথা তন্ত্রেঃ—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তি র্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈঃ হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা।

জ্ঞানবলে মুক্তি সহজেই লব্ধ হয়, ও যজ্ঞাদি পুণ্য-বলে বিষয়-সুখ-ভোগ সহজে হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র উপায়েও সেই হরিভক্তি-লাভ হয় না।

আনন্দঘন ভক্তির বিষয়-প্রদর্শন-স্থলে প্রহ্লাদকৃত নৃসিংহদেবের স্তব উল্লিখিত হইয়াছে।

ত্বৎ-সাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥

হে ভগবন্! আপনার দর্শন-লাভে আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আমার নিকট ব্রহ্মানন্দও এখন গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে। যে ভক্তি প্রিয়বর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষিণী। প্রমাণ যথা,—

নসাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!
নস্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা!০।

হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী বিশুদ্ধা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ইহার একটিও আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে সমর্থ নহে।

প্রস্তাবিত ভক্তি সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম-ভক্তি এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-দর্শনাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তিকেই সাধনভক্তি কহে। এই কথায় প্রেম-ভাব-ভক্তির কৃত্রিমত্ব—শঙ্কা হইতে পরে, তন্নিবারণার্থ ভক্তিশাস্ত্রকারগণ দেখাইয়াছেন যে জীবের হৃদয়স্থিত নিত্যসিদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিবার নাম সাধন।

সাধন-ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধ কথিত হয়। অনুরাগের অভাব-বশতঃ কেবল "শাস্ত্র-ভয়ে" যাহাতে প্রবৃত্তিজন্মে, তাহাকে বৈধীভক্তি কহে। বিষ্ণুকে সদা স্মরণ করিবে কখনই বিস্মৃত হইবে না, সমুদায় বিধি-নিষেধ এই উভয়ের কিঙ্কর। সর্ববিধ আশ্রমীর পক্ষেই এই বিধি নিত্য। মহৎসঙ্গাদি-লাভ-জন্য যাঁর শ্রীকৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং যিনি কর্ম্মে অতিশয় আসক্ত ন

বৈরাগ্যবান্ হন নাই, তিনিই ভক্তি-বিষয়ে অধিকারী। উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে ভক্ত ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্র-বিষয়ে নিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্, তিনিই উত্তম ভক্ত। যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম ভক্ত, আর যাঁহার শাস্ত্র-যুক্তি আদৌ জানা নাই; শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, তিনি অধম ভক্ত। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, ধনার্থী, জ্ঞানী এই চারি প্রকার মনুষ্য আমাকে ভজনা করে। কিন্তু, ইহা ভিন্ন ঈশ-কৃপাসিদ্ধ ভক্ত-কৃপাসিদ্ধ জন্মান্তরীণ-পুণ্য-পুঞ্জ-সিদ্ধ ভক্ত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সালোক্যাদিরূপ মুক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থায় প্রধানরূপে ঐশ্বরিক সুখ প্রার্থনীয় হয়; দ্বিতীয়াবস্থায় প্রেম-স্বভাব-সুলভ সেবাই একান্ত স্পৃহনীয় হইয়া উঠে। সুতরাং, সেবারসিক ভক্তবৃন্দ প্রথমাবস্থাকেই প্রতিকূল জ্ঞান করেন, কিন্তু যাঁহারা একবার একমাত্র প্রেম-ভক্তির মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, হরিতে একান্ত অনুরক্ত সেই ভক্তগণ, সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষ কদাচ প্রার্থনা করেন না। এমন কি, দ্বারকানাথের প্রসন্নতাও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারে না। ভক্তিমার্গে শ্রেষ্ঠ-জাতির কথা বলা বাহুল্য, অন্ত্যজজাতিরও অধিকার আছে। ভক্তের প্রমাদ-জনিত দোষের স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাহাকে পঞ্চযজ্ঞের অকরণ-জন্য পাপভাগী হইতে হয় না।

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণীচ রাজন্!
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং,
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং।

করভাজন নিমিরাজাকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমবিহিত সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করে, সে আর দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও আত্মীয়গণের নিকট ঋণী নহে। তাহাকে আর পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ভক্তির তুলনা নাই, ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়।

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কথা।

অদ্য চতুঃশতবর্ষ অতীত হইয়া গেল, শ্রীভগবান্ তাঁহার চির-প্রিয় এই ভারত-ভূমিতে—এই বঙ্গভূমিতে যে ত্রিলোকপবিত্রকরী মধুময়ী লীলার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন; যাহার কণিকা-মাত্র-স্পর্শে জগৎ মধুময় হইয়া গিয়াছে, যাহাতে বিন্দু-মাত্র বিশ্বাস-স্থাপনে কত দস্যু তস্কর, পাপী তাপী, অন্যের পাপ তাপ-হারী, জগৎপবিত্রকারী হইয়া অদ্যাপি সাধু-সমাজে নিত্য পূজা পাইতেছে, সেই লীলার নায়ক অবতার শ্রীশ্রীগৌরহরি সম্বন্ধে অদ্যাপি কাহারও কাহারও মুখে নানাবিধ সন্দেহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সংশয়ের অপনোদন করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বা তাহা এই প্রবন্ধ-লেখকের সাধ্যের আয়ত্তও নহে, কেননা—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে" সেই পরাৎপরের দর্শনমাত্রেই জীবের নিখিল-সংশয়-ছেদন হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বসংশয় কখনই নিবৃত্ত হয় না; তথাপি যে আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি—ইহার উদ্দেশ্য বলিতে হইলে শ্রীমদুদয়নাচার্য্যের ভাষায় বলিতে হয় যে—"ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মনন-ব্যপদেশভাক্। উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা"॥ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কাদির অবতারণারূপ এই যে ন্যায়-চর্চ্চা, ইহা শ্রবণের অনন্তরকর্ত্তব্য মননরূপ উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অবতার কিনা—এ বিষয়ের বিচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য যে, অবতার কাহাকে বলে? অবতীর্ণ হওয়ার হেতু কি? যদি আমাদের শাস্ত্রোক্ত অবতারের লক্ষণ ও হেতু মহাপ্রভুতে থাকে, তবে অবশ্যই তাঁহাকে অবতার বলিতে বাধ্য হইব, অন্যথা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন;—

যস্যাবতারাজ্ঞায়ন্তে শরীরিম্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দ্দেহিম্বসঙ্গতৈঃ॥

মনুষ্যে অসম্ভব এরূপ অলৌকিক শক্তি যাঁহাতে দেখা যায়, তাঁহাকেই "অবতার" বলে। এখন ইহাতে এক আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বে অগস্ত্য প্রভৃতি যোগসিদ্ধ ঋষিগণ গণ্ডূষে সমুদ্র-পান প্রভৃতি অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা কি অবতার? আমি বলি হাঁ—তাঁহারাও অবতার; কারণ ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন;—

যদ্যদ্বিভূমিমৎসত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবং॥

"হে অর্জ্জুন! যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সত্ত্ব-সম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন ও উজ্জ্বল, সে সমস্তই আমার তেজোংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিও।" সুতরাং যোগসিদ্ধ ঋষিগণকে অবতার বলিতে কোন বাধাই নাই, কিন্তু সে অবতারে ও আমার আলোচ্য অবতারে পার্থক্য অনেক। ভারতেশ্বরও রাজা, জয়পুর যোধপুর প্রভৃতির সামন্ত-নৃপতিবৃন্দও রাজা, এবং বর্দ্ধমান নাটোর প্রভৃতির রাজাও রাজা। অবশ্য ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে অর্থাৎ যিনি প্রকৃতি রঞ্জন করেন তিনিই রাজা এইরূপ অর্থ মাত্র ধরিলে অনেকে রাজ-পদ-বাচ্য হইতে পারেন, কেননা অন্ততঃ দু' এক ঘর প্রজা রঞ্জন করেন না এরূপ লোক অতি বিরল; সুতরাং সকলেই রাজ-পদ-বাচ্য হইবার যোগ্য হইলেও যেমন উত্তরোত্তর শক্তির আধিক্য দেখিয়াই রাজ-পদ-ব্যবহার হয়, এবং যাঁহার শক্তি, অন্য কোন মনুষ্য-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে, তিনিই যেমন প্রকৃত রাজা বা সম্রাট্, তেমনি অলৌকিকশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই অবতার-পদ-বাচ্য হইবার যোগ্য হইলেও উত্তরোত্তর শক্তির আধিক্য লইয়া অবতার-পদ-ব্যবহার হইয়া থাকে। যাঁহার শক্তি সাধন-সাপেক্ষ নহে, তিনিই প্রকৃত অবতার। যোগসিদ্ধ ঋষিগণের শক্তি সাধন-সাপেক্ষ। ভিক্ষালব্ধ ধনের অধীশ্বর হইলে যদি তাঁহাকে রাজা বলা যায়, তবে যোগসিদ্ধ শক্তিতে শক্তিমান্ হইলেও তাঁহাকে অবতার বলিতে পারেন। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সাধন-নিরপেক্ষ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই অবতার-পদ-বাচ্য। সেই অবতারও আবার বহুবিধ। গুণাবতার—যেমন সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ লইয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব। পুরুষাবতার—বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী প্রভৃতি। লীলাবতার—মীন, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি। মন্বন্তরাবতার—রৈবত বিভু হরি প্রভৃতি। যুগাবতার—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে, যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, ও পীত-বর্ণ-শরীরধারী তত্তদ্যুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। শক্ত্যাবেশ অবতার—নারদ, সনক, সনন্দন প্রভৃতি। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন;—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়াহরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

অর্থাৎ যেরূপ একমাত্র সমুদ্র হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, মীন কূর্ম্ম প্রভৃতি দশটি মাত্রই অবতার নহে; ঐ দশটি ছাড়াও শ্রীভগবানের অসংখ্য অসংখ্য অবতার আছে। মাত্র দশাবতারবাদীগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, দশাবতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের

উল্লেখ নাই, বলরামেরই উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকে ধরিলে দশের পরিবর্ত্তে একাদশ হইয়া যায়, সুতরাং "দশাবতারই সত্য, তদতিরিক্ত কল্পিত—"এ কথা কখনই বলিতে পারা যায় না। এখন দেখা যা'ক্ ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কি?

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ;—

"যদাযদাহি ধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ॥

"যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিত্রাণ-জন্য দুষ্কৃতিগণের বিনাশ-জন্য ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।" ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে—তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার কোনও নির্দ্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নাই, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি অবতীর্ণ হন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও অসুরাদির উপদ্রব উপস্থিত হয়, তখন তখন যদি সাধন-নিরপেক্ষ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি-নাশ, অসুর-নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তবে সেই মহাপুরুষকে অবতার বলা যাইতে পারে।

ত্রেতাযুগে যখন রাবণাদি নিশাচরগণের পদ-ভরে ধরণী কম্পিতা, তাহাদের অযথা উৎপীড়নে যখন ত্রেতার যুগ-ধর্ম্ম "যজ্ঞ" ধ্বংস-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন সেই যজ্ঞেশ্বর রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিলেন। বহুকাল পরে পুনরায় যখন কংসাদি অসুরগণের ভারে মেদিনী কম্পিতা, কংসানুচরগণের অযথা অত্যাচারে পূজা অর্চ্চনাদির বাধা-বিঘ্ন হইতে লাগিল, তখন পুনরায় শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া কংসাদি অসুর-নিধন করিয়া দ্বাপরের যুগ-ধর্ম্ম অর্চ্চনা অর্থাৎ সেবা-সংস্থাপন করিলেন। আবার ইহার বহুকালপরে সত্যকাল হইতে প্রচলিত বেদোক্ত উদ্দেশ্য ও অধিকারীভেদে বিহিত যজ্ঞাদির অঙ্গ-স্বরূপ যে পশু-ঘাতন, তাহাতে ভয়ঙ্কর ব্যভিচার উপস্থিত হইল ; লোকে যখন যজ্ঞের উদ্দেশ্য যজ্ঞেশ্বরকে ভুলিয়া গেল, কেবল মাত্র নিরর্থক পশু হিংসাকেই "ধর্ম্ম" বলিয়া মনে করিতে লাগিল ; এককথায় এই পুণ্যভূমি

ভারত যখন দানবের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিল, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, আর বেদমর্ম্ম-গ্রহণে অসমর্থ পশু-তুল্য লোকেরা বেদের দোহাই দিয়া স্বীয় কুকার্য্যের সমর্থন করিতে লাগিল, তখনই পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ বৃথা পশুহনন দেখিয়া সদয়হৃদয় বুদ্ধ-রূপে অবতীর্ণ হইলেন, ও নিরর্থক পশু-হিংসার নিবৃত্তি করিয়া অধর্ম্মের অভ্যুত্থান রোধ করিলেন। এ ভাবে সহজেই ক্ষীণ-মস্তিষ্ক কলির জীব, শ্রীভগবান্‌কে ত ভুলিলই, পরন্তু নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর পরমপবিত্র বেদের উপরও বিশ্বাস হারাইয়া ঘোর মোহান্ধকারে ডুবিয়া রহিল। তখন শঙ্করাবতার শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানালোক দ্বারা লোকের মোহান্ধকার ধ্বংস করিয়া শ্রীভগবানের তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিলেন। তাই তাঁহাদের সকলেরই অবতারত্বের প্রতি কাহারও সংশয় নাই। এখন দেখা যা'ক্ কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে সময় আবির্ভূত হন, সে সময় সামাজিক অবস্থা কিরূপ? তখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল কিনা? মহাপ্রভু কর্তৃক তাহার প্রতিকার কিরূপ হইয়াছিল? যদি এ সমস্ত বিষয় শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে, তবে তিনি নিশ্চয় অবতার, অন্যথা তাঁহাকে কখনই অবতার বলিব না।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের কিছুকাল পরে মোহান্ধ মানব পুনরায় ভ্রমে পতিত হইল। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল।

অদ্বৈতবাদের উদ্দেশ্য কি ও দ্বৈতবাদের উদ্দেশ্যই বা কি—তাহার সমালোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখান গ্রন্থ লিখিতে হয়, তাদৃশী শক্তি বা সময়, কিছুই আমার নাই। তবে সংক্ষেপতঃ ইহাই আমি বলিতে পারি বা ইহাই আমার অনুভব যে, দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ উভয়ই সত্য, উভয়ই তুল্য, উভয়ের লক্ষ্যই এক, কেবল মাত্র উদ্দেশ্য-ভেদে বা অধিকারী-ভেদে সাধন-পন্থা ভিন্ন, শব্দগুলি ভিন্ন। স্থূলে ভেদ থাকিলেও মূলে সকলই এক। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। সৎ অর্থাৎ—নিত্য; চিৎ অর্থাৎ—জ্ঞান; আনন্দ অর্থাৎ—সুখ; ইহার মধ্যে অদ্বৈতবাদীগণ জ্ঞানরূপী ভগবানের সাধক। জ্ঞান প্রকাশস্বভাব, তাই তাঁহারা জ্ঞান-বলে জীব-ব্রহ্মের স্বরূপ বা মূল নির্দ্ধারণ করেন। মূল নির্দ্ধারণ করিতে গেলে দেখা যায়, শ্রীভগবান্‌ই নিখিল জগতের মূল, তাঁহা হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। তাই তাঁহারা "সোঽহং" তত্ত্বে মূল নির্দ্ধারণ করেন। দ্বৈতবাদীগণ আনন্দরূপী ভগবানের ভজনা করেন, তাই তাঁহারা জগতের জৈব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া "দাসোঽহং" বলিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

জ্ঞানীর "সোঽহং" ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বর্ণন, ভক্তের "দাসোঽহং" ভগবানের লীলা-বর্ণন, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী দ্বৈতবাদকে উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং প্রকৃত ভক্তও অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে পারেন না। গীতায় বলিয়াছেন ;—

"বহূনাংজন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে।"
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥

অর্থাৎ বহুজন্মের অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হয়। সে জ্ঞান কি? "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" অর্থাৎ বাসুদেবই সব—এই জ্ঞান ; এরূপ জ্ঞানী মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে উত্তম ভক্তের লক্ষণে কি বলিতেছেন শুনুন ;—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।"
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন, ও আত্মাতে সর্ব্ব-ভূত অবলোকন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। যেরূপ নয়নমনোমুগ্ধকর বিবিধ রাগরঞ্জিত চিত্রপট অঙ্কিত করিতে হইলে সর্ব্বগ্রে পটখানা শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়াএকাকার করিয়া লইতে হয়, নচেৎ তাহাতে রং ফলে না, তদ্রূপ নানারাগ-রঞ্জিত ভক্ত চিত্র অবলোকন করিতে হইলেও সর্ব্বাগ্রে ভক্তের চিত্তপটখানিকে "বাসুদেবঃ-সর্ব্বমিতি" এই নির্ম্মল শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিতে রঞ্জিত করিয়া একাকার করিয়া লইতে হয় ; নচেৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি ভক্ত-চিত্তের মনোহর চিত্রগুলি কখনই প্রতিফলিত হয় না। অতএব জ্ঞানীর "সোঽহং" এ—ও ভক্তের "দাসোঽহং" এ—মূলতঃ পার্থক্য কিছুই নাই, কেবল আমাদের বুঝিবার ভুল। যদিও নিখিল জগতের মূল ভগবান্, তথাপি জীবকে জীব বৈ ভগবান্ বলা যায় না। জীবত্ব-নাশ না হইলে "সোঽহং" বলিতে পারা যায় না। সেই সচ্চিৎ-ব্রহ্মের সাধনের পরেই আনন্দরূপী ভগবানের সাধন করিবার অধিকার জন্মে। অদ্বৈতবাদের চরম সীমা অতিক্রম করিয়া ভক্তি-বাদের আরম্ভ। "বাসুদেবঃ সর্ব্ব-মিতি" এই জ্ঞান যাহার নাই, সে কি কখনও ভক্ত হইতে পারে! সুতরাং "সোঽহং" বলিলে সাধন-ভজনের অতীত হইলেন না, পরন্তু অধিকারী হইলেন মাত্র। মূল জানিলে ফলের রসাস্বাদন হয় না। এখানে আমার একটি গল্প মনে পড়িল।

আমার কোনও একটি আত্মীয়, কোনও উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। সেই সময় কোনও এক কৃপণ-পুত্রের সহিত আমার আত্মীয়টির বন্ধুত্ব হয়, তাই তিনি তাঁহার বন্ধুর পিতার নিকট সন্দেশ খাইবার জন্য প্রতিদিন আব্দার করিতেন। পরিশেষে একদিন প্রাতে কৃপণের বাটী গিয়া সন্দেশের জন্য বিশেষ

পীড়াপীড়ি করিলে কৃপণ তাঁহাকে যত্ন করিয়া একটু খেজুরের রস খাওয়াইয়া বলিলেন "বাপুহে! তোমাকে আমি সন্দেশের মূলবস্তু খাওয়াইলাম; আর কেন আমাকে জ্বালাতন কর!" তখন আমার আত্মীয়টি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন যে "ইহারও মূল যাহা অর্থাৎ খর্জ্জুর-কাষ্ঠ তাহাই আমাকে খাওয়াইলে হইত!" ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাই বলিতেছিলাম, মূলের দ্বারা ফলের রসাস্বাদন হয় না, সমগ্র প্রাকৃত জগতের মূল পঞ্চভূত, তাই বলিয়া একদলা মাটি খাইলে সন্দেশ খাওয়া হয় না। তখন দেশের অবস্থা এইরূপ যে, খর্জ্জুর-কাষ্ঠ চর্বিণ করিয়া "সন্দেশ খাইলাম" মনে করিয়া লোক সকল আত্মগর্ব্ব করিতেছে, মাটি খাইয়া "রসগোল্লা খাইলাম" বলিয়া কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য ভুলিয়া গিয়াছে, তত্ত্বমসির তাৎপর্য্য ভুলিয়া গিয়াছে! ভ্রমান্ধ হইয়া মনে করিতেছে, "ভগবান্‌ও যে জীবও সে" সুতরাং আর তাহার সাধনভজনের আবশ্যক নাই! কিন্তু যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই কথা বলিতেছে, সেই শঙ্করাচার্য্যও নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতির ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"মুক্তা অপিলীলয়াবিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"—অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরাও লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন;—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।"
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সময় যাঁহারা "পণ্ডিত" বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহারা ভক্তিমার্গের ভজনাকে মহামোহের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিতেন না যে, তাঁহাদের সেই বেদান্তদর্শনের প্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন;—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্যতেবিভো।"
যতন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে॥
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে।
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

হে ভগবন্, পরম মঙ্গলের নিদান ভবৎপদারবিন্দে ভক্তি না করিয়া যে ব্যক্তি কেবল মাত্র জ্ঞান-লাভের চেষ্টা করে, তাহার সে চেষ্টা তুষাবঘাতনের ন্যায় কেবল মাত্র ক্লেশেই পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ তণ্ডুলবিহীন তুষ ঢেঁকিতে কুটিলে যেমন তাহাতে কোন লাভ হয় না, কেবল মাত্র কুটিবার ক্লেশই সার হয়, সেইরূপ;

ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞানের চেষ্টা করিলেও তাহাতে কোনও ফল হয় না, কেবল মাত্র *জ্ঞানার্জ্জনের ক্লেশই সার হয়। জ্ঞেয় ছাড়িয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলেন, কাজেই জ্ঞেয়-লাভ ত হইলই না, পরন্তু জ্ঞানও হারাইলেন। তখন ব্যাকরণের 'যত্ব' 'ণত্ব' লইয়া হউক্ বা দর্শনশাস্ত্রের 'অবচ্ছেদকতা' লইয়াই হউক্ অথবা স্মৃতিশাস্ত্রের 'কার্ষাপণের পরিমাণ' লইয়াই হউক্, বাদী নিরস্ত করাই পণ্ডিতবৃন্দের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সত্য হউক্ মিথ্যা হউক্, একজন যাহা বলিবেন, অপরে তাহা খণ্ডন করিবেনই, তাহাতে যদি সত্যের অপলাপ হয় হউক্। পক্ষান্তরে ইহাতে অর্থাগমেরও সুযোগ হইয়া উঠিল। প্রতিভা-বলে প্রার্থয়িতার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা দিয়া ব্যবস্থাপকগণ বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দার্শনিকগণ দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিক্‌কে দক্ষিণদিক্ বলিয়া প্রতিপাদন করতঃ স্বীয় প্রতিভার পরিচয়ে ধনীর বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক যশ ও অর্থ-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। "বাদি-তর্জ্জন" নামক একখানা পুস্তকও প্রণীত হইল। তাহাতে কেবল আত্মশ্লাঘা করিয়া বাদীর মনে ভয়োৎপাদনের রীতিনীতি বর্ণিত হইল। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাম্ভিক, বড় অহঙ্কারী ও বড় নাস্তিক! তখন লঘু-গুরু-জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, দম্ভ অহঙ্কারই ভূষণ হইয়াছিল। সামান্য একটি দৃষ্টান্ত বলি ;—

সেই সময় কোন একটি প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত স্বীয় মূর্খ ভাগিনেয়ের ধৃষ্টতা-জন্য তাহাকে 'গরু' বলিয়া তিরস্কার করায় তৎক্ষণাৎ ভাগিনেয়টি তাহার মাতুলকে বলিল ;—"কিংগবি গোত্বমুতাগবি গোত্বং? যদি গবি গোত্বং তদিদমযুক্তং অগবিচ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বং ;—অর্থাৎ হে মাতুল! গোত্ব-ধর্ম্ম কি কেবল মাত্র গরুতেই থাকে? অথবা যে গরু নয় তাহাতেও থাকে? গোত্ব যদি কেবল গরুরই ধর্ম্ম হয়, তবে আমাকে গরু বলা আপনার অযৌক্তিক হইয়াছে, আর যদি গোত্বধর্ম্ম গরু ব্যতীত অপর পদার্থেও থাকিতে পারে, তবে যে তাহা অপনাতেও নাই তাহারই বা প্রমাণ কি?" বুঝুন সভ্য পাঠকমহোদয়গণ! মাতুল-ভাগিনেয়ের শিষ্টালাপ! ভাগিনেয়টি ইতঃপূর্ব্বেই দৈব-বরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছেন, মাতুল তাহা জানিতেন না। এখন ভাগিনেয়ের নিকট অপ্রত্যাশিতরূপে শ্রবণ-মধুর 'গো' শব্দে অভিহিত হইয়া পরম প্রীতিলাভপূর্ব্বক আনন্দে ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিলেন ও সমধিক আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাগিনেয় আর তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাটী চলিয়া গেলেন। যত দিন মূর্খ ছিলেন, ততদিন মাতুলের অন্নেই প্রতিপালিত হইতেন; কোনও দিন মাতুলের

আদেশ লঙ্ঘন করা দূরে থাকুক্, তাঁহার সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে কথা বলিতেও সাহস করেন নাই। পাঠকগণ! ইহাতেই বুঝুন, তখনকার বিদ্যা—বিদ্যা—না অবিদ্যা? এই সময় যিনিই গ্রন্থকার হইয়াছেন তিনিই সর্ব্বাগ্রে নিজগুরুর মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সেইটিই যেন তাঁহাদের গুরু-দক্ষিণা ছিল। এই সমুদয় বিষয়ে যিনি যতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইতেন। জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা, সকলের স্থান "তর্ক" অধিকার করিয়াছিল। স্নান আহারের সময় তর্ক, কার্য্যের সময় তর্ক, বিশ্রামের সময় তর্ক, এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগের সময়ও তর্ক ক্ষান্ত হইত না। গুরু-শিষ্যে তর্ক, পিতা-পুত্রে তর্ক, ভ্রাতায় ভ্রাতায় তর্ক, ছাত্রে ছাত্রে তর্ক, এমন কি পিঞ্জরস্থিত শুক-শারিকা প্রভৃতি পক্ষীগণও "বেদ স্বতঃ প্রমাণ, কি পরতঃপ্রমাণ" ইহা লইয়া বাগ্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত! নৃপতিগণের দিগ্বিজয়ের ন্যায়, পণ্ডিতগণেরও বাগ্-যুদ্ধে দিগ্বিজয় হইত। এই সমুদয় বিদ্যা-নামধেয় অবিদ্যা অর্জ্জনের কেন্দ্রভূমি ছিল নবদ্বীপ। এখানে নানা দিক্ দেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া বাক্‌যুদ্ধ শিখিয়া যাইত; তাই গুরুস্থান বলিয়া নবদ্বীপ সমধিক গর্ব্বিত।

হায়! হায়! যাঁহার গুণগানের জন্য বেদের উদ্ভব, যাঁহার স্বরূপ-নিরূপণের জন্য দর্শনের সৃষ্টি, যাঁহার লীলারসাস্বাদনের জন্য পুরাণের প্রকাশ, যাঁহার সেবাবিধি জানিবার জন্য স্মৃতির বিকাশ, তাঁহার আ'জ কি দুর্দ্দশা! এইরূপে মন্দাকিনী-সলিলে বিষ্ঠা ধৌত হইতে লাগিত, শালগ্রামশিলার দ্বারা পলাণ্ডু পেষিত হইতে লাগিল! অনধিকারীর হস্তে মহতের এইরূপ দুর্দ্দশাই হয়!

এইত গেল পণ্ডিতবর্গের অবস্থা। যাহারা মূর্খ, ইতর, তাহারা চিরকালই শ্রেষ্ঠের অনুকরণ করিয়া থাকে, সুতরাং বলা অনাবশ্যক। যাঁহারা একটু বিশ্বাসী, তাঁহারাও শিক্ষকের অভাবে মনসাপূজা ঘেঁটুপূজা প্রভৃতি করিয়াই তৃপ্ত হইতেছিলেন। আবার যাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চাধিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, তাঁহারা সাধন-ভজনের দোহাই দিয়া মদ-মাংসের শ্রাদ্ধ করিতেন। যে দুটি একটি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাও বিদ্রূপ উপহাস ও অত্যাচারের ভয়ে প্রকাশ্যে কিছুই করিতে পারিতেন না। ইহার পর আবার তখন বিধর্ম্মীর রাজত্বের সময়, সোণায় সোহাগা! ফলতঃ ঐ সময় যেরূপ ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে কখনও সেরূপ গ্লানি উপস্থিত হয় নাই। কারণ ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে স্বপদেই ছিলেন, অসুরগণের অত্যাচারে সময় সময় বাধা পাইতেন মাত্র। আর এখন ব্রাহ্মণগণই অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন, রক্ষকই

ভক্ষক হইলেন, কাজেই একেবারে বিপ্লব উপস্থিত! তাই এবার দুটি একটি অসুর-সংহার করিলে ধর্ম্ম-রক্ষার উপায় নাই, আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সময় গুপ্ত ভক্তগণ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া অশ্রুজলে তাঁহাদের দুঃখহারী শ্রীহরির পাদ-পদ্ম অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। ঠিক্ এই সময় সেই ধর্ম্মবিপ্লবের কেন্দ্রভূমি নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীশচীমাতার গর্ভে—"করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ"—করুণাবতার দীনবৎসল, শ্রী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আসিবে কবে?

(১)

হে বিভো, জগদাধার!
করুণার পারাবার!
আশাতৃষা হ'য়ে ক্ষীণ
অনন্তে হইল লীন ;—
অধম কি চিরদিন, এমনি রবে?
দিন শেষ হয়ে এল, আসিবে কবে?

(২)

বিপুল ব্রহ্মাণ্ডছবি,
জ্যোতির্ম্ময় শশী রবি
সে ভাবে শোভা না পায়,
দিগন্তে মিশায়ে যায়!
নাহি মধু চাঁদিমায়, রজতদ্রবে!
দিন শেষ হয়ে এল, আসিবে কবে!

(৩)

বিকচ প্রসূনচয়ে,
ঊষার শিশিরে ধুয়ে,
রচিনু মালতী-মালা,
সে মালা হইল জ্বালা !
অধীরা কল্পনাবালা, লুকাল এবে !
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে ?

(৪)

হৃদয়-বীণার তার
ঝঙ্কারে গাহেনা আর !
সুখ-স্বপনের প্রায়,
সকলি ফুরায়ে যায় !
কি করিনু হায় হায় ! আসিয়া ভবে !
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে !

(৫)

জীবনের সুখ যত,
বিষম-বিষাদ-হত !
প্রভাতের পিকগান
হয়ে গেছে অবসান !
বৃথাকাজে দিনমান, কাটিল তবে !
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে !

(৬)

দারুণ আঘাতে প্রাণ
হইয়াছে খান্ খান্ !—
ঝরিছে আঁখির লোর ;
নিবিড় আঁধার ঘোর
হৃদয়-আগার মোর ;—আমি ক্ষোভে
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে !

(৭)

ক্লান্ত দিনান্তের কোলে
বাসনা পড়িল ঢলে—
ক্রমে গাঢ় অন্ধকার
ঘেরিতেছে চারিধার !
চোখে নাহি দেখি আর ! জগতে সবে !
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে ?

(৮)

কি কাজে কাটিল বেলা !
সাঙ্গ কি হইল খেলা ?
কর্ণ-হীন জীর্ণতরী
কাঁপিতেছে থরহরি !
বাজিল কালের ভেরী ! গভীর রবে !
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে !

(৯)

ভুলিয়া সংসার-মোহে
নিদারুণ আত্ম-দ্রোহে !
বিফল নয়নজলে
ভাসাইনু ধরাতলে !
কে মোরে আমার বলে' তুলিয়া লবে ?
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে !

(১০)

আত্মা, মন, প্রাণ, দেহ
যেন মোর নহে কেহ !
শিথিল বিবেক-বল,
বিকল ইন্দ্রিয়দল !
সবে করে কোলাহল, বিপুল রবে !
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে ?

(১১)

আশা-বাঁশী বিশ্বপুরে
প্রমত্ত সাহানা-সুরে
অনুপম মাধুরীতে
তোষেনা তাপিতচিতে !
মনে নাই কি করিতে, এসেছি কবে !
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে ?

(১২)

আজি এই সন্ধ্যাকালে
মানস-মন্দির-তলে;
তোমার আরতি বাজে,—
মঙ্গলমূরতি রাজে !
মধুর মোহন সাজে, আসিতে হবে !
দিনশেষ হয়ে গেল ! আসিবে কবে !!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥

অন্বয়। যোগী (যোগারূঢ়ঃ) সততং (নিরন্তরং) রহসি (একান্তে) স্থিতঃ (সন্) একাকী (সঙ্গশূন্যঃ) যতচিত্তাত্মা (যতং সংযতং চিত্তং আত্মা-দেহঃ চ যস্য সঃ) নিরাশী (বীততৃষ্ণঃ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্যঃ) সন্ আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ) ১০

বঙ্গানুবাদ। যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া সংযত-চিত্তে সংযতদেহে আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে সমাহিত করিবেন। ১০

আলোচনা। শ্রীভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যে ধ্যান-যোগের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের আলোচনার শেষে তাহা বলিয়াছি। প্রথম কয়েক শ্লোকে শ্রীভগবান্ যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে যোগাঙ্গ-লক্ষণ বলিতেছেন।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। "যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ" (পাতঞ্জল দর্শন) যোগশাস্ত্রে চিত্তের পাঁচটী অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে যথা;—১ ক্ষিপ্ত ২ মূঢ় ৩ বিক্ষিপ্ত ৪ একাগ্র এবং ৫ নিরুদ্ধ। ১। মন যখন অত্যন্ত চঞ্চল থাকে, কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় ধারণা করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। ২। যখন চিত্ত মোহে আচ্ছন্ন থাকে তদবস্থাকে মূঢ়াবস্থা বলে। ৩। যে অবস্থায় চিত্ত কখন চঞ্চল কখন স্থির হয়, তাহাকে বিক্ষিপ্তাবস্থ চিত্ত কহে। ৪। যখন ধ্যেয়-বস্তুতে চিত্তের একাগ্র টান হয়, তদবস্থায় চিত্ত একাগ্র হয়। ৫। আর যখন চিত্তের অন্য সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হইয়া বৃত্তিসংস্কার মাত্র থাকে, তদবস্থাকে নিরুদ্ধাবস্থা কহে। ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া চিত্ত একাগ্র অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার নাম চিত্তসমাধান। এই চিত্তসমাধান করিতে হইলে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বাহ্য বিষয় হইতে মনকে সংযত করিতে হয়; সংসার যোগ-বিরোধী জানিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইতে হয়—বহির্মূখ চিত্তকে অন্তর্মূখ করিতে হয়। কোলাহলপূর্ণ জনসমাজ গৃহস্থলী স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিত্যাগ করিয়া নির্জন প্রদেশে পর্ব্বত-গুহাদিতে বিজনবনে একাকী বাস করিতে হয়। যোগের প্রতিবন্ধক যাবতীয় পদার্থ ত্যাগ করিয়া দেহ-মন সংযত করিয়া আকাঙ্ক্ষা-পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে সমাহিত করিতে হয়। ১০

শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিন-কুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

অন্বয়। শুচৌদেশে (শুদ্ধে স্থানে) স্থিরং (অচলং) নাত্যুচ্ছ্রিতং (ন অতি উন্নতং) ন অতিনীচং চৈলাজিন-কুশোত্তরম্ (চৈলং বস্ত্রং অজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি কুশাসনোপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্য ইত্যর্থঃ) আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য

তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং (বিক্ষেপ-শূন্যং) কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ (যতাঃ সংযতাঃ চিত্তস্য ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ ক্রিয়া যস্য সঃ) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মনঃ মনসঃ বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাসেৎ) । ১১ । ১২

বঙ্গানুবাদ। অতি উচ্চ বা অতিনিম্ন না হয় এমন পবিত্র স্থানে অগ্রে কুশাসন তদুপরি মৃগচর্ম্ম ও তদুপরি বস্ত্র স্থাপন করিয়া আসন করিবেন। এইরূপ আসনে উপবেশন করিয়া মনকে একাগ্র ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন। ১১। ১২

আলোচনা। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে তিন শ্লোকে ধ্যান-যোগের উল্লেখ করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনমতে যোগাবলম্বনে সাধক মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ে সেই ধ্যান-যোগের উল্লেখ মাত্র করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

পাতঞ্জলদর্শন-মতে সেই যোগ অষ্টাঙ্গ-বিশিষ্ট যথা—“যম-নিয়মাসন-প্রাণা-য়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি”। (যোগসূত্র ২ অঃ ২৯ সূ)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ।

যম। “অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।” (যোগ-সূত্র ২অঃ ৩০ সূ) অহিংসা সত্য অস্তেয় (অচৌর্য্য) ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যমের লক্ষণ। ৯ম, ১০ম, ১৪শ প্রভৃতি শ্লোকে যমের লক্ষণের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

নিয়ম। “শৌচ-সন্তোষ-তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ” (যোগসূত্র ২ অঃ ৩২ সূ) বাহ্য ও আন্তর শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-পাঠ, ঈশ্বর-আরাধনা এই পাঁচটী নিয়মের লক্ষণ। ৭ম, ৮ম, ১৬শ, ১৭শ শ্লোকে নিয়মের আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

আসন। “স্থিরসুখমাসনম্” (যোগ-সূত্র ২ অ ৪৬ সূ) যে ভাবে অনেক-ক্ষণ স্থির-ভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন। আসনেরও কতক-গুলি প্রকার আছে যথা ; পদ্মাসন, বীরাসন ইত্যাদি। ১১শ শ্লোকে আসনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রাণায়াম। “শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ” (যোগসূত্র ২ অঃ ৪৯ সূ) শ্বাস ও প্রশ্বাস—এই উভয়ের গতি সংযত করার নাম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের কথা ৪র্থ অধ্যায়ে ২৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

প্রত্যাহার। "স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইতীন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ" (যোগসূত্র ২ অ ৫৪ সূ) ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের স্বরূপ-গ্রহণের নাম প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিরোধের নাম প্রত্যাহার। ১৮শ শ্লোকে প্রত্যাহারের ইঙ্গিত উল্লিখিত হইয়াছে।

ধারণা। "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" (যোগসূত্র ৩ অ ১ সূ) চিত্তকে একদেশে বা বিশেষ কোন স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা। ১৩শ শ্লোকে ধারণার ইঙ্গিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধ্যান। "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" (যোগ-সূত্র ৩ অ ২ সূ) চিত্ত-বৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান। ২৪শ শ্লোকে ধ্যানের প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে।

সমাধি। "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।" ২ যোগ-সূত্র ৩ অঃ ৩ সূ) চিত্তের একতান প্রবাহ, যখন সমুদায় বাহ্য উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ মাত্রকেই প্রকাশ করে, তখন তাহাকে সমাধি বলে। প্রকৃতপক্ষে সমাধির ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য, উহা অনুভবের ও উপলব্ধির বিষয়। ১৫, ২৯, ২২ শ্লোকে সমাধির ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আমরা উপরে যোগের অষ্টাঙ্গ-লক্ষণের স্থূল মর্ম্ম বলিলাম। শ্রীভগবান্ এই ১১শ ও ১২শ শ্লোকে অষ্টাঙ্গ-যোগের আসনের উপদেশ মাত্র প্রদান করিয়াছেন। যোগ-সাধন উদ্দেশ্যে যে আসনে উপবেশন করিতে হইবে, তাহা সমতল স্থান হইতে অতি উচ্চ বা অতিনিম্ন স্থানে করিবে না। স্থানটী পবিত্র হওয়া চাই, অথবা গোময়াদি-লিপ্ত করিয়া পবিত্র করিয়া আসন স্থাপন করিবে। সর্ব্বনিম্নে কুশাসন, তদুপরি হরিণ বা ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম পাতিয়া তদুপরি বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া আসন প্রস্তুত করিবে। আসন স্থির অর্থাৎ অচল হইবে। এই প্রকার আসনে বসিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া একাগ্র-মনে চিত্ত-শুদ্ধ্যর্থে যোগাভ্যাস করিবে।১১।১২।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩

অন্বয়। কায়শিরোগ্রীবং (কায়ঃ দেহমধ্য ভাগঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবাচ) সমং (সরলং) অচলং (কৃগ) ধারয়ন্ স্থিরঃ (দৃঢ়প্রয়ত্নঃসন্) স্বং (স্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রঃ ইত্যর্থ) দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ (ইতস্ততঃ অনবলোকয়ন্ আসীৎ ইত্যর্থঃ) ১৩।

বঙ্গানুবাদ। দেহ-মধ্যভাগ, মস্তক, গ্রীবাদেশ—সরল ও স্থিরভাবে রাখিয়া অন্য দিকে না চাহিয়া নাসিকাগ্র-ভাগে অবলোকন করিবেন। ১৩।

আলোচনা। মেরুদণ্ডের মূল হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অচলভাবে স্থির রাখিয়া অনন্যদৃষ্টিতে নাসাগ্রভাগ অবলোকন করিবেন—অর্থাৎ অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে নাসাগ্রের সমসূত্রে দৃষ্টি রাখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুকে নাসাগ্রের সমসূত্রে নিয়োগ করিলে দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিসঞ্চালন বাধিত হওয়ায় অন্যমনস্ক হইতে হয় না। অর্দ্ধনিমীলিত নয়নের তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষু পূর্ণপ্রসারিত থাকিলে মন অন্যবস্তুতে আকৃষ্ট হইতে পারে এবং পূর্ণনিমীলিত হইলে নিদ্রার আশঙ্কা হইতে পারে। এই ১৩শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অষ্টাঙ্গ-যোগের ধারণার উপদেশের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

অন্বয়। প্রশান্তাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) বিগতভীঃ (বিগতা ভীঃ ভয়ং স্মাৎ) ব্রহ্মচারি-ব্রতে (ব্রহ্মচর্য্যং গুরু-শুশ্রূষা ভিক্ষাভুক্ত্যাদি তস্মিন্) স্থিতঃ (সন্) মনঃ সংযম্য (মনসোবৃত্তীঃ উপসংহৃত্য) মচ্চিত্তঃ (মন্মনাঃ) মৎপরঃ (অহং পরোযস্য সোঽয়ং মৎপরঃ) যুক্তঃ (ভূত্বা) আসীত (তিষ্ঠেৎ)। ১৪

বঙ্গানুবাদ। প্রশান্তচিত্ত ভয়বর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যশীল সংযতচিত্ত মৎপরায়ণ হইয়া যোগী যোগে অবস্থান করিবেন। ১৪

আলোচনা। যোগাভ্যাসী পূর্ব্বোপদেশ-মত যোগ প্রণালী সম্মত আসন স্থির করিয়া প্রশান্তমনে সংযতচিত্তে ভগবৎপরায়ণ গুরু-শুশ্রূষা-সম্পন্ন ভিক্ষান্ন-ভোজী সর্ব্বপ্রকারে সংযমী ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মী হইয়া সমাধিলাভের জন্য অবস্থান করিবেন। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ অষ্টাঙ্গ-যোগের "যমের" আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

অন্বয়। এবং (উক্তপ্রকারেণ) নিয়ত-মানসঃ (সংযতমনাঃ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (সমাহিতং কুর্ব্বন্) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণং মোক্ষরূপং পরমং নিরতিশয়ং সুখং যস্যাং তাং) মৎসংস্থাং শান্তিং (আত্যন্তিকীং সংসারোপরতিং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ১৫

বঙ্গানুবাদ। সংযতচিত্ত ভোগাভ্যাসী, মনের নিরোধ করিয়া মৎস্বরূপে অবস্থিত হইয়া নির্ব্বাণ-রূপ পরম শান্তি লাভ করেন। ১৫

আলোচনা। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে যোগাভ্যাসের ফল বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-মতে অভ্যাসশীল যোগীর চিত্ত বহির্ব্যাপারে বিরত হইয়া সংযত এবং আত্মাতে সমাহিত হইলে আর তাহার বহির্বিষয়ে বিচরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনের বৃত্তি-সমূহের পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে যোগী পরম শান্তি লাভ করেন। যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাসনা-বিকাশের বীজ দগ্ধ হইয়া যায়, তাহার নাম পরম নির্ব্বাণ। ১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬

অন্বয়। হে অর্জ্জুন! তু (কিন্তু) ন অতি অশ্নতঃ (অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য) নচ একান্তং অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য) নচ অতি স্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) নচৈব জাগ্রতঃ (অতি জাগ্রতঃ) যোগঃ (সমাধিঃ) অস্তি। ১৬

বঙ্গানুবাদ। অত্যধিকভোজী বা অনাহারী, অতিনিদ্রাশীল বা অতিজাগরণ-শীল—ইহাদের কাহারও সমাধি হয় না। ১৬

আলোচনা। শরীর-রক্ষণোপযোগী আহার-নিদ্রা দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনং" অতিভোজীর শরীর কখন সুস্থ থাকিতে পারে না। অনাহারীর শরীর-রক্ষা হয় না। অতি-নিদ্রায় যাহার সময় যায়, সে যোগ অভ্যাস করিবে কখন? বিশেষতঃ অতিনিদ্রায় কখন শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। অতিজাগরণশীল ব্যক্তির ও অসাময়িক নিদ্রায় শরীর অসুস্থ হয়। যোগী আহার-নিদ্রায় নিয়মী হইবেন। শাস্ত্রে কথিত আছে, যোগী পাকস্থলীর অর্দ্ধভাগ ভুক্ত বস্তু দ্বারাও এক চতুর্থাংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিবেন। অপর এক চতুর্থাংশ বায়ু-সমাগমের জন্য শূন্য রাখিবেন। দিবাভাগ জাগরণের ও রাত্রি নিদ্রার সময়। রাত্রির প্রথম চতুর্যাম জাগ্রত থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রা যাইবেন—ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ১৬

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

যশোহর।

আম-নারিকেল-গুবাকের গাছে ঘেরা আছে তা'র সারাটী অঙ্গ
তথাপি প্রকাশে মহিমা-কিরণে আকুমারী হিম-অচল-শৃঙ্গ।
বক্ষঃ-শোণিত খেজুরের রস, মিষ্টতা আনে অমৃত সঙ্গে—
খেজুরের গুড়—চিনি অনুপম—ব্যাপ্ত গৌরব বিশাল বঙ্গে,
কে করে অর্পণ বক্ষঃ চিরিয়া
সুধার আধার আসার ভরিয়া!
সে যে রে আমার শত কামনার সাধনার ধন কল্প-বৃক্ষ—
দীক্ষা আমার, শিক্ষা আমার, ভিক্ষা আমার, আমার লক্ষ্য॥

(কোরাস্)

কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন প্রীতি মনোহর—
বন্দিত চির-নন্দিত পুনঃ আর্য্য-গরিমা-গীত যশোহর॥

প্রতাপ-প্রতাপ চমকি উঠিল উজলি যাহার শ্যামল অঙ্কে,
দেখাল বাঙ্গালী নহে কাপুরুষ, নয় সে মগ্ন কলুষ-পঙ্কে;
বীর্য্য যাহার ছাইল ভারতে আগ্রার পাদ অবধি শেষ—
কে বলে তাহারে গৌরব-হীন? যশোহরে নাই যশের লেশ!
সীতারাম-শক্তি, মোগল-শাসন
কাঁপায়ে তুলিল বঙ্গসিংহাসন!
সে যে রে আমার শত জীবনের শত সাধনের পূর্ণ সিদ্ধি—
মুক্তি আমার, ভক্তি আমার, তৃপ্তি আমার, আমার ঋদ্ধি॥

(কোরাস্)

কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন প্রীতি মনোহর,
বন্দিত চির-নন্দিত পুনঃ আর্য্য-গরিমা-গীত যশোহর॥

সমাধি-মগ্ন সুন্দরানন্দ-পবিত্র-পীঠ যেথায় রহে,
ধর্ম্মের ধ্বনি, কর্ম্মের সাথে যেথাকার বায়ু সতত বহে;
দেউলের মত সারা অঙ্গে যার পুণ্যের রাশি ভাসিয়া ওঠে,
প্রতি বছরেতে কত না ভক্ত চরণের তলে আসিয়া লোটে;

কপোতাক্ষ ও ভৈরব যার
গুণগীতি গাহি ধায় অনিবার--
সে যে রে আমার সংসার-সার বাসন্তীময় শারদ হৃদি—
জনক আমার, জননী আমার, ভাইটী আমার, আমার দিদি ॥

(কোরাস্)

কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন প্রীতি মনোহর—
বন্দিত চিরনন্দিত পুনঃ আর্য্য-গরিমা-গীত যশোহর ॥

দীনবন্ধু-মধু-সুরেন্দ্র-কৃষ্ণ-কণ্ঠ কোথায় সতত বাজে ;
বিদেশী সনেট্ বঙ্গভাষায় কাহার কৃপায় মধুরে রাজে ?
নবীন ছন্দে নবীন মন্ত্রে নবীন তন্ত্রে নবীন গাথা,
বিশ্বের মাঝে ভক্তিতে ভরা গম্ভীর-শেষ কাব্যের কথা !
কৃষ্ণানন্দ আনিল ভারতে
অন্তনাট্যশিষ্ট-রূপেতে* !
সে যে রে আমার লক্ষ্যের মাঝে বিশ্বের যত প্রভব-জিষ্ণু,
ভারতী আমার, লক্ষ্মী আমার, ব্রহ্ম আমার, আমার বিষ্ণু ॥

(কোরাস্)

কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন প্রীতি মনোহর,
বন্দিত চিরনন্দিত পুনঃ আর্য্য-গরিমা-গীত যশোহর ॥

আজি মা তোমার বিরস অধরে আমরা আবার ফুটাব হাস্য ;
অবনতশিরে বরিয়া লইব তোমার রাতুল-চরণ-দাস্য।
সন্তান-শত-আরাধিত ধন, আবার তোমার কিসের ভয়—
লক্ষ সুতের বক্ষঃ ডালিকা নিঃস্ব হ'লেও তুচ্ছ নয় ॥
হাস মা কনক-কমল-বরণী
ভয় কি ভুবনে তোমার জননি ?

---

* মহেশপুর নিবাসী ৺ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি "অন্তর্ব্যাকরণনাট্যপরিশিষ্ট" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। হিঃ পঃ সঃ।

স্নিগ্ধতা-মাখা রুচির মধুর বদনে ছুটুক সুচির হর্ষ ;—
দেখিয়া ধন্য হইব আমরা চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ॥

(কোরাস্)

কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন প্রীতি মনোহর,
বন্দিত চির নন্দিত পুনঃ আর্য্য-গরিমা-গীত যশোহর ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ



সাববেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতাৎ পরা)

অথ দ্বিতীয়ার্দ্ধে

সপ্তমে খণ্ডে

সেয়ং প্রথমা।

শ্যাবাশ্ব ঋষির্বামদেবো বা।

১ ২　৩ ১ ২　৩　১র　২র　৩ ১ ২
আজুহোতা হবিষা মর্জ্জয়ধ্বং নি হোতারং গৃহপতিং দধিধ্বম্।
২ ৩ ১র　২র ৩ ২ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২　৩ক ২র
ইড়স্পদে নমসা রাতহব্যং সপর্য্যতা যজতম্ পস্ত্যানাম্॥ ১ ॥ ৬৩ ॥

আজুহোত—অগ্নিমাহ্বয়ত।

মর্জ্জয়ধ্বং—মৃড়য়ধ্বং, সুখয়ধ্বং (ডকারস্য জকারশ্ছান্দসঃ)

হোতারং—দেবানামাহ্বাতারং।

গৃহপতিং—গৃহপালকং অগ্নিং।

নিদধিধ্বং—নিঃশেষেণ ধারয়ধ্বম্।

ইড়ঃ—ইলায়াঃ। পদে—উত্তরবেদ্যাম্ ইত্যর্থঃ।

নমসা—নমস্কারেণ হবিষা বা যুক্তং।

রাতহব্যং—দত্তহবিষ্কং (প্রদত্ত হয় হবিঃ যাঁহাতে তিনি দত্ত-হবিষ্ক)

সপর্য্যত—পরিচরত।

যজতং—যজনীয়ং পূজনীয়মগ্নিং।

পস্ত্যানাং—যজ্ঞ-গৃহাণাং মধ্যে।

হে পুরোহিতগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে আহ্বান কর, অনন্তর তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিয়া সুখী কর। দেবগণের আহ্বাতা, যজ্ঞগৃহের পালক সেই অগ্নিদেবকে আমাদের উত্তরবেদীতে লইয়া গিয়া স্থাপন কর। তদনন্তর যজ্ঞ-গৃহের মধ্যে সেই পূজনীয় নমস্কৃত দত্ত-হবিষ্ক অগ্নির পরিচর্য্যা কর। ৬৩।

অথ দ্বিতীয়া।

বাষ্টহব্য ঋষিঃ।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ২ ৩ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
চিত্র ইচ্ছিশো স্তরুণস্য বক্ষথো ন য়ো মাতরাবম্বেতি ধাতবে।

৩ ১ র ১ র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ র ৩ ২ ১ ২
অনূধা য়দজীজনদধা চিদা ববক্ষৎ সদ্যো মহি দূত্যং চরন্॥ ২। ৬৪॥

চিত্রইৎ—আশ্চর্য্যভূতমেব।

শিশোঃ—শিশু-ভূতস্য।

তরুণস্য—তরুণস্য অগ্নেঃ।

বক্ষথঃ—হবির্ব্বহনং। বক্ষথ ঃ—বহনং গমনমিত্যর্থঃ (বক্ষেরৌণাদিকো হ থস্-প্রত্যয়ঃ)।

যঃ—জাতোঽগ্নিঃ।

মাতরৌ—সর্ব্বস্য নির্ম্মাত্রৌ; সর্ব্বস্য মাতৃভূতে দ্যাবাপৃথিব্যাবরণ্যৌ বা।

ন অম্বেতি—ন গচ্ছতি।

ধাতবে—স্তনপানায় (ধেট্পানে তুমর্থে ইতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ)

অনূধাঃ—উধোরহিতঃ।

য়ৎ—যদি।

অজীজনৎ—জনয়েৎ, তর্হি স্তনপানায় ন গচ্ছতীতি যুক্তম্, তথা ন ভবতি, কিন্তু দ্যাবাপৃথিব্যো হি সর্ব্বেষাং কামদুখে খলু, তথাপি ন যাতি, তস্মাদস্য হবির্ব্বহনং বিচিত্রম্।

অধচিৎ—উৎপত্ত্যনন্তরমেব।

আ ববক্ষৎ—দেবান্ প্রতি হবীংষ্যাবহতি।

সদ্যঃ—তদানীমেব শীঘ্রং।

মহি—মহত্বং।

দূত্যং—দূতকর্ম্ম। চরন্—আচরন্।

যিনি উৎপন্ন হইয়া স্তনপানের জন্য মাতৃদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন না, কিন্তু উৎপত্তির পরেই মহান্ হইয়া দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেবগণের নিকট হবির্দ্রব্য সকল বহন করিয়া দিতেছেন; তজ্জন্য সেই শিশুভূত তরুণবয়স্কের হবির্বহন অত্যন্ত আশ্চর্য্য! বাস্তবিক মাতৃদ্বয় যদি স্তন-রহিত হইয়াই ইহাঁকে উৎপন্ন করিতেন, ইহাঁর স্তনপান জন্য না যাওয়া যুক্ত হইত বটে, কিন্তু তাহা নহে, ইহাঁর মাতৃদ্বয় স্তনযুক্তই বটেন, কারণ ইহাঁরা আমাদের সকলেরই কামদুঘা হইতেছেন। ৬৪।

অথ তৃতীয়া।

বৃহদুক্থ ঋষিঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
৩ ১২ ৩ ২ ১২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সং বেশন স্তন্বেত চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে॥ ৩। ৬৫।

(এতয়া বৃহদুক্থো বাজিনং নাম স্বপুত্রং মৃতং বদতি)

ইদং—জ্যোতিরগ্ন্যাখ্যং। তে—তব।

একং—একোঽংশঃ। পরঃ—পরং উৎকৃষ্টং।

উ—অন্যোপি। তে—তব।

একং—বায্বাখ্যোংশঃ তেন প্রাণবায্বাখ্যেনাংশেন বাহ্যং বায়ুং সংবিশস্ব

(শরীরাগ্নিপ্রাণ-বায্বোঃ বাহ্যাগ্নি-বায্বোশ্চৈকত্বাদংশত্বমিতি ভাবঃ)

তৃতীয়েন জ্যোতিষা—আদিত্যাখ্যেন তেজসা তদাত্মনা সংবিশস্ব।

সংবেশন ঃ—সম্যক্ প্রবেষ্টা

তন্বে—তনবে পুনঃশরীর-গ্রহণায়।

চারু—কল্যাণোভূত্বা। এধি—ভব।

প্রিয়ঃ—তেন সহ প্রীয়মানঃ।

পরমে—উত্তমে। জনিত্রে—জনকে।

হে মৃত পুত্র! অগ্নিনামা এই জ্যোতি তোমার এক অংশ; তজ্জন্য তোমার দেহে যে অগ্নির অংশ আছে—তাহা দ্বারা তুমি এই বাহিরের অগ্নিতে প্রবেশ কর; আরও বাহিরে তোমার বায়ু-নামক আর একটি অংশ আছে, তজ্জন্য সেই বায়ুতেও তুমি আপনার অন্তরের প্রাণবায়ু দ্বারা প্রবেশ কর। এইরূপে

বাহিরে আদিত্য-নামে তোমার যে তৃতীয় জ্যোতি আছে তাহাতে তুমি আপন আত্মার সহিত আসিয়া প্রবেশ কর। বৎস! তুমি তাহার সহিত অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করিবে; সুতরাং উৎকৃষ্ট-জন্মদাতা সেই আদিত্য-দেবে তুমি পুনরায় শরীর-ধারণ করিবার জন্য পবিত্র হইয়া প্রবেশ কর। ৬৫। (১)

অথ চতুর্থী।

কুৎস ঋষিঃ।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া।

৩ ২উ ৩ ২ ২ ৩ ১
ভদ্রা হিনঃ প্রমতিরস্য সংসদ্-

২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব॥ ৪। ৬৬।

ইমং স্তোমং—এতৎ স্তোত্রং।

অর্হতে—পূজ্যায়।

জাতবেদসে—জাতানামুৎপন্নানাং বেদিত্রে জাতপ্রজ্ঞায়।

রথমিব—যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা—সূত্রধার যেরূপ রথের সংস্কার করে তদ্রূপ।

সম্মহেমা—সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ।

মনীষয়া—নিশিতয়া বুদ্ধ্যা।

অস্য—অগ্নেঃ।

সংসদি—সম্ভজনে।

নঃ—অস্মাকং

প্রমতিঃ—প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ।

ভদ্রা হি—কল্যাণী সমর্থা খলু-অতস্তয়া বুদ্ধ্যা কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ।

হে অগ্নে।

(১) এই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব এই যে, জ্ঞানীগণও স্বভাব-সিদ্ধ দুশ্ছেদ্য পুত্রাদি-স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহারা পদে পদে স্থূলশরীর, সূক্ষ্ম-শরীর, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য জানিয়াও পুনরায় সেই সমষ্টিরূপেই সেই নাম ও রূপধারী আধারই দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন।

তব সখ্যে—অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি।

মা রিষাম—বয়ং হিংসিতা ন ভবামঃ। অস্মান্ রক্ষ ইত্যর্থঃ।

যে অগ্নি আমাদের পূজনীয় ও জাতপ্রাণিমাত্রের জ্ঞাতা, আমরা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা এই স্তোত্রকে রথের ন্যায় সংস্কৃত করিয়া, সেই অগ্নি-দেবকে পূজিত করিতেছি। (১) এই অগ্নির উপাসনা-কার্য্যে নিযুক্ত আমাদের উৎকৃষ্ট বুদ্ধি আমাদের কল্যাণ-দানে সমর্থ। হে অগ্নে! আপনার সহিত আমাদের বন্ধুত্ব থাকিতে আমরা যেন কাহারও দ্বারা হিংসিত না হই, অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৪। ৬৬।

অথ পঞ্চমী।

দ্বয়োর্ভারদ্বাজঋষিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৭ ২ ২ ৩ ১
মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা।
২ ৩ ১ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
বৈশ্বানর মৃত আ জাত মগ্নিম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কবিং সম্রাজ মতিথিং জনানা-
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ॥ ৫। ৬৭।

মূর্দ্ধানং—শিরোভূতম্।

দিবঃ—দ্যুলোকস্য।

অরতিং—গন্তারং যদ্বা গন্তব্যং স্বামিনং।

পৃথিব্যাঃ—প্রথিতায়াঃ ভূমেঃ।

বৈশ্বানরং—বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনম্।

ঋতে—ঋতমিতি সত্যস্য যজ্ঞস্য বা নাম।

আ—আভিমুখ্যেন জাতম্—সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নম্।

কবিং—ক্রান্তদর্শিনম্।

সম্রাজং—সম্যগ্রাজমানম্ যজমানানাং।

(১) যেরূপ সূত্রধার সুশাণিত অস্ত্রের দ্বারা জীর্ণরথ মেরামৎ করে; তদ্রূপ আমরা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা এই জীর্ণ স্তুতিকে সংস্কৃত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করিতেছি। বেদ এক সময়ে সংস্কৃত হয় নাই। কোন সময়ে একটি স্তুতি রচিত হইল, তখন ব্যাকরণ ছিলনা, সুতরাং তাহাতে গ্রাম্য ভাষা মিশ্রিত রহিল; কিছুদিন পরে আর একটি নূতন স্তুতি রচিত হইলে পূর্ব্বের স্তুতিটি সংস্কৃত হইল। লেখক।

অতিথিং—হবির্বহনায় সততং গন্তারম্ যদ্বা অতিথি-বৎপূজ্যম্।

আসন্—(আসনি আস্যং দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী) আস্য-ভূতম্। (অগ্নি-লক্ষণেনাস্যেন হি দেবা হবীংষি ভুঞ্জতে)

পাত্রং—পাতারং রক্ষকং, যদ্বা আস্যেন ধারকম্। এবংগুণবিশিষ্টং বৈশ্বানরাগ্নিং।

নঃ—অস্মাকং সম্বন্ধিনি যজ্ঞে।

দেবাঃ—স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ, দেবা এব বা।

আ জনয়ন্ত—আভিমুখ্যেনাজনয়ন্। অরণ্যোঃ সকাশাদ্ উদপাদয়ন্।

যিনি দ্যুলোকের মস্তক-স্বরূপ পৃথিবী হইতে হবি লইয়া পুনরায় দ্যুলোকে গমন করিয়া থাকেন; যিনি দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া বিশ্বস্থিত সমস্ত মানবের নিকট রহিয়াছেন; সত্যের বা যজ্ঞের জন্য সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হইয়াছেন; যিনি দূরদর্শী, অত্যন্ত দীপ্তিশালী এবং যজমানগণের যজ্ঞ-গৃহে অতিথির ন্যায় পূজ্য; যিনি সমুদায় দেবগণের মুখ-স্বরূপ (অর্থাৎ অগ্নিতে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদত্ত হইলে দেবতাগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন) এবং যিনি আমাদের প্রদত্ত হবি ঐ দেব-মুখ-ভূত নিজ মুখে ধারণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ গুণ-বিশিষ্ট অগ্নিদেবকে ঋত্বিগাদি দেবগণ আমাদের যজ্ঞে অরণীদ্বয় হইতে উৎপন্ন করিলেন। ৫। ৬৭।

অথ ষষ্ঠী।

২উ ২ ১ ২র ৩ ১
বি ত্ব দাপো ন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠা-
৩ ৫ ২ ৩ ২
দুক্‌থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ॥
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়-
৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ন্ত্যাজিম্ন গির্ব্ববাহো জিগ্যুরশ্বাঃ॥ ৬। ৬৮

ত্বৎ—ত্বৎ-সকাশাৎ।

আপোন—আপঃ উদকানি যথা, তদ্বৎ।

পর্ব্বতস্য—মেঘস্য।

পৃষ্ঠাৎ—উপরিভাগাৎ।

উক্‌থেভিঃ—উক্‌থৈঃ স্তোত্রৈঃ যজ্ঞৈর্হবির্ভিশ্চ।

অগ্নে! হে অগ্নে!

ব্যজনয়ন্ত—আত্মনঃ কামান্ বিবিধান্ জনয়ন্তি।

তং—প্রসিদ্ধং।

ত্বা—ত্বাম্। গিরঃ—বাচঃ।

সুষ্টুতয়ঃ—শোভন-স্তুতি-রূপাঃ।

বাজয়ন্তি—বলিনং কুর্ব্বন্তি, যদ্বা বাজমন্নমিচ্ছন্তি।

আজিম্ন—সংগ্রামং যথা শীঘ্রং জয়ন্তি তদ্বৎ।

গির্ব্ববাহঃ—গীর্ভিঃ স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্ভির্বহণীয়াগ্নে! যাঁহাকে স্তুতি করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করা যায়, সেই অগ্নিকে "গির্ব্ববাহ" কহিয়া থাকে।

জিগ্যুঃ—জয়ন্তি বশীকুর্ব্বন্তি।

অশ্বাঃ—বাহাঃ।

হে অগ্নে! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মেঘের উপরিভাগ হইতে যেরূপ জল বর্ষণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগের দেবগণও স্তুতি, যজ্ঞ ও হবির্দ্বারা আপনা হইতে নিজের কাম্য বস্তু সকল চাহিয়া লইতেছেন। হে গির্ব্ববাহ! ভরদ্বাজ প্রভৃতি স্তোতাগণ আপনাকে দানশীল জানিয়া আপনার নিকটে অন্ন যাচ্ঞা করিতেছেন। আর অশ্বগণ যেমন শীঘ্র সংগ্রাম জয় করে, সেইরূপ এই সুন্দর স্তুতিবাক্যগুলিও আপনাকে অতি শীঘ্র জয় করিতেছে অর্থাৎ বশীভূত করিতেছে। ৬। ৬৮।

অথ সপ্তমী।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং

২র ৩ ২ ৩ ১ ২
হোতারং সত্যয়জং রোদস্যোঃ।

৩ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৭
অগ্নিং পুরা তনয়িত্নো রচিত্তা-

দ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্॥ ৭। ৬৯॥

বামদেবো ঋতে।

বঃ—যুষ্মাকং।

অধ্বরস্য রাজানং—যজ্ঞস্য অধিপতিং।

রুদ্রং—রোরূয়মান্ দ্রবন্তং শত্রূন্ রোদয়ন্তং বা যদ্বা রুদ্রাত্মকং।

হোতারং—দেবানামাহ্বাতারং।

সত্যযজং—সত্যস্যান্নস্য দাতারং যদ্বা সত্যযজং সত্যেন হবিষা দেবান্ যজন্তম্, যদ্বা সত্যস্যানন্দলক্ষণস্য সঙ্গময়িতারং রোদস্যোর্ব্যাপ্য বর্ত্তমানম্।

রোদস্যোঃ—দ্যাবাপৃথিব্যোঃ।

হিরণ্যরূপং—সুবর্ণ-প্রভম্ এবংবিধং অগ্নিং।

অবসে—রক্ষণায়।

তনয়িত্নোঃ—তনয়িত্নুরশনিঃ সহ্যাকস্মিকঃ তৎসদৃশাৎ।

অচিত্তাৎ—ন বিদ্যতে চিত্তং যস্মিন্ তদচিত্তম্, চিত্তোপলক্ষিতসর্ব্বেন্দ্রিয়োপসংহারোমরণমিতি যাবৎ—তস্মান্মরণাৎ।

পুরা—প্রাগেব।

আ কৃণুধ্বং—যূয়ং সমন্তাদ্ধবির্ভিরগ্নিং ভজধ্বম্।

যিনি সমুদায় যজ্ঞের অধিপতি, যিনি দেবতাগণের আহ্বাতা, যিনি রুদ্রমূর্ত্তি, যিনি স্বর্গে ও মর্ত্তে সত্য হবি-দ্বারা দেবতাগণের যাগকারী এবং যিনি সুবর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা সকলে বজ্রপাততুল্য আকস্মিক ভাবে আগমন-শীল মৃত্যু হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে সম্যগ্‌রূপে উপসনা কর। ৭। ৬৯।

অথ অষ্টমী।

বশিষ্ঠ ঋষিঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ র ২র ৩
ইদ্ধে রাজা সমর্য্যো নমোভিঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
যস্য প্রতীক মাহুতং ঘৃতেন।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩
নরো হব্যেভিরীড়তে সবাধ

১র ২র ৩১২
অগ্নি রগ্র মুষসা মশোচি॥ ৮। ৭০॥

সমিদ্ধে—সমিধ্যতে।

রাজা—দীপ্তঃ।

অর্য্যঃ—স্বামী, হবিষাং প্রেরকো বা।

অগ্নিঃ—দেবঃ। নমোভিঃ—স্তুতিভিঃ সহ

যস্য—অগ্নেঃ।

প্রতীকং—রূপং
ঘৃতেন আহুতং ভবতি।
যে চ নরাঃ—অস্মদীয়াঃ।
সবাধঃ—সংশ্লিষ্টাঃ সঞ্জাতবাধাঃ
হব্যেভিঃ—হব্যৈঃ সার্দ্ধং।
ঈড়তে—স্তুবন্তি।
সঃ—অগ্নিঃ। উষসাং অগ্রম্। আ অশোচি—আ দীপ্যতে।

যিনি দীপ্ত, হবিঃপ্রেরক, আমাদিগের স্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই বর্দ্ধিত হইতেছেন; যাঁহার রূপ ঘৃতের দ্বারা আহুত হইতেছে, বিপদ্‌গ্রস্ত স্তোতাগণ হব্যদানের সঙ্গে সঙ্গেই যাঁহার স্তব করিতেছেন, সেই অগ্নিদেব উষার পূর্ব্বেই চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হইতেছেন।

অথ নবমী।

ত্রিশিরাস্ত্বাষ্ট্র ঋষিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নি-
২র ৩ ১ ২
রা রোদসী বৃষভো রোরবীতি।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
দিবশ্চিদন্তাদুপমা মুদান-
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ড়পা মুপস্থে মহিষো ববর্দ্ধ ॥ ৯ ॥ ৭১ ॥

সায়নাচার্য্য-ভাষ্যং

অগ্নিঃ বৃহতা কেতুনা প্রজ্ঞানেন যুক্তঃ সন্ আ ইদানীং রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ প্রযাতি প্রকর্ষেণ গচ্ছতি। কিঞ্চ দেবানামাহ্বানকালে বৃষভ ইব রোরবীতি অত্যর্থং শব্দং করোতি। দিবশ্চিৎ অন্তরিক্ষলোকস্যাপি, অন্তাৎ পর্য্যন্তাৎ। উপমাম্ উপমেত্যন্তিক নাম, মেঘস্য সমীপম্ উদানট্ উদশ্নুতে জ্বলনাত্মনাদিত্যাত্মনাবস্থিতঃ সন্ ঊর্দ্ধং ব্যাপ্নোতি অশ্নতের্ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্। তিপো হল্ঙ্যাদি লোপঃ। অপাং বৃষ্টি-লক্ষণানামুদকানাম্। উপস্থে উপস্থানে অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা মহিষঃ মহান্ ববর্দ্ধ বর্দ্ধতে। ৯ ৭১।

এক্ষণে অগ্নি বৃহৎ প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া স্বর্গ ও মর্ত্তে প্রবেশ করিতেছেন (কারণ

অগ্নিদেব অর্থাৎ বৈশ্বানরাগ্নি সূর্য্যদেব উদিত হইলে সকল স্থানের লোকেই তাঁহাকে এক সময়ে দেখিতে পায়) ; তিনি যজ্ঞে দেবতাগণের আহ্বান-কালে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করিতেছে (১) মেঘের নিকট হইতে অন্তরিক্ষলোক পর্য্যন্ত আপনার জ্বলন-রূপে আদিত্যের সহিত অবস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধে ব্যাপ্ত হইতেছেন এবং বৃষ্টি-লক্ষণ জলের (এখানে মেঘের) নিকট অন্তরিক্ষ-প্রদেশে বৈদ্যুতিকরূপে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছেন। ৯। ৭১।

অথ দশমী।

বশিষ্ঠ ঋষিঃ।

৩ ১উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যো-
১ ২ ৩ ১
র্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দূরে দৃশং গৃহপতিমথর্ব্যুম্॥ ১০। ৭২॥

ইতি দ্বিতীয়ার্দ্ধীয়া দ্বিতীয়া দশতিঃ।

সায়নাচার্য্য-ভাষ্যং

নরঃ নেতারঃ ঋত্বিজঃ প্রশস্তং প্রকর্ষেণ স্তুতং দূরে দৃশং দূরেদৃশ্যমানং দূরে পশ্যন্তং বা গৃহপতিং গৃহাণাং পালকং অথর্ব্যুং (অথর্ব্যতি গত্যর্থঃ) অগমম্ অতন-বন্তং বা। হস্তচ্যুতং হস্তেন গতম্, অরণ্যোর্বিদ্যমানম্ অগ্নিং দীধিতিভিঃ অঙ্গুলিভিঃ জনয়ত জনয়ন্তি। অত্র যাস্কঃ "দীধিতয়ো ঽঙ্গুলয়ো ভবন্তি, ধীয়ন্তে কর্ম্মস্বরণী প্রত্যৃতরানে অগ্নিঃ সমরণাজ্জায়ত ইতি বা, হস্তচ্যুতা হস্তপ্রচ্যুত্যা জনয়ন্তি প্রশস্তং দূরে দর্শনং গৃহপতিমতনবন্তম্" ইতি।

প্রাতঃকালে যে সময়ে অগ্নিদেব স্বর্গ ও মর্ত্তে প্রবেশ করিতে থাকেন, সেই সময়ে ঋষিগণের হোমকালে তাঁহার বৃষভের ন্যায় আর এক মূর্ত্তি হইয়া থাকে। তখন তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চারি শৃঙ্গ ; গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিরূপ তিনটি পাদ এবং উদিতাগ্নি ও অনুদিতাগ্নি রূপ দুইটি মস্তক এইরূপ হইয়া থাকে। তিনি স্বর্গে সূর্য্যরূপে, শূন্যে বৈদ্যুতিকরূপে এবং মর্ত্তে অগ্নিরূপে এই তিন স্থানে আবদ্ধ থাকেন। এই বৃষভমূর্ত্তি অগ্নিকে প্রাতঃকালে যখন ঋষিগণ হোমে উজ্জ্বলিত করেন, তখন তিনি "হুঃ হুঃ" এইরূপ একপ্রকার শব্দ করিয়া থাকেন, ইহাই বৃষভের ন্যায় চীৎকার।

যিনি উত্তমরূপে ব্যাপ্ত, দূরে দৃশ্যমান, গমনশীল, যজ্ঞগৃহের রক্ষক ; যিনি হস্ত দ্বারা জন্মাইয়া থাকেন ; অরণীদ্বয়ে বিদ্যমান সেই অগ্নিকে ঋত্বিক্‌গণ স্বীয় অঙ্গুলি-সমুদায় দ্বারাই অরণীদ্বয় মন্থন করিয়া উৎপন্ন করিতেছেন ।

ইতি সামবেদ-সংহিতানুবাদে প্রথম প্রপাঠকের
দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বিতীয় দশতি সমাপ্ত ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ।

দেব-তত্ত্ব ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুষ্প গুলির পরেই সিন্ধুচারী রাক্ষস-মূর্ত্তি প্রকট হইতে লাগিল । অন্ততঃ; অনেকে উহাদিগকে ঐরূপই অনুমান করিল । ঐ মূর্ত্তি-নিচয়ের কোন কোনটী সর্পবৎ বক্র । উহাদের দেহ যেন পূর্ণায়ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছিল । দূর হইতে দেখিলেও মনে হয়, যেন উহারা কিছু গ্রাস করিতেছে। চিত্র-বিদ্যা-সম্ভব আলোক ও ছায়া এবং অন্যান্য সূক্ষ্মাংশ সমস্তই ঐ মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান । ঐ সকল মূর্ত্তির পর আবার আর কতকগুলির আবির্ভাব হইল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বিটপি-চিত্র । যেন বৃক্ষ গুলি হইতে ফল ঝরিয়া পড়িতেছে । বৃক্ষ গুলির সম্মুখে যেন শৈল-সঙ্কুল ভূমিখণ্ড বিন্যস্ত, আবার উহাদের পশ্চাদ্ ভাগে যেন সমুদ্র তরঙ্গায়িত ! এই সকল চিত্রাবলী দেখিয়া দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল :— "বাহবা, এ যেন ঠিক জাপান-দেশীয় নৈসর্গিক শোভা !" বক্তৃতার পর, শ্রীমতী ওয়াট্‌স্ হগ্‌স্ "ইডিওফোন্" নামক সঙ্গীত-যন্ত্রটি গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে মুখ দিয়া সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে একজন লণ্ডনী-সহযোগীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । তিনি দেখিলেন, যন্ত্রের প্রান্তস্থিত চাক্‌তির উপরে রেণুপটল, সঙ্গীতকারিণী মহিলার স্বর-লহরীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ২ পরিবর্ত্তিত হইয়া সুন্দর ২ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে ।"

মন্ত্র-ফল—উপর্য্যুক্ত পরীক্ষায় নিম্ন-লিখিত বিষয় কয়টী প্রতিপন্ন হয় :— (ক) স্বরের মূর্ত্তি আছে ; (খ) বিশেষ ২ স্বরের বিশেষ ২ মূর্ত্তি প্রকট হইয়া থাকে ; (গ) যদি তুমি কোন একটি বিশেষ মূর্ত্তির উৎপত্তি ঘটাইতে

চাও, তবে তোমাকে বিশেষপ্রকারের সুরের বিশেষপ্রকার ভাবে আলাপ করিতে হইবে; (ঘ) এতদুদ্দেশ্যে অন্য সুর বা অন্য প্রকার আলাপ ফলোপ-ধায়ক হইবে না। এমন কি, উহাদের সদৃশ সুর-আলাপেও কোন কাজ হইবে না।

এক্ষণে, এই তথ্য গুলি মন্ত্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া দেখ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা গুলি উহাদের সহিত কতটা সমঞ্জস, তাহাও দেখ। "অগ্নিম্ ইলে পুরো-হিতম্"—এই বিশেষ মন্ত্রটী আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। মনে কর, তুমি মন্ত্রটী পরিবর্ত্তিত করিয়া এইরূপ বলিলে যে "ইলে অগ্নিম্ পুরোহিতম্" কিম্বা 'অগ্নির' পরিবর্ত্তে "বহ্নি" বলিলে, (কেননা বহ্নি ও অগ্নি একার্থবোধক;) তাহা হইলে, মন্ত্র-ফল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, তুমি একটি মন্ত্রের বিপর্যয় বা অনুবাদ করিতে পার না। যদি ঐরূপ কর, তবে মন্ত্র আর "মন্ত্র" রহিল না। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, ঋষিরা এতদ্বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনে জৈমিনির মত দেখিলেই তোমরা এ বিষয় জানিতে পার। কি প্রকার ব্যোম-কম্পন উদ্ভূত করিতে হইবে, সেই টুকুই মন্ত্রের লক্ষ্য; মন্ত্রোচ্চারিত শব্দরাজির কোন অর্থ আছে কি না আছে, সেটুকু দেখা আবশ্যক নহে। বস্তুতঃও দেখা যায়, এমত বিস্তর মন্ত্র আছে, যাহাদের আদৌ কোন অর্থ হয় না। তান্ত্রিক বীজ-মন্ত্র এই শ্রেণীভুক্ত। অথর্ববেদের মন্ত্র-অংশ-স্থিত শব্দগুলিরও ব্যুৎপত্তি-ঘটিত কোন অর্থ নাই। ইহা দেখিয়াই প্রতীচ্য ভাষাবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, বেদ শৈশবাবস্থাপন্ন মানব-জাতির অস্ফুট-বাণী। উহাঁরা বেদে এই তথা-কথিত বালকত্ব দেখিতে পাইয়া, উহার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়েন। ব্যুৎপত্তি ও ব্যাকরণ-ঘটিত অর্থ দ্বারা বিচার করিলে বৈদিক স্তোত্রগুলির যথার্থ ভাব পরিগ্রহ করা যায় না। হিন্দুদিগের "কালোয়াতি সঙ্গীত" উচ্চারণ অনুসারে তুমি শ্রেণীবদ্ধ করিতে পার, কিন্তু ঐ সকল সঙ্গীতের যথার্থ গুণ, স্বর ও স্বরার্দ্ধ বিন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; তদ্রূপ, একটি বৈদিক মন্ত্র যে রাগ-রাগিণী ও তাল-লয়ে রচিত, তাহাদের বিশেষত্বের উপরই উহার ফল-সিদ্ধি নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব, প্রাচীন লেখকেরা কেন যে মন্ত্রের স্বর ও বর্ণের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। তাঁহারা অবগত ছিলেন যে, কোন একটী মন্ত্র, স্বর বা বর্ণহীন হইলে উহা অন্যায়-রূপে পরিচালিত হয় এবং তাহাতে অভীপ্সিত ফলের পরিবর্ত্তে বিপরীত ফল প্রসূত হইতে পারে।

প্রাচীনকালে এই জন্যই বেদ মুখে মুখে শিখিতে হইত, এই জন্যই পুরুষানুক্রমে

গুরুর মুখে শুনিয়াই শিষ্যকে উহা শিখিতে হইত। এমন কি, যখন লিপি-বিদ্যা সাধারণের আয়ত্তাধীন হইল, তখনও সেই প্রাচীনকালীন "মুখে মুখে শুনিয়া শিক্ষা করিবার রীতি" প্রচলিত ছিল। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভৃতি স্বর সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, তাল-লয়ের প্রতি মনোযোগী হইয়া, প্রত্যেক স্তোত্রটী আবৃত্তি করিতে হয়। সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলেই মন্ত্র নিষ্ফল হইবে।

আমরা দেখিলাম যে মন্ত্রের অনুবাদ চলে না। নূতন করিয়া কোন মন্ত্র রচিত হইতে পারে কি? হাঁ; রচয়িতার যদি শব্দ-বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান যথেষ্ট থাকে, এবং মন্ত্রের আবৃত্তি করিলে তজ্জন্য ব্যোম-কম্পন-প্রসূত যে মন্ত্র-ফল ঘটিয়া থাকে—রচয়িতা যদি তাহা দর্শন করিবার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নূতন মন্ত্র রচনা করিতে সমর্থ। শব্দ-বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান ও প্রাগুক্তপ্রকার দৃষ্টি-শক্তি এ উভয়ই ঋষিদিগের ছিল। তজ্জন্যই তাঁহারা ভাবী বংশধরগণের ব্যবহারার্থে এত অধিক শক্তিমান্ মন্ত্র রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

শব্দের সংস্কৃত নাম বর্ণ। বর্ণ কথার ঠিক অর্থ রঙ্। এরূপ নামকরণের হেতু কি? হেতু এই যে—অদৃশ্য জগতে যাবতীয় শব্দেরই বর্ণ আছে; শব্দ হইতেই বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট মূর্ত্তি প্রকট হইয়া থাকে।* আবার বর্ণের সঙ্গে সঙ্গেও শব্দ বিদ্যমান থাকে। সংস্কৃতভাষায় এই জন্যই বর্ণ-সমূহের সংশ্লেষ-স্বরূপ সূর্য্যকে—রবি বলা হয়। রবি ও রব একার্থমূলক। রবই—শব্দ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীমতী হগ্স্ যে সময় পরীক্ষা দ্বারা শব্দের মূর্ত্তি

---

* এতদ্বিষয়টী সম্পূর্ণরূপে আশাতিরিক্ত স্থান হইতে সমর্থিত হইয়াছে। মিঃ লুম্লি প্রণীত "গীতিনাট্য-বিষয়িণী পূর্ব্বস্মৃতি" নামক গ্রন্থে এই সমর্থন দৃষ্ট হইবে।

মিঃ লুম্লি বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে সরকারী নাটকের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে নাটকের কার্য্য যেরূপ ভাবে চলে, তদ্বিষয়ে তিনি সুন্দর এক-খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই পুস্তকে তিনি এমত এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শব্দের বর্ণ দেখিতে পাইত। গীতি-নাট্য-মঞ্চের সঙ্গীত শুনিতে২ এই ব্যক্তি নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পায়। ঐ সকল বর্ণ, তাঁহার শ্রুত-স্বরের গুণানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

গায়কবৃন্দের স্বর-নিকর-প্রসূত যে সকল বর্ণ, এই ব্যক্তির সমক্ষে প্রকটিত হইয়াছিল, মিঃ লুম্লি তাহার একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

ও বর্ণ প্রমাণীকৃত করিতেছিলেন, সে সময়ে তাঁহার স্বর-প্রসূত মূর্ত্তি গুলিতে অল্প অল্প বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

রামগীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তা)

কোষেম্বয়ং তেষুতু তত্তদাকৃতি-
র্বিভাতি সঙ্গাত্ স্ফটিকোপলোযথা।
অসঙ্গরূপোঽয় মজোযতোঽদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতোবিচারিতে ॥ ৩১ ।

যেরূপ ধবল স্ফটিক নীল, পীত, বা লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের নিকট থাকিলে ঐ স্ফটিক নীল পীত বা লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মা বাস্তবিক সঙ্গ-রহিত নিরাকার, জন্মরহিত ও অদ্বিতীয় হইলেও অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষের সংসর্গবশতঃ লোকে তাঁহাকে সেই সেই কোষ-ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া জানে; কিন্তু মহাবাক্য দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিচারিত হইলে আত্মা সকলের নিকট সঙ্গরহিত, জন্মবিহীন ও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বয়ং ই প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ।

বুদ্ধেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহদৃশ্যতে
স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতোমৃষা
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২ ।

লোকে জাগ্রত্ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ও আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক এই তিন অবস্থার সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে, জাগ্রদ-বস্থায় স্বপ্ন-সুষুপ্তির অনুভব হয় না, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রত্ ও সুষুপ্তির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আবার সুষুপ্তিকালে জাগ্রত্ ও স্বপ্নের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না, সুতরাং নিত্যশুদ্ধ অবস্থাত্রয়াতীত নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী সঙ্গরহিত আনন্দস্বরূপ

আত্মাতে কখনই এই অস্থির ব্যভিচার-দোষযুক্ত অবস্থার কল্পনা হইতে পারে না ॥ ৩২ ।

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততেধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা
যাবদ্ ভবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ ॥ ৩৩ ।

এখানে এরূপ সংশয় হয় যে, বুদ্ধির বৃত্তি জড়স্বরূপা, জড়েরস ময়ে ২ অবস্থান্তর প্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে, সুতরাং পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত অবস্থাত্রিতয়কে কিরূপে বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়া বলা হইবে? এই সংশয়াপনোদনের জন্য উক্ত হইতেছে যে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও চিদাত্মার নিরন্তর একত্র অবস্থান-নিবন্ধন অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়, এবং রজোগুণের ও তমোগুণের কার্য্যবশতঃ যে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি অজ্ঞস্বরূপা থাকে, ততদিন জীবের সংসারোৎপত্তিও থাকে ॥ ৩৩ ।

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্ঘনাবৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলম্ ॥ ৩৪ ।

এই অবিদ্যাপ্রকাশিত সংসার কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে, তাহারই সদ্যুক্তি কথিত হইতেছে। যেমন নারিকেলাদি-ফলের জলপান করতঃ তদাধারভূত অসার ফল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ "ইহা আত্মা নয়" 'ইহা আত্মা নয়' অর্থাৎ সমস্ত জগতের কোন পদার্থই আত্মা নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত-পূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা চিদ্ঘনস্বরূপ অমৃতের আস্বাদ লইলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, তাহারা মুমুক্ষু ব্যক্তি, নাম-রূপবিশিষ্ট সংসারকে অর্থাৎ দৃশ্য-বস্তু-সমূহকে মিথ্যা-বোধে ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ।

কদাচিদাত্মা নমৃতোনজায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপিবিবর্দ্ধতেঽনবঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ—
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ ॥ ৩৫ ।

আত্মার জন্ম নাই মরণও নাই, ক্ষয় এবং বৃদ্ধিও নাই; আত্মা পুরাণ, সুতরাং জন্ম, জন্মানন্তর বিদ্যমানতা,—বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ষড়্ভাববিকার

তাঁহা হইতে নিরস্ত হইল। বাস্তবিক আত্মা নিরতিশয়-সুখাত্মক ও স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ, এবং সর্ব্বগত ও অদ্বিতীয়॥ ৩৫

এবম্বিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবোদুঃখময়ঃ প্রতীয়তে।
অজ্ঞানতোঽধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানেবিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাত্॥ ৩৬

যদি এরূপ সংশয় হয় যে, ঈদৃশ জ্ঞানময় ও সুখাত্মক অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাতে এই দুঃখময় সংসার কিরূপে অনুভূত হয়? এই সংশয়-পাশ ছেদন করিবার জন্য কহিতেছেন যে, স্ব-স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ অধ্যাস-(পর-শ্লোকে ব্যাখ্যাত) হেতু এই সংসারের প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। মিথ্যাবস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, সত্যের প্রকাশ না থাকিলেই মিথ্যার প্রতীতি হয় মাত্র। মনে কর, সূর্য্যালোক-স্পর্শমাত্রেই অন্ধকার বিলুপ্ত হয়। অন্ধকার বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, সুতরাং উহার কোন কার্য্যও নাই। এক্ষণ অজ্ঞান—অন্ধকারের ন্যায় বলিতে হইবে। অজ্ঞানের উৎপত্তি নাই, কিন্তু জ্ঞানজন্য বিনাশ আছে। জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান অবশ্যই দূর হয়। যেমন সূর্য্য-প্রকাশে অন্ধকার দেখা যায় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানও আর দেখা যায় না॥ ৩৬

যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমা-
দধ্যাসমিত্যহুরমুং বিপশ্চিতঃ।
অসর্পভূতেঽহিবিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরেজগত্॥ ৩৭

পণ্ডিতেরা বলেন যে, এক বস্তুতে যে অন্য বস্তুর ভান অর্থাৎ আরোপ হয় তাহার নাম অধ্যাস। যেরূপ রজ্জুপ্রভৃতি বস্তুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ অজ্ঞান-নিবন্ধন অধিষ্ঠান-স্বরূপ জগদীশ্বরে জগত্ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ ঈশ্বরে দৃশ্যমান বস্তুসকল সত্যরূপে প্রতিভাত হয়; বাস্তবিক জগদীশ্বর ভিন্ন সকলই বস্তুই মিথ্যা। ৩৭

বিকল্প-মায়ারহিতেচিদাত্মকে
ঽহঙ্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণে—
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলেপরে॥ ৩৮

বিকল্পসমূহের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ মায়া। তৎ-সঙ্গরহিত চিদ্রূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে এবং মায়োপহিত ঈশ্বরচৈতন্যে এই অহঙ্কাররূপ অধ্যাস প্রথমে কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাই সর্ব্বসংসারের কারণ হইয়া থাকে। জল-মধ্যস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্বে যেমন অজ্ঞান-বশতঃ সূর্য্য বলিয়া বালকের ভ্রম-জ্ঞান জন্মে, কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তার প্রভাবে এই মিথ্যাজগতের সত্তা, প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বালকের যেমন সূর্য্য-বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে প্রতিবিম্বে সূর্য্যভ্রম বিদূরিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই জগদ্-ভ্রান্তির সম্পূর্ণ শান্তি হইবে॥ ৩৮।

ইচ্ছাদি-রাগাদি-সুখাদি-ধর্ম্মিকাঃ
সদাধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে।
যস্মাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখ-স্বরূপেণ বিভাব্যতে হিনঃ॥ ৩৯।

ইচ্ছা, উপেক্ষা, রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ, আত্মা হইতে বিভিন্ন ও সংসারের হেতু, কিন্তু উহাই আবার আত্মস্বরূপে প্রতীত হয়; কেন না, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তির বিদ্যমানতা-প্রযুক্ত ইচ্ছা-রাগাদি সমস্তই থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে জীবের অন্তঃকরণ নিজকারণ অবিদ্যা-সত্তায় বিলীন হইবার পরে উক্ত রাগ-দ্বেষাদি কিছুমাত্র থাকেনা, তখন সাক্ষি-চৈতন্য পরমানন্দরূপে অনুভূত হয়েন, সংসারাভাসের লেশমাত্রও থাকে না। রাগদ্বেষাদি আত্মার গুণ হইলে সুষুপ্ত্যবস্থাতেও অনুভূত হইত। মনুষ্য যখন সুষুপ্ত্যবস্থা হইতে জাগরিত হয়, তখন "আমি পরম সুখে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম, ক্লেশ-তাপ-দ্বেষাদি কিছুমাত্র ছিল না" এইরূপই তাহার বোধ হইয়া থাকে। অতএব অন্তঃ-করণের বিদ্যমানতা, সংসার-প্রকাশের হেতু, এবং অন্তঃকরণের অবিদ্যমানতা, সংসার-পাশনাশের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হইল॥ ৩৯।

অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ।
আত্মাধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতো
বুদ্ধ্যাপরিচ্ছিন্ন পরঃ স এবহি॥ ৪০।

জীব, অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত চিদ্রূপ আত্মার চিদাভাস, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-দুঃখ-ভোগ-ভাগী। আত্মা অন্তঃকরণের সাক্ষিরূপে স্বতন্ত্র অবস্থিতি করেন। এই আত্মাকে কিন্তু বুদ্ধি-বিচারাদিদ্বারা বিভাগ করা যায় না। সময়ে তিনিই বিচারিত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন।

যে চৈতন্যসত্ত্বাকে আশ্রয় করতঃ অন্তঃকরণ কার্য্য করিয়া থাকে, তিনিই আত্মা। জীব, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-বিচার দ্বারা তাঁহাকে অখণ্ড, অব্যয়, সনাতন, ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়া পরমসুখ লাভ করিয়া থাকে॥ ৪০।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

আঁধার।

অয়ি বিভাবরি! পোহাওনা আর
কাতরে এ দীন মাগে,
পোহাইলে তুমি ভাতিবে জগৎ
উষার রক্তিম-রাগে।
জাগিয়া উঠিবে ভূচর খেচর
ধরিয়া বিভুর গান,
শুনিলে আমার দারুণ বাজিবে
কাঁদিয়া উঠিবে প্রাণ।
প্রভাতের বায়ু প্রভাত-আকাশ
প্রভাতের দিনমণি—
হেরিলে আমার জাগিবেক প্রাণে
অতীতের কাব্যখানি।
থাক থাক তুমি তিমির মাখিয়ে
লুকায়ে অনন্ত তনু,
না চাই দেখিতে সলিল-শিকরে
উদিত সহস্র ভানু।
শিশুর অধরে মধুর হাসিটী
হেরিলে জাগিবে দুখ—
যুবকের শিরে চাঁচর চিকুর
হেরিলে ফাটিবে বুক্।
যেওনা যামিনি! থাক—থাক—থাক
অনন্ত আঁধার লয়ে;
বিশ্বের দাহন যাক্ জুড়াইয়ে
বিজনে তোমায় পেয়ে।
জীবন-সঙ্গিনি দেখা যদি দিলে
নীরব নিস্তব্ধ প্রাণ—

হউক্ শীতল　　চিতার আগুণ—
　　শুনিয়া নীরব-গান।
জীবন ভরিয়া　　কামনা করিয়া
　　বাসনা রাখিনু ধরি—
আঁখির পলক　　নাহি ফিরাইতে
　　কোথায় গিয়াছে ডরি !
নাহি প্রাণে যার　　আনন্দের ভাতি
　　কি কাজ অ.লোকে তার ?
আজীবন সেই　　থাকুক আঁধারে
　　জীবন আঁধার যার।
থাক থাক রাখ'　　ব্রহ্মাণ্ড ঘেরিয়া
　　অনন্ত আঁধাররাশি—
তমসামিশ্রিত　　শ্যাম জলধর
　　থাকুক্ শ্রী-অঙ্গে মিশি।
থাকুক্ উরসে　　ঝিল্লীর ঝঙ্কার
　　সুদূর বীণার তান--
অনিল-কম্পন—জলের কল্লোল--
　　একটী পাখীর গান।
স্বরগের শোভা　　ছায়াপথ দিয়া
　　ঢালুক্ সুধায় ধার,
স্রষ্টার করুণা　　করুক্ প্রচার
　　নক্ষত্র-অক্ষর তাঁর।
পোহাইলে তুমি　　ছুটিবে জগৎ
　　সাধিতে আপন কাজে ;
কত ফুল ফল　　হেলিবে দুলিবে
　　খেলিবে অটবী-মাঝে।
অঙ্কে লয়ে শিশু　　নাচাবে জননী
　　বদনে পীযুষ-ধারা,
করিবে কূজন　　বিহঙ্গমকুল
　　হইয়া আপন-হারা।
হেরিলে জীবন　　ভাসিবে বিষাদে
　　শতধা হইবে হিয়া
তাই বলি তুমি　　যেওনা যেওনা
　　দারুণ যাতনা দিয়া।

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

বিজয়া।

বোধনে দুর্গোৎসবের প্রবৃত্তি, পূজায় পরিণতি, বিজয়ায় পরিসমাপ্তি। শুভ-ষষ্ঠীযোগে জগজ্জননীর উদ্বোধন; সপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমীতে মহাপূজা, আর বিজয়া-দশমীতে বিসর্জ্জন—শান্তি—মহামিলন। মৃন্ময়ী-প্রতিমা অবলম্বনে চিন্ময়ী কাত্যায়নীর আবাহন-অর্চ্চনা-বিসর্জ্জন প্রতিবৎসর গতানুগতিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। উৎসবের আয়োজন অনেক স্থানে কমিতেছে, কিন্তু মূলে প্রয়োজন-জ্ঞানের দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িতেছে।

দুর্গোৎসব সম্মিলনোৎসব। দুর্গাপ্রতিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, পার্শ্বে সৌভাগ্য-দেবতা লক্ষ্মী, বিদ্যা-দেবতা ভারতী, শৌর্য্য-দেবতা কার্ত্তিকেয় ও মঙ্গল-দেবতা গণপতি বিরাজ করিতেছেন। মধ্যে মহাসিংহারূঢ়া মহিষাসুরমর্দ্দিনী মহামায়া কাত্যায়নী দশকরে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া স্মিতমুখে শোভা পাইতেছেন। ঊর্দ্ধভাগে মহাযোগী মহেশ্বর সমাধিস্থ, আর বিশ্ব-রক্ষক দেববর্গ যথাযোগ্য ভূষণ, বাহন ও আয়ুধ লইয়া অসুর-দলের সহিত মহারণরঙ্গে মত্ত রহিয়াছেন। দেবাসুর-সংগ্রামের চিত্র, এই উৎসবের গূঢ় উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। অসদ্ভাব-রূপ অসুরদলকে পরাস্ত করিয়া সদ্ভাব-স্বরূপ দেবদল, বিজয়শ্রী লাভ করিতেছেন—জগতের কল্যাণার্থে সংসারে ধর্ম্মরাজ্য—শান্তিরাজ্য-স্থাপনের জন্য জগদম্বা, পাপাসুরকে শাসনের নাগ-পাশে বাঁধিয়া রাখিয়া বিদ্যা, ঋদ্ধি, শৌর্য্য ও মঙ্গল-মূর্ত্তি লইয়া সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—এ চিত্রে কি হিন্দু সর্ব্বশক্তির সম্মিলন, সর্ব্বতত্ত্বের সমন্বয়-সাধন, সর্ব্ববিধ সমস্যার সম্পূরণ দেখিতে পাইতেছেন না?

দুর্গোৎসব যে তাত্ত্বিকভাবে সম্মিলনের উৎসব, তাহা সত্য, কিন্তু সামাজিক-ভাবেও ইহার সম্মিলন-প্রবণতা অস্বীকার করা যায় না। দুর্গোৎসবে বস্ত্র, অলঙ্কার, উপহার, আহার্য্য প্রভৃতির দানে আদানে যেমন সামাজিক সহানুভূতির বিকাশ হয়, আর উহা যেমন প্রকারান্তরে অজ্ঞাতসারে সকলকে আত্মীয়তার বা সম্মিলনের ক্ষেত্রে টানিয়া লয়, তাহা অল্প চিন্তায়ই বুঝা যায়। সর্ব্বশেষে বিজয়ার প্রেমালিঙ্গনের অবসরে, প্রণাম—আশীর্ব্বাদ—নমস্কার—প্রতিনমস্কারে, "মিষ্ট-মুখের" ব্যাপারে অজ্ঞ-বিজ্ঞ ধনী-দীন বাল-বৃদ্ধ তরুণ-প্রৌঢ় লঘু-গুরু ইতর-ভদ্র সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে—এক মহাসম্মিলন—অপূর্ব্ব একপ্রাণতা প্রকাশ পায়, তাহাতে দুর্গোৎসবের সামাজিক সম্মিলনোৎসব সুসিদ্ধই হয়।

তান্ত্রিক-জগতে সাধকের তীব্র সাধনায় জগদম্বা কুলকুণ্ডলিনীর উদ্বোধন, জাগরণ, দোষশোধন বা অসুর-বিনাশ আবার বিসর্জ্জনে পরমজ্যোতিতে সম্মিলনে শান্তি, শিব-শক্তির একাত্মভাবে মহামিলন এবং সেই মহামিলনেই বিরাম। বাহ্যজগৎ অন্তর্জ্জগৎ উভয়ত্রই মায়ের কার্য্য অমঙ্গলনাশ ও শান্তি-স্থাপন—সংযম-সাধন ও শান্তি-দান।

দুঃখের বিষয়, সাধন অভাবে বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে উৎসব ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। এখন আর মানস অসদ্বৃত্তিরূপ অসুরদলকে বিনাশ করিয়া সদ্বৃত্তিরূপ দেবদল, হৃদয়-স্বর্গে মহামায়ার সর্ব্বশক্তিময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে না। মন ক্রমে অসদ্ভাবে বিভোর হইতেছে। চিত্তশুদ্ধি ক্রমে দূরবর্ত্তিনী হইতেছে। জন-সমাজ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে। বাহ্য উদ্দেশ্যেও ক্রমে বহুদোষ প্রকাশ পাইতেছে। বিরোধ-বিসম্বাদ দ্বেষ-হিংসা ক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে। "গলাগলি"র স্থানে "দলাদলি" ঘটিতেছে। 'কোলাকুলি' 'কিলাকিলি'তে পরিণত হইতেছে। জটিল বৈষয়িক ব্যাপারে পরস্পরের মিলন, প্রায় অসম্ভব হইয়াই উঠিয়াছে। পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রেও 'সম্মিলন' প্রাণের জিনিষ বলিয়া গণ্য হয় কিনা সন্দেহ। ফলতঃ ভিতরে বাহিরে দেবভাবের জয় হইতেছে আর অসুর ভাবের পরাজয় হইতেছে - কিনা, তাহাতে অধুনা ঘোর সংশয়। কাজেই মনে হয়, দুর্গোৎসব—বিজয়োৎসব—আনন্দোৎসব ভিতরে বাহিরে প্রাণহীন হইতে চলিয়াছে।

যদি হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ রাখিতে পারা যায়, যদি অসদ্ভাবরূপ অসুরদলকে হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা যায়, তবে বিজয়ার আনন্দ-মিলন ঘটিতে পারে। আর যদি পারস্পরিক দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি অসুরভাবসম্পন্ন জনগণের হৃদয়ে সৌজন্য সহানুভূতি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে দেবতায় পরিণত করিতে পারা যায়, তবেই সামাজিক শান্তির—সামাজিক মিলনের সম্ভাবনা। অন্যথা বিজয়ার প্রাণহীন উৎসবে ঐহিক পারত্রিক কোনও শান্তি মিলিবে না। জগদম্ব! বিজয়ার প্রকৃত পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধন কর মা!

শ্রী—দীন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিদায় ও উদয়। যশোহর নবমবঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের সাধারণ ও সাহিত্য-শাখার নির্ব্বাচিত সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যসেবী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ মহোদয় অস্বাস্থ্য-বশতঃ সম্মিলনের কার্য্যে স্বীয় অসামার্থ্য জানাইয়া অভ্যর্থনা-

সমিতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পদত্যাগপত্র যথাবিধি গৃহীত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ; পি-এইচ্ ডিঃ মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতিকর্ত্তৃক সম্মিলনের সাধারণ ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়—সভাপতি পদ-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন ও অভ্যর্থনাসমিতিকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন। সমিতির সদস্যগণ তাঁহার পদগ্রহণ-সংবাদে প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

সমর-সমস্যা। বুলগেরিয়ান্ সৈন্য জার্ম্মাণ্ গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সার্ভিয়া আক্রমণ করিয়াছে। অপরদিকে ইংরেজ ও ফরাসী-সৈন্য গ্রীসের মধ্য দিয়া সার্ভিয়াকে সাহায্য করিতে যাইতেছে। গ্রীস্ নিজের নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করিতেছে। ইউরোপের মহাসমর-সমস্যা ক্রমে জটিলতর হইতে চলিল।

পাপাচরণ। দেশে পাপাচরণের প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র ডাকাতির সংবাদ শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি আবার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্ম্মচারীকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইলে কাহারও কল্যাণ হইতে পারে না। হিন্দুর শিক্ষা লোপ পাওয়ায় সংযতভাব বিনষ্ট হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল অধর্ম্মস্রোতে সমাজ প্লাবিত হইতেছে। হিন্দুশিক্ষার প্রচার হইলে এ পাপস্রোতে বাধা পড়িতে পারে।

সভা-সংবাদ। আগামী ৪ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার যশোহর জেলার লোহাগড়া-গ্রামে সুপ্রথিতনামা ধনী ও স্বজাতি-বৎসল শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ সরকার মহাশয়ের ভবনে বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবি-সভার ১৫শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

সানুবাদ তর্পণসারঃ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—বাণীপুস্তকালয় ২২নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। গ্রন্থ ক্ষুদ্র কিন্তু প্রয়োজনীয়। স্নান, তর্পণ, আচমন প্রভৃতির শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠানে অনেকেই অজ্ঞ। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থের সাহায্যে ঐ সকল বিষয়ের শাস্ত্রীয় উপদেশ ও মীমাংসা অবগত হওয়া যায়। নিত্যকর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া আজ সমাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। নিত্যকর্ম্মে মনোনিবেশ ব্যতীত দুর্দ্দশা-নাশের উপায় নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় হিন্দু-সমাজের ধন্যবাদার্হ। আশা করি, তর্পণসার হিন্দুর গৃহে২ রক্ষিত হইবে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড | অগ্রহায়ণ। | ১৩২২ সাল।
৮ম সংখ্যা। | | ১৮৩৭ শকাব্দা

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথমকাণ্ড—তৃতীয় অনুবাক—তৃতীয় সূক্ত)

ভগমস্যা বর্চ আদিষ্যধি বৃক্ষাদিব স্রজম্।
মহাবুধ্নইব পর্ব্বতো জ্যোক্ পিতৃষ্বাস্তাম্॥ ১

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। অস্যাঃ (অনভিমতায়াঃ স্ত্রিয়াঃ) ভগং (ভাগ্যং) বর্চ্চঃ (শারীরং তেজঃ) আদিষি (আদদে, মন্ত্র-প্রভাবাৎ স্বীকরোমি ইত্যর্থঃ) বৃক্ষাৎ (পুষ্পিতাৎ পাদপাৎ) স্রজম্ (পুষ্পনিকরম্) ইব। (আদিষি ইতি সম্বন্ধঃ।) (অপহৃতবর্চ্চস্কা স্ত্রী কিং করোতু ইত্যত আহ) মহাবুধ্নঃ (মহান্ বুধ্নঃ মূলং যস্য সঃ, ভূম্যামধিকতরং প্রথিত ইত্যর্থঃ) পর্ব্বতঃ ইব ইয়ং স্ত্রী জ্যোক্ (চিরকালং) পিতৃষু (পিতৃমাত্রাদিগৃহেষু) আস্তাম্ (নিবসতু, ন কদাচিৎ পতিমুখং পশ্যতু ইতি ভাবঃ।)

বঙ্গানুবাদ। পুষ্পিত পাদপ হইতে পুষ্পসমূহ তুলিয়া লওয়া মত এই অনভিমতা রমণীর ভাগ্য ও তেজঃ (মন্ত্র-বলে) কাড়িয়া লইতেছি। এই রমণী দৃঢ়মূল পর্ব্বতের মত (স্থায়িভাবে) চিরকাল পিতৃ-গৃহে বাস করুক্।

টিপ্পনী। আচার্য্য-সায়ণের মতে এই সূক্তের মন্ত্র কয়টী কোনও রমণীকে 'দুর্ভগা' করিবার জন্য প্রাচীনকালে প্রচলিত অনুষ্ঠান-বিশেষে ব্যবহৃত হইত।

যে রমণীকে 'দুর্ভগা' করিতে হইবে—তাহার ব্যবহৃত মাল্য, কন্দুক, দন্তকাষ্ঠ বা তাহার মস্তকের কেশ সংগ্রহ করিয়া এই সূক্তস্থ মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক, প্রক্রিয়া-বিশেষের সহিত ঐ সকল, স্থান-বিশেষে প্রোথিত করিয়া রাখিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কৌশিকসূত্রে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। রমণীকে স্বামি-সুখে বঞ্চিত করিয়া পিতৃ-গৃহে চিরকালের জন্য থাকিতে বাধ্য করা—এই কর্ম্মের লক্ষ্য। এ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের আয়োজন এখনও সমাজের অংশ-বিশেষে দৃষ্ট হয়। মন্ত্র-প্রভাবে রমণীকে বশীভূত করিবার চেষ্টা এদেশে অদ্যাপি কদাচিৎ দেখা যায়। পতি-পত্নীর মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য মন্ত্রৌষধ-প্রয়োগ বহুবিবাহের প্রসাদে এখনও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। এই সকল মন্ত্র হইতে সমাজের যে অবস্থা বুঝা যায়, তাহা আর্য্য-সভ্যতার উজ্জ্বল অংশের সহিত সম্পর্কশূন্য।

এষাতে রাজন্ কন্যা বধূর্নি ধূয়তাং যম।
সা মাতুর্বধ্যতাং গৃহেহথো ভ্রাতুরথো পিতুঃ॥ ২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে রাজন্! (রাজমান সোম!) হে যম (নিয়ামক!) এষা কন্যা (স্ত্রী) তে (তব) বধূঃ (জায়া প্রথমতস্ত্বয়া পরিগৃহীতত্বাৎ) (সা ইয়ং) নিধূয়তাং (দৌর্ভাগ্যেণ পতিগৃহাৎ নিঃসার্য্যতাম্) সা (বধূঃ) মাতুঃ (জনন্যাঃ) গৃহে বধ্যতাম্, অথো (অপিচ) ভ্রাতুঃ গৃহে বধ্যতাম্, অথো (অপিচ) পিতুঃ (জনকস্য) গৃহে বধ্যতাম্ (বদ্ধেব চিরং তত্র বর্ত্ততাম্ ইত্যর্থঃ)

বঙ্গানুবাদ। হে রাজন্ সোম, হে নিয়ামক, এই রমণী তোমার জায়া। এই রমণী পতিগৃহ হইতে ('দুর্ভগা' হইয়া) বিতাড়িত হউক্। এই রমণী মাতার গৃহে, ভ্রাতার গৃহে অথবা পিতার গৃহে (দুর্ভগা হইয়া) চিরকাল অবস্থান করুক্।

টিপ্পনী। এই সূক্তের সকল মন্ত্রই "দৌর্ভাগ্যকরণে" ব্যবহৃত হয়, এ মন্ত্রটীও সুতরাংই ঐ কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। এ মন্ত্রে সোম-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে "হে সোম, হে নিয়ামক, এ রমণী তোমার জায়া, কারণ, তুমিই সর্ব্বপ্রথমে এই রমণীকে গ্রহণ করিয়াছিলে। এখন আবার মন্ত্রপ্রভাবে তুমিই ইহাকে পতিগৃহ হইতে বিদূরিত কর ও পিতৃগৃহে চিরকাল (ইহাকে) বদ্ধবৎ থাকিতে বাধ্য কর।" এখানে রমণীকে সোমের 'জায়া' বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র আলোচ্য। মন্ত্রটী এই—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে, সোম প্রথমে কন্যাকে গ্রহণ করেন, পরে গন্ধর্ব্ব উহাকে গ্রহণ করেন, পরে অগ্নি উহাকে গ্রহণ করেন। পাণি-গ্রহণকারী বর, কন্যার চতুর্থ পতি। এই মন্ত্রের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। "সোম" "গন্ধর্ব্ব" ও "অগ্নি" দেবতা বা অন্য পদার্থ—ইহা লইয়াও মতভেদ প্রচুর। একদল বলেন, "প্রথমে কন্যা সোম কর্ত্তৃক গৃহীত হয় অর্থাৎ সোমরস প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে; পরে গন্ধর্ব্ব তাহাকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব (সঙ্গীতাচার্য্য) তাহাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেন; পরে অগ্নি গ্রহণ করেন—অর্থ পাককার্য্যে অগ্নি-সেবায় কন্যা প্রবৃত্ত হয়; তৎপরে যোগ্যবরে সমর্পিত হয় অর্থাৎ কন্যার বিবাহ হয়।" অন্য দল বলেন "সোমদেবতা কান্তিরূপে কন্যার দেহে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে শুচিতা প্রদান করেন, গন্ধর্ব্ব-দেবতা সুস্বররূপে দেহে প্রকাশ পাইয়া কন্যাকে মধুরভাষিতা প্রদান করেন, অগ্নি কাম-লাঞ্ছন বা অভিপ্রায় রূপে প্রকাশ পাইয়া কন্যাকে পবিত্রতা (বরের গ্রহণ-যোগ্যতা বা ভোগ-যোগ্যতা) প্রদান করেন। শেষে বর, সেই পবিত্রা বালাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।" সোম, গন্ধর্ব্ব ও বহ্নির গ্রহণকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রের ইঙ্গিত—"কন্যাং ভুঙ্‌ক্তে রজস্বগ্নিঃ শশীচ লোমদর্শনে, স্তনোদ্ভেদেতু গন্ধর্ব্বঃ" রজোযোগ অগ্নির গ্রহণকাল, লোমোদ্‌গম সোমের গ্রহণ-কাল, স্তনোদয় গন্ধর্ব্বের গ্রহণকাল। যৌবনের চিহ্নগুলি দেব-কৃপায় স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইলে বিবাহকাল উপস্থিত হয়—এ ভাবটা এই ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা যায়। যে ভাবেই হউক্, রূপকের ভাষায় সোম কুমারী-কন্যাকে প্রথম ভোগ করেন, সুতরাং তিনি প্রথম পতি, রমণী তাঁহার জায়া। সোম যখন জায়ার নিয়ামক, তখন তিনি মন্ত্রমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া রমণীকে পতিগৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া পিতৃগৃহে স্থাপন করিতে পারেন—এই ভাবেই প্রার্থনা।

এষা তে কুলপা রাজন্ তামু তে পরিদদ্মসি।
জ্যোক্ পিতৃষ্বাসাতা আশীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ ॥৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে রাজন্ (সোম) এষা (স্ত্রী) তে (তব) কুলপা (কুলস্য পালয়িত্রী প্রথমতস্ত্বয়া গৃহীতত্বাৎ) তাম্ (স্ত্রিয়ম্) তে (তুভ্যম্) উ (এব) পরিদদ্মসি (পরিদদ্মঃ পরিদানং রক্ষার্থং দানং এতাবন্তং কালং পতি-সমীপে স্থিতামেনাং রক্ষণার্থং পুনস্তুভ্যং দদামেবেত্যর্থঃ) (তস্যানিবাসস্থান-মাহ) জ্যোক্ (চিরকালং) পিতৃষু (পিত্রাদি-গৃহেষু) আসাতৈ (আস্তাম্ নিবসতু) (পিতৃকুলবাসস্য অবধিমাহ) শীর্ষ্ণঃ (শিরসঃ) সমোপ্যাৎ (সংপতনাৎ নিপাতা-বধি মরণপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে রাজন্ সোম, এই রমণী তোমার কুলপালয়িত্রী, (অতএব) ইহাকে তোমাকেই পরিদান করিতেছি। এই রমণী মরণপর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করুক্।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে সোমদেবতাকে বলা হইতেছে "এই রমণীকে যখন তুমি প্রথমেই গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন এ তোমার কুলপালিনী, সুতরাং ইহাকে তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন রাখাই সঙ্গত। এই নিমিত্ত তোমাকেই পরিদান করিতেছি। (পরিদান অর্থ—রক্ষার্থ দান।) ইহার রক্ষার ভার তোমার উপর দিতেছি। এ যাবৎ সে পতিগৃহে ছিল, এখন তাহাকে তোমার অধীনে রাখিতেছি; তুমি তাহাকে রক্ষা করিবে, কিন্তু সে পিতৃগৃহে আমরণ বাস করিতে বাধ্য হইবে। দেখিও যেন রমণী পিতৃগৃহ হইতে কদাপি পতিগৃহে যাইতে না পারে!"

অসিতস্য তে ব্রহ্মণা কশ্যপস্য গয়স্য চ।
অন্তঃ কোশমিব জাময়োঽপি নহ্যামি তে ভগম্॥৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। (হে নারি!) ত (তব) ভগং (ভাগ্যং) অসিতস্য কশ্যপস্য গয়স্য চ (ঋষেঃ (সম্বন্ধিনা) ব্রহ্মণা (মন্ত্রেণ) অপিনহ্যামি (পিহিতং করোমি) (তত্র দৃষ্টান্তঃ) জাময়ঃ (জায়ন্তে আসু অপত্যামিতি গৃহস্থাঃ স্ত্রিয়ঃ) তাঃ অন্তঃ (গৃহমধ্যে অবস্থিতং) কোশং (ধনবস্ত্রাদি-স্থাপনার্থং আবৃতং স্থানম্) ইব (তাদৃশং স্থানং যথা পিহিতং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। হে রমণি! গৃহস্থ নারীগণ যেমন গৃহমধ্যে অবস্থিত কোশ আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ অসিত, কশ্যপ ও গয় ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট বেদমন্ত্র দ্বারা তোমার ভাগ্য আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছি।

টিপ্পনী। এই মন্ত্রে, যাহাকে 'দুর্ভগা' করিতে হইবে—সেই রমণীর প্রতি সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে "হে নারি! মন্ত্রবলে গৃহাভ্যন্তরস্থ কোশবৎ তোমার সৌভাগ্যকে আবৃত করিতেছি।" সায়ণের মতে 'অন্তঃ' অর্থ গৃহমধ্যে, 'কোশ' অর্থ "ধনবস্ত্রাদিস্থাপনার্থ আবৃত স্থান"। গৃহের অভ্যন্তরে গুপ্তস্থানে যেমন রমণীরা অর্থ ও বস্ত্রাদি রাখিয়া সে স্থান আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ রমণীর ভাগ্য আবৃত করিয়া রাখা হইতেছে। "অন্তঃ" অর্থে আমরা বুঝি 'ভূমির মধ্যে',—'কোশ' অর্থে বুঝি 'ধনরত্ন'। অতি প্রাচীন কালে (বর্ত্তমানেও কদাচিৎ) ধনরত্ন মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা হইত। অবস্থাপন্ন লোকের বাটীতে গৃহের মেঝের মধ্যে, দেওয়ালের গায়ে বা সিঁড়ির নীচে গুপ্ত অন্তর্গৃহ থাকিত, তাহাই 'মালখানা' রূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকালের এই অবস্থার

পরিচয় এই মন্ত্রে আছে। এই সূক্তের প্রথম তিনটী মন্ত্রের ঋষি যথাক্রমে অসিত, কশ্যপ ও গয়—এ মন্ত্র হইতে এরূপ অনুমান হয়।

প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অনুবাক তৃতীয় সূক্ত সমাপ্ত।

শ্রী ——

গৌরাঙ্গ-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তখনকার সেই প্রেম-পয়োধির পরিপ্লাবনে সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত টলমলায়মান হইয়াছিল। তাহার অমৃত-সিঞ্চনে কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইয়াছিল, জন্মান্ধ দিব্য নয়ন লাভ করিয়াছিল, পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করিয়াছিল, পাষাণ মানব হইয়াছিল। ত্রেতাযুগে ষাইট্ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়া চোর রত্নাকর (বাল্মীকি) কাব্যরত্নাকর হন, আর আমার দয়াল-প্রভুর সময় কত শত দস্যু, কত শত চোর, কত শত পাষণ্ড নাচিয়া গাহিয়া অনায়াসে "প্রেম-রত্নাকর" হইয়াছিল—"আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে, রতন হইল কত জনা"—জগাই মাধাই তাহার সাক্ষী। ইহা কি মনুষ্য-শক্তিতে সম্ভবে? পাঠক মহোদয়গণ! এই যে মধুর-মৃদঙ্গ-সহযোগে মধুরতর-সুর-তালাদি-সমন্বিত মধুরতম-হরিনাম-কীর্ত্তন, যাহা শ্রবণমাত্রে চিত্ত নির্ম্মল হয়, সংসারের প্রবল-দাব-দহন নিবৃত্ত হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের স্বাদ-গ্রহণে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়, ইহা কাহার প্রসাদলব্ধ? নিত্য গোলোকের প্রতিবিম্ব-স্থানীয় পরমরমণীয় শ্রীবৃন্দাবন, যাঁহার প্রতি তৃণ-গুল্মটি পর্য্যন্ত মধুময়ী কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা করিয়া দেয়, যাহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছিল, কাহার দয়ায় তাহার পুনরুদ্ধার হয়? ঐ যে গগনস্পর্শী গোবিন্দজির সপ্ততল মন্দির, যাহার শিখরস্থিত দীপালোক, একদিন সগর্ব্বে আগ্রার রাজপ্রাসাদকেও বিদ্রূপ করিত, নুরজাহানের আদেশক্রমে পরশ্রী-কাতর যবনরাজ জাহাঙ্গীর যাহার ত্রিতল ধ্বংস করেন—সেই ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির অদ্যাপি কাহার মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে? ঐ গোপালভট্ট-সেবিত শালগ্রাম-সমুদ্ভূত পরমরমণীয় রাধারমণ-বিগ্রহ কাহার মাহাত্ম্য সূচনা করিতেছেন? ঐ যে পাষাণমণ্ডিত পুণ্য-সলিল রাধাকুণ্ড—শ্যামকুণ্ড—যাহার নাম-শ্রবণ মাত্রেই মধুময়ী কৃষ্ণলীলা অন্তরে জাগরূক হইয়া

উঠে, উহা কাহার কৃপায় আবিষ্কৃত হয় ? ঐ যে নীলাচলস্থিত সিদ্ধ বকুল, এক-খানা মাত্র ছালের উপর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া—"হরি নামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে"—এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে, সে কাহার মহিমায় ? ঐ যে বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য, যাহা এক মাস মধ্যে বিরচিত হইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলে মহাবিস্ময় উৎপাদন করে, উহা কাহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে ? ঐ যে তপঃ-ক্লিষ্ট সহজ দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ, এক মণ ওজনের ঘণ্টা বাদন করিয়া বৃন্দাবনের বিগ্রহ-সেবার অধিকার গ্রহণ করিলেন সে কাহার শক্তিতে ? ঐ যে কৌপীনমাত্রসম্বল গোস্বামিগণ কোটি কোটি-মুদ্রাব্যয়াপেক্ষ পরম রমণীয় প্রাসাদমালায় বৃন্দাবনধাম মণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন সে কাহার শক্তিতে ? ঐ যে সনাতন-গোস্বামী রূপ-গোস্বামী প্রভৃতি ভূস্বামীগণ রাজ্যৈশ্বর্য্যসমূহ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কৌপীন-মাত্র সম্বলে "পথের ভিখারী" হইলেন, সে কাহার প্রেরণায় ? ঐ যে দাস গোস্বামী প্রভৃত ধন-সম্পত্তি ও রূপবতী যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া আট্ দিনের মধ্যে নিবিড় জঙ্গল অতি-ক্রম করিয়া অনাহার অনিদ্রায় আঠার দিনের পথ নীলাচলে পৌছিয়া একটি নবীন সন্ন্যাসীর পদমূলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, সে কাহার আকর্ষণে ? ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মকল্প মহর্ষিগণের লীলাক্ষেত্র ভারতের নিকট তপঃ-সিদ্ধ পুরুষ নূতন আর কি বিভূতি দেখাইবেন ? বিশ্বামিত্র নূতন সৃষ্টি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, তথাপি ভারত তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা দূরে থাকুক্ "ব্রহ্মর্ষি" বলিতেও সহজে সম্মত হন নাই ! ভারতের ন্যায় জহুরীর নিকট মেঁকি চালান দায় ! ভারতের যখন সুদিন ছিল, ব্রাহ্মণগণ যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন, যখন সৃষ্টি-সংহারের শক্তি-সম্পন্ন ঋষিগণ ছিলেন, তখনই কয়জন রাজা মহা-রাজা ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পদমূলে গিয়া ছুটিয়া পড়িয়াছেন ? তখন ত সত্যকাল ! তখন ত সমুদয় লোক সত্ত্বহুল ছিলেন ! সকলেরই বিষয়াসক্তি কম ছিল ! সকলের চিত্তই ধর্ম্মপ্রবণ ছিল ! কৈ ? তথাপি অনেকেই বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম লাভ করিতে যান নাই ! আর এই তমঃ-পূর্ণ ঘোর কলিকালে প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ সাম্রাজ্য ছাড়িয়া একটি নবীন সন্ন্যাসীর পদমূলে মস্তক লুণ্ঠিত করিবার জন্য উন্মত্ত ! ইহা কাহার আকর্ষণে ? ঐ যে সন্ন্যাসীগুরু পরম পণ্ডিত অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী উন্মত্তের ন্যায়, বালকের ন্যায়, নৃত্য করিতে করিতে ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন, সে কাহার প্রেরণায় ? ঐ যে অসাধারণ-ধী-শক্তি-সম্পন্ন

অদ্বিতীয় দার্শনিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম—"বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তি-যোগ-শিক্ষার্থ-মেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা, আবির্ভূতস্তস্যপাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ"—বলিতে বলিতে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে একটি বালক সন্ন্যাসীর পদমূলে পতিত হইলেন—সে কোন্ উন্মাদনায় ? পাঠক মহোদয়গণ! ইহা কি মনুষ্য-শক্তিতে হয় ? কখনও কি এরূপ মনুষ্য দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন? শক্তিতে বিস্মিত—গুণে মুগ্ধ অনেকেই করিতে পারেন, কিন্তু সেই প্রাণের প্রাণ নিখিল জীবের অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্ ব্যতীত এরূপ বিশ্ব-বিমোহন, জগদুন্মাদক আকর্ষণ অন্যের হইতে পারে না। এক সেই দ্বাপরযুগে যমুনা-পুলিনে ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর নব নটবর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম-ঠামে যখন মোহন বেণুর মধুর ধ্বনি করিতেন, তখন যমুনা উজান বহিত, আর স্থাবর-জঙ্গমের স্বভাব-বিপর্য্যয় হইত অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের অশ্রু-কম্প-পুলকাদি জঙ্গমধর্ম্ম প্রকাশ পাইত, আর মনুষ্যাদি জঙ্গম পদার্থের বৃক্ষাদি স্থাবরপদার্থের ন্যায় জড়ভাব উপস্থিত হইত! আর আমাদের নদীয়া-বিহারী ভুবনমনোহারী গৌরহরি যখন অরুণ নয়নে, মধুর বদনে, প্রাণহারী হরিনাম করিতেন, তখন জাহ্নবী উথলিয়া উঠিতেন, কুলবতী কুল ছাড়িতেন আর—"স্থাবর জঙ্গম আদি, "হরি" বলে নিরবধি",—এই ভাব লক্ষিত হইত। ইহাতে কি বুঝা যায় ? ইহাতেও কি তাঁহাকে মনুষ্য বলিতে চাহেন ?

এখন একবার পূর্ব্বের কথাগুলি স্মরণ করুন, অর্থাৎ যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন যদি সাধন-নিরপেক্ষ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি নাশ করেন, তবে শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তিবলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া গণনা করা হয়। এই লক্ষণ যখন আমাদের মহাপ্রভুতে দেখিতে পাইতেছি, তখন কেনমা তাঁহাকে অবনতমস্তকে অবতার বলিব ?

যদি বলেন "স্বীকার করিলাম—সে সময় ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল, কিন্তু মহাপ্রভুতে কোনও অলৌকিক শক্তি ছিল না," তদুত্তরে বক্তব্য—মনে মনে ঐরূপ ধারণা পোষণ না করিয়া মনোযোগ দিয়া একবার তাঁহার মধুময় লীলা-গ্রন্থপাঠ করিয়া দেখুন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত সবই অদ্ভুত, সবই অলৌকিক, সবই বিচিত্র। শ্রীশ্রীশচী-মাতার নূপুর-ধ্বনি-শ্রবণ, ধ্বজ-বজ্রা-ঙ্কুশাদি-চিহ্ন-শোভিত পদাঙ্ক-দর্শন, সহসা চতুর্ভুজ আদি মূর্ত্তি-দর্শন, অলঙ্কার-লোভী

... গৃহে আনয়ন, ধ্যান-যোগে আহূত হইয়া অতিথি তৈর্থিক ব্রাহ্মণের অন্ন-ভোজন যোগমায়া-প্রভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে দর্শন-দান, জগাই-মাধাই-উদ্ধার ও সেই সময় আহ্বানমাত্রে সুদর্শন-চক্রের আবির্ভাব, বিশ্বরূপ দেখান, ষড়্ভুজমূর্ত্তি-প্রকাশ, এমন কি তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব সমূহ ও অলৌকিক! এগুলি তাঁহার সাধনলব্ধ-শক্তিজাত, এরূপ বলা যায় না। তৈর্থিক ব্রাহ্মণের অন্ন-ভোজন পর্য্যন্ত ব্যাপার গুলি অতি বাল্যবয়সে হয়। জগাই-মাধাই-উদ্ধারের সময়ও বিশেষ কোনও সাধন ভজন করিতেন না। আর সাধন ভজন করিলেই যদি তাঁহার অবতারত্বের ব্যাঘাত ঘটে, তবে বুদ্ধদেব কি করিয়া অবতার হন? তাঁহার ন্যায় কঠোর তপস্যা কয়জন করিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণই বা কি করিয়া অবতার হন? নরলীলার অনুরোধে শিবারাধনা জন্য তিনিই কি কম কঠোর করিয়াছেন! মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বের মেঘবাহন পর্ব্বাধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিজের সাধনার বিষয় বলিতেছেন,—

"দিনেঽষ্টমেতু বিপ্রেণ দীক্ষিতোঽহং যথাবিধি।"
দণ্ডী মুণ্ডী কুশী চীরী ঘৃতাক্তো মেখলীকৃতঃ॥
মাসমেকং ফলাহারো দ্বিতীয়ং সলিলাশনঃ।
তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থঞ্চ পঞ্চমঞ্চানিলাশনঃ॥
একপাদেন তিষ্ঠংশ্চ ঊর্দ্ধবাহুরতন্দ্রিতঃ॥

হে যুধিষ্ঠির! অষ্টমদিনে ব্রাহ্মণের নিকট আমি যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। ঐ সময় আমি মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ড ধারণ করিয়াছিলাম। তখন কুশাসনে উপবেশন করিতাম, চীর বসন পরিধান করিতাম। আমি মেখলা ধারণ করিয়াছিলাম। ঐ সময় আমি প্রথম মাস ফল আহার করি, দ্বিতীয় মাস কেবল মাত্র জলপান করিয়া থাকি, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এই তিন মাস কেবল মাত্র বায়ু ভোজনে অতিবাহিত করি। ঐ সময় আমি এক পদের উপর ভর করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ছিলাম। যদি বলেন "শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ যে অবতার—এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু সম্বন্ধে শাস্ত্রে সেরূপ কোনও উল্লেখ নাই।" উত্তরে বলিব, একেবারে উল্লেখ নাই একথা বলা যায় না, তবে সুস্পষ্টরূপে বা বাহুল্য রূপে উল্লেখ নাই। তাহার কারণ, মহাজনগণ অতীত অবতারের কথা যেরূপ বিস্তৃত ভাবে লেখেন, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ অবতারের কথা তাদৃশ লেখেন না। কাজেই তাঁহার অবতারত্ব-সম্বন্ধে সমসাময়িক শাস্ত্রকার গোস্বামিগণ বিশেষ কোনও আন্দোলন করেন

নাই। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের জীবনারাধ্যধনের সেই জগদুন্মাদন বিশ্ববিমোহন মধুমুগ্ধ ভ্রমর-গর্ভ স্বর্ণপদ্মসন্নিভ অথবা ইন্দ্রনীলদ্যুতি-গর্ভ মহামারকতদ্যুতি-দূষিত দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ ভূষিত বরবপু ও তাঁহার সেই তারুণ্যামৃত-প্লাবিত কারুণ্যামৃত-পূরিত আরুণ্যরাগ-রঞ্জিত নয়ন-যুগল-গলিত ত্রিতাপহারী শান্তিকারী প্রেমবারি, যে একবার নয়ন-গোচর করিবে, তাহাকে আর প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইতে হইবেনা যে তাহাদের আরাধ্য বস্তুটি কি? সূর্য্য প্রকট থাকিতে আলোক জ্বালিয়া তাহা কাহাকেও দেখাইতে হয় না। অস্তমিত হইলে বটে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন বা শাস্ত্রাদি দ্বারা তাহা লোককে জানাইতে হয়। গোস্বামীগণ মেঁকী চালাইতে ছিলেন না, তাই তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া কেবল মাত্র জগৎকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন—"সদাহৃদয়-কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ"—অর্থাৎ দিবা-ভাগেও গাঢ় তমসাচ্ছন্ন তোমাদের হৃদয়রূপ গহ্বরে-(যে হৃদয়ে ভগবদ্-বিকাশ ঘটে না সেহৃদয় একটি গহ্বর মাত্র বৈ আর কি ?)—সদাসর্ব্বদা শ্রীশ্রীশচীনন্দন প্রকাশিত হউন, অর্থাৎ তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে তিনি কি? ইহা কি সামান্য সাহসের কথা! মেঁকী লইয়া কি কেহ বাজারে ফেলিয়া দিয়া বলিতে পারে "তোমরা বাজাইয়া দেখ, গলাইয়া দেখ!" পাঠক মহোদয়গণ! এই কারণেই মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণেও শ্রীরামের অবতারত্ব-বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যাঁহারা দেখিতে সমর্থ, তাঁহাদের নিকট প্রমাণের অভাব হইবে না। বলিতে পারেন "পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ, ভাবি অবতার কল্কী সম্বন্ধে লিখিতে পারিলেন, আর মহাপ্রভু সম্বন্ধে কেন লিখিলেন না?" আমি বলি, কল্কী সম্বন্ধে তাঁহারা যতটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভু সম্বন্ধেও ততটুকু লিখিতে ত্রুটি করেন নাই। তন্মধ্য হইতে মাত্র কএকটি প্রমাণ বারান্তরে উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।



জাগরণ।

১

হে মোর মানস, জাগরে ধীরে।
মোহ-ঘুম তোর ভাঙ্গিল কি রে।
সঞ্চিত যত স্মৃতির রতন
রাখিয়াছ হৃদে করিয়া যতন;
আজি সেই ব্রত কর সমাপন
আঁখির নীরে!
জাগরে ধীরে।

২

তরুণ অরুণ-কিরণ রাশি,
তোমার আলয়ে পড়িছে আসি।
এখনো কি তোর রুদ্ধ দুয়ার?
এখনো বাহিছ সুপ্তি-পাথার।
স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিশ্ব-শোভার
মহিমা রাশি।
পড়িছে আসি।

৩

ভেঙ্গে গেল ঘুম,—নীরব ধ্যান!
উলসি' বিলসি' নাচিল প্রাণ।
হেরিনু সহসা চক্ষু মেলিয়া,
উৎসব রোল বিশ্ব ব্যাপিয়া,
আলোকে বাতাসে চ'লেছে ভাসিয়া
সুরভিঘ্রাণ।
নাচিল প্রাণ।

৪

হৃদয়ে,—অসীম করুণা মাগি'
নব জাগরণ কাহার লাগি'?]

নদী গেয়ে যায় মৃদু কলতান,
ভেসে আসে বায়ে বিহগের গান ;
অলস অবশ তনু মনঃ প্রাণ
উঠিল জাগি !
কাহার লাগি' !!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

গড়োয়ালে হিন্দুতীর্থ।

(২)

বাঃ (Bah)।

বাঃতে বাজার আছে ; বাঃ হরিদ্বার-বদ্রিনাথ-পথের এক চটী বা যাত্রী-নিবাস। বাঃ অলকানন্দার বামতীরে ; বিপরীত-তীরে তেহরী-গড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ। উভয়স্থানে গমনাগমনের জন্য নদীর উপর ঝোলাসেতু আছে ; সেতু ২৮০ ফুট্ বিস্তৃত। এই সেতু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের গোহনার জল-প্লাবনের পর পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিদ্দূরে অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। সঙ্গমের পর সম্মিলিত নদীদ্বয় গঙ্গানামে অভিহিত হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে আগত যাত্রীগণ সেতু পার হইয়া দেব-প্রয়াগে আগমনপূর্ব্বক তীর্থ-কর্ম্ম সম্পন্ন করে। এই স্থান উভয় নদীর সঙ্গমস্থল বিধায় "প্রয়াগ" নামে খ্যাত। যাত্রীগণ প্রয়াগে স্নান ও মন্দিরে রঘুনাথজীর দর্শনপূজন করিয়া থাকে, কিন্তু চিরন্তন প্রথানুসারে যাত্রীগণকে বাঃতে অবস্থিতি কবিতে হয়। দিবসে সেতু উত্তীর্ণ হইয়া গমন করে এবং সন্ধ্যাগমে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। অধিকাংশ পাণ্ডাই দেবপ্রয়াগ ও রণকোটে বাস করেন। তাঁহারা যাত্রীগণকে দেব-দর্শনার্থ দেবালয়ে লইয়া যান।

ব্যাসঘাট।

ব্যাসঘাট যাত্রীগণের বিশ্রাম-স্থান। ইহার কিয়দ্দূর নিম্নে গঙ্গা ও নায়ার (Nayar) নদীদ্বয়ের সঙ্গম-স্থল। পূর্ব্বকালে ব্যাসমুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। নায়ার-নদীর উপরিস্থিত ১৬০ ফুট্ বিস্তৃত ঝোলাসেতু উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়।

চামোলী।

চামোলী অলকানন্দার বাম-তীরে অবস্থিত। যাত্রীগণ এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এই চটীর ঠিক্ উপরেই ডেপুটি কালেক্টরের বাসস্থান ও আদালত। চটী হইতে অনেক নিম্নে পূর্ত্ত-বিভাগের এক বাঙ্গালা আছে। পূর্ব্বে বাজার অলকানন্দার দক্ষিণ তটে অবস্থিত ছিল, কিন্তু গোহনা-প্লাবনে সে বাজারের এক্ষণে চিহ্নমাত্রও নাই। নূতন বাজার নদীর বাম-তীরে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে এক চিকিৎসালয় ও এক পুলিশষ্টেশন আছে। যতদিন যাত্রীগণের সমাগম থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত (মে হইতে অক্টোবর অবধি) পুলিশ অবস্থিতি করে, তৎপরে অন্যত্র গমন করিয়া থাকে। যে সকল যাত্রী কেদারনাথ হইতে বদ্রীনাথ গমন করে, তাহাদিগকে এই স্থানের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয় এবং এই স্থান দিয়া প্রত্যাগমন করিতে হয়।

গৌরীকুণ্ড।

গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ-মন্দিরের ৪ ক্রোশ নিম্নে মন্দাকিনীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। যাত্রীগণ এই স্থানে বিশ্রাম করে। এই স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ ও জলাশয় আছে। যাত্রীগণ গৌরীকুণ্ডে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিয়া কেদার অভিমুখে অগ্রসর হয়। পথ অতিশয় সংকীর্ণ। গৌরী বা পার্ব্বতী এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, তদবধি জলাশয় "গৌরীকুণ্ড" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোপেশ্বর।

গোপেশ্বর চামোলীর নিকটস্থ একখানি গ্রাম। কেদারনাথ হইতে বদ্রীনাথ আসিতে হইলে এই গ্রামের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। গোপেশ্বর বালাসুতী নাম্নী স্রোতস্বতীর বাম তীরে অবস্থিত। বালাসুতী অলকানন্দার উপনদী। গোপেশ্বরে গোপেশ্বরের এক সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরে লৌহময় একটি ত্রিশূল আছে। ত্রিশূলে খোদিত অক্ষর-পঙ্‌ক্তি কাল-প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। রাওয়ল মন্দিরের অধ্যক্ষ। ইনি দাক্ষিণাত্যের জঙ্গম-গোঁস্বামি-বংশ-সম্ভূত। মাল্লানাগপুরের কয়েকখানি দেবত্র (গুন্থ) গ্রামের আয় হইতে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই মন্দির কেদারনাথের রাওয়লের অধীনস্থ ছিল, এক্ষণে এই মন্দিরের রাওয়ল স্বতন্ত্র।

গুপ্তকাশী।

মন্দাকিনীর দক্ষিণ তীর হইতে প্রায় ৮০০ ফুট উচ্চে গুপ্তকাশী অবস্থিত।

এখানে কতিপয় ধর্ম্মশালা ও একটি শিব-মন্দির আছে। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অগস্ত্য-মুনি ও ভিরী হইয়া কেদারনাথ যাইতে হইলে এই স্থান দিয়া যাইতে হয়। উখী-মঠে প্রত্যাগমন কালে যাত্রীগণ এই স্থানে বিশ্রাম করে। উখীমঠ নদীর অপর তীরে এবং ১৪০ ফুট্ বিস্তৃত ঝোলা-সেতু দ্বারা গুপ্তকাশীর সহিত সংলগ্ন। গুপ্তকাশী বিখ্যাত স্থান। দেবগণ মহাদেবের প্রীত্যর্থ গুপ্তভাবে এই স্থানে তপস্যা করেন, তদ্ধেতু এই স্থানের নাম গুপ্তকাশী হইয়াছে। (গুপ্ত=লুক্কায়িত; কাশী=জ্যোতি) মন্দিরের সম্মুখভাগে এক ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, উহা 'মণিকর্ণিকা-কুণ্ড' নামে অভিহিত।

জোশীমঠ বা জ্যোতির্ধাম।

জোশীমঠ, জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেবের ধাম। বদ্রিনাথ-মন্দিরের রাওয়ল ও অপরাপর কর্ম্মচারীগণ সমস্ত শীতকাল এই স্থানে বাস করেন। ধৌলী ও বিষ্ণু-গঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে জোশীমঠ ১৫০০ ফুট্ ও সমুদ্র-সমতল হইতে ৬১০৭ ফুট্ উচ্চে অবস্থিত। নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল ১৷৷০ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লোক-সংখ্যা ৪৫৫ জন, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লোক-সংখ্যা ৫৭২ জন এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে যখন বদ্রিনাথ-মন্দিরের কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন না তৎকালে জোশীমঠের লোক সংখ্যা ৪৬৮ জন ছিল। বদ্রি-নাথের রাওয়ল ও পুরোহিতগণের গৃহাবলী প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, সুদৃঢ় ও সুগঠিত। ইহাঁরা নবেম্বর মাস হইতে মে মাসের মধ্যভাগ অবধি এই স্থানে বাস করেন; কারণ ঐ সময়ে বদ্রিনাথ-মন্দির তুহিন-রাশি মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। জোশী-মঠের দেবালয় দর্শন করিলে সাধারণ বাস-গৃহ বলিয়া বোধ হয়। দেবালয়ের ছাদ ঢালু ও তামার পাতে মোড়া। সম্মুখে অঙ্গন ও অঙ্গনের চতুর্দিকে গৃহাবলী। অঙ্গনে একটি জলাধার। পিত্তল-নির্ম্মিত দুইটি নলের মধ্য দিয়া অনবরত জলাশয়ে বারিধারা নিপতিত হইতেছে। গ্রামের দক্ষিণস্থ পাহাড় হইতে নির্গত এক স্রোত-স্বতী হইতে এই জল আসিতেছে। পূর্ব্বে যাত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত গৃহসমূহে অব-স্থিতি করিত, এক্ষণে তাহারা ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করে। অধিকাংশ ধর্ম্মশালা প্রধান বর্ত্মের উপর নির্ম্মিত। কতকগুলি অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অঙ্গনের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রায় দশ ফুট্ উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণু-মন্দির ৩০ বর্গফুট্। অধিকাংশ মন্দিরের অবস্থা শোচনীয়; ভূমিকম্পে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য ও নবদেবীর মন্দিরগুলির ভূমিকম্পে কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। বিষ্ণুমূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ-প্রস্তরে গঠিত।

মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভাস্করকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। এইরূপ সুন্দর মূর্ত্তি সচরাচর নয়ন-গোচর হয় না। মূর্ত্তি সাতফুট উচ্চ এবং চারি স্ত্রী-মূর্ত্তি কর্ত্তৃক ধৃত। অপর মূর্ত্তি পিত্তল-নির্ম্মিত; গলদেশে যজ্ঞসূত্র দুই পার্শ্বে দুই পক্ষ সুতরাং গরুড়ের মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। গণেশের মূর্ত্তি দুই ফুট উচ্চ; এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণকার্য্য প্রশংসাযোগ্য। মন্দিরের পুরোহিত, ব্যবসায়ীগণ ও কৃষকগণ জোশীমঠের অধিবাসী। এখানে যাত্রীগণের জন্য ডিস্পেন্সরী আছে।

নরসিংহদেব সম্বন্ধে স্থানীয় প্রচলিত গল্প।

একদা এই প্রদেশীয় প্রাচীন রাজবংশের বাসুদেব নামক জনৈক রাজা, গভীর অরণ্যানী মধ্যে মৃগয়ার্থ গমন করেন। রাজার অনুপস্থিতি-কালে বিষ্ণু (নরসিংহদেব) মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রাজ-প্রাসাদে আগমন করিয়া রাণীর নিকটে খাদ্য-প্রার্থনা করেন। রাণী তদনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাজ-শয্যায় শয়ন করেন। ইত্যবসরে রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং এক-জন অপরিচিত ব্যক্তিকে তদীয় শয্যায় শয়িত দর্শন করেন। এই দৃশ্য দর্শন-মাত্রেই ক্রোধানলে নৃপতির আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কোষমুক্ত তীক্ষ্ণধার তরবারি দ্বারা তদ্দণ্ডেই ছদ্মবেশীকে সবলে আঘাত করিলেন। আঘাত বাহুতে পতিত হইল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আহত স্থান হইতে শোণিতস্রাবের পরিবর্ত্তে অনর্গল দুগ্ধধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। রাজা তদ্দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া পরামর্শের জন্য রাণীকে আহ্বান করিলেন। রাণী আগমনপূর্ব্বক অদ্ভুত কাণ্ড সন্দর্শন করিয়া কহিলেন "নিঃসন্দেহ ইনি দেবতা; কেন তুমি ইঁহাকে আঘাত করিলে?" রাজা তদনন্তর ছদ্মবেশী নরসিংহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কিরূপে এই পাপের দণ্ডবিধান হইবে?" নরসিংহ স্বমূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক উত্তর করিলেন "আমি নরসিংহ, আমি এতকাল তোমার উপর সন্তুষ্ট ছিলাম এবং সেই জন্য তোমার দরবারে আসিয়া ছিলাম; এক্ষণে তোমার অপরাধের যেরূপ দণ্ডবিধান করিব শ্রবণ কর:—

তুমি এই জোতির্ধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কাত্যুর গমন কর এবং তথায় তোমার রাজ্য স্থাপন কর। স্মরণ রাখিও যে; এই আঘাত তোমার প্রতিষ্ঠিত মন্দির মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তির অঙ্গে পরিদৃশ্যমান হইবে। যখন সেই মূর্ত্তি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, হস্ত এককালে রহিবে না, তৎকালে তোমার বংশও ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইয়া একেবারে ধরাধাম হইতে অদৃশ্য হইবে। যৎকালে এই হস্ত পতিত

হইবে, তৎকালে পর্ব্বত ভগ্ন হইবে, বদ্রিনাথ-গমনার্থ পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তপোবনে (ধবলা নদীর খাতে বা আদিবদ্রীতে) নববদ্রীর আবির্ভাব হইবে।"

কালীমঠ।

কালীমঠ পবিত্র স্থান; কালী-নদীর বাম তীরে অবস্থিত। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে কালীনদীর ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। এখানে দুর্গাদেবীর মন্দির আছে এবং দেবীর সম্মুখে ছাগ-মহিষাদি বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসীগণ তাহাদিগের প্রথমজাত কন্যাগণকে দেবীকে উপহার প্রদান করিয়া থাকে। এই কন্যারা দেবীর 'রাণী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মন্দিরস্থ পুরোহিতগণের উপপত্নীরূপে কালযাপন করে। *

করণ-প্রয়াগ (কর্ণ-প্রয়াগ)।

করণ-প্রয়াগ এই দেশস্থ পঞ্চ অলকানন্দা-সঙ্গমের অন্যতম। এই স্থানে অলকনন্দার সহিত পিণ্ডার নদী সম্মিলিত হইয়াছে। করণ-প্রয়াগ অলকানন্দার বামতীরে অবস্থিত এবং যাত্রীগণের বিশ্রামস্থান। বাজার পিণ্ডারের বাম-তটে স্থাপিত। অপর কুল হইতে যাত্রী-নিবাস ও বাজারে আসিতে হইলে ২২১ ফুট্ বিস্তৃত ঝোলা-সেতু উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে হয়। আধুনিক বাজার পুরাতন বাজার অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের গোহনা-জল-প্লাবনে পুরাতন বাজারের চিহ্ন মাত্রও নাই। এখানে পুলীশ-ষ্টেসন ও যাত্রীগণের জন্য হাসপাতাল আছে। প্রবাদ—রাজা কর্ণ এই স্থানে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া বাঞ্ছিত ধন-রত্নাদি লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থান সাগরসমতল হইতে ২৩০০ ফুট্ উচ্চ।

কেদারনাথ।

কেদারনাথ-মন্দির সমুদ্র-সমতল হইতে ১১,৭৫৩ ফুট্ উচ্চ এবং "মহাপন্থা" নামক গিরিশৃঙ্গের নিম্নস্থ তুহিনাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে বহির্গত এক পাহাড়ের উপর স্থাপিত। মন্দির কারুকার্য্যসমন্বিত ও সুদৃশ্য এবং মন্দাকিনী-খাত-মধ্যস্থ। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগস্থ শুভ্র ধুসর-বর্ণ প্রস্তরে গঠিত ও তদুপরি উচ্চচূড়া-সুশোভিত। সম্মুখস্থ শ্রেণীবদ্ধ গৃহাবলী পাণ্ডাগণের অধিকৃত; এই সকল গৃহে যাত্রীগণ আসিয়া অবস্থান করে। পূজকগণ গৃহ-শ্রেণীর দক্ষিণ-দিকে বাস করেন। সদাশিব পাণ্ডব-শিবির হইতে পলায়ন করিয়া মহিষরূপে

---

* District Gazetteer of U P & Oudh vol. XXVI P 170

এই স্থানে লুক্কায়িত হন, এবং পাণ্ডবগণকে আপনার পশ্চাদ্ধাবমান দর্শন করিয়া অনন্যোপায় হইয়া এই স্থানেই ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ পরিদৃশ্যমান থাকে। এই স্থানে সেই পশ্চাদ্ভাগেরই অর্চ্চনা হইয়া থাকে। মহিষরূপ মহাদেবের অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল হিমালয়-প্রদেশের চারি বিভিন্ন স্থানে প্রপূজিত হয়। বাহু তুঙ্গনাথে, মুখ রুদ্রনাথে, উদর (নাভি) মধ্য-মহেশ্বরে এবং কেশ বা জটা ও মুণ্ড কল্পেশ্বরে বিদ্যমান আছে; সুতরাং "পঞ্চ কেদার" বলিতে হইবে। যে পূজকগণ কেদার, গুপ্তকাশী, উখীমঠ ও মধ্য-মহেশ্বরে পূজার্চ্চনাদি করেন, তাঁহারা উখীমঠের অধীনস্থ। কেদারনাথের রাওয়ল সকলের প্রভু। পূজকগণ বীরসেব-সম্প্রদায়ের জঙ্গম গোঁসাই। অন্যান্য মন্দিরের অর্থাৎ তুঙ্গনাথ, ত্রিযুগী ও কালীমঠের পুরোহিতগণ পাহাড়ী ও রাওয়লের অধীনস্থ। কেদারনাথে আসিবার দুই পথ। এক; কর্ণ-প্রয়াগ, চামোলী ও তুঙ্গনাথ হইয়া, অপর হরিদ্বার হইতে শ্রীনগর ও রুদ্র-প্রয়াগ হইয়া মন্দাকিনীর খাতের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। এই উভয় বর্ত্মই গুপ্তকাশী হইতে এক ক্রোশ উচ্চে নল নামক গ্রামে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উখীমঠ ও গুপ্তকাশী (উভয় স্থান মন্দাকিনীর উভয় তটে এবং পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী) অতিক্রম করিয়া ফাটা ও গৌরীকুণ্ড নামক দুই চটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌরীকুণ্ড হইতে কেদারনাথ একাদশ মাইল, কিন্তু পথ অতি দুর্গম। কখন উচ্চে আরোহণ কখনও বা নিম্নে অবতরণ করিতে হয় এবং চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যও নয়নানন্দদায়ক নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণ দুরতিক্রম্য ও দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ তীর্থ-ত্রয় দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। হরিদ্বারের মেলা শেষ হইলে যাত্রিগণ পাহাড়ে আগমন করিতে আরম্ভ করে। ১লা বৈশাখ যাত্রিগণ হরিদ্বারে সমবেত হয়। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভ ও প্রত্যেক ষষ্ঠ বৎসরে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা হইয়া থাকে। কুম্ভে গঙ্গাদেবী প্রথমে ভূতলে অবতরণ করেন। ভারতের অপরাপর স্থানের অধিবাসীগণ ব্যতীত অধুনা রাজপুতানা ও পঞ্জাব হইতেও বহুলোক হরিদ্বারে আগমন করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী কেদার ও বদ্রীতে গমন করিয়া থাকে। আবার গোঁড়া শৈবগণ কেবল "কেদার" ও গোঁড়া বৈষ্ণবগণ কেবল মাত্র "বদরী" দর্শন করে, কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই উভয় স্থান দর্শন করিয়া থাকে। কেদারনাথ-মন্দিরস্থ শৈব সন্ন্যাসীগণ "জঙ্গম"

নামে খ্যাত ; মোহান্ত "রাওয়ল" নামে পরিচিত। সমস্ত লোকই মালাবার-উপকূল-বাসী। কেদারনাথ হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী মহাপন্থ নামক গিরি-শৃঙ্গ-'ভৈরব-ঝাপ' নামে খ্যাত। পূর্ব্বে যাত্রীগণ স্বর্গ-প্রাপ্তির আশায় এই স্থান হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক জীব-লীলা শেষ করিত। এক্ষণে ইংরাজ-শাসনকালে এই দুঃসাহসিক কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। যাহারা এইরূপে মানবলীলা সম্বরণ করিত, তাহারা আপনাদিগের নাম-ধামাদি নিকটবর্ত্তী মন্দির-গাত্রে খোদিত করিয়া রাখিত।

গড়োয়াল-জেলার ৬০ খানি দেবত্র (গুন্ত) গ্রামের বার্ষিক আয় ১০৩১০৲, আলমোড়া ও নৈনিতাল—জেলাদ্বয়ের ৪৫ খানি গ্রামের বার্ষিক আয় ৮০৮৲ এবং তেহরী গড়োয়ালের কয়েকখানি গ্রামের বার্ষিক আয় ২৫০৲ ; এতদ্ব্যতীত যাত্রীগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বার্ষিক আয় ৯০০০৲ সর্ব্বসাকল্যে বার্ষিক ৪০,০০০৲ টাকা আয়।

রাওয়ল স্বয়ং কেদারনাথ-মন্দিরে অবস্থিতি করেন না। তাঁহার চেলাগণ দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। অপরাপর মন্দিরের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ চেলাগণ নিযুক্ত আছে। রাওয়ল উখীমঠে বাস করেন। মন্দিরের কার্য্য এবং আয় ও ব্যয়ের পরিদর্শনার্থ এক সমিতি আছে। রাওয়ল সমিতির কর্ত্তা। মন্দিরের কর্ম্মচারী ও গুন্থ (দেবত্র) গ্রাম-সমূহের প্রধানগণ সমিতির সভ্য। সভ্যগণ কর্ত্তৃক রাওয়ল নির্ব্বাচিত হন। কেদারনাথ-মন্দির মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে ; শীতকালে বন্ধ হয় ; এবং কর্ম্মচারীবর্গ উখীমঠে আসিয়া অবস্থিতি করে।

মধ্য-মহেশ্বরের মন্দির গুপ্তকাশীর ৯ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে চৌখাম্বা-নামক গিরি-শৃঙ্গ-চতুষ্টয়ের পাদদেশে অবস্থিত। শৃঙ্গচতুষ্টয় ২২০০০ (বাইশ হাজার) হইতে ২৩০০০ (তেইশ হাজার) ফুট্ অবধি উচ্চ। এই স্থান পঞ্চ-কেদারের অন্যতম এবং কেদারনাথের রাওয়লের অধীনস্থ। শীতকালে শিবালয় বন্ধ হইলে রজতময় শিবমূর্ত্তি উখীমঠে আনীত হন কিন্তু পাষাণময় শিবলিঙ্গ চিরদিনই তথায় থাকেন। উখীমঠের রাজপুতগণ আপনাদিগের প্রথমজাত কন্যাসন্তানকে মধ্য-মহেশ্বরকে উপহার প্রদান করে এবং কন্যাগণ কালক্রমে পুরোহিতগণের উপপত্নীরূপে অবস্থিতি করে। এই কন্যাগণ মধ্য-মহেশ্বরের "রাণী" বলিয়া অভিহিত হয়।

কেশর-প্রয়াগ।

কেশর-প্রয়াগ অলকানন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল। এই স্থানে বিষ্ণু-মন্দির

আছে। মণিভদ্র এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার সেনাগণ পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন :—

"কেশর-প্রয়াগ-শ্রুতম্ ক্ষেত্রনাম পরম্ মতম্
মহাবিষ্ণুশ্চ তত্রৈব মণিভদ্রাশ্রমস্তথা
পুরা যত্র বরতনো ভীমসেনোঽ জয়দ্ রিপূন্
গন্ধর্ব্বাখ্যান্ মহাভাগো মণিভদ্র-পুরঃসরান্।"

নন্দা-দেবী।

নন্দা-দেবী ব্রিটীশ রাজ্য মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত এবং ২৫,৬৬০ ফুট্ উচ্চ। তুনগিরি (২৩,১৮৪ ফুট্) ত্রিশূল (২৩,৪০০ ফুট্) ও নন্দকোট (২৩,৫৩৩ ফুট্) এই তিন শৃঙ্গ। নন্দাদেবী হিমালয়ের অন্যান্য শৃঙ্গসমূহের ন্যায় বরফাবৃত নহে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, নন্দাদেবী এরূপ ঋজুভাবে দণ্ডায়মান যে, তাহার গাত্রে বরফ জমিবার সম্ভাবনা নাই। উন্নত চূড়ার প্রায় এক মাইল নিম্নে দ্বাদশ বৎসর অন্তর এক মেলা হইয়া থাকে, কিন্তু স্থান এত দুর্গম যে, পঞ্চাশ জন যাত্রীও তথায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, চূড়া—স্থানীয় দেবতার রন্ধনশালা। ইহার কারণ এই যে, বায়ু-বেগ-প্রভাবে তথা হইতে ধুমাকার তুহিন-মেঘ সতত উত্থিত হয়। এখানে গলিত বরফ-স্রোতের উপর প্রাতঃকালীন রবিকর নিপতিত হইয়া রামধনুর সৃষ্টি করে; এই দৃশ্য দর্শন করিলে অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হয়।

কমিসনর শ্রীযুক্ত ট্রেল (Trail) প্রথম নন্দাদেবীর তত্ত্বানুসন্ধান করেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একটী পথ আবিষ্কার করিতে পারিলে তিব্বতের সহিত ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইতে পারে। তিনি কেবল আলমোড়া-জেলাভি-মুখীন পূর্ব্বদিকস্থ ক্রমনিম্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তৎপরে ১৮৮৩ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অপর ইংরাজগণ নন্দাদেবী দর্শন করেন। কেহই শিখর-দেশে যাইতে আজি পর্য্যন্ত সক্ষম হন নাই।

নন্দপ্রয়াগ।

নন্দপ্রয়াগ অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। এই স্থানে যাত্রীগণ বিশ্রাম করে। এই স্থানে বাজার আছে। নন্দপ্রয়াগ হইতে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত একটি বর্ত্ম, মন্দাকিনীর উপর ১২০ ফুট্ বিস্তৃত একটি ঝোলা-সেতুর উপর গিয়াছে।

পাণ্ডুকেশ্বর।

পাণ্ডুকেশ্বর গ্রাম, জোশীমঠের ৯ মাইল উত্তরে। এই স্থানে যোগবদ্রীর মন্দির আছে। যোগবদ্রী পঞ্চ বদ্রীর অন্যতম। পাণ্ডবগণ পরীক্ষিৎকে রাজ্য প্রদান করিয়া সংসারের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থে এই স্থানে আগমন করেন।

রুদ্রপ্রয়াগ।

রুদ্রপ্রয়াগ পঞ্চসঙ্গমস্থলের (প্রয়াগের) অন্যতম। পঞ্চ প্রয়াগ যথা—বিষ্ণুপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ। অলকানন্দার সহিত যথায় মন্দাকিনী সম্মিলিত হইয়াছে তথায় এক বাজার ও রুদ্রনাথের মন্দির আছে। যাত্রীগণ এই স্থানে স্নাত হইয়া রুদ্রদেবের অর্চ্চনা করিয়া কেদারনাথ গমন করে। কথিত আছে যে, দেবর্ষি নারদ এই স্থানে রুদ্রনাথের আরাধনা করিয়াছিলেন।

সৎপন্থ।

সৎপন্থ একটি হ্রদ—বদ্রিনাথের ৯ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। হ্রদ ত্রিকোণাকার; প্রত্যেক কোণের নামও স্বতন্ত্র; যথা; ব্রহ্মঘাট, বিষ্ণুঘাট ও মহেশ্বরঘাট। দুইটি অপ্রশস্ত জলস্রোত ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরঘাটে পতিত হইতেছে। হ্রদের পরিধি প্রায় $\frac{3}{8}$ মাইল; ইহার যে কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বরফরাশি দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থান দর্শন করিতে যাইতে হইলে যাত্রীগণ বদ্রীনাথ হইতে আপনাদিগের সহিত জ্বালানি কাঠ ও পক্ক খাদ্য লইয়া যায়। এই স্থানে আসিতে দুই দিবস অতিবাহিত হয়। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই স্থান-দর্শনের উপযুক্ত সময়। অবস্থিতির স্থান কেবলমাত্র গুহা। সৎপন্থে যাইতে পথিমধ্যে এক জলপ্রপাত দৃষ্টিগোচর হয়, ইহার নাম "বসুধারা"; এইখানে যাত্রীগণ স্নান করে। প্রবাদ, যদি কোন জারজ ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করিতে আগমন করে, তাহাহইলে এক বা দুই মিনিটের জন্য প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয় ও জলধারা বন্ধ হইয়া যায়।

শ্রীনগর।

শ্রীনগর গড়োয়াল জেলার সদর ষ্টেসন। সমুদ্র হইতে ১৭০৬ ফুট উচ্চে অলকানন্দার বামতীরে অবস্থিত। হরিদ্বার হইতে বদরী ও কেদার যাইতে হইলে শ্রীনগর হইয়া যাইতে হয়। শ্রীনগর একদা গড়োয়ালের রাজধানী ছিল; বর্ত্তমান কালে রাজ-প্রাসাদের চিহ্ন মাত্রও নাই; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের গোহনা-প্লাবনে উহা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। নূতন নগর প্রাচীন নগরের প্রায় পাঁচ

ফর্লং উত্তর-পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে। নগরের পথ সমূহ সুবিস্তৃত ও শ্রেণী-পাদপ-সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত। অধিকাংশ গৃহই দ্বিতল, প্রস্তর-নির্ম্মিত ও ছাদ শ্লেট-প্রস্তর-যুক্ত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার তালিকানুসারে অধিবাসীর সংখ্যা ২,৯০১; অধিবাসীগণ ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জৈন, আগরোয়াল বেণিয়া, সোণার (স্বর্ণকার) ও অল্পসংখ্যক মুসলমান। ব্যবসায়ীগণ নাজিবাবাদ হইতে কাপড়, গুড় ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী করিয়া থাকে। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ হাসপাতাল। সদাব্রত-ফণ্ড হইতে ১৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে এই হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পুলীশ-ষ্টেসন, সম্মিলিত ডাক ও টেলি-গ্রাফআফিস ও ছাত্র-নিবাস সহ হাইস্কুল আছে। গোহনাপ্লাবনে প্রাচীন নগরের ধ্বংশ হইলে অনেক অধিবাসী তেহরী-গড়োয়ালে যাইয়া বাস করে। অধিকাংশ মন্দির প্লাবনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেবল কতিপয় মন্দির কালের করাল কর হইতে রক্ষা লাভ করিয়াছে। নগরের অর্দ্ধ মাইল নিম্নে কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। গুন্থ (দেবত্র) ভূমির উপস্বত্ব হইতে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। বন্ধ্যারমণীগণ বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীতে, পুত্রবতী হইবার আশায়, এই স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া থাকে। তাহারা হস্তে জ্বলন্ত ঘৃতের দীপ লইয়া সারা রাত্রি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনাহারে ও অনিদ্রায় দণ্ডায়মান থাকে। শুনা যায়, যাহার দীপ প্রভাত পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত না হয়, তাহার আশাই ফলবতী হইয়া থাকে।

তপোবন।

তপোবন (ধক্তোপবন) গ্রাম, ধবলী-নদীর বাম তীরে অবস্থিত এবং জোশী-মঠ হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী। গ্রামের সন্নিকটে কতকগুলি উষ্ণ-প্রস্রবণ ও একটি মন্দির আছে। ধবলীর ২ ক্রোশ উচ্চে সুবেন-নামক গ্রাম; তথায় ভবিষ্যবদ্রীর মন্দির বর্ত্তমান। ভবিষ্য বদ্রী, পঞ্চ বদ্রীর অন্যতম। তপোবনের পর সুরেথোটা যাত্রীগণের বিশ্রামস্থান; এই স্থান তপোবন হইতে ৪ ক্রোশ হইবে।

ত্রিযুগীনারায়ণ।

ত্রিযুগীনারায়ণ গৌরীকুণ্ড হইতে ৪ মাইল ও কেদারনাথ হইতে ১১ মাইল। এখানে দেবালয় আছে। কেদারনাথ-গমন-কালে যাত্রীগণ এই স্থান দর্শন করে। তেহরী গড়োয়াল হইতে পানোয়ালী পাহাড়ের মধ্য দিয়া এই স্থানে আসিবার পথ অতিশয় দুর্গম। এই স্থানে সত্য-যুগে শিবের সহিত হিমাচল-নন্দিনী পার্ব্বতীর বিবাহ হয়; বিবাহকালে যে পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, অদ্যাবধি

সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই; সমভাবে গত তিন যুগ জ্বলিতেছে। এই হেতু এই অগ্নির নাম "ত্রিযুগীনারায়ণ।" অগ্নির নাম হইতে গ্রামেরও নামকরণ হইয়াছে। যাত্রীগণ এই অগ্নি হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া ললাট-দেশে লেপন করিয়া থাকে। এখানে চারিটি পবিত্র জলাশয় আছে, যাত্রীগণ তথায় স্নান ও পিতৃকার্য্য করে। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে বিষ-হীন সর্প সমূহ গমনাগমন করিতেছে দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাদিগের স্পর্শ, যাত্রীগণের পক্ষে শুভ জনক বলিয়া কথিত হয়।

ত্রিশূল।

ত্রিশূল নন্দাদেবী-পর্ব্বতের কয়েকটি শৃঙ্গের মধ্যে অন্যতম। নন্দাদেবী ২৫,৬৬০ দুনগিরি ২৩,১৮৪, নন্দকোট ২২,৫৩৩ ও চাঙ্গাব্যঙ্গি ২২,৫১৬ ফুট্ উচ্চ। এই সম্মিলিত গিরিরাজির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ত্রিশূল। ত্রিশূল, দক্ষিণে পিণ্ডার-নদী ও পশ্চিমে অলকানন্দা পর্য্যন্ত ক্রমনিম্ন হইয়া আসিয়াছে। ত্রিশূল শিবের অস্ত্র। ত্রিশূলের তিন চূড়া উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শিখর উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তে এবং ২৩,৪০৬ ফুট্ উচ্চ; দ্বিতীয় চূড়া ২২,৪৯০ ও তৃতীয় চূড়া ২২,৩৬০ ফুট্ উচ্চ।

উখীমঠ।

উখীমঠ-গ্রামে একটি মন্দির আছে। এই স্থানে কেদারনাথের রাওয়ল, আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ সহ বাস করেন। যাত্রীগণ কেদারনাথ হইতে প্রত্যাগমন-কালীন ও বদ্রীনাথ-গমনের পূর্ব্বে এই স্থান দর্শন করে। এই গ্রামে মন্দাকিনীর বাম তীরে অপর পারে অবস্থিত গুপ্তকাশী। মন্দিরের মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। এতদ্ব্যতীত শিব, পার্ব্বতী, মান্ধাতা, অনিরুদ্ধ ও উখার (বাণ-দুহিতা ঊষার) ধাতুময় মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে ঊষা তপস্যা করিয়াছিলেন; তদীয় নামানুসারে এই স্থানের নাম উখা (ঊষা) বা উখী হইয়াছে। (বলা বাহুল্য যে, উত্তর-পশ্চিমবাসীগণ 'ষ' কে 'খ' উচ্চারণ করিয়া থাকে, যেমন ভূষণ=ভূখন; বিভীষণ=বিভীখন, বিষ=বিখ, পুরুষ=পুরুখ ইত্যাদি।) এই স্থানে নব-দুর্গার এক মূর্ত্তি আছে। সদাব্রত, চিকিৎসালয় ও পুলীশ ফাঁড়ী—যতদিন যাত্রীগণের সমাগম থাকে তাবৎকাল খোলা থাকে।

বিষ্ণু-প্রয়াগ।

বিষ্ণু-প্রয়াগ যাত্রীগণের বিশ্রামস্থান; ইহা হরিদ্বার হইতে বদরী যাইবার পথে অলকানন্দা-তটে অবস্থিত। যাত্রীনিবাস হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অলকানন্দার নাম "বিষ্ণুগঙ্গা।" মন্দিরের নিম্নে বিষ্ণুকুণ্ড। মন্দির অলকানন্দা ও

ধবলী-নদীদ্বয়ের মধ্যে পর্ব্বতের যে অংশ বহির্গত হইয়া আসিয়াছে তদুপরি নির্ম্মিত এবং জোশীমঠ হইতে ১॥০ মাইল দূরবর্ত্তী। বিষ্ণু-প্রয়াগ, পঞ্চ সঙ্গম-স্থলের অন্যতম এবং যাত্রী-নিবাস। সঙ্গমস্থলে পর্ব্বত-গাত্র খোদিয়া যাত্রীগণের বিষ্ণু-কুণ্ডে স্নানার্থ সোপানাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীর গভীরতা ও স্রোতের প্রবলতা অত্যধিক বিধায় যাত্রীগণ লৌহ-শৃঙ্খল বা লৌহবলয় ধারণ-পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া থাকে; নতুবা প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এতাদৃশ সতর্কতা অনুষ্ঠিত হইলেও প্রতিবৎসর অনেক যাত্রী অকালে কাল-কবলে কবলিত হয়। বদরীনাথ যাইবার পথে লোহার ঝোলা-সেতু উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। এই সেতু ১৪৫ ফুট্ বিস্তৃত।

অলকানন্দা।

অলকানন্দা বদরীনাথের উত্তর হইতে নির্গত হইয়া মানা-নামক গ্রামের নিম্নে সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কুবেরের অলকাপুরী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া "অলকানন্দা" নামে খ্যাত হইয়াছে। কেদারখণ্ডে লিখিত আছে যে, অলকানন্দা ও ধবলী-নদীর সঙ্গমস্থলে বিষ্ণু-প্রয়াগ। অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল দেব-প্রয়াগ। নন্দ-প্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মন্দাকিনী সংযুক্ত হইয়াছে। কর্ণপ্রয়াগে (বিষ্ণু-প্রয়াগ হইতে ৪৫ মাইল) পিণ্ডার নদী অলকানন্দায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রুদ্র-প্রয়াগে মন্দাকিনী অলকানন্দার সহিত যুক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু-প্রয়াগে অলকানন্দাধারার কিয়দংশ বিষ্ণুগঙ্গা নামে অভিহিত। অলকানন্দা মৎস্য-বহুল। কোন কোন মৎস্য ৪।৫ ফুট্ হইবে। "মহাশের" নামক মৎস্য পরিমাণে এক মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অলকানন্দার বালুকাময় সৈকতে অল্লাধিক পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লছমনঝোলা হইতে বদরীনাথ যাইতে হইলে যাত্রীগণ অলকানন্দার বাম তীর দিয়া বাঃ হইয়া চামোলী উপনীত হয়।

আদি-বদ্রী।

আদি-বদ্রী যাত্রীগণের বিশ্রাম স্থান, ইহা কর্ণ-প্রয়াগ হইতে ১১$\frac{৩}{৪}$ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ধর্ম্মশালা আছে। ৪২ ফুট্ বিস্তৃত ও ৮৫ ফুট্ দীর্ঘ স্থানের মধ্যে ষোড়শ দেবায়তনের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। সকল মন্দিরের উচ্চতা সমান নহে; উচ্চতা ৬ ফুট্ হইতে ২০ ফুট্ পর্য্যন্ত। প্রধান মন্দির, উচ্চ চবুতারার উপর নির্ম্মিত, মন্দিরের মধ্যস্থলে দেব-মূর্ত্তি। থাপলিয়াল ব্রাহ্মণগণ নিকটস্থ থাপলি-নামক গ্রামের অধিবাসী এবং বিগ্রহসমূহের পূজক। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক মন্দির গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে ডাকঘর আছে।

শ্রীআশুতোষ তরফদার।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কপোতাক্ষী-তট-দেশে তুলেছিলে তান—
পল্লী-প্রিয় স্বভাবের শিশু সুকোমল,
প্রকৃতির প্রিয়সখা আবেশ-বিহ্বল
মোহিলে কাকলি-রবে উরোপের প্রাণ!
কৃষ্ণকুমারীর দুঃখে নীরব রোদন;
ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা-তপ্ত অশ্রুধারে,
বাজাইলে বঙ্গবাসী-হৃদয়ের তারে,—
প্রমীলার অরুন্তুদ বিতথ বেদন!
পদ্মাবতী-শর্ম্মিষ্ঠার যুগলমালায়
বাণীর আসন-তল সাজাইলে সুধী,
রত্নময়ী চতুর্দ্দশ-লহরী গলায়
পরাইলে, দেখি গৌড় মুগ্ধ নিরবধি।
আঁকা আছে বাঙ্গালির অন্তরে ও ছবি
বাঙ্গালার মিল্‌টন্ ভারতের কবি!

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ভগবান্ ও তাঁহার নাম।

বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্ব যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন কিন্তু দৃশ্যতঃ ভিন্ন, ভগবান্ ও তাঁহার নাম তদ্রূপই পরমার্থতঃ অভিন্ন, ব্যবহারতঃ ভিন্ন। বস্তু—শ্রীভগবান্, নাম তাঁহার প্রতিবিম্ব। বস্তুর আকার যেরূপ, প্রতিবিম্ব তদ্রূপই হইয়া থাকে। ভগবান্ যেমন, নামও তেমনই।

নাম তাঁহার সহিত নিত্যসংযুক্ত—তাহা হইলে নাম সত্য। আবার নাম উপাধি—তাহা হইলে নাম ঐচ্ছিক। বেদান্তের নির্গুণ নিরাকার অনাম অরূপ ব্রহ্মের উপসনার্থ ও ধ্যানার্থ আলম্বন-স্বরূপ নাম-রূপের গ্রহণ আবশ্যক। নাম-রূপের মধ্য দিয়া না যাইলে সেই অচিন্ত্য অগ্রাহ্য অনাম অরূপের ধারণা হইবে কিরূপে?

অন্যদিকে সগুণ সাকার সৌন্দর্য্যময় শ্রীভগবানের নাম-রূপ তাঁহার বিভূতি মাত্র। নাম-রূপ বহির্বিকাশ বলিয়া জগদ্বাসীর সহজেই প্রত্যক্ষে আইসে। ডাকার মত ডাকিতে জানিলে সে ডাক কখন নিষ্ফলে যায় না। আর ডাকিতে হইলে 'নাম' ধরিতেই হইবে; অন্ততঃ মনে একটি আকার—একটি নাম প্রতিভাসিত হইবেই হইবে। ভক্তের হৃদয়ে যে নামের বীজ রোপিত হইবে, যতগুলি মহৈশ্বর্য্যময় নামের ফোয়ারা ছুটিবে, সেই নাম বা ততগুলি নামই তাঁহার।

নাম তাঁহারই নাম। মর্ত্ত্যবাসী আমাদের নিকট তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার নামই বড়; মাধুর্য্যে নামই শ্রেষ্ঠ। বস্তুকে যেখানে আমরা দেখিতে ছুঁইতে পাই না, মহিমার শিখরের লাগালই পাই না, সেখানে প্রতিবিম্বই অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তব—বাস্তব বলিয়াই আমাদের নিকট তত নবীন তত মধুর ঠেকে না, কিন্তু সেই বাস্তবই যখন কবিকল্পনায় চিত্রিত হয়, তখন তাহা অধিক বৈচিত্র্যময় অধিক নবীনতাময় অধিক মধুর বলিয়াই বোধ হয়। বাস্তব গিরি নদী বন গহ্বরই চিত্রে অঙ্কিত হইলে তাহার মাধুর্য্য অধিক উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহার কারণ, গিরি নদী বন গহ্বরাদি বাস্তব পদার্থের অসৌন্দর্য্য অংশ, অপর-দিকের রুক্ষতা ভীষণতা, কবির কাব্যে চিত্রকরের চিত্রে দৃষ্ট হয় না। অন্ততঃ সহৃদয় ও সূক্ষ্মদর্শী তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দিক্ই দেখেন, উপলব্ধি করেন। নাম প্রতিবিম্ব। সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করিতে হইলে প্রতিবিম্ব-লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিতে হয়। নামরূপ নদীর মধ্য দিয়া শ্রীভগবান্ সাগরে যাইতে হয়।

মধুর দ্রব্যের নাম, সেই দ্রব্যের আনুসঙ্গিক ও অধ্যস্ত অসৌন্দর্য্য ও অমাধুর্য্য লোপ করিয়া চিত্তে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যই ফুটাইয়া তুলে। যেমন পদ্মের নাম করিলেই তার সুন্দর মনোহর বর্ণ, সুন্দর সুগঠিত গঠন, মিষ্ট মধুর গন্ধ এবং আরও কিছু অব্যক্ত ভাব মনে আসে; কিন্তু তার মৃণালে যে কণ্টক আছে, বৃন্তে যে কার্কশ্য আছে, তুলিতে গেলে যে সর্প-ভয় দংশনের সম্ভাবনা আছে, তাহা মনে পড়ে না। হাতের উপর অবস্থিত পদ্মের কণ্টকময় মৃণাল, কর্কশ-বৃন্ত, বৃন্তচ্যুততা-হেতু অস্ফুৎফুল্লভাব, চিত্তের সম্পূর্ণ প্রফুল্লতা দিতে পারে না। আম্র-ও তাহার নামের মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান্। আম্রের নামে মনে পড়ে তার মিষ্ট আস্বাদ মধুর গন্ধ। কিন্তু সেই আম্র সম্মুখে পাইলে সঙ্গে ২ আবার মিষ্টতা আছে কিনা, কীট বাস করিয়াছে কিনা এই সন্দেহও জাগে। ছাল পুরু আঁটী বড়, আস্বাদ পান্‌শে—এই সব মনে পড়ায় ষোল আনা সুখ জন্মে না। কিন্তু আম্র-নামে সে ভয় নাই।

এই যে দুর্গোৎসব হইয়া গেল; ইঁহার নাম মনে পড়িবামাত্র অভিনব ভাবের উদ্রেক হয়। বাটীতে মা আসিবেন, চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া থাকিবেন, দশভুজা মা দাঁড়াইয়া সন্তানকে অভয় দিবেন—এ স্মৃতি কত সুখের! বাটীতে দুর্গোৎসব-সময়ে তত সুখের অনুভূতি জাগে না। দূর হইতে প্রিয়জনের নাম মনে পড়িলে চিত্তে তাহার গুণগুলিই ভাসে, সুন্দর মূর্ত্তিটি চক্ষুর উপর নৃত্য করে, সরল মধুর ব্যবহারই মনে পড়ে। কোন দোষ, কোন অসদ্ব্যবহার, প্রীতির অভাব, একত্রাবস্থানে অরুচি মনে পড়ে না।

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবানের নামের মধ্যে নামই বড়, নামই মধুর। প্রকৃত বস্তু শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নামে ভেদাভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, প্রথমে পৃথক্ ভাবিয়াই চলিতে হইবে। আর এই ভেদজ্ঞানই উপাসনা-কালে আবশ্যক। অবশ্য তাঁহারই নাম—এ জন্য একটি অভেদভাবও জাগরূক থাকিবে।

শ্রীভগবান্ অপেক্ষা তাঁহার নাম মহিমায় বড়। নামে কেবল তাঁহার মাধুর্য্যটুকু, সার সৌন্দর্য্যটুকুই আছে, কিন্তু শ্রীভগবানে সমস্তই আছে। শ্রীভগবান্ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা। শান্তরূপ ও বিশ্বরূপ একাধারে তিনি। ধার্ম্মিকের পক্ষে অমৃত হ্রদ, নাস্তিকের নিকট ভয়ানক অরণ্যানী। ভক্তের পিতা, পাপীর শাস্তা, "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" এই দ্বিবিধ কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট। কাজেই শ্রীভগবানে শান্ত ও ভীষণ ভাব, প্রসন্ন ও উৎকট গুণ, মানুষরূপ ও বিশ্ব-বিভূতি বিদ্যমান বলিয়া সকলের কাছেই তিনি মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্যময় দয়াময়রূপে প্রতীত হন না। প্রেম ভক্তি ভয় বিস্ময় একাধারে তাঁহাতে বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের পরমভক্ত পরমপ্রিয় অর্জ্জুনও বিশ্বরূপ দর্শনমাত্র ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, মনকে স্থির রাখিতে পারেন নাই। অন্যে পরে কথা। কিন্তু নাম-গ্রহণে ভয় ও বিস্ময়ের সম্ভাবনা নাই, মনস্থৈর্য্য নষ্ট হইবার কারণ নাই।

নাম-মূল্যে শ্রীভগবান্‌কে ক্রয় করা যায়—এ কারণ নাম প্রধান। টাকা দ্বারা অভিপ্রেত অনেক দ্রব্য ক্রয় করিতে পারা যায় বলিয়া সাধারণতঃ ক্রেতব্য দ্রব্য অপেক্ষা টাকাই আমাদের নিকট বড়। এই নাম-মূল্য কাছে থাকিলে যখনই ইচ্ছা তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারা যাইবে, তাই নামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীভাগবতে এই নাম-মাহাত্ম্য অতি সুন্দররূপে বুঝান হইয়াছে।

সত্যভামা কৃষ্ণের আদরিণী অভিমানিনী প্রেমময়ী পত্নী। কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন বটে কিন্তু রমণীর আমিত্ব, প্রণয়িনীর আমিত্ব, যুবতীর আমিত্ব

সংসারের অহমিকা কৃষ্ণের পায়ে ঢালিয়া দিতে পারেন নাই। সম্পূর্ণ ভেদ-জ্ঞানেই তিনি কৃষ্ণের উপাসিকা ও সেবিকা। সেই সত্যভামা দেবর্ষি নারদকে আপনার স্বামী দান করিয়াছেন, ষোল আনা স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি স্বামী দান করিয়াছেন। সত্যভামা—ভগবৎ প্রেমের নিকৃষ্ট চিত্রই সত্যভামা। অন্তরে ফল্গুর মত প্রেম বিদ্যমান কিন্তু ভিতরে বাহিরে অহমিকার স্রোত বহমান। অনুরূপ মূল্য পাইলে দেবর্ষি কৃষ্ণকে ফিরাইয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণের ওজনে স্বর্ণ হীরা মুক্তা প্রভৃতিই "অনুরূপ মূল্য" বলিয়া সত্যভামা বুঝিলেন। চিন্তামণিকে পার্থিব রত্নের সহিত তুলনা করা হইল। সত্যভামা গৃহস্থিত ধনরত্ন আপনার গায়ের অলঙ্কার দিলেন, রুক্মিণী প্রভৃতিও স্বামীর জন্য নিজ নিজ অলঙ্কার খুলিয়া দিলেন; তথাপি কৃষ্ণের দিক্ই ভারী রহিল। রুক্মিণী কৃষ্ণ-প্রেম-মুগ্ধা অহমিকা-শূন্যা সেবিকার দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারিণী, তাই কৃষ্ণ-নাম-মাহাত্ম্য জানিতেন। তখন রুক্মিণী নিরভিমানিনী কৃষ্ণপ্রাণা সতী তুলসী-পত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া ধনরত্নের স্থানে চাপাইলেন। সেই তুলসী-পত্রের দিক্ই ভারী হইল। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এস্থলে কৃষ্ণ শ্রীভগবান্ বুঝিতে হইবে।

এই নামই মহামন্ত্র। যাহার স্মরণে কীর্ত্তনে মানব ত্রাণ পায়, প্রেমে অধিকারী হয়, প্রেমময়ের সেবার সৌভাগ্য লাভ করে, সেই নামই মহামন্ত্র। স্তবপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, বৈদিক-ওঙ্কার, এবং তান্ত্রিক বীজমন্ত্র—সকলই নাম। এই নাম-মন্ত্রই অবিদ্যা ও মোহ-রোগের মহৌষধ।

নাম যখন জপ করা যায়, তখনই বলি 'মন্ত্র' যখন পাঠ করা যায়, তখন বলি 'স্তোত্র' যখন এক সঙ্গে মিলিয়া করা যায়, তখন বলি 'সঙ্কীর্ত্তন'।

পাপীর পক্ষে শ্রীভগবানের নাম-গ্রহণ ব্যতীত অপর উপায় নাই। পাপীর কাছে শ্রীভগবান্ অনেক দূরে; পাপীই অনেক দূরে রাখিয়াছে বলিয়া তিনি দূরে। পাপী তেমন করিয়া ভগবান্‌কে ভাবিতে পারে না, মন খুলিয়া ডাকিতে পারেনা, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবার মত দাঁড়াইতেই পারে না। সম্মুখে উপস্থিত হইলেও শ্রীভগবান্‌কে তাহার চিনিবার শক্তি থাকে না, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত ও কাতর হয়; কাজেই নামই অবলম্বন। শ্রীভগবানের নিকট স্থানাস্থানের বিচার আছে, ভাল-মন্দের প্রভেদ আছে, পাপপুণ্যের তারতম্য আছে, কিন্তু নামের কাছে তাহা নাই; নামে শুধু কোমলতা, শুধু মধুরতা, শুধু সৌন্দর্য্য—শুধু মিষ্টতা।

"কৃষ্ণকে ভুলিলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু কৃষ্ণনাম ভুলিলেই ক্ষতি অধিক"—ইহা প্রবাদ-বাক্যের মত বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত। ইহার কারণ শ্রীভগবানের

নাম মনে থাকিলেই তৎপ্রতি একটি প্রেম-ভাব থাকিবে। নামের স্মরণে গানে কীর্ত্তনে জপে স্বয়ং শ্রীভগবান্ আছেন। যেখানে নাম-গান হয়, সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে তিনি পারেন না। প্রথম নাম। এই নাম-বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপিত থাকিলে ইহা এক দিন অঙ্কুরিত হইবেই। শেষে তরুর আকারে দেখা দিবে, প্রেমফল ফলাইবে। তাই নাম রূপ বীজ কখন উৎপাটিত করিবে না। প্রেমে হৃদয় গলে। সেই গলা হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রতিচ্ছায়া সুস্পষ্ট পড়ে। শ্রীভগবৎ প্রেম যাহার হইয়াছে, তাহার কাছে শ্রীভগবান্ বাঁধা।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এই প্রেম হৃদয়ের যাবতীয় মলা দূর করে, অহমিকার কণাটুকু পর্য্যন্ত ঝাঁটাইয়া দেয়। তখন পার্থিব সুখ-দুঃখ তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। সেই প্রেম-রসিকের নিকট সকল বিশ্ববাসী ভাই, সমস্ত রমণী মাতা—ভগ্নী—কন্যা!

এই প্রেমের তুলনায় কৃষ্ণত্ব ছার। এই প্রেমের স্বাদ যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার কাছে সংসারের সুখ-সম্পদ্ নগণ্য, স্বর্গভোগ তাঁহার শক্র। এমন কি চির প্রার্থনায় মুক্তিকেও তিনি বড় মনে করেন না। তিনি ভগবান্ হইতে চান না, ভগবানের দাসবৎ থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে চান। তিনি যোগৈশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন অহেতুক প্রেম। এই প্রেমরসাস্বাদের কাছে মোক্ষানন্দ অনেক নিম্নে পড়িয়া থাকে বলিয়া ভক্ত বৈষ্ণবের ধারণা। তাঁহার নামে যে সুখ, নাম-গানে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে যে তৃপ্তি, অহেতুক প্রেমের আস্বাদ যেরূপ অপূর্ব্ব, তাহার তুলনা নাই। জীবের জীবত্ব-লোপে, বাসনার চিরন্তন নির্ব্বাণে অহংভাবের বিচ্ছেদে আবার সুখ কি? অহং না থাকিলে সে রসাস্বাদন করিবে কে? সে নাম-মাহাত্ম্য জীবকে বিলাইবে কে? মর্ত্ত্যে অমৃত অভয়ের সন্ধানইবা দিবে কে?

শ্রীভগবানের নামই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। অজ্ঞাত ব্যক্তিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে তিনি কাছে আসেন; নতুবা তাঁহারই অন্তরঙ্গ কোন লোক আসিয়া তাঁহার বিবরণ জানাইয়া দেয়, মিলাইবার পথের সন্ধান দিয়া যায়। তুমি মন্ত্রজপ দ্বারাই একমনে ডাক, নাম-কীর্ত্তন স্তোত্রগান দ্বারাই একপ্রাণে ডাক, তিনি আসিবেন; কিম্বা উপযুক্ত মহাপুরুষের সাহায্য পাইয়া প্রেমময়কে পাইবার অধিকার পাইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

নামের উপর যথার্থ নির্ভর করিয়া থাকিলে যাঁহার নাম তিনিই উদ্ধারের উপায় করিয়া দিবেন। "মা মা" রোদনে মায়ের প্রাণ কাঁদিবে, অসহায় সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইবেন; ইহাতে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কথা নাই।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

যোগ তপস্যায় বিপদের ভয় আছে, কঠিন বোধে ফিরিবার আশঙ্কা আছে, ঐশ্বর্য্যলোভে প্রকৃত ফল-প্রাপ্তির অসম্ভাবনাও আছে, নামে এ ভয় নাই। এই নামমাহাত্ম্য সহজ পথ বলিয়া প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ কলিযুগে উহারই প্রচার করেন। নামের পথে জাতীয় পার্থক্য, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নাই। সার্ব্বভৌম ঐক্য সর্ব্বজীবে সমতা এ পথে বিদ্যমান। যোগে তপস্যায় ঐশিক শক্তিতে অধিকার জন্মে। সেই ঐশিক শক্তিতে জীব সহজেই মুগ্ধ হইতে পারে। তাহাতে আত্মহারা হইয়া আপনার প্রাণের প্রাণকে ভুলিয়া অষ্টৈশ্বর্য্য পাইয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারে; তাহা হইলেই ক্ষতি। নামে এই প্রলোভন নাই। এই ঐশিক শক্তির অধিকার পাইলেও প্রেম-রসিকের তাহার প্রতি লক্ষ্যই পড়িবে না। শক্তি যতই বাড়ুক না, প্রেম-বৃদ্ধির ফলে ক্রমেই ভক্ত দীন হইতে দীনতর হইবে—তাহার হৃদয় ক্রমেই আরও শান্ত আরও কোমল আরও নত হইবে। তপস্যার ফল অপার্থিব ঐশ্বর্য্যও হইতে পারে, কিন্তু নামের ফল প্রেম ব্যতীত ঐশ্বর্য্য হইতেই পারে না।

যে ভাবেই হউক্ নাম লইতে লইতে প্রেমের ভাব চিত্তে জাগিবে। কিন্তু সেই সময়ে বড়ই সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। কারণ তখন সবে মাত্র শিশু হাটিতে শিখিতেছে। চলিবার মত শক্তি যোল আনা হয় নাই। সে সময় ঐ প্রেম-বীজ হৃদয়ে যে রোপিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। প্রথমতঃ অভিমান অহঙ্কার ত সেই বীজটিকে শুষ্ক করিবার জন্য উদ্যুক্ত আছেই, তদ্ভিন্ন প্রেমহীন নাম-মাহাত্ম্য-বিশ্বাস-শূন্য ব্যক্তির উপহাস বিদ্রূপ সহানুভূতি উৎসাহ সবই শত্রুতাচরণ করিবে। বন্যার মত আসিয়া ঐ বীজটিকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তাহার খোঁজ হইবে না। নবোদ্ভূত প্রেমভাব, সঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে অতি সঙ্গোপনে লোকের দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতে হইবে। সম্পূর্ণ বল-সঞ্চয় হইলে সেই প্রেমবীজ আপনিই পুষ্পিত ও ফলিত হইবে, তখন তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত হইবে, তজ্জন্য নিজেকে কোন চেষ্টা পাইতে হইবে না। প্রথমেই ভয়, পরে আর ভয়ের সম্ভাবনা নাই। মৎস্য-শিশু

প্রথম সামান্য স্থির জলে ভাসিতে অভ্যস্ত হইলে শেষে হিংস্র-কুম্ভীরাদি-সঙ্কুল সাগরেও অবহেলাক্রমে ভাসিতে পারে। প্রথমেই যদি তাহাকে সাগরে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে একদিনও বাঁচিবে না। এই সঙ্গোপননীতি বহুদিন হইতেই সাধক-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। নিজ ইষ্টমন্ত্র যে কাহাকে বলিতে নাই, সকলেই জানেন। সেই মন্ত্র উচ্চারণকালে কাহারও কর্ণে পাছে প্রবেশ করে এই ভয়ে নিজের কর্ণেও শুনিতে নিষেধ আছে। যাহা নিজের কর্ণে শুনিতে নাই, তাহা অপরকে কে শুনাইতে যাইবে! তারপর সেই মন্ত্র-জপাদি-ব্যাপারে যাহা যাহা ঘটে, চিত্তে যে যে ভাব জন্মে, তাহা এক গুরু ব্যতীত অপরকে বলিতে নাই।

নামে শ্রদ্ধা—বিশ্বাস প্রথম আবশ্যক। নামে শ্রদ্ধা—বিশ্বাস না থাকিলে জপ তপ সকলই নিষ্ফল। তীরে জাল রাখিয়া জলের মধ্যে সমস্ত দিন ডুবিয়া থাকিলে মৎস্য ধরা যায় না। নাম জানা থাকিলে সহজেই বস্তু চিনিতে পারা যায়, পাইতে কষ্ট হয় না। নাম না জানা থাকিলে সম্মুখে পাইয়াও চেনা যায় না, ধরা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাম মন্ত্র। ইষ্টমন্ত্রও নাম। এই নামের যে শক্তি আছে, যাঁর নাম, তাঁহাকে না জানিলেও নাম-স্মরণে নাম-কীর্ত্তনেও যে ফল আছে, তাহা আমাদের আর্য্য-ঋষিগণ জানিতেন। মন্ত্রের দেবতা জানিয়া মন্ত্রের অর্থ জানিয়া মন্ত্রজপে ফল ষোল আনা, কিন্তু মন্ত্রের দেবতা ও মন্ত্রের অর্থ না জানিলেও মন্ত্র-জপে ফল পাওয়া যায়। মন্ত্রের শক্তিই অপূর্ব্ব। অজ্ঞ, মণিমাহাত্ম্যজ্ঞের মত পূর্ণ মূল্য না পাইলেও অর্দ্ধমূল্য পাইয়া থাকে। মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য জানিয়াই ঋষিগণ অষ্টম বর্ষে উপনীত বালকের মন্ত্রজপাদি করিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। একমনে মন্ত্রজপ করিয়া যাইলে মন্ত্রের অর্থ আপনিই হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইবে, মন্ত্রের দেবতার কৃপা-লাভ হইবে! নামমহিমাই এইরূপ। তড়িৎশক্তির মত নাম-মাহাত্ম্য এক অপূর্ব্ব ভাবে চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবে। এই নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল পথ। ইহাতে প্রথমেই বাহ্যভাব অধিক থাকায় সাধারণ ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে আন্তরভাবের দিকে আগুয়ান হয়। প্রথমে আন্তর ভাবের দিকে যাইবার চেষ্টা করিলে অনেকে যাইতেই চাহিবে না, যাইয়াও প্রথম রস পাইবে না। মন্ত্রজপ অপেক্ষা নাম-সঙ্কীর্ত্তন আরও সরল হৃদয়-গ্রাহী উপায়। স্তোত্ররূপ কীর্ত্তন ছিল বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন যে তাহারও উত্তম সংস্করণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নাম-মাহাত্ম্য এই সঙ্কীর্ত্তন-মহিমা বিশেষ-ভাবে প্রচার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব কলিযুগে অবতীর্ণ হন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন একটি শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥

পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবান্ অপেক্ষা ভগবানের নাম বড়—ইহার তাৎপর্য্য কি! আমাদের কাছে "নাম বড়" বলিয়াই নাম বড়। নচেৎ পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, নাম তাঁহা হইতে অভিন্ন। আর নাম তাঁহারই নাম।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

অন্বয়। যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিতাহারবিহারকারিণঃ) কর্ম্মসু (কার্য্যেষু) যুক্তচেষ্টস্য (প্রণবাদিজপেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য তস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রা-জাগরৌ যস্য তস্য) যোগঃ দুঃখহা (দুঃখ-নিবর্ত্তকঃ) ভবতি। ১৭

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিয়মিত রূপে আহার বিহার করেন, জপাদিতে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা, পরিমিতরূপে যিনি নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ-নিবারক হয়। ১৭

আলোচনা। পূর্ব্ব-শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অধিকাহারী অনাহারী অতি-নিদ্রাশীল অনিদ্র ইহাদের সমাধিলাভ হয় না। এখন কি রকম যোগী সমাধি লাভ করিতে পারেন, তাহাই বলা হইতেছে যে, যিনি নিয়মিত আহার-বিহারকারী এবং নিয়মিত নিদ্রাজাগরণশীল প্রণবাদি-জপেও যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা, তিনিই যোগ দ্বারা সমাধি লাভ করিয়া দুঃখ-নিবারণ করিতে পারেন। বস্তুতঃ কোন কার্য্যেরই আধিক্য বা অভাব গ্রহণীয় নয়। ফলতঃ যোগ-সাধন-পক্ষে শরীর-রক্ষা-পূর্ব্বক গুরূপদেশ-প্রতিপালনই একমাত্র উপায়। ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

অন্বয়। যদা বিনিয়তং (বিশেষেণ সংযতং একাগ্রতামাপন্নং) চিত্তং সর্ব্ব-কামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (সন্) আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে তদা পুরুষঃ যুক্তঃ (সমাহিতঃ) ইতি উচ্যতে। ১৮

বঙ্গানুবাদ। চিত্ত যখন সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া কেবল আত্মাতেই নিশ্চয় ভাবে অবস্থিতি করে, তখন যোগীকে যোগযুক্ত বলা যায়। ১৮

আলোচনা। যোগীর কি অবস্থা হইলে তাহাকে সমাধিপ্রাপ্ত বলা যায়, তাহাই বলিতেছেন যে, যখন যোগী সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হন অর্থাৎ বাহ্য ব্যাপারে চেষ্টাশূন্য ও এককালে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মাতেই চিত্তস্থাপন করেন, তখন তাঁহাকে সমাধি-লাভে সমর্থ বলা যায়। ১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

অন্বয়। যথা দীপঃ (প্রদীপঃ) নিবাতস্থঃ (বাতবর্জ্জিতস্থানে স্থিতঃ) ন ইঙ্গতে (ন চলতি) আত্মনো যোগং (আত্মবিষয়কং যোগং) যুঞ্জতঃ (যোগ-মনুতিষ্ঠতঃ) যতচিত্তস্য (সংযতচিত্তস্য) যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা। ১৯

বঙ্গানুবাদ। আত্ম-বিষয়ক-যোগানুষ্ঠান-শীল সংযতচিত্ত যোগীর চিত্ত, নির্ব্বাত-স্থান-স্থিত প্রদীপের ন্যায় কম্পন-শূন্য নিশ্চল থাকে। ইহাকে সমাধির সূচক বলা যায়। ১৯

আলোচনা। বাতস্পর্শের অভাবে দীপ-শিখা যেমন অচঞ্চল সরল থাকে, বাহ্য বিষয়ের সংসর্গের অভাবে নিরুদ্ধ-চিত্ত যোগীর চিত্তও তদ্রূপ নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে। ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ-সেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১
যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতং।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা॥ ২৩

অন্বয়। যত্র (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) যোগ-সেবয়া (যোগানুষ্ঠানেন) নিরুদ্ধ চিত্তং উপরমতে (উপরতিং গচ্ছতি) যত্র চৈব (যস্মিংশ্চ কালে) আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা) আত্মানং এব পশ্যতি (ন তু দেহাদি) আত্মনি এব (ন তু বিষয়েষু) তুষ্যতি (তং যোগ-সংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ)। ২০

যত্র (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) আত্যন্তিকং (অনন্তং) অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং) বুদ্ধি-গ্রাহ্যং (শুদ্ধবুদ্ধি-গ্রাহ্যং) সুখং বেত্তি (যত্র চ) স্থিতঃ (সন্) তত্ত্বতঃ (আত্ম-স্বরূপাৎ) ন চলতি (তং যোগ-সংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ) ২১

যং লব্ধ্বা (যং আত্মসুখরূপলভ্যং লব্ধ্বা) ততঃ অধিকং অপরং লাভং ন মন্যতে যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি (শীতোষ্ণাদিদুঃখেন) ন বিচাল্যতে (নাভিভূয়তে) (তং যোগ-সংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ) ২২

তং (য এবম্ভূত অবস্থাবিশেষস্তং) দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং (দুঃখেন সংযোগো দুঃখ-সংযোগঃ তেন বিয়োগো দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগঃ দুঃখ-শব্দেন দুঃখ-মিশ্রিতত্বাৎ বৈষয়িকসুখমপি গৃহ্যতে) যোগ-সংজ্ঞিতঃ (যোগ-শব্দ-বাচ্যং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) স যোগো নিশ্চয়েন (অধ্যবসায়েন) অনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা (নির্ব্বেদ-রহিতেন চেতসা) যোক্তব্যঃ (অভ্যসনীয়ঃ) ২৩

বঙ্গানুবাদ। যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ নিষ্ক্রিয় হয় ও শুদ্ধান্তঃকরণে পরমাত্মার দর্শন-লাভ করিয়া তাহাতেই পরিতোষ প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত কেবল শুদ্ধ-বুদ্ধি-গ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ অনুভব করিয়া চিত্ত, আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না, যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অপর লাভকে অধিক বলিয়া বোধ করেন না এবং কোন প্রকার দুঃখে অভিভূত হয়েন না, সেই অবস্থার নামই যোগ। নির্ব্বেদ-রহিত চিত্তে অধ্যবসায়ের সহিত এই যোগ অভ্যাস করিবে। ২০।২১।২২।২৩

আলোচনা। যোগশাস্ত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ) চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। বিংশ হইতে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে সেই যোগের অবস্থা বলিয়া তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর বলা হইয়াছে, বাহ্য বিষয়ব্যাপার হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে। যেমন অগ্নি-রাশিতে কাষ্ঠ-সংযোগ না করিলে তাহা ক্রমে নির্ব্বাপিত হয়, তেমন মনকে বাহ্যবিষয়-সংস্পর্শ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলে যোগাভ্যাসীর চিত্তবৃত্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। যোগাভ্যাসের যে অবস্থায় চিত্ত, নিরুদ্ধ হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎকারে আত্মতুষ্টি লাভ করে, তাহাই যোগের অবস্থা।

যোগাভ্যাসী যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য (বাহ্য বিষয়াস্বাদে যতদূর সুখানুভব হয় ততোধিক) অবর্ণনীয় সুখানুভব করেন, তাহাই যোগের অবস্থা। যোগী যখন ঈদৃশ আনন্দ উপভোগ করেন, তখন ইত্যাকার আনন্দ অপেক্ষা অধিক আনন্দ তাঁহার আর কিছুই থাকে না। অন্তঃকরণে বাহ্য-বিষয়ের অসংযোগ-হেতু শীত তাপাদি কোন বাহ্য ক্লেশ তাঁহার অনুভবে আসে না। ঈদৃশ অবস্থাই যোগের অবস্থা। এই অবস্থায় দুঃখের লেশ মাত্র থাকে না। যোগী নির্ব্বেদশূন্য হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত এই আনন্দময় যোগ অভ্যাস করিবেন। ২০।২১।২২।২৩

সংকল্প-প্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪

অন্বয়। সংকল্প-প্রভবান্ কামান্ (সংকল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগ-প্রতি-কূলান্ কামান্) সর্ব্বান্ অশেষতঃ (নিঃশেষেন) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) মনসা ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমুদয়ং) সমন্ততঃ (সর্ব্বতঃ প্রসরন্তং) বিনিয়ম্য (নিয়তং কৃত্বা) (যোগোযোক্তব্যঃ) ২৪

বঙ্গানুবাদ। মনের কামনা-জাত সংকল্পসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া যোগ-সাধন করিবেন। ২৪

আলোচনা। ভোগ-বাসনা-যুক্ত জীবের অন্তরে ইন্দ্রিয়-লালসা বিলাস-বাসনা ও পরজন্মে স্বর্গাদি-ভোগ-কামনার উদয় হওয়ায় তল্লাভের জন্য জীব, কাম্য কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কোন যোগানুষ্ঠায়ী এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠান অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন, কেহবা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে অন্তরালে রাখিতে বা ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু মন অসংযত থাকিলে ইঁহাদের কাহারও আকাঙ্ক্ষা—সংকল্পজাত কামনা দূর হয় না। শ্রীভগবান্ ২য় অধ্যায়ে ৫৯ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে বলিয়াছেন যে, কেহ ইন্দ্রিয়-বিকলতা-হেতু দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ জ্ঞানে অসমর্থ হইতে পারে, কিন্তু তত্তদ্বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা আছে—ঈদৃশ ব্যক্তির যোগসাধন হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয় স্মরণ করে, সে কপটাচারী। অতএব যোগী, চিত্তকে ইন্দ্রিয়-বিষয়-ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করিয়া সংকল্প-জাত কামনা পরিত্যাগ করতঃ যোগ সাধন করিবেন। ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্ম-সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

অন্বয়। ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্য্যেণ বশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ (অভ্যাস-ক্রমেণ নতু সহসা) মনঃ আত্মসংস্থং (আত্মনি এব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং) কৃত্বা উপরমেৎ (উপরতিং কুর্য্যাৎ) (উপরমস্বরূপমাহ) ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ (সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ভাবয়েদিত্যর্থঃ)। ২৫

বঙ্গানুবাদ। ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধি দ্বারা ক্রমাভ্যাসে মনকে আত্মাতেই নিরুদ্ধ করিবে। তখন অন্য চিন্তা কিছুই করিবে না। ২৫

আলোচনা। পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্ম-সংস্কারের দ্বারা মনের স্থৈর্য্য ও চাঞ্চল্য জন্মে। যোগানুষ্ঠায়ী চিত্ত-সংযমনে কৃতসংকল্প হইলেও চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধককে সময়ে সময়ে স্বপ্নবৎ বাহ্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে। এই জন্য স্বভাব-চঞ্চল চিত্তকে বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে "ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধি দ্বারা ক্রমাভ্যাসে মনকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিবে। কদাচিৎ মন বহির্ম্মুখ হইলেও সহিষ্ণুতা-সহকারে তাহাকে অন্তর্ম্মুখ করিতে চেষ্টা করিবে।" একবারে না হয় বহুবারের চেষ্টায় মন অবশ্য সংযত নিরুদ্ধ হইবে। কাহারও এ চেষ্টার ফল জন্মান্তরেও হইতে পারে। ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

অন্বয়। মনশ্চঞ্চলমস্থিরং (মনঃ চঞ্চলং অত্যর্থং চলং অতএব অস্থিরং) (তৎ) যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি) ততঃ ততঃ এতং নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত্য) আত্মনি এব বশং নয়েৎ (স্থিরং কুর্য্যাৎ)। ২৬

বঙ্গানুবাদ। চঞ্চলতা-প্রযুক্ত মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে। ২৬

আলোচনা। এই শ্লোকটীর আলোচনা সম্বন্ধে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ-স্বামীজি তাঁহার গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা তাহা অবিকল এস্থানে গ্রহণ করিলাম।

"কৌশল-ক্রমে মন সংযত হইলেও তাঁহার স্বাভাবিক অস্থিরভাব শীঘ্র বিদূরিত হয় না। মনের এই চঞ্চলস্বভাব যে পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অভিভূত বা তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগসিদ্ধির আশা অতি অল্প। যে নারী পিত্রালয়ে অবস্থিতি কালে প্রতিবেশীমণ্ডলীর গৃহে গৃহে বেড়াইয়া বেড়ায়, সে প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহার গৃহনিরুদ্ধ হইয়া বাস করা বড়ই

কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে বহির্বিচরণে তাহার একান্ত ইচ্ছা হইলেও শ্বশ্রূ ননন্দাদির তাড়না-ভয়ে বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় না। এই অবস্থায় মর্ম্মব্যথা পাইয়া সেই নারী অত্যন্ত ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু ক্রমশ যখন তাহার ইহপরলোকের একমাত্র গতি প্রাণপতির সহিত প্রণয় গাঢ় হয়, তখন সে আর বাহিরে যাইতে চাহে না। পতির নিরুদ্ধ গৃহই তাহার আনন্দ-নিকেতন হইয়া উঠে। সেইরূপ জন্মজন্মান্তরের বহির্বিষয়-সুখ-সংস্কারাপন্ন ও বহির্বিচরণ-শীল চিত্তকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে স্বভাবগুণে সমাধিবিরোধী বহির্ব্যাপারে ধাবিত হইবে। কিন্তু সাধক ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা মনকে আত্মার স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে শিখাইলে অবশেষে মন আত্মাকারাকারিত হইয়া গেলে তাহার প্রকৃতি-গত চাঞ্চল্য-দোষ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন নিবাত-দীপ-শিখার ন্যায় মন আত্মাতে স্থির থাকিবে।" ইহা প্রত্যাহারের লক্ষণ। ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

অন্বয়। শান্তরজসং (কেবল শুদ্ধসত্ত্বস্বভাবং) প্রশান্ত-মনসং (বিক্ষেপ-শূন্য-চিত্তং) অকল্মষং (ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জিতং) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তং) এনং যোগিনং উত্তমং সুখং সমাধিসুখং (স্বয়মেব) উপৈতি (আগচ্ছতি)। ২৭

বঙ্গানুবাদ। রজোগুণহীন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত ঈদৃশ যোগী উত্তম সুখ (সমাধি-সুখ) প্রাপ্ত হন। ২৭

আলোচনা। যখন যোগী মনকে বাহ্য বিষয় হইতে সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত করিয়া অচঞ্চল চিত্তে "ব্রহ্মই সকল" ইত্যাকার চিন্তায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সমাধি-সুখ লাভ করেন। ইহা সমাধির লক্ষণ। ২৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নারদের উপাখ্যান।

আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি প্রকট করিতে হইলে বিশেষ ২ স্বরের প্রয়োজন হয়। বিশেষ ২ স্বরে বিশেষ ২ মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। মন্ত্র-ব্যাপারে এই তথ্যটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ভিন্ন ২ দেবের আবাহনের নিমিত্ত তোমরা ভিন্ন ২ মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাক। যদি তোমরা মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে চাও তাহা হইলে বিশেষ একটী মন্ত্র তোমরা ব্যবহার কর। কিন্তু বিষ্ণু বা শক্তির পূজায় পৃথক্ মন্ত্র আবশ্যক। মন্ত্রের আবৃত্তি করিলে ব্যাপারটা কি হয়? মন্ত্রাবৃত্তির পৌনঃপুন্যে তোমার অর্চ্চনীয় দেবের মূর্ত্তি ক্রমশঃ গঠিত হইয়া উঠে। ঐ মূর্ত্তিটী অধিশ্রয়ণ স্বরূপ। অভীষ্টদেবের কৃপাকণাবর্ষী প্রভাব তথায় একত্রীভূত হয়। পরে ঐ প্রভাব ঐ কেন্দ্র হইতে বিকীরিত হইয়া পূজকের অন্তরে প্রবিস্ট হইয়া থাকে। এই কারণেই মন্ত্র ও মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবকে অভিন্ন বলা হয়। বৃহৎ গান্ধর্ব্ব তন্ত্রে (৫ম অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে যে, একটী মন্ত্রের আবৃত্তি করিলেই উহার উদ্দিস্ট দেবের মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া থাকে।* এই তথ্যটী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উক্ত তন্ত্রে নারদের উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। একদা নারদ শব্দ-বিজ্ঞানে স্বীয় নৈপুণ্য ভাবিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হৃদয়ে কৈলাশ-নামক শিবালয়ে গমন করিলেন। শিবকে স্বীয় সঙ্গীত-নৈপুণ্য ও শব্দতত্ত্ব-জ্ঞানে পরাজিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি

---

* আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক অ্যালবার্ট্সন্ সম্প্রতি বলিয়াছেন—"ইহা একটী বৈজ্ঞানিক তথ্য যে একখানি ক্ষুদ্র মসৃণ লৌহরেকাবির উপরে আলোক-রশ্মি পতিত হইলে, শব্দ স্ফুরিত হইয়া থাকে। রেকাবি খানিকে যদি অতি-সূক্ষ্ম-ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্র-সুলভ কিম্বা দূরকথন-যন্ত্র-সুলভ কর্ণাকৃতি বৈদ্যুতিক চক্রে স্থাপিত করা না যায়, তবে সেই শব্দ শ্রবণ-গোচর হয় না।

প্রাচীনকালীন মিসরবাসীগণ চিত্র-ভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্ম পুস্তক লিখিতেন। তাঁহাদের ঈদৃশী পদ্ধতির কারণ কতকটা প্রাগুক্ত ব্যাপারে বুঝা যায়। এতদ্ব্যাপারে তাঁহারা মহাগুরুত্ব স্থাপন করিতেন। কোন লেখকের লিপি-বিদ্যায় চিত্র-ভ্রম ঘটিলে, তাহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বীজানাং দেবরূপতাম্।
মন্ত্রোচ্চারণমাত্রেণ দেবরূপং প্রজায়তে॥

সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। শিবকে বলিলেন "আপনি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন।" কিন্তু শিবের প্রীতি হইল না; তিনি একটীও প্রশংসা-সূচক কথা বলিলেন না। ইহাতে নারদ শিবকে অত্যন্ত অভদ্র ভাবিয়া বিরক্ত হইলেন। অবশেষে অতীব ক্লান্ত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যাইতে ২ তিনি পথি মধ্যে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, ঐ প্রদেশস্থ অনেকগুলি নাগরিক মৃতাবস্থায় তথায় পতিত রহিয়াছে; কতকগুলিকে দেখিয়া বোধ হইল কে যেন উহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, অঙ্গ-বিকৃতি ঘটাইয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া উহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে দুরাত্মা যাইতেছে, ঐ পাষণ্ডই আমাদের সঙ্গিগুলিকে নিধন করিয়াছে।" নারদ ইহা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি এবম্প্রকার দোষারোপের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীতে তাললয়ের অসঙ্গতি-হেতুই এই ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখন তিনি অনুতপ্তহৃদয়ে, অশ্রুপাত করিতে করিতে শিবালয়ে অচিরাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শিব-সীমন্তিনী পার্ব্বতীর স্তব করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "যে অন্যায় করিয়াছি তাহার সংশোধন করুন।" পার্ব্বতী স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাল-লয়-যুক্ত একটী স্বর্গীয় ধ্বনি করিলেন। উহাতেই সেই মৃত দেহগুলি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল—বিকৃত বিদীর্ণ দেহগুলিতে সৌন্দর্য্য দেখা দিল।

এতদুপাখ্যানে আমরা জানিতে পারি যে, শব্দ কেবল যে সংঘটন করে তাহা নহে, উহা ধ্বংসও করিয়া থাকে। উহা সৃজন করে, আবার বিনাশও করে। পদার্থ-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে যে সকল তথ্য জানা যায় তাহাতে ঐ কথাই প্রমাণিত ও দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে।

এই কারণেই হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকে শব্দকে পরিব্যক্ত "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। খৃষ্টানগণও বলেন যে বাক্যই ঈশ্বর। শব্দেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, শব্দেই ইহার ধ্বংস সংসাধিত হইবে। অতএব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শব্দ একটী প্রধান বস্তু। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মা বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র বিশ্বটী সৃজন করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত তদীয় "তান্ত্রিক খৃষ্টধর্ম্ম" গ্রন্থে মন্ত্র-শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। আমার বিশ্বাস, উদ্ধৃতাংশ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইবে। কথাগুলি এইঃ—"শব্দমাত্রেরই

আছে। ঐ মূর্ত্তি অদৃশ্য জগতে প্রকট হইয়া থাকে। শব্দের সমাবেশে জটিল মূর্ত্তির উদ্ভব হয়। সূক্ষ্ম জগতের জড়াংশও অতি সূক্ষ্ম। ঐ সূক্ষ্ম জড়ে শব্দ-মূর্ত্তি গঠিত হইলে তাহাতে বর্ণও প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব শব্দ হইলেই যেমন নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ বিবিধ বর্ণও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল বর্ণের অনেকগুলি অতীব সুন্দর। + + + উচ্চতর দেবযোনির সহিত সংস্রব রাখিতে হইলে তাঁহাদের কার্য্যোপযোগী বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য এবং যাহাতে আমাদের সূক্ষ্মদেহ তাঁহাদিগের প্রভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তদুদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট শব্দের প্রয়োজন। + + + দেহগুলিকে উচ্চতর প্রভাব-গ্রহণযোগ্য করিবার নিমিত্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শব্দে বিশৃঙ্খল ব্যোম-কম্পন সুশৃঙ্খলপ্রণালীতে পরিণত হয়। এই প্রণালী উদ্দিষ্ট দেবের প্রকৃতির অনুরূপ। উদ্দিষ্ট দেব যে সুরে বাঁধা, সূক্ষ্ম দেহগুলিকে সেই সুরে শব্দায়মান করিয়া লইতে হইবে, তবেই তাঁহার প্রভাবে সাধক অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবেন। এবম্বিধ ব্যাপার পুরাকালে শব্দ-ব্যবহার দ্বারাই সংসাধিত হইত। + + + প্রত্যেক ধর্ম্মেই ঐরূপ বিশেষ ২ শব্দ আছে। উহাদিগকে "শক্তিশালি-কথা" বলে। কথা গুলিতে বাক্য আছে; বাক্যগুলি বিশেষ ভাবে গ্রথিত ও বিশেষ প্রকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ধর্ম্মেই এবম্প্রকার বিস্তর বাক্য আছে। এ গুলি বিশিষ্টপ্রকার শব্দ-বিন্যাস মাত্র। সাধারণতঃ ইহাদিগকে "মন্ত্র" নামে অভিহিত করা হয়। + + + একটী মন্ত্রকে ভাষান্তরিত করিলে উহা সাধারণ বাক্যে পরিণত হইয়া থাকে। উহাতে পূর্ব্ব শব্দ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় অন্য শব্দের উৎপত্তি হয়। + + শব্দে একটা সজীব উজ্জ্বল মূর্ত্তি হয় বলিয়াই উহা উচ্চারিত হইলে উহার কম্পন ভিন্ন ভিন্ন জগতে যাইয়া পৌঁছে এবং তত্রত্য দেবগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। তখন সেই সকল দেবের কেহ কেহ সাধকের প্রার্থিত কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়েন। প্রত্যেক ধর্ম্ম্য কার্য্যেই এবম্প্রকার মন্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন।

মুদ্রা।

মন্ত্রের পর মুদ্রার প্রয়োজন। ইহা বাহ্যিক ও দৃশ্য ব্যাপার—কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ-ভঙ্গী মাত্র—বস্তুতঃ কতকগুলি চিহ্ন মাত্র। (হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাকেই মুদ্রা বলে)। যজ্ঞকালে মন্ত্র ও মুদ্রার সংশ্লিষ্ট দেবগণ আহূত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আসিয়া শক্তি-সঞ্চার করেন ও সূক্ষ্মদেহীদিগকে স্বস্ব বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূরিত করিয়া তুলেন। ভৌতিক ব্যোমে পর্য্যন্ত সেই শক্তি পরিচালিত

হয়। এইরূপ ব্যাপারে যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহার শক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

বিশেষ বিশেষ দেব-মূর্ত্তি।

উচ্চ শ্রেণীর দেবগণ নানামূর্ত্তি ধারণ করেন। এই সকল মূর্ত্তির কতকগুলি তাঁহাদের নিকট অতি প্রিয়। যে সকল মহর্ষি সাধনা-বলে দিব্যদৃষ্টি-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ঐ সকল প্রিয় মূর্ত্তি তাঁহাদের গোচরীভূত হয়। পুরাকাল হইতে বংশপরম্পরায় উহা চলিয়া আসিতেছে। ধাতু বা প্রস্তরে কিম্বা কোন ২ পবিত্র দেব-মন্দিরে চিত্রিত করিয়া আমরা উহা রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ঐ মূর্ত্তিগুলি কল্পনা-প্রসূত বা রূপকাত্মক নহে। উহা যে সাঙ্কেতিক ব্যাপার, তাহাও নহে। অনেকে দেব-মূর্ত্তিগুলিকে কল্পনা-প্রসূত প্রভৃতি ভাবিয়া থাকে বটে কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত। কতিপয় মহর্ষি বাস্তবিকই ঐ সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তাঁহারাই মানবের উপকারার্থে ঐ সকল মূর্ত্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া উহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঐ গুলিই দেবগণের যাবতীয় মূর্ত্তি নহে। তাঁহাদের মূর্ত্তি বহু ও নানাবিধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাধারণতঃ দেবগণকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু স্থূল জগতে কোন একটা উদ্দেশ্য-সাধনার্থ তাঁহারা যে কোন শরীর ধারণ করিতে সমর্থ। ভূলোকে প্রকট হইতে ইচ্ছা হইলে, তাঁহারা স্থূলদেহ পর্য্যন্ত পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

দেবগণের মূর্ত্তি গ্রহণ করা কিম্বা অতি সহজে অতি শীঘ্র ইচ্ছামাত্র স্থূলদেহ ধারণ করা সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিস্তর প্রমাণ আছে। ভুবর্লোক-নামক মানস-স্তরের জড়াংশ এতই নমনীয় যে দেবগণ অনায়াসেই উহার সাহায্যে ইচ্ছা মাত্র যে কোন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। তাহাই শাস্ত্রে বলে যে দেবগণের অসংখ্য মূর্ত্তি। দেব নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে সীমাবদ্ধ নহেন।

যুধিষ্ঠির, শিবি ও রামচন্দ্রের উপাখ্যান।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে ধর্ম্ম-দেব যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ সময়ে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত সারমেয়-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিক-রাজা শিবি এবং পারাবত ও বাজপক্ষী সম্বন্ধে যে গল্পটী আছে তাহাও সুপ্রসিদ্ধ। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রদেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ছিলেন।

দেবগণের প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির গ্রন্থেও ঐ প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোম-দেশের প্রাচীন মহাকাব্যে এবম্প্রকার কাহিনী বিস্তর আছে। এ গুলিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অন্যায়।

একটী আপত্তির খণ্ডন।

আমি অনেককে দৃঢ়তা সহকারে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, দেবগণের যদি মূর্ত্তিই থাকে, ঋষিদের কথাই যদি সত্য হয় অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের সময়ে মন্ত্রাহূত হইয়া যদি দেবগণ আসিয়াই থাকেন, তবে বৈদিক-যজ্ঞে ইন্দ্র-দেব হস্তি-পৃষ্ঠে আগমন করিলে তদীয় গুরুভার-নিবন্ধন যজ্ঞবেদী তৎক্ষণাৎ বিকট শব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত; বরুণের আগমনে যজ্ঞ-স্থান জল-প্লাবিত হইত এবং অগ্নিদেবের আবির্ভাবে ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের সংঘটন হইত। এই কথাগুলি আধুনিক মীমাংসকদিগের তর্কের পুনরুক্তি মাত্র। ইহাঁরা জৈমিনির কথার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। তাই ইহাঁরা দেবগণের নিরাকারত্ব প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। উহাঁদের কথার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ আমরাও এরূপ তর্ক করিতে পারি যে, বিজ্ঞান ব্যোমকে সর্ব্ব-সঞ্চরণশীল বলিলেও উহা সেরূপ নহে; কেননা, তাহা হইলে দেহের ভিতরে সঞ্চারকালে দেহ ছিদ্রযুক্ত হইয়া পড়িত। দেবগণের স্থূলদেহ আছে, এ কথা কেহই কোন দিন বলে নাই। তাঁহাদের দেহও যে ভৌতিক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে ভৌতিক উপাদান তাঁহাদেরই প্রকৃতিগত। স্থূলাবস্থাই যে ভৌতিক উপাদানের চরম অভিব্যক্তি তাহা নহে। জড় উপাদান বিস্তর সূক্ষ্মাংশেও বিরাজ করিয়া থাকে।*

---

* লোকে সাধারণতঃ ভাবিয়া থাকে যে হিন্দুধর্ম্মে মূর্ত্তি-পূজা ব্যাপারটী একটী আধুনিক নবপ্রবর্ত্তন। অনেকের ধারণা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ধ্বংসাবস্থার পরে এই ব্যাপারটী হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এবম্প্রকার ধারণা ভ্রান্ত; কেননা, আমরা বৈদিক যুগের সাহিত্যেও মূর্ত্তি-পূজার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। প্রমাণ গুলি এই :—

১। সামবেদের অদ্‌ভূত ব্রাহ্মণে দেব-মন্দিরের কম্পিত হইবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়; দেব-মূর্ত্তি গান করিলেন, নৃত্য করিলেন, নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার ঘর্ম্ম হইল, তিনি পান করিলেন এবং হাস্য করিলেন—এবম্প্রকার বিবৃতিও ঐ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। অথর্ব্ববেদে কৌশিক সূত্রের অদ্‌ভূত-অধ্যায়ে ঐ প্রকার ঘটনার বিবরণ আছে।

শঙ্করাচার্য্য তদীয় সুপ্রসিদ্ধ-ভাষ্যে মীমাংসকগণের আর একটী গুরুতর আপত্তি সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই আপত্তিটী এই যে, ইন্দ্রদেব এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানবগণ কর্ত্তৃক মন্ত্রাহূত হইলে তিনি কিরূপ করিয়া তত্তৎস্থানে একই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন? প্রকৃত ঘটনা এই যে, যখনই একটী বৈদিক স্তোত্র যথাযথ ভাবে উচ্চারিত হয়, তখনই সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম জড়াংশে একটী শব্দ-মূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে। আহূতদেব ঐ মূর্ত্তিতে আবিষ্ট হয়েন। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে অনেকগুলি শব্দ-মূর্ত্তির উদ্ভব হয়। ঐ গুলি উদ্দিষ্টদেবের কায়ব্যূহ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় একই সময়ে ঐ গুলিতে প্রকাশমান হওয়া ঐ দেবের পক্ষে আদৌ কঠিন নহে।

এরূপ আপত্তি করাও অসঙ্গত যে, দেবগণ যখন সহজে দৃষ্ট হন না, তখন উহাঁরা নিরাকার। ঐরূপ তর্কসূত্র অবলম্বন করিলে, পরমাণুবাদ ও ব্যোম-পদার্থের অস্তিত্ব আমাদিগের নিকট অলীক হইয়া উঠিবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একজন দেব, স্থূল শরীর ধারণ করিয়া চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত হইলেন এবম্বিধ প্রমাণ শাস্ত্রে বিস্তর রহিয়াছে। বস্তুতঃ, পুরাকালে তাঁহারা নিরন্তরই মানবগণকে দেখা দিতেন এবং প্রকাশ্যতঃ তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।*

দেবগণকে দেখিবার উপায়।

বর্ত্তমান যুগটী অবিশ্বাসের যুগ। এক্ষণে দেবগণকে দেখিতে হইলে আমাদিগকে যোগাশ্রয় করিয়া তাঁহাদের স্তরে উঠিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদিগকে দৃষ্টি-শক্তির বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টি ব্যাপারটী কি? আমাদিগের অভ্যন্তরে এমন শক্তি আছে যাহা বহিস্থ ব্যোম-কম্পে সাড়া দিয়া থাকে। সেই শক্তিটীর নামই—দৃষ্টি। একটী উদাহরণ দেখ; আমরা স্বভাবতঃ নীলাতীত বর্ণের রশ্মিগুলি দেখিতে বা সঙ্গীতের স্বরার্দ্ধ (Half tones) শ্রবণ করিতে পারি না। ইহার কারণ কি? স্পষ্ট কারণ এই যে আমাদিগের সাড়া দিবার শক্তি একটী নির্দ্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ। কোন উপায়ে ঐ শক্তি

৩। গৌতম-ধর্ম্ম-সূত্রে দেব-মন্দিরের উল্লেখ আছে। ১৯ অঃ, ১৪ শ্লোক। ৯ অঃ, ৬৬ শ্লোকেও দেব-মন্দিরের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ ধর্ম্ম সূত্রেই ৯ অঃ, ১২ ও ১৩ শ্লোকে দেব-মূর্ত্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। আপস্তম্ভ ৩০ কাণ্ড, ২০।২২ শ্লোকেও ঐ প্রকার প্রমাণ আছে। — ("প্রাচ্যদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র" নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৯৫—৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

* শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের "জীবন ও মূর্ত্তির বিবর্ত্তন" নামক গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধি করিতে কিম্বা ঐ পরিসরের বিস্তার ঘটাইতে পারিলে, যে সকল বস্তু এক্ষণে আমাদিগের নিকট অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে সে সকল তখন আমরা দেখিতে পাইব এবং যে সকল শব্দ এক্ষণে আমরা শুনিতে পাইতেছি না তখন সর্ব্বদাই সেগুলি আমাদের শ্রবণ-গোচর হইবে। দেব-দর্শনও ঐ প্রকারে হইবে। প্রত্যেক স্তরেই দৃষ্টি—যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। যন্ত্র-শক্তি ও যন্ত্রের উপযোগিতা পরিবর্ত্তিত হইলেই দৃষ্টি-শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে। পারত্রিক দৃষ্টির উৎকর্ষ-সাধন করিলেই তুমি দেবগণকে নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইবে।

আমাদিগের শক্তিগুলি যে বিকাশ-প্রবণতা-বিশিষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন কোন লোক বর্ণ-ভেদ-করণে অক্ষম। ইহার অর্থই এই যে উহারা কোন এক বিশেষপ্রকার ব্যোম-কম্পে সাড়া দিতে অসমর্থ। আমরা এমন শিকারী কুক্কুরের বিষয় অবগত আছি, যাহারা অসাধারণ ঘ্রাণ-শক্তির বলে শিকারের পদ-চিহ্নের ঘ্রাণ লইতে লইতে তাহার অনুসরণ করিতে পারে। মানসিক শক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখ। একজন "এস্কুইমো" দুই সংখ্যার অধিক গণনা করিতে পারে না; আবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি, সূক্ষ্মমান-গণিতের আলোচনায় আমোদ অনুভব করেন। এই দুই প্রকার ব্যক্তির মানসিক শক্তির পার্থক্য বস্তুতঃই অত্যধিক। কিন্তু ইহাও ক্রমবিকাশের ফল। উচ্চতর স্তরের সূক্ষ্ম ২ ব্যোম-কম্পন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমরা এক্ষণে তাহাতে সাড়া দিতে অসমর্থ। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি-শক্তির এরূপ উন্নতি সাধন করিয়া লইতে পারি যে উহার সাহায্যে ঐ বিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ব্যোম-কম্পে সাড়া দিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে স্থূল জগতের বৃক্ষ-প্রস্তর প্রভৃতির ন্যায় দেবগণও আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

যশোহর-জননীর উক্তি।*

সুপ্ত আমার দীপ্ত গরিমা,
কে তুই জাগালি হৃদয়ে মোর ?

* হিন্দু-পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'যশোহর' পদ্যটীর পরিশিষ্ট রূপে এই পদ্যটী রচিত। লেখক।

এরে চারিদিকে নেহারি যে ওরে,
সুধু অমানিশি--আঁধার-ঘোর !
বজ্র-বেদন কে জাগালি বুকে,
ঘুচাতে আমার দুঃখ-দৈন্য ?
আয় আয় ওরে, বুকে ধরি তোরে,
জননী তোদের হবে যে ধন্য !
কেমনে ঘুচাবি এ ঘোর দীনতা ?
কেমনে আনিবি নবীন বল ?
বল শুনি ওরে সন্তান মোর ;
এ কিরে সুধুই কথার ছল ?

"আম নারিকেল গুবাকের গাছে"
ভরি গেছে মোর সারাটী অঙ্গ,
আজি এই ঘন-ঘোর-নিশি-যোগে,
নাহি মিলে হায় মানব-সঙ্গ ! (১)
"খেজুরের গাছে" পড়ে নাহি হাত,
কৃষক নাহি যে ঘরে !
ছোট ঘর খানি আঁধার করিয়া
সে ত গেছে চিরতরে !
কৃষক-বালার আখিনীরে মোর,
অঞ্চল গেছে তিতি ;
কেন রে অবোধ জাগাইলি মোরে ?
কেন এ হরষ-গীতি ?

"প্রতাপ-প্রতাপ"— "সীতারাম-কথা"
কেনরে অবোধ তুলিলি আজি ?
এ যে সুধু হায় ! কল্পনা-কুসুমে,
ভরেছিস হারে, মায়ের সাজি !

(১) শুনিয়াছি, বর্ত্তমান বর্ষের পূজার প্রাক্কাল হইতে প্রবল ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা যশোহরবাসীর প্রাণ হরণ করিতেছে। এই মৃত্যুর হাত হইতে যশোহরের নরনারীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টাই বর্ত্তমানে প্রধান কার্য্য। লেখক

চাহিনা ত আমি অসি-ঝঞ্ঝনা,
চাহি যে তোদের মনের বল্ !
"ত্যাগে সিদ্ধি" ;—সে কি আছেরে তোদের ?
না—না—এ যে সুধু কথার ছল !
উচ্চ অধম সবারে ঘিরিয়া
রোদনের বাণী উঠিছে নীতি ;
কেনরে অবোধ জাগাইলি মোরে ?
কেন শুনাইলি হরষ-গীতি ?

ভৈরব আজি গিয়েছে কাড়িয়ে
"ভৈরব-দেহ" চেতনা-হীন,
আজি যে কোথায় "কপোতের আখি"
অতীত-গরব ধূলায় লীন। (২)
পূজা-প্রাঙ্গন হয়েছে বিজন,
সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে না আজি ;
"ভক্ত" আমার লয়েছে বিদায় ;
রিক্ত আমার ফুলের সাজি !
"ধর্ম্মের ধ্বনি কর্ম্মের সাথে",
কে তুলিবে আজি—মরণ-ভীতি
কে তাড়াবে বল—নতুবা কেনরে
জাগাইলি মোর হরষ-গীতি ?

অধরে তোদের ঢেলে দিল মধু
একদিন যেই যতন ভরে ;
করেছিস কিছু সন্তান মোর
এতদিন তা'র স্মৃতির তরে ? (৩)
এ যে রে মহৎ মরণের ভূমি ;
উঠিয়াছে যদি মরণ-বাণী

(২) মনে হয়, অচিরে ভৈরব-সংস্কারে মনোযোগী না হইলে অল্পদিনে ভৈরবতীরবর্ত্তী গ্রামগুলি বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে। [লেখক]

(৩) কবি মধুসূদনের জন্মভূমিতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যশোহরবাসী বিশেষ কি করিয়াছেন জানিনা। [লেখক]

থাকিস্ না সুধু মরণ আকড়ি,
অতীত গরবে জীবন মানি ;
আপনারে নিয়ে থাকিবি রে যদি,
বুকে ধরি সদা মরণ-ভীতি ;
কেন রে অবোধ জাগাইলি মোরে ?
কেন রে তুলিলি হরষ-গীতি ?

সুপ্ত আমার দীপ্ত গরিমা,
কে তুই জাগালি হৃদয়ে মোর ?
এবে চারিদিকে নেহারি যে ওরে,
সুধু অমানিশি আঁধার ঘোর।
বজ্র-বেদন কে জাগালি বুকে,
ঘুচাতে আমার দুঃখ-দৈন্য ?
আয় আয় ওরে, বুকে ধরি তোরে,
জননী তোদের হবে যে ধন্য !
কেমনে ঘুচাবি এ ঘোর দীনতা ?
কেমনে আনিবি নবীন বল ?
বল শুনি ওরে সন্তান মোর ;
এ কি রে সুধুই কথার ছল !

শ্রীকেশবলাল বসু।

আবাহন।

(গীত)

আকুলহৃদে আবেগ-ভরা আমাদের এই যত্নে গড়া
কোমল পেলব ভক্তিমালা সকল ধনের বাড়া—
জ্যোৎস্না দিয়ে গাঁথা এ যে নয়ন-মনোহরা,
(নিয়ে) সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে,
বিফল মানস পূর্ণ কর বিমল পরশ-দানে।

সান্ধ্য সমীর বহে ধীরে বিহগ চলে আপন নীড়ে
রবির এমন রক্ত কিরণ ডোবে আঁধার-কোলে—
(এস) যশের মুকুট শিরে ধরি জ্ঞানের হাওয়ায় দু'লে।

সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে,
বিফল মানস পূর্ণ কর বিমল পরশ-দানে।

তোমার স্নিগ্ধ সুধাবাণী শান্তমধুর মূর্ত্তিখানি
আমরা সবাই বক্ষে ধরি আশার আলোয় জাগি,
(শুধু) তোমার আশীষ পুণ্যেভরা চরণ কোলে মাগি।
সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে,
বিফল মানস পূর্ণ কর বিমল পরশ-দানে।

জ্ঞানের উজল আলোক এস, পূর্ণ চাঁদের কিরণ এস,
প্রভাত মলয় সমীর এস ফুলের সুবাস নিয়ে ;
তোমার রাঙ্গাছবি চরণ-তলে পড়ুক্ মাথা নুয়ে।
সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে,
বিফল মানস পূর্ণ কর বিমল পরশ-দানে।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী। সুলেখক শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক বিরচিত তত্ত্ববিদ্যামূলক উপাখ্যান-গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা। তত্ত্বনিধি মহাশয় তত্ত্ববিদ্যাসভার প্রতিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয়া ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কীর "Bewitched Life" নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "নাস্তিক ও জাপানী যোগী" প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকায় 'বিদেশীর মর্ম্মকথা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে তত্ত্বনিধি মহাশয় এই "Bewitched Life" গ্রন্থের অনুবাদের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "নাস্তিক ও জাপানী যোগী" অনুবাদ-গ্রন্থ হইলেও লেখকের লিপিচাতুর্য্যে ও ভাব-প্রকাশ-পটুতায় মৌলিক গ্রন্থের ন্যায় বোধ হয়। পাঠক এগ্রন্থে নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদের শোচনীয় পরিণাম ও যোগ-বলের অসীম মহিমা অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইবেন। লেখকের যোগ্যতা, বিজ্ঞতা, ভাষা-সম্পৎ ভাবপ্রকাশপটুতা ও রস-বিকাশপ্রবীণতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট এবং 'রাজনগর দ্বারবঙ্গ' ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

কল্পলতা। (প্রথমভাগ) প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র সরকার প্রণীত (১৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) কবিতা-গ্রন্থ। মূল্য ৮০ আনা। বর্ত্তমান যুগে কবিতা-স্রোতস্বতী যে নূতন খাতে তরঙ্গ-বিস্তার করিতেছে, তাহার পরিচয় 'কল্পলতা'য় নাই। 'কল্পলতায়' প্রাচীন-পদ্ধতির লীলা-খেলা। গ্রন্থকারের সরল সুন্দর জটিলতা-শূন্য ভাবপূর্ণ রচনা বস্তুতই আনন্দ প্রদান করে। কতিপয় কবিতা আমাদের কাছে ভালই লাগিয়াছে। অনেকগুলি 'কবিতা' উপদেশ-পূর্ণ। কবিতাগুলির মধ্যে ফল্গুধারার মত একটী অন্তঃস্রোত বিদ্যমান; পাঠক নিপুণ-চিত্তে পাঠ করিলে সে স্রোতে না ডুবিয়া পারিবেন না। কল্পলতায় যে দোষ নাই তাহা নহে, তবে আমরা গুণেরই পক্ষপাতী। এ গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক যে প্রীত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়।

"সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতার-বাদ।" শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রণীত ৬০নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত (২৭ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত) পুস্তক। এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হয়। মাত্র অর্দ্ধ আনার ডাক টিকেট্ পাঠাইলেই পাওয়া যায়। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়-গুরুত্বে মহৎ। লেখকের ভাষাসৌষ্ঠব সাধারণ, কিন্তু ভাব-গৌরব ও যুক্তিজাল অসাধারণ। লেখক বলিতেছেন, মূল মোক্ষ-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে "নিজের সহিত সকল প্রাণীর সমান উপমা ধারণ করিবে। সকল প্রাণীকে নিজের আত্মার ন্যায় ভাল-বাসিবে। কাহারও স্থূল শরীরে ও মনে ক্লেশ দিবে না।" ভাল কথা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে নাস্তিকমত বৌদ্ধমত প্রভৃতির ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে নবীন-বেদান্তি-মতের উপর যে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তাহা অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হইল না। মোটের উপর এই পুস্তক পাঠে যে বহু উপকার লাভ করা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। রচয়িতা ধন্যবাদের পাত্র।

প্রাপ্ত স্বদেশী দ্রব্য সম্বন্ধে মন্তব্য।

শটীফুড্। কলিকাতা বেলিয়াঘাটার ১।২ নং ওয়েষ্ট-ক্যানাল্ রোডের D. Sarkar কোম্পানীর শটীফুড্ ব্যবহারে আনন্দিত হইলাম। শটী আমাদের দেশের সামগ্রী, 'শটীর পালো' সুপথ্য ও বলকারক। বিদেশাগত পথ্য অপেক্ষা ইহা বহুগুণে উত্তম ও এ দেশের লোকের প্রকৃতির উপযোগী। ইহা শিশু-গণের ও রোগীগণের পক্ষে বার্লি প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক উপকারী। শটী-ফুডের বহুল-প্রচলন প্রার্থনীয়। এক টীনের মূল্য সাড়ে চারি আনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন। নির্ব্বাচিত সভাপতিমহাশয়গণের এবং বহু প্রবীণ সাহিত্যসেবী মহাশয়গণের অনুরোধে ও স্থানীয় স্বাস্থ্য-বৈকল্যে যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশন বড়দিনের অবকাশে না হইয়া গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে হইবে—অভ্যর্থনা-সমিতি এইরূপ স্থির করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। ইহাতে চিরাচরিত প্রথার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মহামণ্ডলের মহাধিবেশন। শ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের ষষ্ঠ-মহাধিবেশন আগামী বড় দিনের অবকাশে (২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) মহাতীর্থ শ্রীশ্রীকাশীধামে হইবে—স্থিরীকৃত হইয়াছে। 'মহামণ্ডলে'র বর্ত্তমান নায়ক ধর্ম্মপ্রাণ কাশ্মীরাধিপতি, গিধোরাধিপতি এবং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়গণ হিন্দু-সাধারণকে এই মহাধিবেশনে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। মহামণ্ডল যাহাতে প্রকৃত ভাবে কার্য্যকারী হয়, ভারতীয় বর্ণাশ্রমি-সমাজের যথার্থ কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তানের কর্ত্তব্য। 'মহামণ্ডল' লইয়া কিছুদিন ধরিয়া অনেক আন্দোলন হইতেছে—অনেকবার "অপ্রিয় প্রশ্নাবলী" শুনিতেছি, আশা করি, এবার মহামণ্ডল সুসংস্কৃত হইয়া 'ধর্ম্ম মহামণ্ডল' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

মহাসমিতি। পত্রান্তরে প্রকাশ—এবার বড়দিনের বন্ধে বম্বে নগরে বাণিজ্য-মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। স্যার্ ফজল্ ভাই করিম ভাই মহাশয় বাণিজ্য-মহাসমিতির সভাপতি হইবেন। বম্বে নগরে ঐ সময় জাতীয় মহাসমিতিরও অধিবেশন হইবে। আরও অনেক সমিতির অধিবেশন—ঐ সময়ে বম্বে নগরে হইবে শুনিতেছি। সমিতি-সমূহের সাফল্য সংঘটিত হউক্।

দান। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ—মহোদয় বেলগেছিয়া মেডিকেল স্কুলে দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। স্কুলটী কলেজে পরিণত হইতেছে, এ সময় সাহায্য-প্রাপ্তিতে মহদুপকার সন্দেহ নাই। দাতা অনাময় দীর্ঘ-জীবন লাভ করুন।

সৎকর্ম্ম। রেঙ্গুনের শ্রীযুক্ত এ, কে, জামাল সি, আই, ই, মহোদয় কলিকাতার মুসলমান অনাথাশ্রমে মাসিক ১৫০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অনাথের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনি প্রকৃতই মহাপ্রাণ।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড
৯ম সংখ্যা।
পৌষ।
১৩২২ সাল।
১৮৩৭ শকাব্দ।

বৈষ্ণব-কবি।

(১)

ওহে বৈষ্ণব-কবি!
কোথায় শিখিলে প্রাণারাম গান,
কাহার প্রসাদ লভি?
দেশ কাল ভাব ভুলিয়া সকলি,
রচিলে কেমনে চারু-পদাবলী!
কাব্য-কাননে কোকিল-কাকলী
ঝঙ্কার করি উঠে!
কুঞ্জে কুসুম ফুটে!

(২)

দেখেছিলে কি গো তুমি—
খেলে কালিন্দী-জল-কল্লোল,
কালার চরণ চুমি!
সুদূর দ্বাপরে বাঁশরীর তান্
শুনিয়া যমুনা বহিল উজান;
ঢালে ব্রজবালা তনু মনঃ প্রাণ

মাধবের পদতলে,
হৃদয়ের শতদলে !

(৩)

মুগ্ধা মাধবী রাতি !
চন্দ্রিকা-মোহে হাসিছে ভাসিছে
সুপ্ত তারকা-ভাতি !
অদূরে ঝরিছে স্বর পাপিয়ার
শ্যাম-নিকুঞ্জে রাস, রাধিকার ;
তোমার মানস করে অভিসার
গোপনে তাহার সনে,
প্রেমের বৃন্দাবনে !

(৪)

কেলি-কদম্ব-মূলে,
ত্রিভঙ্গ বাঁকা শিরে শিখীপাখা
গলে মালা বনফুলে !
শ্যামসুন্দর ভুবনমোহন,
রাধিকা-রমণ, রাধিকার মন,
রাসরসাবেশে পুলক-মগন ;—
নিরখিয়া, সে মাধুরী
এনেছ করিয়া চুরি !

(৫)

তোমার প্রেমের ধার—
দুকূল প্লাবিয়া চলেছে ছুটিয়া
শান্তির পারাবার !
অধীর আবেগে আপনা ভুলিয়া
মর্ম্ম-মথন ঊর্ম্মি তুলিয়া,
রভস লালসে হেলিয়া দুলিয়া
গাহিয়া অমিয়গান,
জুড়ায় জগতপ্রাণ !

(৬)

নিবিড় গহন তলে,
কাব্য-সরের অগাধ অসীমে
মাণিক মুকুতা জ্বলে!
জ্বালিয়াছ চির উৎসব-বাতি;
নাচিছ গাইছ প্রেমামোদে মাতি,
পরাণ-সখারে কি দিবস রাতি
আরতি করিছ ধীরে!
ব্যাকুল নয়ন-নীরে!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় থাকিতে পারে না, সুতরাং সাধন-ভজন-প্রণালীও কালভেদে ভিন্ন হইবে। সত্যকালে যাহা উপযোগী ছিল ত্রেতায় তাহা উপযোগী হইতে পারে না; ত্রেতায় যাহা অনুকূল, দ্বাপরে তাহা প্রতিকূল হইবে; আবার দ্বাপরে যাহা অনায়াসসাধ্য ছিল, কলিতে তাহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই পরম কারুণিক ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া কালোপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। অবতীর্ণ ভগবান্‌কে "যুগাবতার" বলে, ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে "যুগ-ধর্ম্ম" বলে। ইহা আমার কল্পিত কথা নহে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এখন দেখা যাক্ কলি-যুগের ধর্ম্ম কি? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রেই বা কি উল্লেখ আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন—

"কৃতেযদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ"।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবং॥

বিষ্ণুপুরাণ, পাদ্মোত্তরখণ্ড, বৃহন্নারদীয় পুরাণ সমস্বরে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন;—

"ধ্যায়ন্ কৃতেযজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্"।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবং॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে একমাত্র কীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল হয়, সুতরাং সত্যের যুগধর্ম্ম ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরের অর্চ্চনা, আর কলির যুগধর্ম্ম কীর্ত্তন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃহন্নারদীয় পুরাণ দৃঢ়তা-সহকারে বলিতেছেন ;—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং"।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেবগতিরন্যথা ॥

এখন দেখা যাক্ ঐ সকল যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কিরূপ বর্ণনা আছে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের "নাম-করণ" সময়ে গর্গ নন্দকে বলিতেছেন ;—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ"।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাঙ্গতঃ ॥

অর্থাৎ তোমার এই বালক প্রতিযুগেই দেহ-ধারণ করিয়া থাকেন। কোনও সময়ে শুক্লবর্ণ, কখনও রক্তবর্ণ, কখনও বা পীতবর্ণ হন। এখন ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ, তাহা আবার একাদশ স্কন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন ;—

"কৃতেশুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ"।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥

সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটাজুটধারী বল্কল-পরিধান কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম-নির্ম্মিত উপবীতধারী, করে অক্ষমালা ও দণ্ড-কমণ্ডলু।

"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ"।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥

ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ চতুর্ব্বাহু ত্রিরাবৃত্ত-মেখলাধারী, স্বর্ণবর্ণকেশ-শোভিত, যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তক-বেদের আত্মা, এবং স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞকাষ্ঠধারী।

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসানিজায়ুধঃ"।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চলক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবসন, চক্রধারী, শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বনমালা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত। পরে ইঁহাদের অর্চ্চনা-মন্ত্রাদি বলিয়া বলিতেছেন—"কলাবপি তথা-শৃণু"—অর্থাৎ এই তোমাদের নিকট সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর-যুগের উপাস্য ভগবানের রূপাদির বিষয় বলা হইল, এখন কলিকালের উপাস্য যিনি, তাঁহার বিষয় শুনঃ—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং স্বাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং"।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তিহিসুমেধসঃ ॥

এখানে 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থ 'শ্যামরূপ' নহে, কিন্তু যিনি অবিরত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলেন অথবা যিনি কৃষ্ণকে বর্ণনা করেন। যদি বলেন এ অর্থ কষ্টকল্পনা, কিন্তু না করিয়া উপায় কি ? আপনিই বা ইহার অন্য কি সরল অর্থ করিতে পারেন ? কৃষ্ণবর্ণ অর্থ কালরূপ, এরূপ যথাশ্রুত অর্থ করিবার সম্ভব নাই, কেননা পরেই রহিয়াছে "ত্বিষাকৃষ্ণং" ইহার সহিত দ্বিরুক্তি হয় ; অকার প্রশ্লেষ করিলেও বিরোধ হয়, সুতরাং কৃষ্ণবর্ণং অর্থ কৃষ্ণকে বর্ণনকারী, "ত্বিষাকৃষ্ণং" ত্বিষা—অকৃষ্ণং গৌরবর্ণং। এ অর্থ জটিল হইলেও 'কৃষ্ণবর্ণং' ইহার সহিত দ্বিরুক্তি ও বিরোধের ভয়ে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইহার অর্থ হইল যিনি গৌরবর্ণ এবং যিনি অবিরত কৃষ্ণ-গুণ গান করেন। "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং" অঙ্গ অর্থ—অংশ। অংশের অবয়বকে উপাঙ্গ বলে। তাহা হইলে অর্থ হইল, তাঁহার নিজের অংশই (অদ্বৈত, নিত্যানন্দ) পাষণ্ড-দলনের তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও অংশের অংশগণ (শ্রীবাসাদি) তাঁহার পারিষদ। তাহা হইলে এখন একবার সমগ্র শ্লোকটির সম্পূর্ণ অর্থের প্রতি মনোযোগ করি। যাঁহার দেহকান্তি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যিনি অবিরত কৃষ্ণ-গুণ গান করেন, এবং নিজ অংশই যাঁহার পাষণ্ড-দলনের তীক্ষ্ণ অস্ত্র এবং অংশের অংশগণ যাঁহার পারিষদ, পণ্ডিতগণ সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চন করিবেন। তিনিই কলি-যুগাবতার, আর কীর্ত্তন-যজ্ঞই কলির যুগ-ধর্ম্ম। পাঠক মহোদয়গণ ! এইটি ইহার সম্প্রদায়-প্রচলিত অর্থ। ইহাতে যদি আপনাদের প্রীতি না হইয়া থাকে * তবে সেই পতিতপাবন দয়ার সাগর সহসা মুহূর্ত্তের জন্য এই অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যেরূপ অর্থ স্ফুরণ করাইয়াছিলেন, তাহা একবার শ্রবণ করুন ;—

কৃষ্ণবর্ণং স্বরূপতঃ ইন্দ্রনীলশ্যামং, অভ্যন্তরে ইতিশেষঃ। ত্বিষা-কান্ত্যা শ্রীরাধায়া ইতিভাবঃ। অকৃষ্ণং গৌরবর্ণং। ত্বিষা ইত্যত্র হেতৌতৃতীয়া স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণোঽপি যঃ প্রিয়াত্বিষাবৃতত্বাৎ গৌরবর্ণঃ ইতিভাবঃ।

অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভ্যন্তরে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, প্রিয়াকান্তি দ্বারা আবৃত থাকায় বাহিরের আভা যাঁহার সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অঙ্গ ও উপাঙ্গ যাঁহার অস্ত্র

---

* প্রীতি না হইবার কারণ, গোস্বামিগণের উক্তি কোটি-সমুদ্র-গভীর, তাহার মর্ম্ম বিনা সাধনে অনুভূত হয় না। সাধন-ভজন বিহীন বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন মাদৃশ ব্যক্তির উক্তি সুখবোধ্য—ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে লেখক, গোস্বামিগণ অপেক্ষা সমধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়া নিজের বাতুলতা প্রকাশ করিতেছেন। লেখক।

ও পার্ষদ, সুধীগণ সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিবেন, সুতরাং তিনিই কলির যুগাবতার ও সঙ্কীর্ত্তনই কলির যুগধর্ম্ম। ভাগবতসন্দর্ভেও বলিয়াছেন ;—

"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং"।

কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃস্ম কৃষ্ণ-চৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহার অভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণ, বহির্দ্দেশ গৌরবর্ণ, অঙ্গোপাঙ্গাদি যাঁহার বৈভব, কলির মানবগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। ইহাতেও যদি সন্দেহ দূর না হয়, তবে আরও স্পষ্টতর প্রমাণ শ্রবণ করুন,—মহাভারতে দান-ধর্ম্মে বিষ্ণুর সহস্র-নাম-স্তোত্রে বলিতেছেন ;—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী"।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশক্তি-পরায়ণঃ ॥

এই সুবর্ণবর্ণ, এই হেমকান্তি বরবপু, এই চন্দনাঙ্গদ-ভূষিত, এই নিষ্ঠাশক্তি-পরায়ণ এই সন্ন্যাসকারী ব্যক্তিটিকে? আরও স্পষ্টতর প্রমাণ চান? উপ-পুরাণে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন ;—

"অহমেবক্কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌপাপহতান্নরান্ ॥

হে ব্রহ্মন্! কলিযুগে সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া পাপহত জনগণকে আমিই হরি-ভক্তি গ্রহণ করাই। ইহাপেক্ষা আর স্পষ্টতর প্রমাণ কি হইতে পারে? আর একটি যুক্তি শুনুন। ধর্ম্ম-স্থাপন জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে, ভগবান্ যথাক্রমে—শুক্ল, রক্ত, শ্যামবর্ণ হইয়া, ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনারূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন একথাও সর্ব্ব-বাদিসম্মত। এখন কলির যুগাবতার কে? যুগধর্ম্ম কি? ইহাই বিচার্য্য। "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ইত্যাদি ভাগবত প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপর-যুগাবতার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। "কলাবপি তথাশৃণু"—এই বাক্যের দ্বারা কলির যুগা-বতার যে পৃথক্ তাহাও বলা হইয়াছে। "ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা হরিনাম-কীর্ত্তনই যে কলির যুগধর্ম্ম তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"—এই শ্লোকপ্রতিপাদ্য যিনি তিনিই কলির যুগাবতার— "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ"—এই শ্লোকাংশ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মই কলির যুগধর্ম্ম—ইহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই, সুতরাং সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু ভাগবতের—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"—এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য যে মহাপ্রভু, বিরুদ্ধবাদিগণ ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য

এই যে, ঐ শ্লোক গৌরাবতারের প্রতিপাদক না হয় না হউক্, কিন্তু ঐ শ্লোক-প্রতিপাদ্য অবতার কে? বিরুদ্ধবাদিগণ কলিতে মাত্র দুটি অবতার স্বীকার করেন—বুদ্ধ ও কল্কী। তন্মধ্যে বুদ্ধ অতীত ও কল্কী ভবিষ্য। ঐ শ্লোক বুদ্ধদেবকে বুঝাইতে পারে না, কারণ তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না, পীতবর্ণও ছিলেন না। "মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য দ্বিভূজা চিকুরোজ্ঝিতা"—তাঁহার বর্ণ পাটল; পাটল অর্থ শ্বেতরক্ত-মিশ্রিত বর্ণ, পীতবর্ণ নহে। যদি বলেন "ত্বিষাকৃষ্ণং" এখানে 'অকৃষ্ণ' শব্দও কেবল পীতবর্ণ বুঝায় না, কৃষ্ণ ভিন্ন সকল বর্ণই বুঝাইতে পারে। তাহা হইলেও বলা যায় যে, তিনি কীর্ত্তন-প্রচারক নহেন, তিনি জ্ঞান-প্রচারক ও ধ্যান-পরায়ণ। ধ্যান সত্যের ধর্ম্ম। ভাগবতের মধ্যেই উল্লিখিত আছে যে অসুর-মোহনের জন্যই বুদ্ধাবতার, যুগধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নহে। বুদ্ধের ভক্তগণও তাঁহাকে কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করেন না। কল্কী ও কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ নহেন, শুক্লবর্ণ। তিনি কীর্ত্তন-প্রচারক নহেন এবং তিনি অন্তিম-কলিতে ম্লেচ্ছ নিধন জন্য আসিবেন, যুগধর্ম্ম-প্রচার জন্য নহে। তাঁহার কথাও স্বতন্ত্ররূপে ভাগবতে বর্ণিত আছে। সুতরাং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"—শ্লোকের প্রতিপাদ্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ব্যতীত আর কে হইবেন? এই কলি-যুগাবতার যে প্রচ্ছন্ন, তৎসম্বন্ধে একটি প্রমাণ বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব। ভগবানের এক নাম 'ত্রিযুগ'। ভগবান্ শ্রীমতীর ভাবকান্তি দ্বারা মন ও দেহ আবৃত রাখায় কলিতে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। অন্য তিন যুগে ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা ব্যক্ত থাকেন। কিন্তু ভক্তের কাছে কিছুই লুকাইবার সাধ্য নাই, তাই তিনি অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ভক্ত-কুল-চূড়ামণি প্রহ্লাদ স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বং" ॥

অর্থাৎ কলিযুগে তুমি (প্রিয়াকান্তি দ্বারা) আবৃত থাক বলিয়া তোমাকে লোকে "ত্রিযুগ" বলিয়া থাকে। "ছন্ন" পদটি আচ্ছাদনার্থক 'ছদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সুতরাং ইহার অর্থ "আবৃত হইয়া অবতীর্ণ হওয়া" একেবারেই অবতীর্ণ না হওয়া নহে। কলিকালে যদি একেবারেই অবতার অস্বীকার করেন, তবে বুদ্ধ কল্কী সম্বন্ধে কি বলিবেন? সুতরাং আশা করি, "মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছুই নাই" বোধ হয় এ কথা বিতণ্ডালিপ্সু ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই বলিবেন না। বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও আমাদের শাস্ত্রে ইহার অধিক প্রমাণ নাই।

বিপক্ষবাদিগণ আর এক আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মহাপ্রভু যে, অবতার তাহা তিনি নিজ মুখে কখনও বলেন নাই, পরন্তু কেহ তাঁহাকে অবতার

বলিলে তিনি অপরাধ হইল বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন। হাঁ, তিনি কখনও কখনও সেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অন্য, তাহা পরে বলিব। তিনি নিজমুখেও নিজের পরিচয় দিয়াছেন তাহার বহুল প্রমাণ বহুগ্রন্থে আছে, তন্মধ্যে চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ড হইতে সামান্য কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"আরে আরে কংস যে মারিল সে মুই।"
আরে নেড়া সকল জানিস দেখ্ তুই ॥
অব, ভব, শেষ, রমা, করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বাসুদেবা ॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল ॥
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ।
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ ॥
মুই সে ধরিনু গিরি দিয়া বাম হাত।
মুই সে আনিনু স্বর্গ হইতে পারিজাত ॥
মুই সে ছলিনু বলি করিনু প্রসাদ।
মুই সে হিরণ্য মারি রাখিনু প্রহ্লাদ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আহার-তত্ত্ব।

প্রাণ-ধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন সর্ব্বসম্মত। শরীরযন্ত্রের চালনার ফলে যে সকল উপকরণের অপচয় হয় তাহার যোগ্য প্রপূরণ এবং যে সকল মল-দ্রব্য অতিরিক্তমাত্রায় দেহে উপচিত হয় তাহার যথোচিত নিঃসারণ না ঘটিলে প্রাণরক্ষার পথ ক্রমেই কণ্টকিত হইতে থাকে। দীর্ঘকাল এই আদান ও বিসর্গ উপযুক্ত-ভাবে না চলিলে দেহ, রোগের কবলে পতিত হয়; পরিণামে রোগের তাড়নে ও পীড়নে প্রাণপক্ষী অকালে অকর্ম্মণ্য দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই অনিষ্টকর ব্যাপারের প্রতীকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আদান ও বিসর্গ অর্থাৎ খাদ্য-পানীয়াদি-গ্রহণ এবং মল-মূত্রাদি-ত্যাগ যথাবিধানে সম্পাদন

করিবার জন্য চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। মল-মূত্রাদি-ত্যাগের শাস্ত্রীয় বিধান, বর্ত্তমানে আর প্রতিপালিত হয় না। ইহাতে যে আমরা ক্রমে অলক্ষ্যে স্বাস্থ্য-হানির গণ্ডীতে প্রবেশ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যথাকালে মল-মূত্রাদি-প্রবৃত্তি প্রধানতঃ আহার-সৌষ্ঠবের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং, আমরা এই প্রবন্ধে আহার-তত্ত্বের আলোচনাই করিব।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের বক্ষে অনিয়মের বা উচ্ছৃঙ্খলতার ঝটিকাবর্ত্ত চলিতেছে। আহারের কাল, মাত্রা, ইতিকর্ত্তব্যতাদির বিচার এখন আর দেখা যায় না। প্রায় সকলেই "সুশীল ও সুবোধ বালকের মত" যখন তখন "যাহা পান তাহাই খান।" এরূপ অবস্থায় এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রের অভিপ্রায় প্রচারিত হওয়া সঙ্গত, মনে হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের প্রচারক সত্যদ্রষ্টা মনীষিগণ স্থূলভাবে যে আহারকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই—"যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ। যাম-মধ্যে রসোৎপত্তিঃ যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ।" (দিনে ও রাত্রিতে) এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না, আবার দুই প্রহরের পরেও ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে দেহে রস-বৃদ্ধি হয়, আর দুই প্রহরের পরে ভোজন করিলে বল-হানি হয়। ইহাতে বুঝা যায়, এক প্রহরের মধ্যে পাকস্থলীর বিশুদ্ধি ঘটে না—আমরস সম্পূর্ণ শোষিত হয় না—আর দুই প্রহরের পরে পাকস্থলীস্থ সমস্ত উপকরণ নিঃশেষিত হওয়ায় অন্য আহার্য্য না পাইয়া যন্ত্র সকল ক্লান্ত হইয়া পড়ে—শরীরের ক্ষয় উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় এক প্রহরের পর ও দুই প্রহরের মধ্যে ক্ষুধা, অভ্যাস ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"অহনিচ তথা তমস্বিন্যাং সার্দ্ধ প্রহর যামান্তঃ" দিনে ও রাত্রিতে দেড় প্রহরের সময় আহার বিধেয়। এই সময়-নির্দ্ধারণ স্থূলভাবে করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্ম উপদেশও ইহার মধ্যেই বিদ্যমান আছে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, যতক্ষণ না উদর-শুদ্ধি হয় ততক্ষণ আহার করা কর্ত্তব্য নহে, আবার যখন পরিপাক-যন্ত্র আহার্য্যের অভাবে কাতর হইয়া পড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া আহার করাও কর্ত্তব্য নহে। মধ্যপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যখন উপকরণের অভাব হইবে, তখন পূরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে দিলেও হইবে না, পরে দিলেও চলিবে না। আহারের সম্বন্ধে সুশ্রুত-সংহিতায় উত্তর-তন্ত্রে যুক্তিপূর্ণ ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে। সুশ্রুতে দেখা যায়—

বিসৃষ্টে বিন্মুত্রে বিশদকরণে দেহে চ সুলঘৌ—
বিশুদ্ধে চোদ্গারে হৃদি সুবিমলে বাতে চ সরতি,

তথান্ন-শ্রদ্ধায়াং ক্ষুদুপগমনে কুক্ষৌচ শিথিলে
প্রদেয়স্ত্বাহারো ভবতি ভিষজা কালঃ সতু মতঃ।

দেহে মলমূত্র সঞ্চিত থাকিতে আহার করা কর্ত্তব্য নয়। উদর ও মূত্রাধার পরিষ্কৃত হইলে অর্থাৎ উক্ত স্থানে ভার-বোধ বা বেদনাদি না থাকিলে, ইন্দ্রিয়গণ বিশদ ভাব লাভ করিলে, দেহ লঘুতাপ্রাপ্ত (ঝরঝরে) হইলে, উদ্গারশুদ্ধি ঘটিলে, হৃদয় বিমলতা প্রাপ্ত হইলে, অপানবায়ু (দুর্গন্ধি-শূন্য হইয়া) সহজতঃ প্রবৃত্ত হইলে, অন্নে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলে, ক্ষুধার উদয় হইলে, কুক্ষি শিথিল হইলে চিকিৎসক আহার ব্যবস্থা করিবেন, কারণ ঐ সময় আহার-গ্রহণই সঙ্গত। কোষ্ঠ-শুদ্ধি না হইলে, ইন্দ্রিয়ের বিকার ঘটিলে, দেহে ভার-বোধ হইলে, উদ্গারে বিকৃত স্বাদ বা অনুচিত গন্ধ থাকিলে, হৃদয়ে বিকৃতি থাকিলে, অপানবায়ুর দোষ থাকিলে, অন্নে রুচি না হইলে, ভালরূপ ক্ষুধা না হইলে, কুক্ষিতে জড়তা ও ভারবোধ থাকিলে বুঝিতে হইবে—শরীর স্বাভাবিক নহে, সুতরাং আহারকাল দূরবর্ত্তী। আহার-কালের এই পরিচয়, রোগ-শূন্যতা স্বাস্থ্য ও ভুক্তদ্রব্য সুজীর্ণ হওয়া বুঝাইয়া দেয়। বস্তুতঃ ভুক্তদ্রব্য সুজীর্ণ হইলে ঐ ভাব না হওয়া বিচিত্র। আমরা সুত-রাংই বুঝিলাম, পূর্ব্বভুক্ত সুজীর্ণ হইলে ও শরীর মল-দোষবর্জ্জিত হইলেই আহার-কাল উপস্থিত হইবে। এই সময়, অভ্যাস ও অবস্থা অনুসারে যখন তখন হইতে পারে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সুদীর্ঘকালের বহুদর্শনের ফলে বুঝিয়া ছিলেন যে, এতদ্দেশের জল বায়ু প্রভৃতির অনুকূলে সাময়িক অবস্থানু-সারে মানব-প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন সুসম্ভব, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে গেলে, স্থানীয় বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে গেলে, প্রতি-দিন এক প্রহরের পর দুই প্রহরের পূর্ব্বে যে কোনও নিয়মিত সময়ে আহারের অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য। কেবল শারীরবিজ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিলে মনে হইতে পারে "অন্য সময়ে আহার করা অভ্যাস করিয়াও অনেকে সুস্থ আছেন, সুতরাং ঐরূপ সময়-নির্দ্ধারণ অবৈজ্ঞানিক" কিন্তু মনে রাখা উচিত, এতদ্দেশীয় বহিঃ-প্রকৃতির সহিত জীব-প্রকৃতির সামঞ্জস্যরক্ষাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যগণ ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন; ধর্ম্মভাবশূন্য জীবন অপেক্ষা ধর্ম্মভাবযুক্ত মরণকেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। এই জন্য তাঁহাদের সময়-নির্দ্ধারণ আধ্যাত্মিক-ভাব-পূর্ণ জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের অনুকূলেই হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। তাঁহারা ধর্ম্ম-বিকাশের জন্য দৈনন্দিন যে সমস্ত কার্য্যের (পঞ্চ-মহাযজ্ঞ প্রভৃতির) অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন

হইলে চিত্তযন্ত্রে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুর প্রকাশ পাইবার সুবিধা হয়, সেইগুলির সমাপ্তি হইলেই আধ্যাত্মিক মঙ্গলের অনুকূল আহার-গ্রহণের সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-জীবনের দিকে বেশী লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সময়-নির্ণয় করিয়াছেন।

ঋষিগণ "অখাদ্য" গুলিকে প্রাণরক্ষার সর্ব্বথা প্রতিকূল মনে করিতেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু অখাদ্য গুলিকে যে ধর্ম্মরক্ষার সর্ব্বথা প্রতিকূল মনে করিতেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারিব, আর্য্যগণ আহার-বিধানে, দেহ-রক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষার দিকে বেশী ঝোঁক্ দিয়াছেন। এই কারণেই দ্রব্যগুণ-বিধান-শাস্ত্রে অখাদ্য-দ্রব্যের অনিষ্টকারিতার বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাই মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে, কেননা, উহাদের অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর দ্রব্যও 'খাদ্য' মধ্যে স্থান পাইয়াছে অথচ উহারা 'অখাদ্য' বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সুতরাং এরূপ বুঝা সহজ হইবে না। মনে হয়, ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ যাহাকে অখাদ্য বলিয়াছেন, তাহাদের নিন্দা করিয়া প্রকারান্তরে পরিত্যাগ করিতে বলাই দ্রব্যগুণ-বিজ্ঞবর্গের অভিপ্রায়। তবে যেখানে কোনও নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য প্রাণ-রক্ষার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়, তখন তাহা অখাদ্য হইলেও শাস্ত্রকারগণ তাহার ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছেন। আপাততঃ প্রাণরক্ষা করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়ার অবসর মিলিবে—এই ভাবিয়া প্রাণ-সঙ্কট অবস্থায় অখাদ্যের ব্যবহার সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনে "সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তথাদর্শনাৎ" এই সূত্রে দেখা যায়, ব্রাহ্মণনন্দন প্রাণ-রক্ষার্থ গজ-পালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছেন। "কেবল প্রাণ-রক্ষার্থ" এই টুকু মনে রাখিতে হইবে। গজ-পালের উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ ভক্ষণ করিতে ব্রাহ্মণনন্দন কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু পরে জলপান করিতে সম্মত হন নাই। কুল্মাষ ভক্ষণে তাঁহার জীবন-রক্ষা হইলে আর তিনি গজ-পালের জলপান করিতে যাইবেন কেন? "ঔষধার্থে সুরা-পান"—ব্যবস্থাও এই জাতীয়। ইহাতে সর্ব্বত্র অখাদ্যের অনুমোদন করা হয় না, অবস্থা-বিশেষে প্রাণ-রক্ষার্থ নিয়ম-ভঙ্গ করিয়া পরবর্ত্তিকালে তাহার প্রতীকার করা চলে—এই টুকুমাত্র বলা হয়। "খাদ্য" শব্দের অর্থ—ধর্ম্মের অবিরোধে দেহ-রক্ষক বস্তু, আর 'অখাদ্য' অর্থ—ধর্ম্ম-হানিকর ও স্বাস্থ্য-হানিকর বস্তু। 'অখাদ্য' যখন প্রাণরক্ষার সহায় হয় তখন উহা অনুমোদিত হয়, সুতরাং তখন উহা আর খাঁটী অখাদ্য নহে, কথঞ্চিৎ খাদ্যই; তবে খাঁটী খাদ্য নহে, কারণ উহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার-বিধান শিথিল হওয়ায় দেশে স্বাস্থ্য-হানি ও

ধর্ম্ম-হানি ঘটিতেছে। ধর্ম্ম-হানি ও স্বাস্থ্য-হানি সর্ব্বত্র সমসাময়িক না হইলেও ধর্ম্ম-হানি হইতেই যে সর্ব্ববিধ হানির আবির্ভাব হয়, তাহাতে সংশয় নাই। আহারকাল-বিচার যেমন দরকারী, খাদ্যাখাদ্য-বিচার ততোধিক প্রয়োজনীয়।

আহারকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আহার করা অন্যায়—একথা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিতেছেন। সুশ্রুতে আছে—

অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানঃ শরীরে হ্যলঘৌনরঃ।
তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণং বা নিয়চ্ছতি।
অতীতকালে ভুঞ্জানো বায়ুনোপহতেঽনলে।
কৃচ্ছ্রাদ্বিপচ্যতে ভুক্তং দ্বিতীয়ঞ্চ ন কাঙ্ক্ষতি॥

আহারকালের পূর্ব্বে শরীর লঘু হয় না, শরীরে ভার-বোধ থাকে, সুতরাং তখন ভোজন করিলে অজীর্ণ উপস্থিত হয়, ক্রমে নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হয়, পরিণামে মরণ সম্মুখীন হইয়া সকল শেষ করিয়া দেয়। আর আহারকাল অতীত হইলে পরে উদরাগ্নি বায়ু দ্বারা উপহত হয়, তখন আহার করিলে কষ্টে তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পরিপাকে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় পরবেলায় আহারকালে ক্ষুধার উদয় হয় না, শরীর-শুদ্ধি হয় না। অগ্নিমান্দ্য ক্রমে নানা-রোগ আহ্বান করিয়া আনে। প্রতীকার না করিলে পরিণামে অমঙ্গল হইতে পারে। এই উপদেশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করা কর্ত্তব্য। অদ্য প্রাতে—কল্য মধ্যাহ্নে—পরশ্বঃ অপরাহ্নে এই ভাবে আহার করা কেবল উদরাগ্নির প্রতি অসদ্ব্যবহার করা মাত্র। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন আহার করা কর্ত্তব্য, এই কথা বুঝাইবার জন্যই আমাদের এই বিষয়ের আলোচনা।

আহার সম্বন্ধে চরক-সংহিতায় এইরূপ সাধারণ উপদেশ দেখা যায়—"নারত্নপাণির্নাস্নাতো নোপহতবাসা নাজপিত্বা নাহুত্বা দেবতাভ্যো নিরূপ্য পিতৃভ্যো নাদত্ত্বা গুরুভ্যো নাতিথিভ্যোনোপাসিতেভ্যঃ নাপুণ্যগন্ধঃ নামালী নাপ্রক্ষালিত-পাণিপাদ-বদনো নাশুদ্ধমুখোনোদঙ্মুখোন বিমনা নাভক্তাশিষ্টাশুচিক্ষুধিতপরি-বারো ন পাত্রীষ্বমেধ্যাসু নাদেশে নাকালে নাকীর্ণে নাদত্ত্বাগ্র্যমগ্নয়ে নাপ্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ ন মন্ত্রৈরনভিমন্ত্রিতং ন কুৎসয়ন্ ন কুৎসিতং ন প্রতিকূলোপহিত-মন্নমাদদীত, ন পর্য্যুষিতমন্যত্র মাংস-হরিতক-শুষ্কশাক-ফল-ভক্ষ্যেভ্যঃ নাশেষ-ভুক্ স্যাদন্যত্র দধি মধু শক্তুলবণ-সর্পিভ্যঃ" অর্থাৎ হস্তে রত্নধারণ না করিয়া, স্নান না করিয়া, বস্ত্র-ত্যাগ না করিয়া, জপ না করিয়া, হোম না করিয়া, দেবপূজা না করিয়া, পিতৃলোকের উদ্দেশে দান অর্থাৎ দৈনন্দিন শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করিয়া,

গুরু, অতিথি ও আশ্রিতগণকে না দিয়া, গন্ধ-দ্রব্য-ব্যবহার না করিয়া, মাল্য-ধারণ না করিয়া, হস্ত পদ ও মুখ না ধুইয়া, মুখ-শোধন না করিয়া, উত্তরমুখ হইয়া, অন্যমনা হইয়া, অভক্ত অশিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত পরিচারক-পরিবৃত হইয়া, অন্নপাত্র অপবিত্র হইলে, ভোজনস্থল অপ্রশস্ত হইলে, ভোজনকাল উপস্থিত না হইলে বা অতিক্রান্ত হইলে, সঙ্কীর্ণ সময়ে বা অন্যজাতীয় ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, অগ্নিতে ভোজ্যাগ্রভাগ না দিয়া অর্থাৎ অন্ন দ্বারা হোম না করিয়া, প্রোক্ষণ-জল দ্বারা অন্ন প্রোক্ষিত না করিয়া, মন্ত্র দ্বারা অন্ন অভিমন্ত্রিত না করিয়া, অন্নের নিন্দা করিয়া, অন্ন নিন্দিত হইলে, শত্রু নিকটে থাকিলে বা শত্রুকর্তৃক আনীত হইলে (সে অন্ন) ভোজন করিবে না। পর্য্যুষিত অন্ন-ভোজন করিবে না, কিন্তু মাংস, আর্দ্রক, শুষ্ক শাক, শুষ্ক ফল পর্য্যুষিত হইলেও ভোজন করিবে। ভোজনপাত্রে ভোজ্যদ্রব্যের শেষ রক্ষা করিবে, নিঃশেষ করিয়া খাইবে না, কিন্তু দধি মধু লবণ ঘৃত ও ছাতু নিঃশেষ করিয়া খাইবে।

হস্তে রত্নধারণ, যেমন চিত্তের প্রসাদ-জনক তেমনই পক্ষান্তরে শরীরের হিতকারক। রত্নধারণে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী সবল হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির সাম্য রক্ষিত হয়, সুতরাং রত্নধারণ উপকারক, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। স্নানের পর শরীর নির্ম্মল হয়, মন প্রফুল্ল হয়, শরীরে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার অবাধ প্রসারে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যন্ত্রগুলি উল্লাস লাভ করে; আহার করিবার উহাই যোগ্য সময়। পূর্ব্ববস্ত্রত্যাগ ও শুচিবস্ত্রপরিধান করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। রাত্রিবাস পরিধান করিয়া আহার করা সঙ্গত নয়। স্নান ও বস্ত্র-ত্যাগ না করিলে শরীরে বহু মল ও কীটাণু সঞ্চিত থাকে, তাহা দ্বারা শরীরের অনিষ্ট হয়। মলাদি, ভক্ষ্যদ্রব্যে মিশিলে অক্লেশে রোগোৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং ঐ সমস্ত পরিহার করা কর্ত্তব্য। জপ, হোম, দেবপূজা, পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি না করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য নয়। স্নানের পর স্থিরচিত্তে সুস্থশরীরে জপ-হোম-পূজাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে, পক্ষান্তরে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয়—প্রকারান্তরে জগন্মঙ্গলের একাংশ সম্পাদন করিতে চেষ্টাবান্ হয়। জপ, হোম, তর্পণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যাপার হইলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞান এগুলির প্রতি প্রচুর সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই আর্য্য-সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব। গুরু, অতিথি ও আশ্রিতগণকে খাওয়াইয়া শেষে খাওয়া শিষ্টাচার-সম্মত। নিজে ইহাদের আগে খাওয়া মূঢ়তা-ব্যঞ্জক ও শিষ্টমর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জন্য অপরাধজনক। উহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। গন্ধদ্রব্য-ব্যবহার ও মাল্য-ধারণ, মনের স্ফূর্ত্তিদায়ক

স্বাস্থ্য-জনক দূষিত কীটাণুবারক ও দুর্গন্ধবিনাশক, সুতরাং হিতকর। হাত পা ও মুখ ধুইয়া আহার করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে "পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ" ২ হস্ত ২ পদ ও মুখ—এই পাঁচ স্থান ধৌত করিয়া শরীর সুস্থ করিয়া পরে আহার করিবে। বর্ত্তমানেও শুনা যায়, বারম্বার হাত-পা-মুখ ধোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় ভাল। জাপানীরা নাকি ঐরূপ করিয়া থাকেন। শরীরের যে সকল স্নায়ুকেন্দ্র শীতল জল দিয়া ধৌত করিয়া আহার করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ হয়, তাহাই আর্য্য-ঋষিরা "পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ" বিধানে বুঝাইয়াছেন। ভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আর্দ্রক দ্বারায় মুখ-শোধন করিয়া দুর্গন্ধনাশ ও অগ্নিদীপন এবং রুচি-বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। কথিত আছে যে, উত্তরমুখে ভোজন করিলে পুত্রের অকল্যাণ হইতে পারে। এই নিষেধ বুঝিবার মত জ্ঞানোন্নতি এখনও বর্ত্তমান সভ্য-জগতে হয় নাই। অন্যমনা হইয়া খাইলে লালাস্রাব অল্প হয়, পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং "তন্মনা" হইয়া খাইতে হইবে। পরিচারকগণ ক্ষুধার্ত্ত অশিষ্ট অভক্ত হইলে আগে তাহাদিগকে আহার করাইয়া শান্ত করিয়া লওয়া উচিত, নচেৎ তাহারা অসন্তুষ্টচিত্তে তাকাইয়া থাকিবে, মনঃ-সংযোগে বাধা হইবে, উৎকণ্ঠায় পরিপাকের বাধা ঘটিবে, বায়ু-বৃদ্ধি হইবে। অন্যবিধ অনিষ্টও হইতে পারে। পাত্র অপবিত্র হইলে তাহাতে অন্ন-ভোজন রোগজনক হয়। ভোজনস্থান ভাল হওয়া চাই, দুর্গন্ধময় অপবিত্র ও বায়ু-সঞ্চার-রহিত হওয়া উচিত নয়। নিকৃষ্ট-জাতি-স্পৃষ্ট-খাদ্য শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, উহাতে অনিষ্ট হইতে পারে। নীচগণের দেহে বস্ত্রে এমন কি তাহাদের দেহচতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে পর্য্যন্ত অনিষ্টকর বীজাণু বাস করে। তাহা তাহাদের পক্ষে অহিতকর হয় না, কিন্তু ভদ্রলোকের অহিতকর হইয়া থাকে—একথা বৈজ্ঞানিকগণ বলেন। সুতরাং, নীচলোকের স্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করা সঙ্গত নহে। ভোজনকালের পূর্ব্বে বা ভোজনকাল অতিবাহিত হইলে ভোজন করা অন্যায়, ইহার কারণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অল্পসময়ে ব্যস্তভাবে খাওয়া সঙ্গত নয়, তাহাতে ভক্ষ্য দ্রব্য সুন্দররূপে চর্ব্বিত না হওয়ায় পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। প্রোক্ষিত অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে খাদ্যের পবিত্রতা-রক্ষার্থ আগন্তুক-দোষ-বিঘাতার্থ খাদ্যে প্রোক্ষণজলের ছিটা দেওয়া হইত; উহা হিতকরই ছিল। মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক ভোজন কর্ত্তব্য। অন্নকে পবিত্র হবিঃ-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, ভোজনকে প্রাণাগ্নিহোত্র রূপে বুঝিয়া, ভোজন করিলে, ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণ হইতে পারে। ভোজ্য-দ্রব্যের নিন্দা করায় তৎপ্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, ফলে পরিপাকের বাধা ঘটে। কুৎসিত অন্ন, স্বাস্থ্য-হানিকারক

ও ধর্ম্মনাশক। শত্রুদত্ত অন্ন, প্রাণ-নাশের কারণ হইতে পারে। শত্রু কাছে থাকিলে উৎকণ্ঠিতচিত্তে ভোজন করায় পরিপাকের বাধা হয়—অন্যবিধ বিপদের আশঙ্কাও আছে। পর্য্যুষিত অন্ন অস্বাস্থ্যকর। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—পর্য্যুষিত খাদ্য তামস-ভাবের উত্তেজক। ঐ খাদ্য খাইলে তমোগুণ প্রবলতা লাভ করে, ধর্ম্মভাব শিথিল হয়, সুতরাং উহা অখাদ্য। মাংসাদি পর্য্যুষিত হইলেও বোধ হয় তত অপকারী হয় না, সেই জন্য চরক-সংহিতাকার ওগুলিকে বাদ দিয়াছেন। 'সর্ব্বং সশেষং ভোক্তব্যং' শাস্ত্রের আদেশ। নিজের অতিভোজন না হয়, প্রাণিগণও কিছু পাইতে পারে, এই উভয়দিকে লক্ষ্য করিলে ভোজন-পাত্রে শেষ রাখিতে হয়। তবে যে সমস্ত দ্রব্য দীর্ঘকাল পাত্রে থাকিলে অপরের পক্ষে অব্যবহার্য্য হইবার সম্ভাবনা, সেগুলিই নিঃশেষ করিয়া খাওয়া সঙ্গত। "নিঃশেষং দধি পায়সম্" ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা। দধি, পাত্রে পড়িয়া থাকিলে অনিষ্টকর হয়, পাত্রও খারাপ হয়; পায়স প্রভৃতিও তাই। সেই জন্য ওগুলিকে রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বারান্তরে আহার-তত্ত্বের অপরাংশের আলোচনা করিব।

শ্রীপ্রবোধানন্দ শর্ম্মা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮

অন্বয়। এবং (এবম্প্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (বশীকুর্ব্বন্) বিগতকল্মষঃ (বিগতপাপঃ) যোগী সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপং) অত্যন্তং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) সুখং অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) (স জীবন্মুক্তো ভবতীতি ভাবঃ)। ২৮

বঙ্গানুবাদ। এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-স্বরূপ অত্যন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ২৮

আলোচনা। বিষয়-ভোগ-বাসনা সুখ-দুঃখ-পাপ-পুণ্য-ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা মনকে আত্মাতে সমাহিত করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ

করিবার পথে বহু বিঘ্ন। ক্বচিৎ কোনও সাধকের একজন্মে ইহা ঘটে। কাহারও একাধিক জন্মে সম্ভব হইতে পারে। একেত মানবচিত্ত চঞ্চল ভোগলোলুপ, তাহারপর যদিও পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় মনকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারা যায়, তথাপি যোগ সমাধির অন্তরায় অনেক। যোগশাস্ত্রমতে যোগ সমাধির ৯টী অন্তরায়। যথা—১। ব্যাধি ২। মানসিক জড়তা ৩। সংশয় ৪। প্রমাদ ৫। আলস্য ৬। চঞ্চলতা ৭। ভ্রান্তি-দর্শন ৮। একাগ্রতা লাভ না করা ৯। অনবস্থিতত্ব। এই কয়েকটী চিত্তবিক্ষেপ অন্তরায়। "ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্ত-বিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ" (১ অ ৩০ যোগসূত্র) ইহার বিস্তৃত লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই নয়টী দোষের পরিহারের জন্য যোগসূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধানের উল্লেখ আছে। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" (যোগসূত্র ১ অ ২৩ সূত্র) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও সমাধি-লাভ হয়। বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া "ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক্" এই প্রকার সংকল্প-সহকারে যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের তাদৃশ ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধি-লাভ সুলভ হয়। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা—প্রণিধানাদ্ ভক্তি-বিশেষাৎ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যান মাত্রেণ তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধি-লাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি।" (১ অঃ ২৩ সূ ব্যাসভাষ্য) ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি সংশয় আলস্য প্রভৃতি বিক্ষেপক অন্তরায় সকল দূরে যায়—যোগীর আত্মার স্বরূপ-দর্শন হয়। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কঠোর একাগ্র দৃঢ় বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাঁহারাই অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধন দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন—আর যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কোমল, অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনের কঠোরতা-সহনে অসমর্থ, তাঁহারা ভক্তি-পথাবলম্বী হইয়া "ঈশ্বর-প্রণিধান" রূপ ভক্তি-যোগের সাধন দ্বারা সমস্তবাধাবিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন—এই মর্ম্মেই গীতার এই শ্লোকে "সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শং" অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্ম-লাভ উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে অষ্টাঙ্গ-যোগের সফলতা হইতেও ভক্তি-যোগের সুগমতা বলা হইয়াছে। ২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

অন্বয়। যোগযুক্তাত্মা (যোগসমাহিতচিত্তঃ) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তেষু নির্ব্বিশেষং দর্শনং জ্ঞানং যস্য) (স যোগী) আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং (ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তান্তরেষু অবস্থিতং) সর্ব্বভূতানিচ আত্মনি (অভেদেন) ঈক্ষতে।২৯

বঙ্গানুবাদ। যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন। ২৯

আলোচনা। যতক্ষণ যোগীর চিত্ত, নির্বিঘ্ন যোগ-সমাধি-লাভ না করে, ততক্ষণ এই দৃশ্যমান সংসারের সমস্ত বস্তুতেই স্বতন্ত্রতা উপলব্ধ হয়। অবাধ সমাধিলাভ হইলে আর সেরূপ হইতে পারে না। যোগযুক্তাবস্থায় স্বাতন্ত্র্য-দৃষ্টি বা বৈষম্যবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। তখন জগৎ আত্মময় ও আত্মাতেই জগতের বিকাশ উপলব্ধ হয়। এই ভাব—ভাষার বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয় মাত্র। ২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

অন্বয়। যঃ মাং (পরমেশ্বরং) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) পশ্যতি ময়িচ সর্ব্বং (প্রাণি-মাত্রং) পশ্যতি তস্য অহং ন প্রণশ্যামি (ন পরোক্ষো-ভবামি) স চ মে ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্যো ভবতি) ৩০

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ, সর্ব্বভূতে আমাকে দেখেন এবং আমাতেই সর্ব্বভূত-দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। ৫০

আলোচনা। শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন, যোগীর অবাধ সমাধি-লাভ হইলে জগৎ ব্রহ্ম ও জীবাত্মার স্বতন্ত্রতা-জ্ঞান থাকে না। এই শ্লোকে বলিতেছেন, যাঁহার সর্ব্বভূতে তাদৃশ অভেদ-জ্ঞান হয়, আমি কখন সেই যোগীর পরোক্ষ হই না, সে যোগীও কখন আমার অদৃশ্য হন না—অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টিপাতে তাঁহাকে অনুগ্রহ করি। সাধন-বলে ব্রহ্মলাভ করিলে যোগী ব্রহ্মানুগৃহীত হইয়া পরস্পর অবিচ্ছিন্ন হন। ৩০

সর্ব্বভূত-স্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগীময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১

অন্বয়। যঃ (যোগী) সর্ব্বভূতস্থিতং মাং একত্বং আস্থিতঃ ('অভেদং' আশ্রিত্য) ভজতি (সমারাধতে) সঃ যোগী সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) বর্ত্তমানঃ অপি ময়ি বর্ত্ততে। (সাযুজ্যভাবং প্রাপ্য বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ)। ৩১

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ আমাকে আপনার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া ভজনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অভিন্নরূপে অবস্থিতি করেন। ৩১

আলোচনা। পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যোগী সমাধি-লাভ করিয়া

যখন জগৎ ব্রহ্ম ও জীবাত্মাতে অভেদ-জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি আমার প্রত্যক্ষানুগ্রহীত হন। এই শ্লোকে বলিতেছেন, সেই সমাধিসম্পন্ন আমাতে অভিন্ন-জ্ঞানযুক্ত যোগী আমাতেই অবস্থিতি করেন অর্থাৎ তিনি "সাযুজ্য"-গতি প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।

বেদান্তসূত্র উপনিষৎ ও গীতার মতে ব্রহ্মই জীব-জগতের উৎপত্তি-স্থিতিলয়ের স্থান। ব্রহ্মই জগতের চরম প্রাপ্য। ব্রহ্ম হইতেই জগৎ জাত হয়, আবার ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য। সেই পূর্ণতা লাভ করার নামই জীবের মুক্তি। সাধন-কৌশল-ক্রমে পুরুষ যখন সেই চরম লক্ষ্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহাকে সমাধিস্থ বলা যায়। সমাধিস্থ পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া বলিতে পারেন "সোঽহং" আমিই তিনি "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি হই ব্রহ্ম। তখন আমিত্ব নাই, আমি ও ব্রহ্মে অভেদ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মা ব্রহ্ম, অন্য কিছু নয়। "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমি তিনি হও' এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ, সে সময় প্রতীত হয়। তখন উপাস্য-উপাসক-ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়। ৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥ ৩২

অন্বয়। হে অর্জ্জুন যঃ সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) সুখং বা যদি বা দুঃখং আত্মৌপম্যেন (স্ব সাদৃশ্যেন) সমং পশ্যতি স যোগী পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মতঃ (মম অভিমত ইত্যর্থঃ)। ৩২

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী অন্যের সুখ বা দুঃখকে আপনার সুখ-দুঃখের সমান দেখেন, তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৩২

আলোচনা। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শ্লোকে বলা হইয়াছে, যোগীর সমাধি-লাভ হইলে বিষয়দৃষ্টি—বাহ্যজ্ঞান থাকে না, যোগী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। কিন্তু সেই আনন্দ সমাধিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সমাধি-ভঙ্গ হইলে আবার বাহ্যজ্ঞান জন্মে। যেমন সুষুপ্তাবস্থায় বা মূর্চ্ছাকালে মানবের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া থাকে, আবার যখন নিদ্রা-ভঙ্গ হয় মূর্চ্ছা অপগত হয়, তখন পূর্ব্বজ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ সমাধিকালে অন্য জ্ঞান তিরোহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয় কিন্তু সমাধি-ভঙ্গে পুনর্ব্বার পূর্ব্বজ্ঞান-লাভ হয়। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মে সমাধি করিলে আর পূর্ব্বভেদ-জ্ঞানের সংস্কার থাকে না। "আমি তুমি অন্য" এই ভেদ-জ্ঞান দূর হয়। সকল বস্তুতেই একাত্মবোধ জন্মে। নিজের কোন অঙ্গের সুখ-দুঃখে অন্তরে যেমন

সুখ-দুঃখানুভব হয়, তদ্রূপ জগতের কোন প্রাণীর সুখ দুঃখ দেখিলে যোগীর হৃদয়েও সেই সুখ-দুঃখের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করে। যোগী জগৎকে আপন বিরাট্ দেহবৎ জ্ঞান করেন, সুতরাং জগতের যাবতীয় ব্যক্তিকে আত্মবৎ জ্ঞান করায় স্বয়ং তত্তন্নিষ্ঠ সুখ-দুঃখানুভব করেন। ঈদৃশ যোগীই যোগিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমরা ভক্তবীর সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনীতে ইহার একটী দৃষ্টান্ত পড়িয়াছি। সাধক গোস্বামী একবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় অবস্থিত ছিলেন। তখন একদা রাত্রিকালে একটী দরিদ্র সেই মাঘ মাসের দুরন্ত শীতে অনাবৃতশরীরে তাঁহার তাম্বুর দ্বারে কম্পিতকলেবরে উপস্থিত হয়। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ভক্তবীরের শরীর অগ্নিকুণ্ড-সমীপে কম্বলাবৃত থাকিয়াও যেন দুরন্ত শীতার্ত্তের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। অনুচরেরা ইহার কারণ অনুভব করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন বিজয়কৃষ্ণ অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেই অনাবৃতশরীর কম্পবান্ লোকটীকে দেখাইয়া দিলেন। অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ সেই শীতপীড়িত দরিদ্র লোকটীকে অগ্নি-সেক করাইয়া একখানি কম্বল দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন, বিজয়-কৃষ্ণের শরীরও সুস্থ হইল। ৩২

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়াপ্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে মধুসূদন ত্বয়া সাম্যেন (সমত্বেন চিত্তবিক্ষেপ-শূন্যতয়া) যঃ অয়ং যোগঃ প্রোক্তঃ অহং চঞ্চলত্বাৎ (মনস অস্থিরত্বাৎ) এতস্য (যোগস্য) স্থিরাং (দীর্ঘকালব্যাপিনীং) স্থিতিং ন পশ্যামি। ৩৩

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন হে মধুসূদন, তুমি চিত্তের অচঞ্চল অবস্থান-রূপ সমতায় অবস্থিত যে যোগ বলিলে, আমি মনের চঞ্চলস্বভাবত্ব হেতু তাহা দীর্ঘ-কাল-স্থায়ী বলিয়া মনে করিতেছি না। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

অন্বয়। হে কৃষ্ণ হি (নিশ্চিতং) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবেন চপলং) প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয়-বিক্ষেপকরং) বলবৎ দৃঢ়ং (দুর্নিবারং দুর্ভেদ্যং অজেয়ং) অহং তস্য নিগ্রহং (নিরোধং) বায়োঃ ইব সুদুষ্করং (সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং) মন্যে। ৩৪

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভকর দুর্নিবার

অজেয়। মনের গতি-নিরোধ করা আমার নিকট বায়ুর গতি-রোধের ন্যায় দুঃসাধ্য বোধ হয়। ৩৪

আলোচনা। অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিকট যোগতত্ত্ব যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে মনের বশীকরণ ব্যতীত যোগ-সিদ্ধির অন্য উপায় দৃষ্ট হয় না। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। দুর্নিবার ইন্দ্রিয়গণ পর্য্যন্ত মনের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। জন্ম-জন্মান্তরের অভ্যাস ও সংস্কার রাশি মনকে দৃঢ় করিয়া রাখে। ঈদৃশ মনের গতি-রোধ সহজসাধ্য নহে, তাই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন যে, তুমি মনকে স্থির রাখিয়া যে যোগের কথা বলিলে, তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হয় না। প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি মনকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখাও সেই প্রকার দুষ্কর। ৩৩।৩৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। ৩৫

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহং (দুর্নিরোধং) চলং (চঞ্চলং) অসংশয়ম্ (এতদসংশয়ম্) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয় অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে (সংযম্যতে তৎমন ইতি যোজনা)। ৩৫

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন হে মহাবাহো অর্জ্জুন, মন যে দুর্নিরোধ ও চঞ্চল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বিষয়-বিরাগ দ্বারা মনকে সংযত করা যায়। ৩৫

আলোচনা। শ্রীভগবান্ বলিলেন হে মহাবাহো, তুমি যাহা বলিলে "মন চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ" তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা সত্য হইলেও মনের চাঞ্চল্য ও অসংযতত্তা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিবারণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ হঠকারিতা দ্বারা জোর করিয়া মনকে আয়ত্ত করা যায় না—ক্রমে অভ্যাস ও বিষয়-বিরাগ দ্বারা মনকে বশে আনিতে হয়। যোগ-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (যোগসূত্র ১।১২) অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবে। চিত্তবৃত্তিসকলকে বশে রাখিবার জন্য যে নিয়ত চেষ্টা—তাহাকে অভ্যাস বলে। "তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" (যোগসূত্র ১।১৩ সূ) কথিত আছে—অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ যে, অভ্যাস দ্বারা স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়। আমাদের ইহজন্মের স্বভাবও পূর্ব্ব ২ জন্মের অভ্যাসজ-সংস্কারের ফল। স্ত্রী-অন্ন-পান মৈথুন-বিষয়াদি-ঐশ্বর্য্য-জনিত সুখে বিতৃষ্ণার নাম

বৈরাগ্য। অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-পাঠ, সাধুজন-সংসর্গ, ভোগ-বাসনা-ত্যাগ ও প্রাণায়াম এই চারিটী উপায়ের দ্বারা স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, মন সংযত হয় ও যোগ-সাধনের অনুকূলতা লাভ করে। অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-পাঠ দ্বারা জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব বা মিথ্যা-ভাব অনুভূত হইলে বিষয়-বাসনা ক্ষীণ হয়—ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মে। সাধু-সংসর্গ দ্বারা তত্ত্বোপদেশ আলোচনায় তদ্দিকে মনের গতি ও তাঁহাদের আদর্শে বিষয়স্পৃহার হ্রাস হয়। ভোগ-বাসনা-ত্যাগ দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা এবং নিত্য নূতন সঙ্কল্পে আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যায়। প্রাণায়াম দ্বারা মনের বহিঃপ্রবণতা কমিয়া একাগ্রতার দিকে গতি হয়। ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অন্বয়। অসংযতাত্মনা (অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুঃখেন প্রাপ্যঃ) ইতি মে (মম) মতিঃ বশ্যাত্মনা (অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশবর্ত্তী আত্মাযস্য তেন) তু (পুরুষেণ) উপায়তঃ (যথোক্তাদুপায়তঃ) যততা (প্রযত্নং কুর্ব্বতা) যোগঃ অবাপ্তুং শক্যঃ (যোগ্যঃ) ৩৬

বঙ্গানুবাদ। অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে এ প্রকার যোগ দুষ্প্রাপ্য; কেবল যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি সদুপায়ের দ্বারা এ যোগ লাভ করিতে পারেন--ইহাই আমার মত। ৩৬

আলোচনা। যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে সংযত করিতে পারেন নাই, তিনি কখন যোগ-সাধনের অধিকারী হইতে পারেন না। অধ্যাত্মশাস্ত্র-পাঠ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইলেই ব্রহ্মলাভ হয় না। অল্পচেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না বলিয়া “অদৃষ্টে নাই, আমার কিছু হইল না” ইত্যাকার অনুৎ-সাহগ্রস্ত হইলে হইবে না। বিবেক দ্বারা বৈরাগ্য-লাভ ও ক্রমে অভ্যাস দ্বারা মনের সংযমন এবং অভ্যাস ও অধ্যবসায় দ্বারা লক্ষ্য স্থানে পৌছিবার একা-গ্রতা চাই। “এজন্মে না হয় জন্মান্তরে সাধনের ফল পাইব” ঈদৃশ সঙ্কল্প সাধন-দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় থাকিলে যোগ-সাধনের সফলতা ঘটে। ৩৬

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

সাহিত্য-বর্ণলিপি।

কোন এক যুগের মনীষিগণের জ্ঞান এবং কর্ম্ম, পরবর্ত্তী জনগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হইলে তাহাকে সাহিত্য বলে। আদি-যুগে মানুষ, লিপি-কৌশল অবগত ছিল না। তখন জ্ঞান এবং কর্ম্ম অর্থাৎ নীতি-কথা, ধর্ম্ম-বিষয়ক উপদেশ, দেবারাধনা-বিধি, সাংসারিক এবং বৈষয়িক রীতি-পদ্ধতি লোক-পরম্পরায় শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিতে হইত। এই প্রকার শুনিয়া শিক্ষা করায় নাম হয় 'শ্রুতি' এবং ঐ সকল বিষয় স্মরণ রাখায় নাম হয় 'স্মৃতি'। এই শ্রুতি এবং স্মৃতি তদানীন্তন যুগের সাহিত্য। ক্রমে তাঁহাদের এই সকল বিষয়ক জ্ঞান এবং কর্ম্ম, অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্মরণ রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অভাবই উদ্ভাবনের জনক; অভাব অনুভূত হওয়ার তাঁহারা ঐ সকল বিষয় সংরক্ষণের অন্যবিধ উপায়-উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইলেন। এই সময়ে তাঁহারা তাঁহাদেরই ন্যায় স্বভাব-জাত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এবং নিজেদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির আকৃতি, মৃত্তিকায়, গৃহের দেওয়ালে অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সকল আকৃতি উত্তরকালে 'Hieroglyphic' হাইরোগ্লিফিক্ বর্ণমালা নামে অভিহিত হইয়াছে। মিশরদেশে এই প্রকার 'Hieroglyphic' বা চিত্রলিপি বর্ণমালা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। Hieroglyphic কথাটী গ্রীক্ ভাষার দুইটী শব্দ যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। গ্রীক্ ভাষায় Iros শব্দের অর্থ Sacred বা পবিত্র এবং Gluphy শব্দের অর্থ Carving বা ক্ষোদন। মিশর-বাসীগণ দেব-মন্দির, সমাধিস্তম্ভ, দেব-মূর্ত্তি প্রভৃতির গাত্রে এই প্রকার লিপি উৎকীর্ণ করিতেন, তজ্জন্যই এই প্রকার লিপির নাম Hieroglyphic হইয়াছে। মিশরবাসীগণ একটী নর-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পিতা এবং একটী নারী-মূর্ত্তি দ্বারা মাতাকে নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু ঐ নর বা নারী-মূর্ত্তিই আবার ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয়বর্গের বিষয়-নির্দ্দেশ করিতে ব্যবহৃত হইত। একটী শ্মশ্রু-বিশিষ্ট নর-মূর্ত্তি দ্বারা দেবতা, দানব এবং নরপতি বুঝাইত। ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃতবাহু নর-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ভগবদারাধনার ভাব প্রকাশ করা হইত। একটী তীর অঙ্কিত করিয়া যুদ্ধের এবং একটী সর্প অঙ্কিত করিয়া খলতার ভাব প্রকাশ করা হইত। আবার অধোমুখে শয়ান বা আনত নর-মূর্ত্তি দ্বারা হত্যা, মৃত্যু অথবা শত্রুতার ভাবও প্রকাশ করা হইত। অনন্তর তাঁহারা দেখিলেন যে, মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বহুসংখ্যক জীব বা বস্তুর আকৃতি অঙ্কিত করিয়া

লিপি-সংগঠন শ্রম ও সময়-সাপেক্ষ। তখন তাঁহারা রেখা দ্বারা এমন কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্নের আবিষ্কার করিলেন, যাহা দ্বারা মানবের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত একএকটী শব্দ লিখিতে পারা যায়—যেমন ক, খ, ন, এই তিনটী চিহ্নের দ্বারা মানব-কণ্ঠ-নির্গত 'কখন' এই শব্দ লিখিতে পারা যায়, M. A. N. এই চিহ্ন দ্বারা মানব-কণ্ঠ-নির্গত "Man" শব্দটী লিখিতে পারা যায়। এইরূপে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাষাভাষী লোক তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। অবশ্য এই প্রকার উন্নত-প্রণালীর চিহ্ন আদিযুগে প্রচলিত ছিল না। আদিযুগের মনুজগণ যে সকল চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, কালবশে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহারা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন বর্ণ বা অক্ষর নামে অভিহিত। বর্ণ-শব্দের অর্থ রূপ বা আকৃতি। মনের ভাব, রূপ বা আকৃতি-পরিগ্রহ করিয়া আমাদের নয়নে প্রতিভাত হয় বলিয়া উহাকে বর্ণ বলা যায়। অক্ষর শব্দের অর্থ অচ্যুত, যাহার বিনাশ নাই। স্মৃতি-ভ্রংশ বশতঃ বিষয় সমূহ মানবের মন হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে কিন্তু বিষয় সমূহ ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা একবার লিপিবদ্ধ হইলে আর সহজে বিনষ্ট হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইলেও উহারা মানবের জ্ঞান এবং কর্ম্মের কাহিনী প্রচার করিতে সমর্থ বিধায় উহাদিগকে অক্ষর বলা হয়।

পাশ্চত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বর্ত্তমানকালে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণমালা প্রচলিত থাকিলেও আদিযুগে একই স্থানে একই জাতিকর্ত্তৃক বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল। নোয়ার (Noah) শেম (Shem) নামক পুত্রের বংশধরগণ কর্ত্তৃক আরব দেশের উত্তর এবং মরুসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূভাগে সর্ব্বপ্রথমে বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। তাহাদের সৃষ্ট বর্ণমালা শেমীয় (Semitic) বর্ণমালা নামে অভিহিত। মেশা (Mesha) নামে শেম-বংশের জনৈক নরপতি খৃঃ পূঃ নবম-শতাব্দির মধ্যভাগে ইজ্‌রায়েলবংশীয় জনগণের উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের নিদর্শন-স্বরূপ একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ (Moaleite stone) স্থাপন করিয়াছিলেন। এফ্‌ এ, ক্লীন (F. A. Klein) নামে জনৈক পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ১৮৬৮ খৃঃ অঃ মরুসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী রিউবেন (Reuben) জন-পদের ডিবন (Dibon) নামক স্থানে ভূগর্ভে ঐ স্মৃতি-স্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ স্মৃতি-স্তম্ভ এক্ষণে পারিনগরের জগদ্বিখ্যাত লুভ্রে (Louvre) প্রাসাদের প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে স্থাপিত আছে। ঐ স্মৃতি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে,

খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও উক্ত জনপদবাসীগণ বর্ণলিপি-কৌশল অবগত ছিলেন। আমাদের পুরাণ মতে ব্রহ্মা বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে কোন বিষয় শিক্ষা করার ছয় মাস পরে মানুষের মন হইতে উহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি অক্ষর সৃষ্টি করিয়া মানবসমাজে উহার প্রচার করিলেন। যথা—

ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পুরা ॥

এতদিনে বর্ণমালার উদ্ভাবন হইল বটে, কিন্তু বর্ণমালা দ্বারা বিষয় সমূহ লিখিয়া রাখিবার পাত্রের অভাব তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা বাসগৃহের ভিত্তিতে, সমাধি-মন্দিরে, দেবমূর্ত্তির গাত্রে পর্ব্বত-গুহায় প্রস্তর-স্তম্ভ প্রভৃতিতে বিষয় সমূহ উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন। পরে এই প্রকারের পাত্রে স্থান সঙ্কুলান নাহওয়ায় এবং ঐ প্রকার লিপি স্থানান্তর করার সম্ভাবনা নাথাকায় তাঁহারা অন্যবিধ উপায় আবিষ্কারে যত্নবান্ হইলেন। ইহারই ফলে কোনদেশের লোক মাটির টালি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার লিপি উত্তরকালে শিলালিপি ও তাম্রশাসনরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কোন দেশের লোক কাষ্ঠফলকে মম্ মাখাইয়া তাহাতে লিখিতেন। কেহবা বৃক্ষপত্রে এবং বৃক্ষত্বকে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরবাসীগণ নীলনদের তীরে Papyrus reed নামক এক প্রকার "নল খাগড়া" জাতীয় গাছের ত্বকে লিখিতেন; ঐগাছের ত্বক্ "মাজ" পর্য্যন্ত 'পরতে পরতে' জড়ান থাকিত, সেই জড়ান ত্বক্ খুলিয়া লইয়া তাঁহারা কাগজের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এই Papyrus হইতে বর্ত্তমান ইংরাজি Paper শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন কোন দেশে মৃগচর্ম্মের উপর লিখিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। অতঃপর ১০৫ খৃঃ অঃ চীনদেশে Tsai lun. 'তাসি লুণ' নামক জনৈক ব্যক্তি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে তালপত্রে ও ভুর্জ্জপত্রে মসি ও লেখনী-সহযোগে লিখিবার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। পবিত্র বলিয়া পূজাপদ্ধতি ও মন্ত্রসমূহ লিখিবার জন্য আজিও এই প্রকার তালপত্র ও ভুর্জ্জপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ভুর্জ্জপত্র বৃক্ষের ত্বক্। বর্ত্তমানযুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানাবিধ উৎকৃষ্ট কাগজ এবং লিখিবার জন্য উন্নত প্রণালীর যন্ত্র

আবিষ্কৃত হওয়া তৎসাহায্যে মানবের জ্ঞান এবং কর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে পঞ্চবিধ উপায়ে বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ হইত যথা :—

"মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনী-সম্ভবা ;
গুণ্ডিকা ঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধাস্মৃতাঃ ॥"

মুদ্রালিপি অর্থে পিত্তলাদি ধাতুতে বিষয় খুদিয়া তাহা দ্বারা ছাপা হইত। ইরাণী-দিগের পাঞ্জা ও আমাদের শীলমহর দ্বারা ছাপা বিষয় এই শ্রেণীর লিপি। এই প্রকারে ছাপা স্বর্ণ বা রৌপ্যখণ্ড মুদ্রা (Coin) রূপে প্রচলিত আছে। কাপড়ের উপর সূচ এবং সূতাদ্বারা অক্ষর তুলিয়া বা চিত্র অঙ্কিত করিয়া যে লেখা যায় তাহার নাম শিল্পলিপি। এই প্রকারের একটী শিল্পলিপি ফ্রান্সদেশের প্রাচীন নর্ম্মাণ্ডি উপবিভাগের বায়ানগরে বায়া ট্যাপেষ্ট্রী নামে (Bayeux tapestry.) সংরক্ষিত আছে। ঐ শিল্পলিপিটী ২০ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ২৩১ ফিট্ দীর্ঘ বস্ত্রের উপর রঙ্গিন পশমের সূত্রদ্বারা বিজয়ী উইলিয়মের (William the conqueror) পত্নী ম্যাটিল্ডা (Matilda) কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ শিল্পলিপিতে উইলিয়মের রাজত্ব কালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জ্যোতিষিক বিবরণ চিত্রিত আছে। এই প্রকার শিল্পলিপি কার্পেট্ এবং কাঁথা রূপে আজিও আমাদের মহিলা-সমাজে প্রচলিত আছে। লেখনী-সহযোগে লেখার কথা বলা অবশ্য নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চবর্ণের গুঁড়াদ্বারা লিপিপ্রথা আজকাল কেবলমাত্র যজ্ঞকার্য্যে অর্থাৎ ব্রত পূজাদির সময়ে "যন্ত্র"-অঙ্কন কার্য্যে প্রচলিত আছে। ঘুণ যেমন কাষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া থাকে সেইরূপ এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা কাষ্ঠফলক খুদিয়া বা বিদ্ধ করিয়া বিষয় সমূহ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইত ঐ যন্ত্রের নাম 'ঘুণ' এবং অঙ্কিত অক্ষরের নাম 'ঘুণাক্ষর'। এই প্রকার লিপি-প্রথা আজকাল আর প্রচলিত নাই।* এই পঞ্চবিধ লিপির মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকারের লিপি পাঠ্যরূপে এবং কবচাদি রূপে ধারণ বা রক্ষণ জন্য ব্যবহৃত হইত। যথা :—

লেখন্যালিখিতং বিপ্রৈর্মুদ্রাভিরঙ্কিতঞ্চ যৎ।
শিল্পাদিনির্ম্মিতং যচ্চ পাঠ্যং ধার্য্যঞ্চ সর্ব্বথা ॥"

এই প্রকার লিপিবদ্ধ বিষয় সমূহকে আমরা আমাদের বর্ত্তমান ভাষায় "সাহিত্য" বলিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, আবেস্তা, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয় সাহিত্য-পর্য্যায়-ভুক্ত।

আর্য্যজাতি অতিপ্রাচীন কাল হইল সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন।

* ছাপাখানার Wood block এই প্রকার লিপির অন্তর্ভুক্ত।

অতীতের ইতিহাস আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, আদিযুগে উত্তর-মেরু-নিবাসী আর্য্যগণ নানা যাগ-যজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। নানা যজ্ঞের সম্পাদন কল্পে তাঁহাদের হৃদয়ে জ্যোতিষিক কঠিন কঠিন সমস্যার উদয় হইত তজ্জন্য তাঁহারা রেখাছায়া অঙ্কপাত করিয়া ঐ সকল জ্যোতিষিক সমস্যার পূরণ করিতেন। তখন হইতেই আর্য্যসমাজে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে; যেহেতু অঙ্কপাত ব্যতীরেকে গণনা অসম্ভব। উত্তরমেরু-প্রদেশে বাসকালেই আর্য্যগণ বেদসংহিতা ও তদন্তর্গত জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে আদিযুগেই যদি বেদ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে উহার শ্রুতি নাম কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, হিমপ্রলয় উপস্থিত হইলে উত্তরমেরুবাসী আর্য্যগণ আদিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদের স্মৃতি লইয়া দক্ষিণদিকে নিরাপদ স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানই উত্তরকালে আর্য্যনিবাস বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মৃত্তিকার টালি বা প্রস্তর অথবা কাষ্ঠ ফলকে লিপিবদ্ধ বেদ আগমনকালে তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। নূতন স্থানে আসিয়া বেদ নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেকে বলেন, এই নূতন স্থানে—সুমেরু-প্রদেশেই—ঋক্-সংহিতার অনেক নূতন মন্ত্র রচিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ঋক্-সংহিতা লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেদ শ্রুতি ছিল। তাহার পর, বেদ লিপিবদ্ধ হইলেই যে লোকে কেবলমাত্র ঐ লিপিবদ্ধ বেদই পাঠ বা শিক্ষা করিত তাহা নহে, যেহেতু ঋগ্ বেদের—

উতত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বঃ বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা ॥”

শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, কেহ বা বাক্য দেখে অথচ দেখে না, কেহ বা শুনে অথচ শুনেনা, কেহ শুনিয়াও বুঝিতে পারেনা। কামিনী যেমন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নিজ পতিকে দেহ সমর্পণ করে, বাক্যও তদ্রূপ, যাহারা দেখিতে শুনিতে পায় এবং বুঝিতে পারে, তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে বৈদিক কালেই আর্য্যগণ লিপিকৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যেহেতু লিপিবদ্ধ নাহইলে বাক্য দর্শন-যোগ্য হইতে পারে না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

ঈশ্বর।

মহেশের মহিমা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই পরমেশ্বরের মহিমার প্রকট প্রমাণ দেখিতে পাই। জলে যখন বীচিমালা নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হয়, মনে হয় যেন ইহারা ঈশ্বরের পদে ভক্ত্যুপহার দিতে ধাবিত হইতেছে। ঐ যে উন্নতমস্তক পর্ব্বত নীরবে অবস্থান করিতেছে, মনে হয় উহা ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় একান্তহৃদয়ে ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া পরমানন্দরসে নিমগ্ন রহিয়াছে। আকাশে তারাফুলগুলি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া যখন আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করে—সুদূরাবস্থিত ছায়াপথ যখন মানবের মনে অমিয়রাশি ঢালিয়া দেয়—শশধর যখন মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে, মনে হয় যেন উহারা সকলে একত্রে পরমেশ-পদে প্রেমোপহার প্রদান করিতেছে। উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে, সুগন্ধে মন আকুল; ভ্রমর গুন্‌গুন্ রবে মধু পান করিতেছে; কোকিল দূরে অশোকশাখায় কুহুকুহু-তানে প্রকৃতিকুঞ্জ মোহিত করিতেছে, মনে হয় যেন তাহারা একত্রে পরমেশ-সন্নিধানে ভক্ত্যুপহার প্রদান করিতেছে।

কর্ত্তা ব্যতীত কিছুই সৃষ্ট হইতে পারে না। এই বিচিত্র মানবমণ্ডলী, বিবিধ পশুপক্ষী, বৃক্ষ-লতা, অনন্ত তারকা, বিস্তৃত সাগর, প্রকাণ্ড পর্ব্বত—ইহা কি আপনা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, না ইহাদের কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে নানা জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। আমরা সে শুষ্ক কর্কশ তর্ক-পদবীতে আরোহণ করিতে চাই না। সরল মনে বিশ্বাস করি যে—এই বিশাল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন, তিনি ঈশ্বর। লোকে যখন গোপনে পাপ কার্য্য করে তখন তাহার বিষয় সকলের অজ্ঞাত থাকে; সে কেবল একজনের নিকট ভীত হয়, কেবল একজনের নিকট মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়ায়, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। লোকের যখন কোন কার্য্য অপরের নিকট অদৃশ্য থাকে, তখন একজন তাহা দর্শন করেন, তিনিই ঈশ্বর। ভয়ানক কুকর্ম্ম করিয়া মানব যখন আর নীরবে থাকিতে পারেনা, যখন অনুতাপ তাহাকে বৃশ্চিকদংশনসম যন্ত্রনা দিতে থাকে, তখন সে কেবল একজনের নিকট কুকর্ম্মের বৃত্তান্ত বলিতে অগ্রসর হয়, তিনিই ঈশ্বর।

বিষম দুঃখে এই সংসারে এক বন্ধু মিলে, তিনিই ঈশ্বর। মানুষ যেমন কষ্টের ভিতর পড়িয়া ঈশ্বরকে বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ মানুষ আবার সুখের সাগরে ভাসিতে ভাসিতে সেই ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া মনে করে। কি সুখে—

কি দুঃখে মানব ঈশ্বরকে পরমবন্ধু মনে করিয়া দুঃখের—কিংবা সুখের সংবাদ তাঁহাকেই জ্ঞাপন করে।

আমি ঈশ্বরের উপসনা করিতে ভালবাসি। যখন প্রাতঃকালে নবারুণ আকাশে মিটি মিটি লাল রং ছড়াইয়া হাসিতে থাকেন, মনে হয় যেন আমি সেই ঈশ্বরকে তাঁহার—মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ফুলের ডালি দেই। মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব যখন পৃথিবী-দগ্ধ করিতে থাকেন, মনে হয় যে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আমি যেন ঈশ্বরের উপাসনায় রত হই। সন্ধ্যার সমীরণ যখন মৃদু মৃদু প্রবাহিত হয়, মনে হয় যেন আমি সমীরণ সহ ঈশস্তুতি গান করি। রাত্রিতে চন্দ্রমা যখন ফুল্লশতদলসম হাসিতে হাসিতে তারাপুষ্পনিচয়-পরিবৃত হইয়া আকাশে সরোবর-সুষমা সৃষ্টি করেন, আমার মনে হয় যেন আমিও চন্দ্রের মত শতশত আবেগে উৎফুল্ল হইয়া ঈশ্বরের পদতলে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি দিতে ধাবিত হই। মনে হয় যেন ঈশ্বর আছেন—অন্ধ জগতের ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত। আমার মনের মধ্যে ও ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বাসনা হয়। যেন বলিতে ইচ্ছা হয়—

হৃদয়-কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহর-বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিধ্বংসি সচ্চিৎ স্বরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

শ্রীকুমার-বিক্রম মজুমদার।

বাসন্তী-পূজায় কল্প-নির্ণয়।

ভবিষ্য-পুরাণ ভবিষ্যোত্তর কালকৌমুদী কালিকাপুরাণ এবং মায়াতন্ত্রাদির বচন দৃষ্টে জানা যায়, বাসন্তী-পূজায় তিনটি মাত্র কল্প।

১। সপ্তম্যাদি কল্প, ২। অষ্টমী-কল্প, ৩। নবমী-কল্প। নিম্নে ক্রমশঃ প্রমাণ লিখিত হইতেছে।

প্রথম কল্প সপ্তম্যাদি। ভবিষ্যে।

মীনরাশিস্থিতে সূর্য্যে শুক্লপক্ষে নরাধিপ
সপ্তমীং দশমীং যাবৎ পূজয়েদম্বিকাং সদা॥

ভবিষ্যোত্তরে।

চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে সপ্তম্যাদি-দিনত্রয়ে।
পূজয়েদ্ বিধিবদ্দুর্গাং দশম্যাঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥

কালকৌমুদ্যাং জাবালিঃ।

চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে
পূজয়েদ্ বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্লবঙ্গ-কুসুমৈস্তথা।
নানাবিধৈশ্চ বলিভি র্মেষাভৈর্দোষবর্জ্জিতৈঃ
বিচিত্রাভরণৈঃ পার্থ পট্টবস্ত্রাদিভিস্তথা।
এবং যঃ কুরুতে পূজাং বর্ষেবর্ষে বিধানতঃ।
ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ পুত্রপৌত্রাদিকান্ নৃপ।

মায়াতন্ত্রে ৭ম পটলে।

চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে
প্রাতঃ প্রাতর্মহাদেবীং দুর্গাং ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ

দ্বিতীয় কল্প অশোকাষ্টমী-মাত্রে।

কালিকাপুরাণং।

সিতাষ্টম্যাস্তু চৈত্রস্যপুষ্পৈস্তৎকাল সম্ভবৈঃ
অশোকৈরপি যঃ কুর্য্যাৎ মন্ত্রেনানেন পূজনং
ন তস্য জায়তে শোকোরোগোবাপ্যগতুর্গতিঃ

তৃতীয় কল্প, শ্রীরামনবমী-মাত্রে।

কালিকাপুরাণং।

নবম্যাং পূজয়েদ্দেবীং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং
কুঙ্কুমাগুরু-কস্তুরীধূপান্নধ্বজতর্পণৈঃ
দমনৈর্মুরপত্রৈশ্চ বিজয়াখ্যপদং লভেৎ ॥

ভবিষ্যপুরাণে সদাপদোপাদানাৎ জাবালি-বচনে "বর্ষে বর্ষে" ইতি বীপ্সাশ্রবণাচ্চ নিত্যত্বং। এবং জাবালি-শেষ-বচন-পরার্দ্ধে পুত্রাদিরূপ-ফল-শ্রবণাৎ কাম্যত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং। ততশ্চ কাম্যতয়া কৃতে প্রসঙ্গান্নিত্যসিদ্ধিঃ ॥

বাসন্তী পূজায় তিনটী কল্প, তাহার মধ্যে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে যে পূজা তাহা প্রথম কল্প। ভবিষ্যপুরাণাদি ও কালকৌমুদী-গ্রন্থ-ধৃত জাবালি-বচনে উক্ত আছে, হে যুধিষ্ঠির! চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী প্রভৃতি তিন তিথিতে নানাবিধ দ্রব্য, লবঙ্গ, কুসুম, নানাবিধ ছাগমহিষাদি বলি, নানাপ্রকার অলঙ্কার এবং

পট্টবস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা যে মানব প্রতি বৎসর যথাবিধানে দুর্গাপূজা করে, তাহার পুত্র পৌত্র ও অভিলষিত ফল-লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র অশোকাষ্টমীতে যে পূজা তাহা দ্বিতীয় কল্প। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, যে মানব চৈত্রমাসের শুক্ল-পক্ষের অষ্টমীতে বসন্তকালোৎপন্ন পুষ্প এবং অশোক পুষ্পদ্বারা দুর্গামন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক দুর্গা-পূজা করে, তাহার রোগ শোক ও দুর্গতির বিনাশ হয়। একমাত্র শ্রীরামনবমীতে যে পূজা তাহা তৃতীয় কল্প। কালিকাপুরাণে উক্ত আছে, যে মানব নবমীতে কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী, ধূপ, প্রচুর অন্ন, দমনপত্র, ও মুরপত্র (কাঁঠাল-পত্র) দ্বারা দুর্গাপূজা করে, সে ব্যক্তি বিজয় নামক পদ (স্বর্গ-বিশেষ) প্রাপ্ত হয়। বাসন্তী-পূজার নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব উভয়ই আছে। কারণ উক্ত ভবিষ্যপুরাণে "সদা" পদ উপাদান এবং জাবালি বচনে "বর্ষে বর্ষে" এইরূপ বীপ্সা অর্থে দ্বির্ব্বচন ও পুত্রাদি ফলশ্রুতি আছে। সুতরাং কাম্যবিধানে পূজা করিলে নিত্যবিধানের পূজাও সিদ্ধ হইবে।

উপর্য্যুক্ত ভবিষ্যপুরাণাদির বচন দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, বাসন্তী-পূজায় সপ্তম্যাদি ভিন্ন ষষ্ঠ্যাদি কল্পের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। কিন্তু প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহে বাসন্তী-পূজায় ষষ্ঠ্যাদি কল্প লেখা হইতেছে। যদি বলেন—

"ব্যবস্থা তু শারদীয়-পূজা-প্রকরণোক্তা গ্রাহ্যা। বিশেষস্তত্র বোধন-প্রক্রিয়া নাস্তি বোধিতায়া বোধনাসম্ভবাৎ হোমাদিকঞ্চ পূর্ব্ববজ্ জ্ঞেয়মিতি।" দুর্গোৎসব-বিবেকঃ। দুর্গোৎসব বিবেকে লেখা আছে বাসন্তীপূজাতে শারদীয়পূজার প্রায় সকল ব্যবস্থা জানিবে। শারদীয় পূজাতে যেরূপ উদয়-গামিনী মুহূর্ত্ত ন্যূনকাল-ব্যাপিনী তিথির গ্রাহ্যতা, ইহাতেও সেইরূপ ইত্যাদি সমুদয় ব্যবস্থাই শরৎকালের পূজার ন্যায় জানিবে। বাসন্তী-পূজাতে বিশেষ এই যে উত্তরায়ণে জাগরিত দেবগণের বোধন অসম্ভব বলিয়া বোধন নাই। হোমাদিও শারদীয় পূজার ন্যায় জানিবে। ইহাদ্বারাও ষষ্ঠ্যাদি কল্প বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। কি কারণ পঞ্জি-কায় লিখিত হইয়া আসিতেছে জানিতে পারি নাই। এক্ষণে পঞ্জিকার ব্যবস্থাপকগণ অথবা দেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ এবিষয়ে সপ্রমাণ ব্যবস্থা লিখিয়া জানাইলে পরম পরিতোষ লাভ করিব। যদি প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকে, পঞ্জি-কায় ষষ্ঠ্যাদি কল্প লেখা হউক্। না থাকে তাহা উঠান হউক্। অযথা ব্যবস্থা পঞ্জি-কায় লেখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিনা। আশাকরি পূজনীয় স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহা-শয়গণ যথার্থ ব্যবস্থা লিখিয়া ভ্রমাপনোদন করিবেন। ইত্যলং বাহুল্যেন।

শ্রীভগবতীচরণ কাব্যভূষণ।

৺ দীনবন্ধু মিত্র।

ভারতীর স্বর্ণ-বীণা ও কোমল করে
সাদরে সারদা আসি দিয়াছিল তুলে ;
বাজালে বাণীর মঞ্জু-নিকুঞ্জ ভিতরে
বহাইয়া বিপরীতে কল্লোলিনী-কূলে।
মুরছি স্বরগ-পথে উঠিল সে ধ্বনি
প্রতিহত করুণার মর্ম্মভেদি-বাণী—
"পতি-পুত্র শোকে মাতা হ'য়ে পাগলিনী
স্বহস্তে করিল বধ সরলা কামিনী।"
কবিতা-কানন-পিক তোমারি বিহনে
কোকিলের-কল কণ্ঠে নীরব ঝঙ্কার।
সে করুণ তান আর পশে না শ্রবণে
সমাজ নিগূঢ়-ব্যঙ্গ-বিহত আসার।
যশোর উদয়াঞ্চলে অরুণাভ রবি
তুমি যে দীনের বন্ধু বাঙ্গালীর কবি।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেবগণের আকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া "দেব" শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সে কার্য্যটী বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বস্তুতঃ এই শব্দটীর অর্থ—"দীপ্তিমান্ কিছু"। স্বর্লোকের জ্যোতিষ্মান্ জড়ে দেব-দেহ গঠিত। এই স্বর্লোকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই "দেব" শব্দ উদ্ভাবন করা হইয়াছে। হিন্দুগণ বলেন এবং আমরা অবগত আছি যে, স্বর্লোকের জড়াংশ সমুজ্জ্বল পরমাণুপুঞ্জে অর্থাৎ তেজঃ-তত্ত্বে গঠিত। এই জন্যই, দেবগণ যখন দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাদিগকে আলোক-মণ্ডল-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই কারণেই দেবদূতগণের

মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার সময়ে মহাত্মগণ মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে একটী পরিবেশ (প্রভা-বেষ্টন) আঁকিয়া থাকেন। আমাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তির চারিদিকে কি জন্য যে ছটা দেওয়া হয়, এক্ষণে আমরা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। ঐ সকল মহিমান্বিত জীব—উচ্চতরস্তরের ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় দেব-যোনি সত্য সত্যই এক সময়ে মানবের গোচরীভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণকার মূর্ত্তিগুলি তাঁহাদেরই পূর্ব্ব-স্মৃতি মাত্র।

৭। কোথা হইতে দেবগণ সংগৃহীত হইয়া থাকেন?

দেবগণের সরবরাহ কোথা হইতে হয়, আমি এক্ষণে তদ্বিষয়িণী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যাঁহাদিগকে আমরা দেব-আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, তাঁহারাই পৃথিবী-সংশ্লিষ্ট ক্রমবিকাশ-বিধির চরমোৎকর্ষ। "প্রাণি-জগতের উপরে যেমন মানব-রাজ্য, তদ্রূপ—মানবের উপরে দেব-রাজ্য অবস্থিত"—(সি, ডব্লিউ লেড্‌বিটারের "সূক্ষ্মস্তর" গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল দেবতাই মানুষ হইতে হন নাই। ক্রম-বিকাশের নিয়মে মানুষ উন্নীত হইয়া দেবতা পর্য্যন্ত হইতে পারে; আবার দেবগণেরও পৃথক্ প্রকার ক্রম-বিকাশ আছে। উপনিষদে দুই শ্রেণীর দেবতার কথা আছে। এক শ্রেণীর নাম—আজান দেব, অপর শ্রেণীর নাম—সাধ্যদেব। আজান-দেব অর্থে স্বাভাবিক দেব ও সাধ্যদেব অর্থে মানবোৎপন্ন দেব বুঝিতে হইবে। ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতি ক্রমে মানব দেবত্ব-লাভ করিয়াছে এরূপ ভূরি ২ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উদাহরণ দেখ:—ভাগবত-পুরাণে দেবর্ষি নারদের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে তিনি প্রথম জন্মে একজন ক্রীতদাসীর অশিষ্ট আত্মজ মাত্র ছিলেন। আমরা আরও দেখিতে পাই, নহুষ দেব-রাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র আরও বলেন, বলী পরবর্ত্তীকল্পে ইন্দ্র পর্য্যন্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত, চণ্ডীগ্রন্থে সুরথ নামক একজন প্রাচীনকালীন রাজার জীবনী বিবৃত হইয়াছে। ইনি যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে পরবর্ত্তী কল্পে মনু (সাবর্ণি মনু) পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে দেবতার প্রতি মানুষের নিষ্ঠা থাকে, বিবর্ত্তিত হইয়া সে তাঁহারই স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়।† গীতাও বলিয়াছেন যে, যিনি দেবের আরাধনা করিয়া থাকেন তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সাংখ্য-সূত্রের মতও এই প্রকার। সাংখ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইনি বলেন, বৈদিক স্তোত্র গুলিতে মুক্তমানব-মণ্ডলীই

---

† তেন উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি—বৃহদারণ্যক, ১-৫-২৩

(মুক্তস্য উপাসা) উপলক্ষিত হইতেছেন। বেদান্তসূত্রের কথা আরও স্পষ্টতর। ইহাতে অধিকারিকাদিগের কার্য্য-কলাপের কথা আছে। ইঁহারা মোক্ষার্থ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তি, ইঁহারা মুক্ত মানব। বিশেষ ২ কার্য্যগুণে ইঁহারা সৃষ্টি-পালন-কার্য্যে ভগবানের অনুচর হইবার যোগ্য হইয়াছেন। তাই তিনি ইঁহা-দিগকে কোন ২ জাগতিক কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। (ব্রহ্মসূত্র, ৩—৩—৩২)। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সূর্য্য-দেব তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি ইহাও বলিয়া-ছেন যে, সনৎকুমার আগামী কল্পে স্কন্দ পর্য্যন্ত হইবার জন্য নিয়োজিত হইয়া-ছেন। চতুর্দ্দশটী মন্বন্তর বর্ত্তমানকল্পের অন্তর্গত। এই সকল মন্বন্তরে যে যে নরপুঙ্গব মনু, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি প্রভৃতি হইয়াছিলেন বা হইবার কথা ছিল, তাঁহাদের নামের একটা তালিকা বিষ্ণু-পুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, উপর্য্যুক্ত কার্য্যকারকগণ মাত্র নির্দ্দিষ্টকালের জন্য নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হয়েন। নির্দ্দিষ্টকাল গত হইলেই তাঁহারা হয় পুনরায় মানবরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, নয় ক্রম-বিকাশের নিয়মাধীনে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ সময় এই শেষোক্ত ঘটনাই ঘটে। শাস্ত্র বলেন, সূর্য্যদেব দেব-বৎসর-হিসাবে এক সহস্র বৎসর যাবৎ স্বকীয় কার্য্য সম্পাদন করিলে মুক্তিলাভ করিবেন। এটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেব-রাজ্যও ক্রমবিকাশাবর্ত্তন-ব্যাপারের অধীন। বেদান্ত-সূত্র-পাঠে আমরা ইহাও অবগত হই যে, দেবগণকেও "ব্রহ্মবিদ্যা" শিক্ষা করিতে হয়। প্রথিতনামা গুরুর নিকট কোন ২ দেব দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ের বিস্তর শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত আছে। একটী দৃষ্টান্ত দেখ। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবরাজ ইন্দ্র, একজন মহর্ষির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দেবের ক্রম-বিকাশ।

আমাদিগকে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। বিষয়টী এই যে, দেব ও মানব উভয়েই ক্রম-বিকাশ-নিয়মের অধীন হইলেও উভয়ের নিয়ম ঠিক্ একরূপ নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মানব, বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ-প্রভাবে দেবত্ব লাভ করিতে ও দেবকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তথাপি দেবের সহিত তাহার একটু পার্থক্য আছে। ব্যাপারটী এই যে, মানুষ যখন বিবর্ত্তনের একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রমে উপনীত হয়, তখন তাহার সম্মুখে দুইটী বিশিষ্ট মার্গ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

এই মার্গদ্বয়ের যে-কোনটী দ্বারা সে চরমস্থানে উপস্থিত হইতে পারে। একটী মার্গের নাম—ক্রম-মুক্তি। এই মার্গে ধীরে ধীরে বিবর্ত্তন-ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইচ্ছা করিলে, সে এ পথেও চলিতে পারে। এই পথে সে ক্রমে ২ দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে দেহে দেবত্ব-লাভ ঘটে, বৌদ্ধগণ তাহাকে "ধর্ম্ম-কায়াবরণ" বলিয়া থাকেন। তাহার পরে ক্রমে ২ সে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া কালক্রমে প্রজাপতি বা গ্রহবিশেষের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হয়। তখন এই প্রজাপতির অধীনে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিবর্ত্তন—ব্যাপার পরিচালিত হইয়া থাকে। * ইহার পরেই সে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। যাবতীয় পদার্থ এই ব্রহ্ম হইতেই প্রসূত। এই পথে একটীবার আরূঢ় হইলে, সাধারণ মানবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আর থাকেনা। যিনি এই পথারূঢ়, তিনি জাগতিক কার্য্য-সম্পাদনার্থ সাধারণ মানবের সংস্পর্শে যতটুকু আসিবার প্রয়োজন মাত্র ততটুকুই আসেন। অপর মার্গটীর নাম—বিদেহ-মুক্তি। এইটী সাক্ষাৎ মুক্তির পথ। বৌদ্ধগণ যাহাকে "নির্ম্মাণকায়" বলিয়া থাকেন, তাহার মহান্ পরিহার পর্য্যন্ত এই পথে ঘটিতে পারে। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে, শ্রেষ্ঠ মানবগণের ভিতর হইতে দেবগণ কিয়দংশে সংগৃহীত হইয়া থাকেন। যে সকল মানব, বিবর্ত্তন-তরঙ্গের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারাই দেবত্ব লাভ করেন।

৮। দেবের ক্ষমতার পরিমাণ।

অতঃপর আমরা দেব-শক্তির পরিমাণ কতটুকু, তদ্বিষয়িণী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। দেবগণ পরমেশ্বরের চৈতন্য-সমন্বিত শস্ত্র-স্বরূপ। ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে থাকে, সৃষ্টিব্যাপারের কার্য্যবিশেষ যাহাতে সংরক্ষিত হয়, সেই সব বিষয় দেখিবার জন্য দেবগণ নিযোজিত আছেন। ইহাঁদের কর্ত্তৃত্বাধীনে নানাবিধ নৈসর্গিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাঁরাই প্রকৃতির কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধান করেন, তথাপি ইহাঁরা ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। ইহাঁরা ঐশ আত্মার মূলাদর্শ-ঘটিত সংকল্পটী কার্য্যে পরিণত করেন মাত্র। কার্য্য করিবার কালে ইহাঁদিগকে পরমেশ্বরের মূল সংকল্প গ্রহণ করিয়া ও মানিয়া চলিতে হয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তদীয় বেদান্তসূত্রভাষ্যে, (৪-১৭, জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জম্) মুক্তাত্মা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তুল্যরূপে দেবগণ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ঐ স্থলে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, জগতের

* বৃহদারণ্যক, ১—৩—১ ও উহার শাঙ্করভাষ্য দেখ। উচ্চাভিলাষী মানব যে প্রজাপতি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে।

ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উৎপাদনার্থ একটী মূল উপাদান (তত্ত্ব) আছে, পরমেশ্বরই এই উপাদানের সৃষ্টি বা বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই আয়ত্ত। এই কথাটী জড় সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাগতিক শক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জড়ই হউক্ বা শক্তিই হউক্ ইহার কোনটীই স্বয়ং পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সৃষ্ট বা বিনষ্ট হইতে পারেনা। ক্ষমতা সম্বন্ধে সসীম হইলেও দেবগণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাঁহাদের নিরূপিত কার্য্য-গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত।

৯। কয়েকটী আপত্তির আলোচনা।

আমাদিগের ধর্ম্মের যাঁহারা দোষ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সচরাচর যে সকল ত্রুটি প্রদর্শন করেন, আমরা এক্ষণে তাহারই কিছু আলোচনা করিব। হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধিগণ দেবদ্বেষী। তাঁহাদের একটী কথা এইঃ—শাস্ত্রে দেখা যায়, দেবগণ, যোগিদিগকে ভয় করেন; হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের (দেবগণের) "সমাধিভীরুত্ব", "মোক্ষবিরোধিত্ব" প্রভৃতি গুণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দেবগণ ঋষিদিগের কঠোর-তপস্যার অন্তরায় ঘটাইয়াছেন, তাঁহাদের ধ্যান-ধারণায় সাধ্যমত উৎপাত করিয়াছেন, এমত বিস্তর প্রমাণ পুরাণগ্রন্থে বিবৃত আছে। বস্তুতঃ দেবগণ যেন যোগিদিগের পতন দেখিতে বড়ই আগ্রহবান্। ইন্দ্রদেবের কুপরামর্শে স্বর্গবেশ্যা অপ্সরা মেনকা, বিশ্বামিত্র ঋষির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার দেহলতার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মুনিবর বিমুগ্ধ হইলেন। ধ্রুব শৈশবেই যোগী; তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য দেবগণ নানাপ্রকার ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সগরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র, তাহার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকার স্থল-গুলি ধর্ম্মবিরোধিগণের চক্ষে আসিয়া পড়ে। অপরধর্ম্মেও আমরা তাদৃশ ব্যাপার দেখিতে পাই। শয়তান, যীশুকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধও "মার" ও তদীয় দুষ্ট অনুচরগণ দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। গূঢ়-ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞগণ (Occultist) সকলেই জানেন যে, প্রকৃত সাধন ও অকপট প্রণয় এই দুইটীর গতি, বাধাবিঘ্ন-শূন্য চিরশান্তির পথে কখনই হইতে পারে না। বাধাবিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কারণ কি? দেবগণ কি বাস্তবিকই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরোধী? যদি তাহা না হয়, তবে তাঁহাদের এতদাচরণের প্রকৃত হেতু কি?

অনিষ্টকারিণী শক্তি।

এক্ষণে প্রথমেই আমাদিগকে একটী কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে

কথাটী এই ঃ—যাহারা মানবীয় বিবর্ত্তনের বাধা প্রদান করে বা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া কখন ২ নিতান্তই অসমর্থ হইয়া থাকে, তাহারা শুভকারিণী শক্তি নহে, তাহারা অশুভকারিশক্তিপুঞ্জ। তাহারা দেবতা নহে, তাহারা শয়তান ও তদীয় অনুচরবর্গ। তাহারা অসুরদল। দ্বৈতভাবের স্থলেই ঐরূপ আসুরিক অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। আলোক-অন্ধকার, দিবা-রাত্রি, সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ, প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পরস্পর আপেক্ষিক। মহাত্মা জোরো-অস্তারের ধর্ম্মমত এই মূলীভূত দ্বৈতভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, "অহুর্-মস্দ" ও 'আহ্মনে' নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। অনিষ্টের সংঘটন করা, বিবর্ত্তন-স্রোতে বাধা প্রদান করা, উন্নতি স্থগিত করা এই গুলিই অশুভ-শক্তির "ধর্ম্ম"। অশুভশক্তিপুঞ্জের মূলপ্রকৃতিই এইরূপ। উহারা অসরল-পথাবলম্বী। স্বার্থ-পরতা ও বিচ্ছেদের পথেই উহাদিগের গতি। উহাদিগের কাহারও ২ ক্ষমতা খুব অধিক। তাহারা প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ। উহাদিগের যিনি দলপতি, তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবেন, কিম্বা "মার" যে বুদ্ধদেবের সহিত বল-পরীক্ষা করিবে, কিম্বা হিরণ্যকশিপু যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বিষ্ণুকে আহ্বান করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? উহারা প্রত্যেক অধ্যাত্মজ্ঞান-লিপ্সুকেই 'অপরাধী', প্রত্যেক ঈশ্বর প্রেমিককেই 'প্রকৃত শত্রু' মনে করিয়া থাকে। শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, শত্রুগণ জয়োল্লাসে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, অথচ উহারা হাত গুলি জড় করিয়া উদাসীনমূর্ত্তিতে বসিয়া রহিল, ইহা হইতেই পারে না। এরূপ হওয়া নিতান্তই বিস্ময়জনক।

লৌকিক ব্যাখ্যা।

শুভকারিণী শক্তিগুলির আচরণ সম্বন্ধে আমাদিগকে কিরূপ বুঝিতে হইবে? তাঁহারা ধর্ম্মপথের পথিকগণকে বাধা দেন কেন? এ প্রশ্নের নৈষ্ঠিক উত্তর এই যে, দেবগণ তাঁহাদের পদ-মর্য্যাদা হারাইবেন বলিয়া বড় ভয় করেন। যাঁহারা ধর্ম্ম-পিপাসু, পাছে তাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকে, এই জন্য তাঁহারা বিকশিত না হইতেই দেবগণ তাঁহাদিগকে দমন করিতে প্রয়াস পান। একটী উদাহরণ দেখ। আমরা বিষ্ণু-পুরাণে দেখিতে পাই যে, পরাৎ-পরের সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত ধ্রুব যখন কঠোর তপস্যায় রত, তখন ইন্দ্র, দেবদল-সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর সমীপে গমন করিয়া ধ্রুবকে ক্ষান্ত করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ইন্দ্রের ভয়, পাছে ধ্রুব দুরভিসন্ধি-পূর্ব্বক ইন্দ্র, যম, বরুণের বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ দেবের পদ-মর্য্যাদা চাহিয়া বসে। যখন বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ধ্রুবের সেরূপ কোন কুমতলব নাই, তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত

মনে স্বস্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। এই ব্যাখ্যাটীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, পাছে পদ-মর্য্যাদা নষ্ট হয়—এই ভয়ে দেবগণ সতত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু মানবগণকে বাধা দিয়া স্বস্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নিরন্তর উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

এক্ষণে এই লৌকিক ব্যাখ্যাটী যদি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে দেবগণকে ঘোর পাষণ্ড, লোভী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ও কুমন্ত্রণাকারী বলিয়া বোধ হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, দেবগণ বস্তুতঃই ঐ প্রকার। অন্ততঃপক্ষে পুরাণ-গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেবগণকে ঘোর মানবীয় পাপে পাপী ও মানবীয় ভ্রমে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কেন এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার হেতু আমি পরে নির্দ্দেশ করিব। হিন্দু-দেবগণের যে সকল আচরণ, ভয়ানক অন্যায় বলিয়া প্রখ্যাত, আমি প্রথমে তাহাদের আলোচনা করিব। আমি বলিতে চাই, পুরাণ গুলিতে দেবগণকে 'সত্ত্বপ্রধান'—সাত্ত্বিকগুণ-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈদৃশ জীবের চরিত্রে উপর্য্যুক্ত-প্রকার নিকৃষ্ট পাপ ও ভ্রমপ্রমাদ অসম্ভব, অসমঞ্জস ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। নিকৃষ্ট পাপাদি রজঃ ও তমোগুণের বিষয়ীভূত। দেবগণের চরিত্রে যদি তাদৃশ নীচতা সম্ভবপর হয়, তবে মেষশাবক-কেও "হিংস্র" বলিলে অন্যায় হয় না। তাহা ছাড়া, "দেবগণের সরবরাহ" নামক অধ্যায়ে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, উচ্চশ্রেণীর দেবগণ প্রকৃত-পক্ষে মুক্ত জীবাত্মা বা মুক্তপুরুষ। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা কিরূপ করিয়া তাঁহা-দের উপর কাম, ক্রোধ, ভয়, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ আবেগ আরোপ করিতে পারি? এ কথা সত্য যে নিম্নশ্রেণীর দেবগণ অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহাদিগকে "দেব-যোনি" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে বিবর্ত্তিত জীবাত্মা নহেন। তাঁহারা সাধারণ মানবের মত ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু এই টুকুই ক্ষতির কারণ যে, লৌকিক পুরাণে নিম্নশ্রেণীর দেব ও উচ্চ-শ্রেণীর দেব—উভয়দলকেই একতালিকায় ভুক্ত করা হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর দেবগণ বিবর্ত্তন-তরঙ্গের চূড়া-স্বরূপ। তাঁহারা মুক্তজীব। হয় বর্ত্তমান কল্পে, নয় পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা কার্য্যকারক-দলভুক্ত হইয়া এক্ষণে জগৎ-পালন কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। আলো-কের সহিত অন্ধকারের সাদৃশ্য যেমন অসমঞ্জস, প্রাগুক্ত উচ্চশ্রেণীর দেবগণের সহিত পাপের সংস্রবও তদ্রূপ অসম্ভব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

প্রতীক্ষায়।

জল-ভরা তারা দু'টী বুক ভরা ব্যথা নিয়ে—
কে গো তুমি উন্মাদিনি, আছ দ্বারে দাঁড়াইয়ে?
কেন গো কোমল করে মথিয়া মাখন নানা
কেবল দুয়ার-ঘর করিতেছ আনা-গোনা?
আঁখি-জলে ধরা ভাসে, অরুন্তুদ কি বেদনা,—
তবুও সে গেছে চলে—ফিরে ত আর এল না!
কেন শিখিপাখা ধরি আদর করিছ তুমি?
কাক-পক্ষে কেন বক্ষে সোহাগে ধরিছ চুমি?
কেন কাঁদ নন্দরাণী, আছ কা'র প্রতীক্ষায়?
সে যে সুখে রাজপাটে আছে ব'সে মথুরায়!

শুভ্রাংশু-গুণ্ঠিত কেশপাশে করি করার্পণ,
বাম করে ন্যস্ত গণ্ড, বহে শ্বাস ঘন ঘন;
স্নেহের নির্ঝর হৃদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেছে
বিরহ-অশনিপাতে; যে টুকু বা বাঁকী আছে
করেছে আবৃত তা'রে তীব্রভাবে অভিমান;
"আমি তা'র পিতা বটে সে'ত আমার সন্তান!"
সন্তানের অদর্শনে অভিমান দূরে যায়—
সম্মোহ—আবেশে জ্ঞানী ভূপতিত নন্দরায়!
মোহ-আবরণে মুগ্ধ আছ তুমি প্রতীক্ষায়—
কিন্তু সে যে রাজা হ'য়ে আছে সুখে মথুরায়!

কে তুমি চোখের জলে ভিজায়ে কদম-তলা
আলুথালু কেশ-রাশি পাগলিনী-প্রায় বালা?
বসন্ত-সখারে কেন গঞ্জিতেছ বিধুমুখি?
সেও কাল' বটে কিন্তু তব দুঃখে মহাদুঃখী!
ধূলায় ফেলেছ দূরে চুয়া-কুঙ্কুম-চন্দন;
কিন্তু কি আসিবে তা'তে ফিরে শ্রীনন্দনন্দন?

ত্যজিয়াছ আভরণ শ্রীহান হ'য়েছে বেশ ;—
'দয়ানিধি' নাম তবু দয়ার নাহিক লেশ !
কদমের তলে বালা আঁছ মিছে প্রতীক্ষায়
সে যে সুখে রাজপাটে আছে ব'সে মথুরায় !

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

শ্রীরাম-গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-
স্ত্বেকত্রবাসাদনলাক্তলৌহবত্।
অন্যোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্মচেতসোঃ ॥ ৪১ ।

চিদাভাস, সাক্ষ চৈতন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত মন, ও অন্তঃকরণ এই তিনের প্রসঙ্গ-ক্রমে একত্রবাস-হেতু অনলাক্ত লৌহের ন্যায় পরস্পর স্বস্বরূপের আরোপবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্যে জড়াজড়ত্ব প্রতীত হয় অর্থাৎ যেমন অনলাক্তলৌহ-স্থলে অগ্নিতে লৌহবৎ স্থূলতাদি এবং লৌহে অগ্নির ন্যায় দাহিকাশক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ তিনের সংসর্গবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্যে জড়াজড়ত্বের জ্ঞান হয়। চিদাভাস অর্থাৎ জীবাত্মা, সাক্ষিচৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মা—এই উভয়ই বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র, তবে অন্তঃকরণের জড়তা লইয়াই উভয়ের জড়াজড়ত্বের প্রতীতি হয় মাত্র। ৪১ ।

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্যতম্।
স্বত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্ ॥ ৪২ ।

এই শ্লোকে জড়-নিবারণের উপায় কথিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট বেদান্ত-বাক্য-শ্রবণ, তদর্থমনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যাঁহার অনুভবাত্মক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করিয়া আত্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিতবুদ্ধি হইয়া জড়পদার্থকে 'মিথ্যা' জানিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

"তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অনুসন্ধানকে "শ্রবণ" কহে, যুক্তি-দ্বারা সম্ভাবিত বস্তুর অনুসন্ধানকে "মনন" কহে, এই শ্রবণ ও মননদ্বারা নিঃসন্দেহ-রূপে স্থিরীকৃত ব্রহ্ম বিষয়ে স্থাপিত চিত্তের একতান বৃত্তিকে 'নিদিধ্যাসন' কহে ॥ ৪২।

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ো
ঽ সকৃদ্বিভাতোঽহমতীবনির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনো নিরাময়ঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩।

বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থকে অসত্য-বোধে পরিত্যাগকারী তত্ত্বজ্ঞানীর যেরূপ উপ-লব্ধি হয়—এক্ষণ শ্লোকদ্বয় দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আমি প্রকাশস্বরূপ, জন্মরহিত, অদ্বিতীয়; আমি অবিদ্যা ও তৎসম্ভূত সমস্ত-কার্য্যরূপ-মলিনতা-বিহীন হইয়া সদা প্রকাশিত আছি, আমি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের সমষ্টি-স্বরূপ, ও রোগাদিশূন্য, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ, আনন্দস্বরূপ ও ক্রিয়ারহিত। ৪৩ ॥

সদৈবমুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমা-
নতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-মবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈ-
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪।

আমি চিরকালই মুক্ত অর্থাৎ সংসারবন্ধবিহীন, ও অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট, চক্ষু-রাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, জ্ঞান-স্বরূপ এবং কিছুতেই আমি পরিণাম প্রাপ্ত হই না। যে মায়াকে লোক "অনন্তা" বলিয়া জ্ঞাত রহিয়াছে, আমি তাহারও অতীত, কিন্তু আমি বেদবাদি-জ্ঞানিগণের হৃৎকমলে দিবানিশি প্রকাশিত ও অনুভূত হইয়া থাকি ॥ ৪৪।

এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা
বিচারমাণস্য বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫।

যেমন রসায়ন-(মহৌষধ-) সেবনে রোগরাশি অবিলম্বে নির্ম্মূল হইয়া যায়, সেইরূপ প্রাগুক্ত-ভাবাপন্ন হইয়া যিনি বিষয়ানাবিষ্টচিত্তে সর্ব্বদা আত্মবিচার করেন, তাঁহার সেই বিশুদ্ধ ভাবনা—দেহান্তরপ্রাপক কর্ম্মকলাপ-সহিত সমস্ত অজ্ঞানপাশ অচিরে ছেদন করিয়া দিবে ॥ ৪৫।

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জ্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ॥ ৪৬।

এক্ষণে তত্বজ্ঞান-সাধনের উপায় কথিত হইতেছে। নির্জ্জনস্থানে অথবা সিদ্ধাসনাদি উৎকৃষ্ট আসন-বিশেষে উপবেশনপূর্ব্বক চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্-পাণিপ্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়-বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া এবং প্রাণায়াম-সাধনাদিদ্বারা প্রাণ-বায়ুকে বশীভূত করতঃ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইতে হইবে, তাহার পর অন্যান্য সাধনাবিধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনুভবাত্মক জ্ঞান-বিশিষ্ট পুরুষ কেবল সর্ব্বব্যাপী একমাত্র আত্মাতে অবস্থিত হইয়া সেই আত্মতত্ত্বেরই চিন্তা করিবেন। ৪৬।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

শোকোচ্ছ্বাস।

[যশোহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, পরম ভাগবত, বাগ্মি-প্রবর
৺ শরদিন্দু মিত্র ভক্তিনিধি মহোদয়ের
স্বর্গারোহণে]

হে মাতঃ! জনম-ভূমি! কেন আজি তব
নেত্রে বহে অশ্রুধারা? কোন্ অভিনব
নিদারুণ শোকাঘাতে হইয়া জর্জ্জর
বিলাপিছ থাকি থাকি? তোমার অন্তর
বিষম-বিষাদ-রাশি-বিমথিত হায়!
হেরি যে গো, আমাদের বুক ফেটে যায়!
অহো! আজি ভাগ্যহীনা যশোহর-ভূমি!
হৃদয়-আকাশ হ'তে হারায়েছ তুমি
যে সুধাংশু, অংশু যার পবিত্র নির্ম্মল
সন্তাপিত মাতৃবক্ষ করিল শীতল।

সাজায়ে সেবার অর্ঘ্য প্রীতির সম্ভারে
করিলা বাণীর পূজা নানা উপচারে ;
আনিলা প্রেমের বন্যা তুঙ্গ যশোহরে ;—
স্মরিলে সে সব, আজি হৃদয় বিদরে।
জননী গো! আজি তোরে কি সান্ত্বনা দিব ?
অস্তমিত শরদিন্দু—শরদিন্দু-নিভ ॥

শোকমুগ্ধ—শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

"নিগ্রোকর্ম্মবীর বুকারওয়াসিংটন।"

(বৈশ্য-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

নিগ্রোকর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন আর ইহধামে নাই। ওয়াসিংটন তাঁহার কর্ম্মময় জীবন সমাপন্ন করিয়া পরমপিতা ভগবানের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা অধ্যবসায়ে, একনিষ্ঠতায় শতশত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বুকার ওয়াসিংটন তাহাদের অন্যতম। সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে মানুষ স্বায় অধ্যবসায়ের গুণে কতদূর উচ্চপদবীতে অধিরোহণ করিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ওয়াসিংটন। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে একজন সামান্য ঘৃণিত নিগ্রোও জ্ঞানে, ধর্ম্মে, লোকহিতৈষণায় কেমন করিয়া দেশের অগ্রণী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই এই কর্ম্মবীরের পবিত্র জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। চরিত্র-বলে, ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির বলে, মানুষ কেমন সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে—শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য বুকার ওয়াসিংটন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বুকার ওয়াসিংটন আমেরিকার যুক্তপ্রদেশস্থ ভার্জ্জিনিয়াতে সামান্য নিগ্রোদাস (Negro slave) ছিলেন। কোন দিন কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। তাঁহার জীবনপথের পাথেয় ছিল শ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়, আর তাঁহার হৃদয়ে ছিল ভগবানের নাম। তাই তিনি আজ শিক্ষা-প্রচারক ওয়াসিংটন ; তাই, আজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "টাস্কেজী বিদ্যালয়" আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ ও আদর্শ বিদ্যালয়।

ওয়াসিংটন "Up from slavery" নামক স্বীয় জীবন কথায় লিখিয়াছেন "আমি ক্রীতদাস—জাতিতে নিগ্রো। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের ফ্রাঙ্কলিন জেলার কোন

নিগ্রোদাসের আড্ডায় আমার জন্ম। নিতান্ত ঘৃণ্য, অবনত, দুঃখ-দারিদ্র্যময়, নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই আমার বাল্য জীবন কাটিয়াছে। ছেলে বেলায় আমি কোন দিন বিছানায় শুইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। আমরা তিন ভাই-বোন্ মাটিতে পড়িয়া থাকিতাম। কতকগুলি ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়ার উপরে রাত্রি কাটাইতাম। ছেলে বেলায় কখনও শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাই নাই। মুনিবদের ছেলেদের সহিত স্কুল ঘর পর্য্যন্ত যাইতাম। দূর হইতে দেখিতাম, ছেলে মেয়েরা দলে দলে লেখাপড়া শিখিতেছে। সেই দৃশ্য আমার চিত্তে কি অপূর্ব্ব ভাবেরই না সৃষ্টি করিত। ঐরূপ একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া লেখাপড়া করিতে পারা আমার নিকট স্বর্গ-প্রবেশের ন্যায় সুখকর মনে হইত।" দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও যে তিনি সংসার-ক্ষেত্রে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি ভগবানে বিশ্বাস। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন "আমি ভগবানের মঙ্গল-বিধানে বিশ্বাসবান্। যাঁহার করুণায় নানা দুর্দ্দৈবের ভিতর দিয়া আমরা এতদূর উঠিয়াছি, তাঁহারই করুণায় আমরা আরও উন্নত হইব। নিগ্রোজাতি জগতের বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার স্বকীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া জগদীশ্বরের ক্ষমতার পরিচয় দিবে।"

বুকার ওয়াসিংটন জগতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রচারক। তিনি নিজের জীবনকে গঠিত করিয়া তাঁহার স্বজাতিদিগকে শিক্ষা দিবার মানসে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আলাবামা ষ্টেটে (Alabama State) "টাস্কেজী বিদ্যালয়" (Tuskegee Institute) প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে এই বিদ্যালয় ৩০টী ছাত্র লইয়া খোলা হয় এবং বিদ্যালয়-গৃহ এত জীর্ণ ছিল যে বৃষ্টির সময় শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দের ছাতা খুলিতে হইত। আর আজ সেই টাস্কেজীবিদ্যালয়ে ২৩০০একর (প্রায় ১১৫০ বিঘা) জমির উপর ৮৩টী বড় বড় বাড়ী আছে। ছাত্র-সংখ্যা ১৫৯০ পনর শত নব্বই এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১৫৬ একশত ছাপান্ন।

ওয়াসিংটন ঘৃণিত নিগ্রোদাস-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কখনও অনুতাপ করেন নাই; বরং বুক ফুলাইয়া নিজেকে নিগ্রো বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহাতে অতীব আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। আর ওয়াসিংটন এক জায়গায় বলিয়াছেন—আমি নিগ্রোই থাকিতে চাই। দুঃখের সংসারই আমার শিক্ষালয়, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধনাই আমার জীবনের ব্রত।

ওয়াসিংটনের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করা; তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"ভাই নিগ্রো, তুমি সাদা কাল চামড়ার

প্রভেদ মনে রাখিও না। নিজ কর্ত্তব্য-বোধে কার্য্য করিয়া যাও। যদি শক্তি অর্জ্জন করিতে পার, কেহই তোমাকে অস্বীকার করিতে পারিবে না। বিশ্বের মধ্যে সেই শক্তির স্থান আছেই আছে। গুণ কখনই চাপা থাকিবে না; তাহার সম্মান হইবেই হইবে। তোমরা আজ নির্য্যাতিত, পদ-দলিত, কিন্তু ভগবানের এই সনাতনধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন কর। দেখিবে, তোমার শক্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"

কুমার অধিক্রম মজুমদার বি এল্।

একই পথ।

ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতং
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলং ॥ (কাত্যায়ন-সংহিতা)

এই জগতে মানুষমাত্রেই শান্তি চায়। যিনি যাহাই করুন না কেন, শান্তিই সকলের চরম ও পরম লক্ষ্য। ধনী ধনে, জ্ঞানী জ্ঞানে, ধার্ম্মিক ধর্ম্মে শান্তিলাভ করিবার আশায় কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন। কিন্তু শান্তি কোথায়? শান্তির নাম-মাত্রই শুনিতে পাই। শান্তির সাক্ষাৎকার-লাভ কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বুঝি না। অনেকেই আশা-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া চির-জীবন বঞ্চিত হইতেছেন। এই আশা মানুষের সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে আসক্তির মূলীভূত নিদান, অন্যপক্ষে শান্তি-পথের অন্তরায়। কামনা বাসনা, আশার নিত্য সহচরী। হৃদয়ে আশার কণিকা মাত্র থাকিতে নিরাময় শান্তিলাভ একেবারেই অসম্ভব। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উপদেশ—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি ॥" (শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা)

যতদিন মানুষ আশার দাস, বাসনাকামনার কিঙ্কর, প্রবৃত্তির ক্রীড়া-পুত্তলিকা, ততদিন তাহাকে অধিকতর অশান্তির ভীষণ দাবদাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। সংসারাসক্ত জীবের সম্মুখে নিয়ত শত শত দুঃখকর ব্যাপার উপস্থিত হয়। আধিব্যাধি শোক-দুঃখ অভাব অনটন এ সব ত সংসারীর নিত্য সহচর। ভোগাসক্ত মানব জগতের অনিত্যতা বুঝিতে না পারিয়া একমাত্র আশার কুহকিনী শক্তি-বলে অনিত্য ক্ষণিক সুখের আশায় মুগ্ধ ও পথভ্রষ্ট হইয়া সংসার-দাব-দগ্ধ হৃদয়ে চির-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। এই যন্ত্রণার উপশমে চেষ্টা করাই বিবেকীর প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য-সম্পাদন, আত্মোন্নতি, ঐহিক পারত্রিক শান্তি-লাভেই মানব-জীবনের সার্থকতা। একমাত্র শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন এবং ধর্ম্ম-পথে বিচরণপূর্ব্বক সেই প্রেমময়ের প্রেম-লাভ ব্যতীত কদাপি প্রকৃত শান্তি-সুখলাভ ঘটিতে পারে না। কামনা বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়; মায়া-মোহের বন্ধন উন্মোচন করিতে হয়; মানব-জন্ম-লাভ করিয়া জীবনের প্রধান লক্ষ্য আত্মোন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে হয়। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া শ্রীশ্রীভগবদ্ভজনে রত হইতে হয়।

ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া শ্রীশ্রীভগবদ্ভজনের দ্বারা তদেকনিষ্ঠ না হইতে পারিলে হৃদয়-দর্পণের আবিলতা মালিন্যলেপ দূরীভূত হয় না। এই তদেকনিষ্ঠতা লাভ করিতে সাধন চাই। ভজন-সাধন অনায়াসলভ্য নহে বরং আয়াসসাধ্য, কাজেই তৎপথে সহজে চিত্ত প্রধাবিত হয় না। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে সাধনপন্থা অতীব কঠোর ছিল। কলি-যুগের দুর্ব্বলচিত্ত ও অল্পায়ু মানবের জন্য সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্ সাধনপন্থা অতি সহজ করিয়া দিয়াছেন। একমাত্র শ্রীভগবানের মধুর শ্রীনাম-জপ-কীর্ত্তনাদিই প্রধান সাধন বা ভজন। একমাত্র নামেই সর্ব্বশক্তি নিহিত। এই নাম-সাধন ভিন্ন কলি-যুগে অন্য উপায় নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়
কলি-যুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥ (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

তথাহি,—কলের্দোষ-নিধেরাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুংত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥ (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠাংশ)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ (শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ)

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ (শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ)

নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

এই সব শাস্ত্র-বাক্য আলোচনা করিয়া আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি যে কলি-যুগে শ্রীভগবানের নাম-জপ ও কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন।

আবার কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বমুখে তারস্বরে উপদেশ দিতেছেন—

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব ওহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। খুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

(চৈতন্য ভাগবত)

আপন সভারে প্রভু করে উপদেশ। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥"
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সার করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল সবে ইথে নাহি আর॥
দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সবাকারে। স্ত্রী পুত্র বাপ মিলি কর গিয়া ঘরে॥
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস। দণ্ডবৎ করে সবে গেলা নিজবাস॥

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড)

এক্ষণ আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি যে, এই কলিযুগে একমাত্র নাম-সাধন ভিন্ন সেই শান্তি-সুখ-লাভের উপায়ান্তর নাই। এই নাম-সাধনে জাতি-বর্ণ স্থান অস্থান শুচি অশুচি কিছুরই বিচার নাই।

আর কালক্ষয় কেন? মানুষের জীবন পদ্মপত্রের জলের মত সর্ব্বদা টলমল করিতেছে। কোন্ দিন কোন্ মুহূর্ত্তে টলিয়া পড়িবে কে জানে। "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" সর্ব্বদা শ্রীহরির মধুর নাম-গ্রহণ ভিন্ন আর উপায় নাই। অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কাজ করিতে থাক, আর মনে মুখে শ্রীনাম যাহাতে অনুক্ষণ উচ্চারিত হয় সেই চেষ্টা কর। দেখিবে, এই মহামন্ত্র-জপে হৃদয়ের অন্ধকার আবিলতা দূরে যাইবে; চিত্ত স্থির হইবে, মন ধর্ম্মপথে সতত বিচরণ করিবে; অন্তঃকরণে পরমানন্দ পাইবে এবং সর্ব্ব অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। সংসার-নরক-যন্ত্রণা-ভোগের অবসান হইবে এবং চির অনাময় শান্তি লাভ করিতে পারিবে। এই জন্য এই শ্রীনাম-সাধন কলিযুগে একমাত্র সাধন, একই পথ, অন্য পথ নাই।

শ্রীবরদাকান্ত দে।

শোক-গীতি।

সুরটমল্লার——একতালা।

শোকে যশোহর আজি মুহ্যমান্।
শরদিন্দু মিত্র,　　চরিত্র পবিত্র,
কর্ম্মজিত লোকে করিলেন প্রয়াণ।
হৃদয়ে তাঁ'র ছিল　ভগবদ্‌ভক্তি,
সাধু-সঙ্গে ছিল　পরম আসক্তি,
বক্তৃতাতে যেন ছিল দৈবশক্তি
শ্রোতৃগণ হ'তেন　বিমোহিতপ্রাণ।
কৃষ্ণকথা-রঙ্গে নয়নের জল,
প্লাবিত করিত তাঁ'র বক্ষঃস্থল
সৎকথা-প্রসঙ্গে আকাঙ্ক্ষা প্রবল,
ছিল তাঁ'র মনে সতত সমান।
সুকঠিন তত্ত্ব প্রাঞ্জল-ভাষাতে
অসীম ক্ষমতা ছিল প্রকাশিতে,
ভাবশুদ্ধি ছিল, ব্যাখ্যা-বিকাশিতে
হ'তনা প্রতিভা কখনও ম্লান।
মনোহারী ছিল শব্দের বিন্যাস,
ভাবগৌরবের ছিল সুবিকাশ,
অভ্যস্ত আছিল শ্লেষ অনুপ্রাস
সব হ'ত মরি অমৃতসমান।
অল্পাক্ষরে মরি গুরু নীতিকথা
গ্রথিত করিতে আছিল ক্ষমতা,
হৃদয়েতে যেন ছিল সব গাঁথা•
সভাস্থলে সবে পাইত প্রমাণ।
ওজস্বিনী ভাষায় তেজস্বিনী কথা,
শুনি মন্ত্রমুগ্ধ হইত জনতা;—
বাণী আসি যেন হ'য়ে আবির্ভূতা,
রসনা-উপরি লইতেন স্থান।

---

* (বঙ্গবাণীর অক্লান্ত-সেবক বাগ্মিপণ্ডিতবর ভক্তিনিষ্ঠ সৎকবি ৺ শরদিন্দু মিত্র ভক্তিনিধি মহাশয়ের অকাল-প্রয়াণ উপলক্ষে যশোহরের ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে, "যশোহরেশ্বর সঙ্গীত-সমাজের" কণ্ঠসঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সুকবি শ্রীযুক্ত লালনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-মহাশয়-বিরচিত এই গীতটী গীত হয়।)

গিয়া স্বর্গবাসে স্বর্গসুখচয়
ভোগ করুন্ তিনি অক্লান্তহৃদয় ;—
(তথা) দারিদ্র্য অনলে দহেনা আশয়
অর্থ-কষ্টে কারো কাঁদেনা পরাণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শোক-সংবাদ। বঙ্গবাণীর প্রিয়সেবক সুলেখক সুবক্তা সুপণ্ডিত শরদিন্দু মিত্র ভক্তিনিধি মহাশয় আর ইহধামে নাই। শরদিন্দু চিরতরে অস্তমিত হইয়াছেন। সে ভাষাসম্পৎ, সে ভাবশুদ্ধি, সে নৈপুণ্য, সে প্রাবীণ্য, শরদিন্দুর সেই বিশেষত্ব-সমবায় আমরা হারাইয়াছি। যশোহরে সাহিত্য সম্মিলনের বোধনশঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, এ সময় এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের অভাবে প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। শরদিন্দু একসময় হিন্দুপত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। হিন্দুপত্রিকার প্রসাদনে তিনি চিরদিনই যত্নবান্ ছিলেন। শরদিন্দু মিত্র মহাশয়ের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা শাস্ত্রানুরাগ দেবদ্বিজ-ভক্তি উল্লেখযোগ্য ছিল। ভগবান্ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনগণের চিত্তে শান্তিদান করুন।

দান। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-ভাণ্ডারে কিষণ্গড়ের মহারাজা বাহাদুর পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানবিস্তারের জন্য দেশের মনস্বী রাজন্যমণ্ডল ও ভূস্বামিবর্গ মনোযোগ করিলেই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। ধন ও জ্ঞানের মৈত্রী, ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলীর সবিস্ময়-দর্শনীয় হইলেই সুখের কথা।

দানের গুরুত্ব। সংবাদপত্রে প্রকাশ—কাকিনার রাজা অনারেবল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় "বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোরে" পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সদুদ্দেশ্যে দান চিরদিনই উত্তম, তবে সাময়িক আবশ্যকের দিকে লক্ষ্য করিলে বলা যায়, এদানের গুরুত্ব অসাধারণ।

অপূর্ব্ব ঘড়ি। রুষ-রাজধানী পেট্রোগ্রাডে একটী ঘড়ি আছে, যাহা প্রকৃতই অপূর্ব্ব পদার্থ। এই ঘড়িটির ৯৫টী মুখ আছে, এবং ইহা ৩০টী বিভিন্ন স্থানে দিবাভাগের সময় নির্দ্দেশ করে। এতদ্ব্যতীত ইহা সূর্য্যের চতুষ্পার্শে পৃথিবীর আবর্ত্তন, চন্দ্রের ছায়া, রাশিচক্র প্রভৃতির পরিচয় দেয়। এই ঘড়ি গ্রেগরী, গ্রীক্, মুসলমান্ এবং হিব্রু পঞ্জিকা অনুসারে তারিখ নির্দ্দেশ করে। ঘড়িটীর বিভিন্ন অংশ সুইজর্লণ্ড হইতে রুষদেশে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রেরিত হয়। পরে রুষদেশে ২ বৎসর-ব্যাপি-চেষ্টায় ইহার সকল অঙ্গ সংযোজিত হয়। বিরাট্ ব্যাপার।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড — ফাল্গুন। — ১৩২২ সাল।
১১শ সংখ্যা। — ১৮৩৭ শকাব্দ।

জীবনের পরপারে।

(১৯১৬ সালের ৯ই জানুয়ারী "যশোহর নীতি-কথা-সমিতি"তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, মুন্সেফ্ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।)

"বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু
দেখাও তব চির আলোক-লোক।
ওপারে সবি ভাল, কেবল সুখ আলো,
এ পারে মরি ব্যথা আঁধার শোক।
মাঝে দুস্তর, কঠিন অন্তর
শ্রান্ত পথিকেরে বলিছে "সর সর"
তোমার পাদদেশে, পিপাসাতুর এসে
ফিরে কি যাবে ল'য়ে চির-বিয়োগ?
ঐ নিঠুর অর্গল, করুণ শুভকরে
মুক্ত করি দেহ, আতুর দীন তরে;

পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা
তোমারি কাছে পাবে শান্তি সুখ-সুধা ;
অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হোক্ তব সনে অমৃতযোগ।”

দুজ্ঞেয় তত্ত্ব। বহু শত বৎসর গত হইল ঋষিকল্প শঙ্করাচার্য্য প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া ভাব-মুগ্ধভাবে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন—

কস্য ত্বং বাকুত আয়াতঃ
তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ

তুমি কে—কাহার তুমি—কোথা হইতে তুমি আসিয়াছ—এই সব তত্ত্ব একবার চিন্তা করিয়া দেখ।

বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে, মনুষ্য-জীবন বিষম প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। দু দিনের খেলা খেলিতে যেন আমরা করিব ভাষায় “ভব-রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বেশে” সাময়িক হাসি কান্না, সাময়িক শোক-দুঃখ, সাময়িক উৎসাহ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয় ভরা স্নেহ ভালবাসা, অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন অজানিত শূন্য প্রদেশে লীন হইয়া যাইতেছি! জন্মাবধি যে সংস্কার, সে স্নেহ মমতা, যে তীব্র আসক্তি, যে চিরসঞ্চিত বিশ্বাস আমরা পোষণ করিয়া আসিতেছি, দেহধ্বংসে জানি না, এই সব মনোবৃত্তির কি পরিণতি হইবে! স্বর্গীয় কোন কবি একটী গানে বলিয়াছেন—

“কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই।” যে ঐশ্বর্য্যের ভ্রূভঙ্গীতে তুমি আজ সবলকে তুচ্ছ করিতেছ, যে পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিমত্তার হুঙ্কারে তুমি তোমার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে ব্যস্ত, যে সৌন্দর্য্যের আড়ম্বরে বিভোর হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছ, যে বিলাস-বিভ্রমে তুমি প্রাণ মন ভাসাইয়া পূতিগন্ধ আপাত-মনোরম নরকের ব্যসনমরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছ—একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ভাই, একবার আত্মদর্শন করিয়া বিচার কর, ভাই, তোমার সাংসারিকতার লীলা-খেলা ক' দিনের তরে? দার্শনিক কর্কশ যুক্তি-বিজৃম্ভিত ভাষায় বলিবেন “চরম-তত্ত্ব দুজ্ঞেয়—(unknowable) মনুষ্যের সসীমবুদ্ধি এই সব চরম-তত্ত্বের সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না—দেহ-ধারণ ও দেহাবসানের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা জানিবার উপায় নাই, জন্ম ও মৃত্যু দুর্ভেদ্য রহস্যাচ্ছন্ন।” বস্তুত যুগে যুগে কূটতার্কিক মনস্তত্ত্ববিৎ এই দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা সম্বন্ধে যুক্তি-প্রয়োগে কত বিচার

করিয়াছেন—যুগে যুগে কত কত মহাপণ্ডিত কুশাগ্রবুদ্ধি চিন্তাশীল সুধী, এই দুর্ব্বোধ্য ইন্দ্রজালের বাখ্যা করিতে যাইয়া হতাশ হইয়াছেন। তাঁহাদের শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছে—"এই সব চরম-তত্ত্বের মীমাংসা জ্ঞানাতীত।"

সর্ব্বদেশের প্রসিদ্ধ কবিগণের হৃদয়ে মানব-জীবনের শোক দুঃখ, আধিব্যাধি, মানব-জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরত্বে অভিভূত করিয়াছে। সেক্ষপিয়র অমৃতময়ী ভাষায় বলিতেছেন—

To-morrow, to-morrow, to-morrow.
Creeps in this petty space from day to day
Till the last syllable of recorded age.
Life's but a walking shadow
That stuts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more.

সেলি বলিতেছেন—

We look before and after
And pine for what is not
Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those that tell
of saddest thoughts.

প্রাচ্য কবিরাও জীবনের এ দুঃখ সঙ্গীত গাহিয়াছেন—

We so sojourn here for a day or two
And all the gain we get is grief and woe
And the living life's problems all
unsolved.
Harassed by regret we have to go
We are the voices of the wandering wind
Which moan for rest and rest
can ne'er bind ;
So as the wind is, so is mortal life
A moan, a sign, a sob, a storm
and strife.

"দুদিনের হাসি, দু'দিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে"

এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব—এই দুর্ভেদ্য কুহকময়ী মায়া—এই জীবন্ত স্বপ্ন আমি দুই একটী কথার অবতারণা করিব।

ঐশ-তত্ত্ব—পরলোকের অস্তিত্ব। প্রথম ভগবানের অস্তিত্ব। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক বিরাট্ 'অস্তিত্ব' এক বিপুল চৈতন্যের স্পন্দন—এক অলৌকিক নিয়ম-তন্ত্রের কৌশলজাল—এক অভূতপূর্ব্ব মহামহিম-শক্তি—এক অবিনশ্বর আত্মা, আমরা নিত্য অনুভব করি। এই বিরাট্ অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। চিন্তাশীল মহাপণ্ডিত দার্শনিক-প্রবর Herbert Spencer তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ First Principles নামক গ্রন্থে "এই মহান্ Power, Energy" (শক্তিস্ফূরণ) স্বীকার করিয়াছেন। ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকেরা অমোঘ যুক্তি-বলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "মানবের আত্মা, দৈহিক ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের প্রক্রিয়া-শক্তি নহে—এই জড়ের অন্তরালে চৈতন্য আছে—চৈতন্য জড় সমষ্টিভূত কারণ নহে—চৈতন্যের অস্তিত্বের সার্থকতার জন্য জড়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।" বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপে প্রমাণীকৃত তত্ত্ব- প্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন—"The supreme thing in the universe is not *matter* but Spirit and it is for the sake of spirit that matter exists"

বাইবেলে Book of Job এর চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে Job সন্দিগ্ধভাবে মর্ম্মশ্বাসে বলিয়াছিলেন—If a man die shall he live again? এই সন্দেহের আকুল প্রশ্ন প্রত্যেক চিন্তাশীল মানবের মনে উদিত হইবে—"মৃত্যুর পর এই জড়দেহ-ধ্বংসের পর 'আমি' কি থাকি?" জড়বাদী সন্দেহ-বিড়ম্বিত মনুষ্য, এই সংসার-পরিত্যাগের সময় মহাপ্রতাপশালী সম্রাট সুল্তান মামুদের মত অশ্রুজল ত্যাগ করিবেন; কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা ভক্তকবি হাফেজের মত সেই আনন্দনিকেতনে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য আনন্দে মাতোয়ারা হইবেন। সংসারে উৎকট বৈষম্যের মধ্যে পাপের সাময়িক অভ্যুত্থান ও পুণ্যের সাময়িক পরিলোপে আমরা সময়ে সময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যাই এবং ভাবি যে এই সংসারের সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, বিচারবুদ্ধিপরায়ণ নিয়ন্তা কেহ নাই। দুঃখে, ক্ষোভে, দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে প্রাচ্য জড়বাদ বিষাদের সুরে কহে—

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য
পুনরাগমনং কুতঃ?

প্রথম—আমাদের সকলেরই এই স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি (Instinct) যে এ

আমিত্বের (Egoর) মৃত্যুর পর পৌনঃপুনিকতা আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মৃত্যুকে এই অবিনশ্বর আত্মার এক অবস্থা বলা হইয়াছে—

দেহিনঃ অস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। শৈশবের সেই বালক 'আমি' যৌবনের পরিণত সেই পূর্ণবয়স্ক 'আমি' বৃদ্ধাবস্থায় সেই জরাজীর্ণ জড়দেহ-পরিধি "আমি" মৃত্যুর পর "আমি" থাকিব—তখন এই 'আমি'র উপাধি জড়দেহ হইবে না, এই 'আমির' উপাধি সচ্চিদানন্দ দেবাদিদের ন্যায় প্রভামণ্ডিত আবরণ হইবে! মহাত্মা সক্রেতিস্ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে, এই আমিত্বের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে, যখন তাঁহার প্রিয় শিষ্য ক্রিতো তাঁহাকে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিতে বলিল, সক্রেতিস্ বিশ্বাসের বাণীতে তাঁহাকে বলিলেন—Crito Crito where shall I fly to avoid the Inevitable? সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে এই আমিত্বের অস্তিত্ব-বিশ্বাস সজীব রহিয়াছে। সুসভ্য ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া বল্কলধারী অরণ্যবাসী জুলু ও হটেন্‌টট্ পর্য্যন্ত সকল জাতির মধ্যেই জীবনের পরপারে যে চৈতন্য থাকিবে এই ধারণা রহিয়াছে। আমাদের হৃদয়-নিহিত মনোবৃত্তি, পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রধান ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই দিব্য মনোবৃত্তি জড়জগতের যেন কোন পদার্থে তৃপ্ত হয় না! সেই স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, এ মর জগতের কোন বিষয়-ভোগেই যেন শান্তিলাভ করে না! কুবেরের ঐশ্বর্য্য, অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য, অনুপম অপ্রতিহত বুদ্ধি, কিছুতেই মনুষ্যের প্রাণের তন্ত্রীতে সঙ্গীত-ঝঙ্কার উঠে না। প্রাণের এই বিশ্বব্যাপিনী অতুচ্চ আকাঙ্ক্ষা, যেন সসীম সংসার-ক্রীড়ায় প্রশমিত হয় না! সুতরাং এই আকাঙ্ক্ষার পরিপুষ্টির বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে পরকালের অস্তিত্ব-মীমাংসায় উপনীত হইতে হয়।

দ্বিতীয়—মনুষ্যের অন্তর্নিহিত দেব-ভাব-সমুচ্চয়ের (Moral forces) প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সন্তানবৎসল পিতামাতার নিষ্কাম স্নেহ, সাধ্বী পতিপ্রাণা-ধর্ম্মপত্নীর অকৃত্রিম প্রেম, অভিন্ন-হৃদয় স্নেহ-প্রবণ বন্ধুর অকপট ভালবাসা, ব্রহ্মভক্ত সাধুর সগদ্গদ্ ভক্তি, প্রভুহিতৈষী ভৃত্যের অকপট প্রভুভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাশয়ের আত্মদান, এ সকলের সার্থকতা ও সুপুষ্টি কি মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়? আর্ত্তের চক্ষু-জল মুছাইতে, ব্যথিতের ব্যথা দূর করিতে, বিপন্নের বিপন্নিবারণ করিতে যুগে যুগে যে সমস্ত মহাত্মগণ আত্মত্যাগ করিয়াছেন, হিরণ্যকশিপুগণের দানবীয় হুঙ্কারের

বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধীরবুদ্ধি ব্রহ্ম-পরায়ণ ঈশ্বর-ভক্ত সাধু ধর্ম্মের মোহন সঙ্গীত গাহিয়াছেন, হইতে পারে না যে তাঁহাদের এই অনন্তদ্যোতক সাধু চেষ্টা এই সসীম সংসারে, সীমাবদ্ধ? মহিলা কবি Mrs Hemans তাই মানবের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া এই অভয়বাণী ধ্বনিত করিয়াছেন—

Alas for love, if *thou* art all
And not beyond on Earth.

হে পৃথিবি! মানবের অফুরন্ত প্রেমের উৎস যদি তোমাতেই শুকাইয়া যাইত, পরপারে এই প্রস্রবণের উদ্দামগতি না বহিত, হায়! তাহা হইলে মানবের প্রেম—হায়, তাহা হইলে মানবের চরিত্র-মাহাত্ম্য বৃথা - অর্থ-হীন, আড়ম্বরপূর্ণ জল-বুদ্‌বুদ্! এই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে বলিয়া, এই পরপারের সুধাবর্ষী সঙ্গীতের ঝঙ্কারের তান, প্রাণ মাতোয়ারা করে বলিয়া, দেখিতে পাই, দীনদরিদ্র অন্নহীন পর্ণকুটীরবাসী ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ সাধুর জ্যোতিচ্ছটায় পাপের অন্ধতম বিদূরিত হয়, সংসারের আধিব্যাধির মধ্যে আনন্দের কলকল সঙ্গীত ভাসিয়া উঠে, দুষ্কৃতির বিনাশ হয়, সংসার দিব্য সুন্দর ও পবিত্র হয়। প্রাচীন ভারতের সেই কুটীর-বাসী, শাকান্নভোজী, সন্তোষামৃত-পিপাসু চারিত্র্যমাহাত্ম্যদৃপ্ত ব্রাহ্মণের মনো-মুগ্ধকর ছবি যেন তখন পরপারের আভাস বলিয়া দেয়। তাঁহারা 'প্রেয়'কে উপেক্ষা করিয়া শ্রেয়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতায় তাঁহাদের নিষ্কাম জ্ঞান-বৈরাগ্যে, তাঁহাদের মন্দাকিনী-নিস্যন্দি বিশ্বপ্রেমে প্রাচীন ভারতে কি অচিন্তনীয় শান্তির ও মনুষ্যত্বের যুগ আনয়ন করিয়াছিল! যাহা সত্য, সুন্দর, দিব্য পবিত্র, যাহা আত্মার মঙ্গলকৃৎ, সরস্বতীর নৈষ্ঠিক উপাসক ব্রাহ্মণ, একপ্রাণে তাহার সাধনা করিয়াছিলেন! তাঁহাদের ধর্ম্মপদ্ধতি, তাঁহাদের অপূর্ব্ব জ্ঞান বিকাশ, তাঁহাদের বিশ্বহিত-সাধক উদ্যম, তাঁহাদের চরিত্রে দেবত্বের অভি-ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে! এইরূপ চারিত্রমাহাত্ম্যের অমর-গঙ্গার ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি যদি মৃত্যুর পরপারে না পৌঁছায়, তবে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ভাবের সার্থকতা ও ইহজন্মের বৈষম্যের সমন্বয় নাই।

তৃতীয়—বৈজ্ঞানিকেরা কহেন Matter is indestructible জড় অবিনশ্বর। যখন জড়জগতে আমরা অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশল, ঐন্দ্রজালিক নিয়ম শৃঙ্খলা দেখি, তখন স্পষ্টই এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অন্তর্জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জড় যদি অবিনশ্বর হয়, তবে মনুষ্যের আমিত্ব "ব্যক্তিত্ব" অবিনশ্বর। জড়জগতে ছন্দে চন্দ্রসূর্য্য অগণ্য গ্রহ তারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ছন্দে ফুল ফুটে, পাখী

গাহে, কলনাদিনী স্রোতস্বতী অনন্ত মহাসাগরের পানে ছুটে। যদি পরপারের বিদ্যমানতা না থাকে, তবে এই নিয়মপরম্পরা—এই সৃষ্টিতত্ত্ব—এই আধ্যাত্মিক ভাব-প্রবণতা সব বিসদৃশ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। ইহজগতে সাময়িক অস্তিত্বের কোন নিয়ম—চাতুর্য্য থাকে না।

সাধনা। পরপারের কাহিনী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ সাধনা। সাধনা-বলে মনুষ্য, মৃত আত্মার দর্শন পায়, মৃত আত্মার সহিত চিন্তাবিনিময় করে। ইহা কবি-কল্পনা নহে বা মনোমোহন উপন্যাস নহে। ইহা প্রমাণীকৃত সুস্পষ্ট সত্য। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-মনীষী Sir Oliver Lodge যিনি কোন তত্ত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণ না হইলে গ্রহণ করেন না, তিনি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, কিরূপ অবস্থায় মানুষ, মৃত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পায় ও তাহার সহিত ভাববিনিময় করিতে পারে। বাইবেলে একটী সুন্দর বচন আছে। Seek and you shall find. যাহারা চরমতত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া, এই জরামরণ-ক্লিষ্ট সংসারে অমৃতের অন্বেষণ না করিয়া, বৃথা উপহাস করে, তাহারা ভগবান্‌কে অশ্রদ্ধা করে—মনুষ্যের মনোবৃত্তিকে অপমান করে। সাধনা কাহাকে বলে, সাধনা কিরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা বিশদভাবে বলিবার শক্তি ও পাণ্ডিত্য আমার নাই; যে সব মহাত্মারা সাধনা-বলে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রস্তাবনা করিতে সমর্থ। আমাদের দেশে অনেকে বোধ হয় বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন যে, অনেক সময় ভৌতিক ঔষধে বা প্রক্রিয়ায় উৎকট ব্যাধির সম্যক্ প্রতীকার হয়। আমি এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি এবং আপনারা আমাকে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা বলিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আমার বিশ্বাস, যাহারা ভগবানের জগৎ উপেক্ষা করে, যাহারা আদর্শ বিষয়ী ও সংসারী নহে, তাহারা পরকাল-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্য গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন যে, যে কর্ম্মদক্ষ ভক্ত, সেই তাঁহার প্রিয়।

"অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষঃ॥

এই সংসারের আবিলতার মধ্যে ভগবন্মুখী বুদ্ধি লইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসিযৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্॥

Live, move, have your Being in God এই সংসারের ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে মনুষ্যের অক্ষয় অনন্ত শান্তি ও আনন্দ, পরমেশ্বরের অনিশ ধ্যান ও উপাসনা; সমস্ত ধর্ম্মের মূলভিত্তি সেই বিরাট্ পুরুষের সহিত সম্মিলন। এই

বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি অণুতে যাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে, অগণ্য নক্ষত্র-খচিত কোটি কোটি জ্যোতিষ্কশোভিত গগনমণ্ডল, যাঁহার অনন্ত সত্তা প্রাণের ভিতর উদ্দীপ্ত করিতেছে, অসীম নীলিমময় অতলস্পর্শী মহাসমুদ্র ও চিরতুষার-মণ্ডিত অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণি, যাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া প্রাণের ভিতর এক অনন্তত্বের আভাস উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে, ভক্ত যাঁহার আশ্চর্য্য সৃষ্টি-কৌশল, শৃঙ্খলা ও মহাশক্তি অনুধ্যানে অভিভূত হন, মনুষ্যের হৃদয় যাঁহার পবিত্র আসন, মনুষ্যের আত্মা যাঁহার পবিত্র সৃষ্টি, সেই অনাদি অনন্ত চৈতন্যময় পরমপুরুষের অনুধ্যানে পরপারের মনোমোহন গীতি মর্ম্ম স্পর্শ করে। কঠিন দার্শনিক তত্ত্বে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়না। যিনি অনুভূতির বিষয়, মানুষ্যের দেহের অস্থি মজ্জা মাংসের সূক্ষ্ম পরমাণুতেও যাহার অসীম সত্তা স্পষ্টীকৃত হইতেছে, যিনি স্থলে জলে অন্তরীক্ষে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে নিরাকার থাকিয়া মানব-হৃদয়ে অনন্ত প্রেমের ও ভক্তির উচ্ছাস সর্ব্বদাই জাগাইয়া দিতেছেন, তাঁহার পরিচয় শুষ্ক তর্কজালে স্পষ্টীকৃত হয় না। তাঁহাকে জানিতে হইলে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিতে হইবে, সরলপ্রাণে সরল বিশ্বাসে তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে ভূমিষ্ঠ প্রণত হইতে হইবে। ব্যাকুলিতকণ্ঠে পূতহৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে ক্রন্দন করিতে হইবে। তাঁহার দিব্যজ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত করিয়া মোহ দূর করিতে হইবে। সাংসারিকতার নিষ্পেষণ, দুঃখের কুজ্ঝটিকা, প্রলোভনের প্রলঙ্কর হুঙ্কার, যখন হৃদয় ঘেরিয়া দাঁড়াইবে, পাপের সহিত সংগ্রামে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে, তখন ভগবানের অভয়বাণী সাধন-পথের পথিককে আশ্বস্ত করিয়া বলিবে "ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ"। ভগবান্ করুন, সাধনায় যেন আমরা সকলে সে অমৃতের সন্ধান পাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন এই "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত" কাহাকে বলে দেখা যাউক্। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বলিতেছেন—

"রাধায়া ভবতশ্চচিত্তজতুনী স্বেদৈর্ব্বিলাপ্য ক্রমাদ্।
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং

চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্মোদরে।
ভূয়োভির্নবরাগ হিঙ্গুল-ভরৈঃ শৃঙ্গার-কারুঃকৃতী॥

যখন ব্রহ্মাণ্ডরূপ বীজপ্রাসাদে লীলাপর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চিত্তজতুতে, মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার চিত্তজতু, উভয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ-রূপ হিঙ্গুলবর্ণ প্রেমাগ্নি দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া অভিন্নরূপে রঞ্জিত করিয়া তুলে, তখনই রাধাকৃষ্ণ-রূপের "বিবর্ত্ত বিলাস" হয়। পরে রামানন্দ বলিতেছেন,—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখো কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্বঅঙ্গ ঢাকা॥
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমললোচন।
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥

তখন চতুর-চূড়ামণি স্বীয় ভক্তের মন বুঝিবার জন্য নানারূপ ছলনা-বাক্য প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু ভক্তের নিকট ভক্তাধীনের কোন ছলনাই খাটিল না, অবশেষে ভক্তেরই জয় হইল। ভক্ত গৃহীর নিকট ছদ্মবেশী চোর-চূড়ামণি অঙ্গ ঢাকা দিয়া আসিয়াও ধরা পড়িয়া গেলেন। তখন আর করেন কি, দায় ঠেকিয়া পটাপট্ একরার করিতে লাগিলেন ;—

"তবে প্রভু হাসি তারে দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িল ভূমিতে॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শি করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইলা মন॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্র-সুত বিনা তেঁহ না স্পর্শে অন্য জন॥
তাঁ'র ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন॥
তোমা ঠাঁই আমার কিছু গুপ্ত নাই কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সর্ব্বমর্ম্ম॥"

পাঠক মহোদয়গণ! এখন বুঝিলেন কি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কাহাকে ভজন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন?

এখন আর এক আপত্তি হইতে পারে যে, তবে গোস্বামিগণ কেন গৌর-বিগ্রহ স্থাপন না করিয়া রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন? গৌর-সেবা প্রচার না করিয়া কেন শ্যামসুন্দরের সেবা প্রচার করিয়া গেলেন? আমি বলি, রামচন্দ্র বা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট থাকিতে সমসাময়িক ঋষিগণ বা ভক্তগণ রামসীতা বা রাধা-কৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন না কেন? তাঁহাদের সেবা প্রচার করিলেন না কেন? অক্রুর, উদ্ধব, যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতেন, মানিতেন, তাহারাও ত নারায়ণ-সেবা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নারায়ণেই কৃষ্ণ-দর্শন করিতেন ও তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। গোস্বামিগণও রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেই গৌর-দর্শন পাইয়াছেন ও তাঁহাকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়াছেন; আর যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিগ্রহ-সেবারই বা প্রয়োজন কি? স্বয়ং বর্ত্তমানে প্রতিনিধি কে খুজে? সীতাদেবীর প্রাকট্যাবস্থায়ও তাঁহার অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন রামচন্দ্র, স্বর্ণ সীতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থায় গৌরীদাস প্রভৃতি কতিপয় ভক্তপ্রবর তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বড় বড় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আরাধ্যকে "হর্ত্তাকর্ত্তা" জ্ঞানে পুষ্প-চন্দনাদি-দানই পূজার চরম নহে, প্রথমাবস্থা মাত্র। তাই মহাবিরহে পড়িয়াও গোপীগণ কোনও দিন সেরূপ পূজা করিতে পারেন নাই। গোস্বামিগণও সেরূপ পূজা করিয়া কখনই তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণের "বিবর্ত্ত-বিলাসের" মূর্ত্তি, উহা হৃদয়ের ধন, অনুভবের সামগ্রী, সাধারণ্যে প্রকাশের যোগ্য নহে, প্রকাশ করিলেও কুফল বৈ সুফল ফলে না। রাধাকৃষ্ণ না বুঝিলে, তাঁহাদের পরস্পরের অনুরাগ না বুঝিলে, প্রেম না বুঝিলে, প্রেম-বিলাসের বিবর্ত্ত কি বুঝিবে? গোস্বামিগণ সাধারণ ভক্ত নহেন, তাঁহারা সকলেই

পূর্ব্বাবতারের ব্রজ-গোপিকা। তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত-দেহ, পরমালিঙ্গিত বপু সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবেন, আর অনধিকারিগণ তাঁহাকে "সন্ন্যাসী" মাত্র দেখিবে, "ভক্ত" মাত্র বলিবে,—তাহা কি তাঁহাদের প্রাণে সহ্য হয়? রাধাকৃষ্ণ না বুঝিলে লোকে তাঁহাকে সন্ন্যাসী বৈ আর কি দেখিবে? না হয় শাস্ত্রযুক্তি-বলে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মানিতে পারেন, তাহাতেই বা কি হইবে? তাহাতে ত আর উপাসনার সার যুগলের উপাসনা হইল না—"সন্ন্যাস-কৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ"—রূপ দেখিলেন, তাহারই উপাসনা হইল।

"তত্তৎ শ্রীভগবতোঽনং স্বরূপং স্ফূর্ত্তি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে॥"

শ্রীভগবানে উপাসনা-যোগ্য বহু বহু নিত্য মূর্ত্তি সমূহ বিদ্যমান আছে, উপাসনানুসারে তাহা তত্তদুপাসকে প্রকাশ পাইয়া থাকে—অর্থাৎ যিনি যে মূর্ত্তির যে ভাবের উপাসক, তাঁহার নিকট সেই মূর্ত্তির সেই ভাবই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। তাই গীতাতেও বলিয়াছেন ;—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং॥

এজন্য স্বভব-দয়াল ভক্ত-চূড়ামণি গোস্বামিপাদগণ রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভজন-ক্রিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভজন-ক্রিয়া ব্যতীত যখন জীব-হৃদয়ে প্রেমোদয় হইতে পারে না, তখন সেই প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠার সাকার বিগ্রহ গৌরসুন্দর কি করিয়া উদিত হইবেন?

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।"
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্তথা ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ংপ্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির বাসনা মাত্র। পরে সাধু-সঙ্গ-জনিত চিত্তশুদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে ভজনরূপ বৈধী ক্রিয়ার আরম্ভ হয়। ক্রমে যেমন ভজন-ক্রিয়ার গাঢ়ত্ব হয়, অর্থাৎ উপাসক যখন উপাস্যের পরিচয় পা'ন—তখন তাঁহার কৃপায় ভক্তের অনর্থনিবৃত্তির আরম্ভ হয়, এই অনর্থ-নিবৃত্তির উপলব্ধি-হইতে সাধক ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য বুঝিতে পারেন, ইহাই অনুভব। এই অনুভব হইতে যে দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহার নাম বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাসই নিষ্ঠা ; এই নিষ্ঠা-ভক্তির ভজন-ক্রিয়ার নাম রুচি; এই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির ক্রিয়া। তাহার পর আসক্তি অর্থাৎ ইষ্টে আবিষ্টতাময়ী ও গাঢ়-তৃষ্ণাময়ী রাগানুগীয়া

ভক্তি। তাহার পর ভাব। প্রেমাঙ্কুরকে ভাব বলে, ভাবের গাঢ়ত্ব—প্রেম। সেই প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে উহার বিবর্ত্ত-বিলাস উপস্থিত হয়, তাহারই স্বরূপ আমাদের গৌরমূর্ত্তি, আর প্রেমের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি—অর্থাৎ প্রেম যতক্ষণ প্রেম থাকেন, ভাব যতক্ষণ ভাব থাকেন, ততক্ষণই প্রেমপয়োধি সুনীল থাকেন, তাই তিনি শ্যামসুন্দর, আর যখন ভাব-চন্দ্রিকা স্পর্শে প্রেম-পারাবার উচ্ছসিত হইয়া উঠেন, তখন ভাব-চন্দ্রিকার নৈকট্য বশতঃ তাঁহার সমুজ্জ্বল কান্তি প্রতিফলিত হয়—"কাঞ্চনকান্তিবিনিন্দিতকলেবর"—হন, সেই-রূপ আমাদের গৌরসুন্দর। তাই গোস্বামিগণ প্রেম-পয়োধি শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীমতীকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া স্থাপনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সমুদ্রও দেখে নাই, চন্দ্রও দেখে নাই, সে ব্যক্তি চন্দ্রকর-স্পর্শে সমুদ্রে কি রূপ জলোচ্ছাস হয়, তাহার কিরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য হয়, তাহা কিরূপ বুঝিবে? বলিতে পারেন, "আদি হইতে মহাপ্রভুর ভজনা করিলে কি সে বুঝিবে না?" আমি বলি, কি রূপে তাঁহার ভজনা করিবেন?—"সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ"—ভাবে ভজনা করিলে কখনই তাঁহার নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তির স্বাদগ্রহণ হইবে না,—"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—জ্ঞানে ভজনা করিলে নিশ্চয় হইবে। সেই জ্ঞান-লাভের জন্যই ত রসরাজ ও মহাভাবকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে জগতের নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছেন। যে চূণ ও হরিদ্রাকে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় দেখিয়াছে, পুনরায় তাহাদের সম্মিলনাবস্থাও দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তিই তদুৎপন্ন রক্ত বর্ণের স্বরূপটি বলিতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তি নিজের ধী-শক্তি-বলে মিশ্রবর্ণের স্বরূপ নির্দ্ধারণে সমর্থ হন, শ্রীগুরুর কৃপায় একেবারেই "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" ইহা বুঝিতে সমর্থ হন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। যদি কেহ প্লুত গতিতে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একেবারেই হর্ম্ম্যোপরি আরোহণে সমর্থ হন, তাই বলিয়া যে মধ্যবর্ত্তী সোপানগুলি প্রস্তুত করিতে হইবে না, ইহা যেন কেহ না বুঝেন। গোস্বামিগণ রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু যুগলোপা-সনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াও মহাপ্রভুকে সেই যুগল-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিতে মহাপ্রভুর উপাসনাই প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মহা-প্রভুকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদি দর্শন করিলে অনায়াসেই বুঝা যায়। বাহুল্য-ভয়ে সে সমুদয়ের উল্লেখ না করিয়া সর্ব্বজন-বিদিত শ্রীল রূপ-গোস্বামী পাদের একটি মাত্র শ্লোক উল্লেখ করিলাম। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় "বিদগ্ধ মাধব" নামক একখানা নাটক লিখিতে গিয়া তাহার মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ

শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন। ঐ নাটক যখন মহাপ্রভুকে শুনাইতে শ্রীপাদরূপ নীলাচলে আগমন করেন, তখন সুরসিক কবি রায় রামানন্দ ঐ নাটক সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—"কহ রূপ! ইষ্টের বর্ণন।"—রূপ বলিতেছেন ;—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদাহৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভূতযোনি-তথ্য।

বেদোক্ত বিধানে যাহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, জীবনে যাহাদিগকে নানা ভয়াবহ পাপকার্য্য করিয়া যাইতে হয়, যাহারা ভগবানের দ্বেষ নিরন্তরই করিতে থাকে, তাহারা মৃতুসময়ে অজ্ঞাত কোন দোষ পাইলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরিচায়ক প্রমাণ—

ততো বহুতিথে কালে স রাজা পঞ্চতাং গতঃ।
বৈদিকেন বিধানেন ন লেভে চৌর্দ্ধদৈহিকং।

ভূতযোনি একটি কষ্টকর প্রেতাবস্থা মাত্র। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানবকেই নিজকর্ম্মানুযায়ী প্রেতদেহ লাভ করিতে হয়। এই প্রেতদেহ, শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণাদি দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হইলে, জীব, স্বর্গনরক-ভোগোপযোগ্য ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রেতদেহ সাধারণ অবস্থা। এই প্রেতদেহেরই একটি বিশেষ জঘন্য অবস্থার নাম ভূতযোনি। আতিবাহিক-দেহান্তে যে প্রেতশরীরলাভের কথা শুনা যায়, তাহা সকল সময়ে তাদৃশ কষ্টকর নহে। আতিবাহিকদেহ, প্রেতদেহ, ভোগদেহ, লিঙ্গদেহেরই প্রকার-ভেদমাত্র। এই ভূতযোনিও লিঙ্গদেহের সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্যতম পরিণাম। মহাপাপী জীবগণের মধ্যে কেহ মৃত্যুর পর, কেহবা নরক-ভোগান্তে এই ভূতযোনি লাভ করিয়া থাকে। সকলেরই যে এই ভূতযোনি-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা নহে।

লিঙ্গদেহে যাহারা স্বকর্ম্মানুরূপ জন্ম লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকেও প্রেত বলে। তাহারা আকাশস্থ নিরালম্ব থাকিয়া নিজকর্ম্মার্জ্জিত নূতন দেহের সন্ধান করে।

পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গেবা স্বেন কর্ম্মণা॥

জীব এই প্রেতদেহে জীবিত কালের সংস্কারবশে ক্ষুৎপিপাসাদি সামান্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে মাত্র। কষ্টকর মানসদুঃখ এই প্রেতদেহে হয় না; তাহার জন্য ভোগদেহ লাভ করিতে হয়। এই সাধারণ প্রেতগণ লোককে বিভীষিকা দেখায় না, কাহারও দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মারিয়া ফেলিতেও যায় না। এই দেহে বৎসরাধিক থাকা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না—তাই "পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে" এই শাস্ত্রীয় উপদেশ দেখিতে পাই।

ভূতযোনি-প্রাপ্ত পাপিষ্ঠ জীবকেও প্রেত বলে। প্রেতযোনি বলিতে এই ভূতযোনিই বুঝিতে হয়। শাস্ত্রেও কখন উপরোক্ত সাধারণ লিঙ্গদেহস্থ জীব, কখন বা এই ভূতযোনি-প্রাপ্ত জীব, প্রেতশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই ভূতযোনিভাব অতিকষ্টদায়ক। সর্ব্বপ্রাণি-বিগর্হিত শ্লেষ্মমূত্র পুরীষাদি ইহাদের আহার; জনসমাগমরহিত ভীষণ শ্মশানাদি, কিম্বা ভগ্ন পরিত্যক্ত দুর্গন্ধ গৃহাদি ইহাদের বাসস্থান। ইহাদিগকেই দুর্ব্বল-প্রকৃতি মানবেরা ভয় করে, আবার ইহারাও সবলমনঃশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে আসিতে ভয় পায়। লোকালয়ে অবস্থিতি-জনিত সুখ ও সান্ত্বনা ইহাদের জন্মে না।

ছোট শিশুরা কখন ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে শুনা যায় না। ভূতযোনি-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ইহাদের নাই বলিলেই হয়। কারণ, শিশুরা বর্ত্তমান জন্মের কোন পাপ বা পুণ্য লইয়া যাইতে পারে না বলিয়া লিঙ্গদেহে অবস্থিতিই সম্ভব হয় না। সাধারণ পাপপুণ্যই সাধারণ লিঙ্গদেহের অর্থাৎ প্রথমোক্ত প্রেত-দেহের প্রাপক, আর পারলৌকিকার্থ পুণ্য এবং উৎকট পাপ, স্বর্গনরকোপ-যোগ্য ভোগদেহের কারণ। যাহারা বর্ত্তমানজন্মেই কোন প্রকার সাধারণ পাপ পুণ্য লইয়া যায় না, তাহারা উৎকট পাপ এবং পারলৌকিকার্থ পুণ্য লইয়া যাইবে—ইহা সম্ভব নহে। শিশুগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নূতন জন্ম লাভ করিতে পায়। ইহাদিগকে জন্মলাভার্থ কিয়দ্দিনও অপেক্ষা করিতে হয় না। এই হেতু ছোট ছোট শিশুগণের শাস্ত্রীয় দাহ, আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক

শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি প্রেতকার্য্য শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হয় নাই। বিচিত্র নব নব কর্ম্মই বিচিত্র জন্মের আরম্ভক। শিশুজীবনে কর্ম্ম-বৈচিত্র্য নাই বলিয়া অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। তবে বহুজন্ম-পরিচিত বাসনা, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নাশ করা যায় না বলিয়া, শিশুগণ জন্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না।

দুষ্ট পাপী কখন কখন ভূতযোনি অবস্থায় অনিষ্ট করিয়া থাকে—ইহা শুনা গিয়াছে। এই ভূতযোনি অবস্থায় অনুষ্ঠিত পাপের ফল, ঐ ভূতযোনিপ্রাপ্ত জীবকেই ভোগ করিতে হয়। যদিও সাধারণ সিদ্ধান্ত যে, লিঙ্গদেহে পাপের ফলভোগ হইয়া থাকে, নূতন কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না; তথাপি এই ভূতযোনি-দের কৃত পাপ জীবিত অবস্থারই কর্ম্ম-পরিপাকমতে বুঝিতে হইবে। জীবিত অবস্থায় যে দুষ্ক্রিয়ার আচরণ, সময় ও সুযোগ অভাবে ঘটিয়া উঠে নাই, মৃত্যুর পর তাহাই সংঘটিত হয় মাত্র। মৃত্যু-সময়ে ঐ পাপাচরণ-বাসনা এতই উৎকট ছিল যে, মৃত্যুর পর তাহাই সেই জীবে অনুবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে দুষ্ক্রিয়া-চরণ করিতে বাধ্য করায়। জীবিত অবস্থায় রোপিত বীজ মৃত্যু-সময়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে মাত্র তাহার ফল দেখাদিল। জীবিত অবস্থার উৎকট বাস-নাই মৃত্যুর পর স্পষ্টাকারে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে মাত্র। এই পাপ-ফল সেই জীবেরই প্রাপ্য।

এই কষ্টকর ভূতযোনি হইতে অব্যাহতির সময় যখন নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তখনই উহারা প্রায়ই ব্যাকুল ও আত্মহারা হইয়া থাকে। এই সময়ে কোনরূপ উৎকট বাসনার বশবর্ত্তী না হইয়াও উদ্ধারের আশায় লোকদের জ্বালাতন করে—অত্যাচারও করিয়া থাকে। কখন কখন কাহারও দেহে আবিষ্ট হইয়া অত্যাচারিত ব্যক্তিকে "নিজের উদ্ধারের ইচ্ছা" প্রকাশও করিয়াছে, তাহাও শুনাযায়।

গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে ভূতযোনি হইতে অব্যাহতি হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্র-কথা। আমাদের জীবনে ইহার প্রতক্ষ উদাহরণও দুই, একটি মিলিয়াছে। ভগবানের দয়ায়, স্থানের মাহাত্ম্যে, ভক্তির গুণে, বিশ্বাসের জোরে, সংস্কারের প্রভাবে হইতে না পারে, এমন কি আছে? হয়তঃ এই গদাধরের পাদপ্রভাবের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সত্বই বাহির হইবে।

"এষ্টব্যাবহবঃপুত্রাযদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ"

আত্মঘাতীরা প্রায়ই ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। আত্মঘাতীকে বহুকাল এই

ভূতযোনি অবস্থায় থাকিতে হয়; কল্পান্তে উদ্ধারলাভ ঘটে। আত্ম-ঘাতীদের ভাগ্যে সুকৃতি দুষ্কৃতিময় জন্মলাভ বহু কালান্তে ঘটিয়া থাকে বলিয়া ইহাদের শাস্ত্রীয় দাহ-শ্রাদ্ধাদি নাই। স্বর্গ ত দূরের কথা, স্বকর্ম্মোচিত গতি-লাভেও ইহারা অধিকারী হয় না। আত্মহত্যারূপ পাপের প্রেরণায়ই ইহারা নানারূপ যাতনা সহ্য করে, কৃত পুণ্যের ফলভোগ করিতে পায় না। ইহাদের শ্রাদ্ধীয় প্রেতান্ন-লাভ-যোগ্যতাই জন্মেনা। তবে এই আত্মহত্যা-পাপের একটি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রাচীন স্মৃতিতে নাকি আছে। (১)

প্রেতদেহ লিঙ্গদেহেরই প্রকারভেদ হইলেও ভূতযোনিদের দেহের পার্থক্য আছে। বায়বীয় হইলেও কথঞ্চিৎ গুরুত্ব যে সে দেহে বিদ্যমান, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহারা ইচ্ছামত অপরদেহের প্রতিভাস প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু সত্য সত্যই যে কোন দেহ ধারণ করিতে সক্ষম, এ সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর সংশয় বর্ত্তমান।

আমাদের জীবনেই একটিবার লিঙ্গশরীর-দর্শন ঘটিয়াছিল। তাহা সাধারণ লিঙ্গশরীর কি ভূতযোনির দেহ, তাহা বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করিবেন। আমরা শুধু সেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিব। আমাদের নিজেদের জীবনে প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা বলিয়াই ইহা উপস্থাপিত করিলাম।

একদিন আমি ও আমার এক বন্ধু গরিফার (গরিফা শব্দ গৌরীপুর কিম্বা গৌরীভা শব্দের অপভ্রংশ, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক বিচার করিবেন) দিকে বেড়াইতে যাই। বলিয়া দিতে হইবে না যে তখন আমাদের মধ্যে নানারূপ গল্পগুজব হইতেছিল। কথায় কথায় ভূতের কথা উঠিল। বন্ধুটি ইংরাজী-নবীশ, ভূত-মানাটা তাঁহার নিকট কুসংস্কার ও চিত্তদৌর্ব্বল্য বলিয়া বিবেচিত হইল। আমি দার্শনিক প্রণালী অনুসারে লিঙ্গদেহতত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলাম; দুই চারিটি ভূতের গল্প বলিয়া বন্ধুর চিত্তে ভৌতিক বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা পাইলাম। ফল কিছুই হইল না। কথায় কথায় বন্ধুটি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ভূতকে আমি দেখিতে পাইলে সবুট পদাঘাত করি।" আমি তখন একটু প্রমাদ গণিলাম। আমার মুখ হইতে সহসা উচ্চারিত হইল "যদি অপদেবতা থাকে, তবে তোমার এই ভ্রম ঘুচাইয়া দিবেই"।

বন্ধুটি হাসিয়া উঠিলেন। সে দিন আর কোন কথা হইল না। সে দিনকার

(১) আত্মঘাতীর উদ্ধারের জন্য 'নারায়ণবলি' ও 'বর্ণিবধ প্রায়শ্চিত্ত' করিতে হয়। হিঃ পঃ সঃ।

কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলাম। হঠাৎ একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে বন্ধুটীর মত ফিরিয়া গেল। একদিন আমি ও ললিত বাবু (পূর্ণ নাম শ্রীললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) দুইজনে সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া আমাদের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি ৮টা। সম্ভবতঃ ফাল্গুন মাস। একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ; তিথিটি ঠিক্ মনে নাই। আমরা নিজ-রসালাপে ব্যাপৃত; এমন সময় বীরেন্দ্র (প্রথমোক্ত বন্ধুর নাম শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর মজুমদার) উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সে স্বরের প্রত্যুত্তরে আমিও বলিলাম "কেন"? উত্তর পাইলাম "শীঘ্র এস"। ব্যাকুলতার সহিত এই কথা শুনিয়া ললিত বাবু "যাওনা" বলিয়া তাড়া দিলেন। আমিও জুতা পায়ে না দিয়াই বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। ললিতবাবু জুতা পায় দিতে বসিলেন।

বীরেন্দ্র "দেখ ত এটা কি" বলিয়াই সম্মুখস্থ একটি মূর্ত্তি দেখাইলেন। আমি দেখিলাম, আমাদের সম্মুখেই একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সে মূর্ত্তি ছায়া-মূর্ত্তি অথচ নিরাধার স্থানে রাস্তার মধ্যস্থানে। আমি বিস্মিত হইলাম। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পার্শ্বে মিউনিসিপ্যাল আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছিল; স্পষ্টই দেখিলাম, মানবাকার ছায়ামূর্ত্তি। দেহ শীর্ণ, মধ্যমাকার, পরিধানে সাদা কাপড়; দশটি অঙ্গুলি স্পষ্টই কম্পমান দেখিলাম। বীরেন্দ্র বলিলেন "কিছু কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ? আমাদের ছায়াই দেখ রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। কাহারও ছায়া এরূপ সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন?"

আমি এ ব্যাপারের কোনরূপ রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিতেছিলাম না। তখন কৌতুহলবশতই হউক্ বা লিঙ্গশরীর, কি ভৌতিকযোনি—এরূপ কোন আশঙ্কার ভাব আদৌ মনে আসে বলিয়াই হউক্, তাহার গলদেশলক্ষ্যে হাত বাড়াইলাম। সন্ধ্যার পর চলাচল পথের উপর দুইজনের ভয় হওয়াই বরং বিচিত্র। আমার হাত প্রসারিত হইবামাত্র সেই ছায়ামূর্ত্তি আমাদিগকে বেড়িয়া নিমেষ মধ্যে উর্দ্ধাভিমুখে গঙ্গাতীরলক্ষ্যে অপসৃত হইল। হঠাৎ কাণের কাছে একটি বিষম ঝাপ্‌টা খাইলাম। বোধ হইল, যেন একটা ঘূর্ণী বাতাস কাণের কাছ দিয়া বহিয়া গেল। এক লহমার জন্য দুইজনে উদ্ভ্রান্ত হইলাম। চাহিয়া দেখি, সম্মুখবর্ত্তী স্থানটী আলোকময় হইয়া গিয়াছে। তখনই স্বভাবধীর ললিতবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা পর্য্যন্ত হয় নাই। ললিতবাবুর মুখে যেমন 'ভূত' এই কথাটি শুনিলাম, তখনই ভয়ানক ভয় আসিল।

ইহার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে আর একটি ঘটনা ঘটে। আমাদের এই ঘটনা ঘটিবার পর সেই ঘটনাটিও সত্য বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। আমাদের গ্রামের শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাত্রি ১২ টার গাড়িতে কর্ম্মস্থান হইতে বাটী আসিতেছিলেন; এমন সময়ে গ্রামের কোন ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে ডাকিয়া শিবমন্দিরের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন। পথে যাইতে যাইতেই চমক ভাঙ্গিল "ভট্টাচার্য্যের যে সম্প্রতি বিদেশে মৃত্যু হইয়াছে"! তখন ভূতনাথ চাহিয়া দেখেন, ভট্টাচার্য্য হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যাইতেছেন। ভূতনাথের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ ছিল না; তজ্জন্য সে সময়ে লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

বিশ্বপতি।

বিশ্ব মাঝে বিশ্বপতি
পাই যে তোমার দেখা,
আঁধার হৃদি উজল করা
ওগো পরাণসখা!
দীপ্ত তোমার অঙ্গ-আভা
জগজ্জনের মনোলোভা
প্রভাত-রবি লোহিত-শোভা
উদার গগন মাখা।
বিশ্ব-সাগর সুনীল ব্যোম
তোমার আবাস-ভূমি—
তোমার স্নেহ-নিঝর ছুটে
পাষাণ-হৃদয় চুমি,
তোমার রাতুল চরণ-তলে
প্রস্ফুটিত কমল-দলে
প্রকৃতি দেয় অর্ঘ্য ঢেলে
ওগো অন্তর-যামী!

শ্যামল-ঘন বনে তোমার
বাঁশের বাঁশী বাজে,
তোমার সরল উদার হৃদয়
শিশুর বুকেই রাজে ;
মেঘে তোমার ভ্রূকুটি হেরি
ঝঞ্ঝা তোমার বাজায় ভেরি
দামিনী তোমার শাসন-ছু'রি
অনল-শিখার মাঝে।
জননী-পুত্র-দারার হৃদি—
তব স্নেহ ভক্তি প্রীতি ;
বেদ বাইবেল কোরাণ অবেস্তা—
গাইছে তোমার স্তুতি।
উর্ম্মি তোমার নৃত্য-কলা
চন্দ্রে তোমার হাস্য-লীলা
গন্ধ তোমার পুষ্পে ঢালা
ওগো জগৎপতি !
ব্যাপ্ত তুমি নিখিল সনে
চেতন ও জড়ের মাঝে
ভাবুক জনের চিত্ত পরে—
মোদের সকল কাজে।
শাস্ত্র তোমার স্বরূপ কহে
বিহগ তব মহিমা গাহে
বায়ু তোমার বার্ত্তা বহে
স্নিগ্ধ প্রভাত মাঝে।
পেয়েছে যারা তোমার কৃপা
মুগ্ধ তা'রা আত্মহারা—
মোহ-বাঁধন ছিন্ন তা'দের
চায় না পুত্র-দারা,
তোমার প্রেমের স্নিগ্ধবারি
র'য়েছে তা'দের চিত্তোপরি
তোমার চরণ লক্ষ্য করি—
তা'রা যে পাগল-পারা।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীরাম-গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে
নবেদবাহ্যং নচ কিঞ্চিদান্তরং ॥ ৪৭।

পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্ত্তোপাদান-কারণস্বরূপ আত্মাতে লয় করিতে হইবে (স্বরূপের অপরিত্যাগে যদ্দারা কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহার নাম বিবর্ত্তোপাদান। যেমন রজ্জু রজ্জুই থাকে অথচ ভ্রমবশতঃ তাহা সর্প-দর্শনের কার্য্য ভয়াদি উৎপন্ন করে) তাহার পর দ্বৈতবস্তুর অভাব-জ্ঞান-বশতঃ যখন তিনি চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান করিবেন, তখন আর, তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর বলিয়া কিছুমাত্র অনুভব হইবে না। ৪৭।

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়েৎ
ওঙ্কার-মাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবোহি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ ॥ ৪৮।

এক্ষণে পরমাত্ম-চিন্তনের পথ প্রদর্শিত হইতেছে। যে পর্য্যন্ত সমাধি-সিদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত এই চরারাত্মক জগৎকে ওঙ্কাররূপে চিন্তা করিবে। যে কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানোদয় না হয় সে পর্য্যন্ত অজ্ঞান বশতঃ এই চরাচর জগৎ বাচ্য, অর্থাৎ উহাতে ঈশ্বর-সত্তা আছে কিনা ইহা বুঝিবার যোগ্য এবং প্রণব তাহার বাচক অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হয়। জ্ঞানোদয় হইলে বাচ্য-বাচক-ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়; তখন সমস্তই ঈশ্বরময় বলিয়া বোধ হয়, আর কোন সংশয় থাকেনা। ৪৮।

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষোহিবিশ্বকো
হ্যুকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং নতুতত্ত্বতোভবেৎ ॥ ৫৯।

এক্ষণ অকার উকার ও মকারাত্মক প্রণবের অর্থ কথিত হইতেছে। প্রণবের প্রথমবর্ণ অকার-বাচ্য সূক্ষ্মশরীরে অভিমান বশতঃ স্থূলশরীরেও যে আত্মাভিমান

হয়, সেই পুরুষই "বিশ্ব" নামে অভিহিত হয়েন, ইনিই জাগ্রৎসাক্ষী বিরাট্‌পুরুষ। দ্বিতীয় বর্ণ উকার-বাচ্য তেজোময় অন্তঃকরণোপহিত রূপে সূক্ষ্মশরীরে অভিমানবান্ হওয়ায় উক্ত পুরুষই 'তৈজস' নামে অভিহিত হন, ইনি স্বপ্নসাক্ষী লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রণবের তৃতীয় বর্ণ মকার, একমাত্র অজ্ঞানের প্রকাশক হওয়ায় মায়োপাধিক তদ্বাচ্য 'প্রাজ্ঞ' নামে কথিত হইয়াছেন, বেদোক্ত রীতিতে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থানুসারে উক্ত প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু সমাধি-সিদ্ধির পরে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে আর এরূপ থাকেনা ॥ ৪৯।

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে-
দুকার-মধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়-বর্ণং প্রণবস্যচান্তিমম্ ॥ ৫০।

এক্ষণে কিরূপে এই সকলের লয় চিন্তা করিতে হইবে তাহ[illegible] তেছেন। স্থূলদেহাবস্থিত অকারাখ্য পুরুষ অর্থাৎ বিশ্বকে প্রণবের দ্বিতীয়বর্ণ উকারাখ্য তৈজসে লয় করিতে হইবে, অর্থাৎ স্থূলাভিমানকে সূক্ষ্মে বিলীন করিবে। তৎপরে উকারাখ্য তৈজসকে প্রণবের চরমবর্ণ মকারে অর্থাৎ প্রাজ্ঞে লয় করিতে হইবে। জগৎকে শক্তিতত্ত্বে ও শক্তিকে ঈশ্বর সত্তায় বিলীন করিতে হইবে ॥ ৫০।

মকারমপ্যাত্মনিচিদ্‌ঘনেপরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণং।
সোঽহং পরংব্রহ্ম সদাবিমুক্তিম-
দ্বিজ্ঞানদৃঙ্‌মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ ॥ ৫১।

কারণ-শরীরাভিমানী মকারাখ্য প্রাজ্ঞকে বিশুদ্ধচিৎস্বরূপে বিলীন চিন্তা করিবে, অতঃপর "আমিই সেই নিত্য মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপ প্রগাঢ় চিন্তা করিতে ২ যখন আত্মসত্তা স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতে থাকিবে। তখন নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই উপাধিত্রয়-বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপতা লাভ করিবে। ৫১।

এবং সদাজাতপরমাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ ॥ ৫২।

যিনি এইরূপে আত্মচিন্তা করিয়া থাকেন, তিনি এই প্রপঞ্চ মায়াপরিভাসিত পদার্থপুঞ্জ বিস্মৃত হইয়া স্বকীয় আত্মানন্দোপভোগে নিরন্তর পরিতৃপ্ত থাকেন। অতঃপর তিনি সাক্ষাৎ সত্য, স্বয়ংপ্রকাশ আত্মসুখ-স্বরূপ হন, এবং চতুর্বিবধ বিঘ্ন-(লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ-) বিমুক্ত হইয়া প্রশান্ত পয়োধির ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থিত থাকেন।

ধী-মান্ পাঠকবর্গের বোধসুগমার্থ বিঘ্নচতুষ্ঠয়ের বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে। অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ অচলব্রহ্মকে অবলম্বন না করিয়া অন্তঃকরণের যে নিদ্রাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাকে লয় কহে। অখণ্ডব্রহ্মকে অবলম্বন করিতে অপারগ হইয়া সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রাদি অন্যতর পদার্থকে অবলম্বন-পূর্ব্বক সেবক যে উপাসনা করে তাহার নাম বিক্ষেপ। লয় ও বিক্ষেপের অভাবে অন্তঃকরণবৃত্তি যদি স্বাভাবিক স্তব্ধভাবে থাকিয়া অগত্যা ব্রহ্মাবলম্বনে থাকিত হয় তাহাকে কষায় কহে। প্রকৃত যোগসাধনে অসামর্থ্যবশতঃ অখণ্ডানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিতে অপারগ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির কল্পিত সুখস্বরূপ সবিকল্পানন্দকে ব্রহ্মানন্দভ্রমে আস্বাদন করাকে রসাস্বাদ বলাযায়। ৫২।

এবং সদাভ্যস্তসমাধিযোগিনো
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্যহি।
বিনির্জ্জিতাশেষরিপোরহংসদা
দৃশ্যোভবেয়ং জিতষড়্গুণাত্মনঃ॥ ৫৩।

এই প্রকার যে যোগী নিরন্তর সমাধির অভ্যাস করেন, যিনি জিতেন্দ্রিয় ও কামক্রোধাদি ষড়্রিপুকে জয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ষড়্গুণশালী আত্মাকে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি সর্ব্বদা দৃশ্যমান হইয়া থাকি অর্থাৎ যোগনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বাস করি। ৫৩।

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদামুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জ্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ। ৫৪।

মননশীল পুরুষ উক্ত প্রকারে অপরোক্ষানুভূত আত্মাকে অহর্নিশ ধ্যান করতঃ কাম, ক্রোধ, শোক, সংশয়, আত্মপরভেদবুদ্ধ্যাদি হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন-পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন। অনন্তর দেহাত্মাভিমান-বর্জ্জিত ভাবে প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মস্বরূপ আমাতেই বিলীন হইয়া যান।

জীব পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ ও পুণ্যফলানুসারে পশু-কীট মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত প্রাপ্তদেহোপভোগ্য কর্ম্মফলরাশির শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত জীবের দেহপাত হয় না। কর্ম্মাবসান হইলে ব্যাধি-বিগ্রহাদি একটী হেতুকে অবলম্বন করিয়া কাল, জীবকে সংহার করে। কাল, বাল্য যৌবন বা বৃদ্ধত্ব বিচার করে না, ধনী দরিদ্র মূঢ় পণ্ডিত বলবান্ বা দুর্ব্বলের তারতম্য চিন্তা করে না। কর্ম্মফল ভোগসম্বন্ধে কালের প্রবেশাধিকার নাই। কঠোর তপস্যা করিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল বিনাভোগে সমাপ্ত হয় না। আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক ক্রিয়া-বর্জ্জিত হইলে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকে না বটে, কিন্তু উক্ত তত্ত্বজ্ঞান, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে নষ্ট করিতে পারে না; ভোগের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। ৫৪।

আদৌচ মধ্যেচ তথৈবচান্ততো
ভবং বিদিত্বাভয়শোক-কারণং।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ত্যজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাং ॥ ৫৫।

জীবন্মুক্ত পুরুষ, সংসারকে আদি মধ্য ও অন্তে সর্ব্বপ্রকার ভয়শোকের হেতু জানিয়া বিধিবোধিত সমস্ত কর্ম্মমার্গকে পরিত্যাগ করিয়া অখিলজীবের স্বরূপভূত আমাকে নিজস্বরূপসত্তার সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। এই পরিদৃশ্যমান সংসারকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নভাবে চিন্তা করিলেই ভয়ের কারণ হইয়া থাকে; দ্বৈত-বুদ্ধি সমস্ত বিপত্তির মূল। ব্রহ্মই সমস্ত বস্তুর বীজ। অজ্ঞানবশতঃ এই জগৎ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে মাত্র। যখন সকল বস্তুর সত্তা ব্রহ্মসত্তা বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে, তখনই মনুষ্য দুশ্ছেদ্য সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। ৫৫।

আত্মন্যভেদেনবিভাবয়ন্নিদং
ভবত্যভেদেন ময়াত্মনাতদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথাপয়ঃ ॥।
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলে যথানিলঃ ॥ ৫৬।

যে সময়ে যোগনিষ্ঠ মুনি এই সমস্ত জগৎকে নিজ-সত্তার সহিত অভেদবুদ্ধিতে চিন্তা করেন তখন, পয়োধিতে প্রবিষ্ট নদ্যাদির জল, দুগ্ধরাশিতে মিশ্রিত দুগ্ধ, মহাকাশে ঘটাকাশ ও মহাবায়ুতে ভস্ত্রাদি-যন্ত্রনির্গত বায়ুর ন্যায় আত্মা যেরূপ অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পরমাত্মস্বরূপ আমার সহিত তাঁহার আত্মসত্তাকে অভিন্নভাবে বিদিত হন। ৫৬।

ইত্থং যদীক্ষেতহি লোকসংস্থিতো
জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়ন্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতি-যুক্তি-মানতো
যথেন্দুভেদোদিশি দিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ॥ ৫৭।

লোকমণ্ডলী—মধ্যস্থিত "মুনি"পদ-বাচ্য জ্ঞানীব্যক্তি যদিও এই প্রকারে জগৎকে দর্শন করেন, তথাচ তিনি এই জগৎকে অসত্য বলিয়া বিদিত হয়েন; কেমনা শ্রুতি-যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জগতের সত্যতা-জ্ঞান নিরাকৃত হইয়াছে। যেমন দৃষ্টি-বিভ্রম-জন্য চন্দ্রে দ্বিচন্দ্র-ভ্রম, ও উত্তরাদি দিঙ্‌মণ্ডলে দিগন্তর-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ দর্শনে তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর নিকট এই জগৎ মিথ্যা বোধ বলিয়া হয়। ৫৭।

যাবন্নপশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধন-তৎপরোভবেৎ।
শ্রদ্ধালুরত্যূর্জ্জিতভক্তিলক্ষণো
যস্তস্যদৃশ্যোঽহমহর্নিশংহৃদি॥ ৫৮।

যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রপঞ্চ জগৎকে আমার স্বরূপবুদ্ধিতে দর্শন না করিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত পরমোপাদেয়-ভাবনার্থ আমাকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা ঈশ্বরস্বরূপ জানিয়া সাধক আরাধনা করিবে। সেই সাধনায় যে ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা নিবিষ্টচিত্ত হয়, আমি তাহার হৃদয়ে জ্ঞানস্বরূপে দিবানিশি প্রকাশিত হইয়া থাকি। ৫৮।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সহিত সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে যে উক্তি-প্রত্যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে রামানন্দ রায় মহাশয় প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত সাধ্যের শেষ সীমা কিনা তাহা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥
তথাহি গীতং ভৈরবী-রাগেণ গীয়তে।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোজলু দূতী না খোজলু আন।
দুহুঁ কেরি মিলনে মধত পাঁচ বাণ ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান ॥
প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্য-লীলায়াং ৮ম পরিচ্ছেদে।

এই "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত" কাহাকে বলে, এ কথা কোন কোন গোস্বামী প্রভু ও বৈষ্ণবপাদ অনেক স্থলে আমায় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য উত্তর দিতেছি।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তকে অধিকার করিয়া বক্ষ্যমাণ অধিকরণ বিরচিত হইতেছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব পরমার্থতঃ ভিন্ন কি অভিন্ন, ইহাই বিষয়াখ্য অধিকরণ। তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের মূর্ত্তি-ভেদ-বশতঃ এবং ক্বচিৎ ক্বচিৎ একত্বের উপদেশ-বশতঃ এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতেছে—ঐ তত্ত্ব ভিন্ন হইবে, না অভিন্ন হইবে? (পূর্ব্বপক্ষ) ঐ তত্ত্ব অভিন্ন নহে; যেহেতু সর্ব্বদা উপাসনামার্গে যুগলরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং মূর্ত্তিভেদ ভিন্নত্বের পরিচায়ক। (উত্তরপক্ষ)। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলতত্ত্ব আপাততঃ ভিন্ন হইলেও ভিন্ন নহে; যেহেতু—

দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥
শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৪র্থ পরিচ্ছেদে ধৃত
বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রবচনম্ ॥

উপরোক্ত শ্লোকে দেবী রাধিকাকে 'কৃষ্ণময়ী' বলা হইয়াছে। যেরূপ "সুবর্ণময়ী প্রতিমা" বলিলে প্রতিমার অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই সুবর্ণের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ "কৃষ্ণময়ী" শব্দে অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণরূপ; তবে বর্ণ ও স্ত্রী-পুংভেদ মাত্র সাধারণতঃ প্রতীতির বিষয়ীভূত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তিনি কি জন্য কৃষ্ণময়ী রাধিকারূপে প্রকাশিত হইলেন? এই জিজ্ঞাস্য স্থলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিবার জন্যই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের অবতারণা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক্ প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত কি? আদৌ প্রেম কি? সর্ব্বত্র বিশিষ্ট-জ্ঞান, বিশেষণ-জ্ঞানের অধীন হইয়া থাকে। প্রেমের লক্ষণ যথা—

সর্ব্বথা ধ্বংস-রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
উজ্জ্বলনীলমণৌ—স্থায়িভাব-প্রকরণে।

ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহার ধ্বংস হয় না, যুবক-যুবতীদ্বয়ের পরস্পর এরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম কহে। প্রেম দুই প্রকার; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত প্রেম মনোবৃত্তিবিশেষ, কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেম তাহা নহে। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—ভগবন্নিষ্ঠ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষই শুদ্ধ সত্ত্ব নামে পরিচিত হইয়াছে। সেই শুদ্ধ সত্ত্ব চতুর্ব্বিধ যথা—হ্লাদিনী-শক্তি-প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্ব, সন্ধিনীশক্তিপ্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্ব, সম্বিৎ-শক্তি-প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্ব, এবং হ্লাদিন্যাদি-শক্তিত্রয়-সম্বলিত বিশুদ্ধ সত্ত্ব। ইহার মধ্যে সম্বিৎ-শক্তি-প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিপাক-বিশেষকে প্রেম কহে। সেই প্রেম "আমি রমণী, তুমি রমণ"—এই চিত্তবৃত্তি-বিশেষকে অপেক্ষা করে না। ভগবৎ-কৃপাবিশেষই এতাদৃশ প্রেমের উদ্বোধক। তজ্জন্য সাধ্য-সাধনের শেষ অবধি স্থলে রায় রামানন্দ মহাশয় স্বরচিত তাদৃশ প্রেমময় গীত গাহিয়াছিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধত পাঁচ বাণ॥

অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলীদূতী ।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান ।
রামানন্দ রায় কবি ভান ॥

এইরূপে সকল মহাজনেই প্রেম এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

ধ্বংসের কারণ সত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না, যুবক যুবতীর এরূপ পরস্পর ভাব-বন্ধনকে প্রেম কহে ।

অথবা—

সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তঃ মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥
ভক্তি-রসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে ৪র্থ লহর্য্যাম্ ।

যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মল হয় ও যাহা অতিশয় মমতা-সম্পন্ন এরূপ "ভাব" গাঢ় হইলেই "প্রেম" বলা হইয়া থাকে ।

অন্যত্র—

সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয় ।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নামে কয় ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদে ।

অন্যত্র—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥
নারদ পঞ্চরাত্রে ।

অন্যের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে মমতা তাহাকে 'প্রেম' কহে ; ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ এই সকল ভক্তগণ এই প্রেমকে 'ভক্তি' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ।

এই প্রেম দুই প্রকার ; যথা—ভাবোত্থ এবং শ্রীহরির অতি প্রসাদোত্থ । তন্মধ্যে ভাবোত্থ যথা—

ভাব এবান্তরঙ্গানামঙ্গানামনু সেবয়া ।
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষং ভাবোত্থঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্থ লহর্য্যম্ ।

অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ সকলের সর্ব্বদা সেবন দ্বারা, ভাব, পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই "ভাবোত্থ প্রেম" নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভাবোত্থ দুই প্রকার যথা—বৈধভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ। তন্মধ্যে বৈধভাবোত্থ যথা—

এবম্ব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

শ্রীভাগবতে ১১স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকঃ।

এইরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজী পুরুষ, স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম-কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও অবশহৃদয় হওয়াতে উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার, কখনও গান ও এবং কখনও বা নৃত্য করিয়া থাকেন। [পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সকল কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—তিনি হাস্য করেন কেন? উত্তর—"ভগবান্ ভক্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন" মনে করিয়া হস্য করেন; তিনি রোদন করেন কেন? "হা প্রভু! তুমি আমাকে এতদিন উপেক্ষা করিয়াছিলে" এই মনে করিয়া রোদন করেন; তিনি চীৎকার করেন কেন? "হে প্রভু! তুমি কোথায় আছ, একবার দেখা দাও" বলিয়া চীৎকার করেন; তিনি গান করেন কেন? "হে হরে! আমায় অনুগ্রহ কর" বলিয়া অতি আনন্দে গান করেন; তিনি নৃত্য করেন কেন? "হে কৃষ্ণ! তুমি আমার নিকট পরাজিত হইলে, পরাজিত হইলে" বলিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন।]

রাগানুগীয়ভাবোত্থ যথা—

নপতিং কাময়েৎ কশ্চিদ্ব্রহ্মচর্য্যস্থিতা সদা।
তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বরাননা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-গাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা ॥
অস্মিন্ মন্বন্তরে স্নিগ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়া ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্থ লহর্য্যাম্।

এই মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-বার্ত্তায় স্নিগ্ধা হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণা হইয়া চন্দ্রকান্তি মনোহরবদনা ব্রজাঙ্গনা রোমাঞ্চিত শরীরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করতঃ ও সেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধ্যান করতঃ অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া কামনা করেন নাই।

হরেরত্তিপ্রসাদোত্থ—

হরেরতিপ্রসাদোঽয়ং সঙ্গদানাদিরাত্মনঃ।

হরির স্বীয় অঙ্গদানাদিকে অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম কহে, যথা—

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎ সঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "হে উদ্ধব! গোপীগণ আমাকে পাইবার নিমিত্ত বেদ অধ্যয়ন করেন নাই; মহত্তম পুরুষদিগের সঙ্গ করেন নাই, ব্রতাচরণ করেন নাই এবং তপস্যাও করেন নাই; কেবল আমার সঙ্গ দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার যথা—মাহাত্ম্যজ্ঞান-যুক্ত এবং কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্য-মাত্র-জ্ঞান-যুক্ত—

মাহাত্ম্যজ্ঞান-যুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি সদ্বিধা।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্থ লহর্য্যাম্।

তন্মধ্যে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম যথা—

মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ।
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি (১) নান্যথা॥

নারদ পঞ্চরাত্রে।

মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত, সুদৃঢ় এবং সকল বিষয় হইতে অধিক যে স্নেহ, তাহাকেই

---

(১) মুক্তি পঞ্চবিধ যথা—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥ শ্রীভাগবতে ৩।২৯।১৩

ভক্তগণ সালোক্য (শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক-লোকে বাস), সার্ষ্টি (মহৎ ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (নিকটবর্ত্তিতা), সারূপ্য (সমানরূপতা) ও একত্ব (সাযুজ্য) এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও আমার সেবা ব্যতিরেকে গ্রহণ করেন না।

কিন্তু নারদ-পঞ্চরাত্রমতে মুক্তি চতুর্ব্বিধ যথা—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য মিত্যতঃ ক্রমাৎ।
ভোগরূপঞ্চ সুখদমিতি মুক্তিচতুষ্টয়ম্॥

দ্বিতীয় রাত্রে সপ্তমাধ্যায়ে।

নারদ-পঞ্চরাত্রে মুক্তির লক্ষণ যথা—

লীনতা হরিপাদাব্জে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।
ইদমেব হি নির্ব্বাণং বৈষ্ণবানামসম্মতম্॥

হরি পাদপদ্মে লীন হওয়াকে মুক্তি কহে; ইহাই নির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তি,

ভক্তি বলা যায়; এতাদৃশী ভক্তি ব্যতীত সাষ্ট্র্যাদি মুক্তি কখনই লাভ করা যাইতে পারে না।

কেবল প্রেম যথা—

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌপ্রেম-পরিপ্লুতা।
অভিসন্ধি-বিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী
নারদ পঞ্চরাত্রে।

অভিসন্ধি-শূন্য এবং প্রেমপরিপ্লুত কৃষ্ণে যে নিরবচ্ছিন্ন মনের গতি, তাহাকে ভক্তি বলা যায়; এতাদৃশী ভক্তিই বিষ্ণুর বশকারিণী।

মহিমজ্ঞানযুক্তঃস্যাদ্ বিধিমার্গানুসারিণাম্।
রাগানুগাশ্রিতানাস্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ৪র্থ লহর্য্যাম্।

বিধিমার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের যে অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম তাহা মহিমজ্ঞান-যুক্ত; কিন্তু রাগানুগাশ্রিত ভক্তগণের প্রেম প্রায়শই 'কেবল' অর্থাৎ মাধুর্য্য-জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকে। [এই শ্লোকে "প্রায়শই" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে বৈধী ভক্তির কোন অংশ-যুক্ত হইলে 'কেবল' প্রেম হয় না।]

ঐ প্রেমের ক্রম কথিত হইতেছে যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥

কিন্তু ইহা বৈষ্ণবগণের অনুমোদিত নহে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতেও মুক্তি চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন যথা—

চতুর্ব্বিধেষু মোক্ষেষু সাযুজ্যন্তু পদংত্বিদং।
প্রাপ্যং যতীনামদ্বৈতভাবনাভাবিতাত্মনাম্॥
মহাসংসার-দুঃখাগ্নি-জ্বালা-সংশুষ্কচেতসাম্।
অসারগ্রাহিণামন্তঃ-সারাসারাবিবেকিনাম্॥
২য় খণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে ১০৮। ১০৯।

চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তির পদ এইরূপ হইয়াথাকে; যাঁহাদিগের চিত্ত অদ্বৈত-ভাবনায় ভাবিত, মহাসংসার-দুঃখাগ্নির জ্বালায় যাঁহাদিগের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহাদিগের অন্তরে সারাসার-বিবেক নাই, এতাদৃশ অসারগ্রাহি যতিগণের সাযুজ্য পদ প্রাপ্য।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কহিয়াছিলেন—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে।"

অথাসক্তিস্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্থলহর্য্যাম্।

প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজনক্রিয়া, পরে অনর্থ-নিবৃত্তি, তাহার পর নিষ্ঠা, তদনন্তর রুচি, পরে আসক্তি, তৎপরে ভাব, তাহার পর প্রেমোদয় হইয়া থাকে। সাধকগণের প্রেমের আবির্ভাবের এইরূপ ক্রম নিরূপিত হইয়াছে।

যে সকল ব্যক্তি ভাগ্যবান্ তাঁহাদেরই চিত্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞেরা সহসা এই নবীন প্রেমের পরিপাটি জানিতে পারেন না।

তজ্জন্য নারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে—

ভাবোন্মত্তোহরেঃ কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন যে, হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি ভগবান্ হরির ভাবে উন্মত্ত হইয়া পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়াছেন, তিনি আপনার সুখদুঃখ কিছুই জানিতে পারেন না।

নারদ-সূত্র কহেন—

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১।
সাত্বস্মিন্ পরম-প্রেমরূপা॥ ২॥
*　　*　　*
অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম-স্বরূপম্। ৫১।
মূকাস্বাদনবৎ। ৫২।
প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে॥ ৫৩॥

প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচীয়। উহা মূকের আস্বাদনের ন্যায়; অর্থাৎ মূক যেরূপ কোন বস্তু আস্বাদন করিয়া তাহার ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল মনে মনেই রাখে, তদ্রূপ প্রেমের ভাব ব্যক্ত করিতে পারা যায় না।

সুতরাং এই অনির্ব্বচনীয় ভাব, সকল মনুষ্যে প্রকাশিত হয় না, কোন বিশেষ পুণ্যবান্ ব্যক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অতএব এতাদৃশ প্রেমের ফলও অনন্ত—

অতএব ফলানন্ত্যাম্।

শাণ্ডিল্য-সূত্রে ৮।

এইরূপে প্রেমতত্ত্ব কথঞ্চিৎ প্রতিপাদিত হইল। এই প্রেমের বিবর্ত্ত-বিলাস কি ? এক্ষণে সেই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

নব্য বেদান্তিগণ বিবর্ত্তের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন—

অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

যখন বস্তু নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য বস্তুর প্রতীতি জন্মাইবে তখন সেই বস্তুর অন্যথা-খ্যাতিকে 'বিবর্ত্ত' বলে। এই বিবর্ত্তবাদ ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব-রক্ষার জন্য পরমাচার্য্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি একমাত্র সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার বিবর্ত্ত-স্বরূপে এ জগতের প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন। যদি বিবর্ত্ত-বশতঃ রজ্জু হইতে সর্প-বুদ্ধি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে সেই সাদৃশ্যাদি-নিবন্ধন উক্ত বিবর্ত্তের প্রভাবে সর্প হইতেও রজ্জ্বাদি-বুদ্ধি জন্মাইতে পারে। তাঁহার মতে ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হইতেছে। যদি বিবর্ত্তের প্রভাবে ব্রহ্ম হইতে জগদ্‌বোধ জন্মাইত, তাহা হইলে কদাচিৎ জগতেও ব্রহ্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারিত। তাহা হইলে বিবর্ত্তের মূল সত্য বস্তু হইবে এবং প্রতিভাত বস্তু মিথ্যাভূত হইবে, এরূপ নহে। সুতরাং 'বিবর্ত্ত' শব্দের এই প্রকার অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়—

বিবর্ত্ততে অন্যস্বরূপেণ প্রতিভাতি বস্তু যেন স বিবর্ত্তঃ।

সত্যই হউক্ কিম্বা মিথ্যাই হউক্, বস্তু, অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেই 'বিবর্ত্ত' নামে কথিত হইয়া থাকে।

বিবর্ত্তের এরূপ লক্ষণ আশ্রয় করিয়া শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়—

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি।

এই বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায়ে ১ম পাদের সূত্রের ভাষ্যে কহিয়াছেন যথা—

"কল্পদ্রুম-চিন্তামণ্যাদেরীশ্বর-বিভূতি-ভূতস্যাচিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধাহস্ত্যশ্বাদয়ো বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ো ভবন্তীতি শব্দাৎ প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে এবমাত্মনশ্চ সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোর্দ্দেব-নর-তির্য্যগাদয়স্তাস্তথাভূতা ভবেয়ুরিতি তস্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম্।"

অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতিভূত কল্পতরু ও চিন্তামণি হইতে যেরূপ অচিন্ত্য-শক্তিমাত্র-সিদ্ধ গজতুরগাদির বিচিত্রসৃষ্টির প্রকাশ হয়, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু হইতে দেব মনুষ্য ও তির্য্যগাদির সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পাণিনি দর্শনে উল্লিখিত আছে যথা—

অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষররূপী ব্রহ্মস্বরূপ; উহা হইতে অর্থরূপে জগতের প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। তিনি, নিখিল শব্দের বিবর্ত্ত-স্বরূপে অর্থ সকল প্রকাশিত হয়, এরূপ বলিয়াছেন; এবং শব্দ ও শব্দার্থ উভয়কে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রেম-বিলাসের "বিবর্ত্ত" শব্দে প্রেমের বিভূতি বশতঃ সত্য বস্তুও অন্যরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ প্রেম-বিলাসের বিবর্ত্ত-রূপে নিজেই রাধা-রূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রেমের তাদৃশী অভিভাবিনী শক্তির প্রভাবে ইনি পর-পুরুষ ও ইনি পরকীয়া হইয়াছেন। প্রেমিক ভক্তগণ পরমার্থতঃ রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব পৃথক্ না হইলেও অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দাধিক আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই বিচার-দৃষ্টিতে অভিন্ন দেখিয়াও দেখেন না। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দস্বরূপমপ্যানন্দাতিশয়মনুভাবয়িতুং চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিঃ প্রেমৈব তস্যজ্ঞানমাবৃণোতি। প্রেম্নস্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বাৎ তেন তস্য ব্যাপ্তের্ন দোষঃ।"

রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় প্রকাশঃ।

আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার জন্য চিচ্ছক্তিসার-বৃত্তি প্রেমই তাঁহার জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখেন। প্রেম তাঁহার স্বরূপ-শক্তি সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যাপ্তির কোন দোষ ঘটে না।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথমকাণ্ড—তৃতীয় অনুবাক—চতুর্থসূক্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে নদীনাং সংস্রবন্ত্যুৎসাসঃ সদমক্ষিতাঃ।
তেভির্মে সর্ব্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সংস্রাবয়ামসি।৩

পদবোধনী ব্যাখ্যা। নদীনাং (গঙ্গাদীনাং সম্বন্ধিনঃ) যে (প্রসিদ্ধাঃ) সদম্ (সদা বর্ত্তমানাঃ) অক্ষিতাঃ (ক্ষয়রহিতাঃ) (যদ্বা সদমক্ষিতাঃ গ্রীষ্মাদাবপি ক্ষয়রহিতাঃ). উৎসাঃ ভূমেরুদ্গচ্ছন্তো জল-প্রবাহাঃ) সংস্রবন্তি (সম্ভূয় প্রবহন্তি) তেভিঃ (তৈঃ) সর্ব্বৈঃ (নিখিলৈঃ) সংস্রাবৈঃ (জল-প্রবাহৈঃ) ধনং (হিরণ্যাদি) মে (মম) সংস্রাবয়ামসি (সংস্রাবয়ামঃ সংপ্রবাহয়ামঃ) (অবিচ্ছিন্নৈর্নদী-প্রবাহৈঃ শস্যাদিবৃদ্ধিদ্বারা অভিলষিতং ধনং প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ :—যদ্বা নদীনাং প্রবাহঃ যথা অবিচ্ছিন্নঃ তথা মমাপি ধনং অবিচ্ছিন্নং সম্বদ্ধং ভবতু ইত্যর্থঃ।)

বঙ্গানুবাদ। যে সকল সতত-বিদ্যমান ক্ষয়রহিত নদী-সম্বন্ধীয় উৎস মিলিত হইয়া প্রবাহিত হয়, তাহাদের সমগ্র জল-প্রবাহ দ্বারা আমার অভিলষিত ধন প্রাপ্ত হই।

টিপ্পনী। ভূমি-ভাগের অভ্যন্তরস্থ উৎস হইতে নদী প্রবাহিত হওয়ার কথা এ মন্ত্রে পাওয়া গেল। সুতুঙ্গ পর্ব্বত হইতে নদীর প্রকাশে অনেক সময় উৎসের অনুগ্রহ দেখা যায়। উৎসের ক্ষুদ্র জল-ধারা সকল সম্মিলিত হইয়া প্রবল-প্রবাহরূপে প্রকাশ পাইয়া দুই পার্শ্বের ভূমি-ভাগকে সরসতা প্রদান করে ও ফল-শস্য-সম্পদে শোভিত করে ইহা প্রত্যক্ষ। এখানে যজমান প্রার্থনা করিতেছেন, "উৎস-জাত জলস্রোত নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া যেন (শস্য-সম্পৎ-প্রদান দ্বারা) আমার ধন-বৃদ্ধি করে।" আচার্য্য সায়ণ ব্যাখ্যান্তরে বলিয়াছেন "যেমন নদীর প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ আমার ধনসম্পৎও (দেবকৃপায়) অবিচ্ছিন্ন হউক্"। যে ভাবেই হউক, এ মন্ত্রে ধনসম্পদ্বৃদ্ধির কামনা বিরাজ করিতেছে।

যে সর্পিষঃ সংস্রবন্তি ক্ষীরস্য চোদকস্য চ।
তেভির্মে সর্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সংস্রাবয়ামসি। ৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। সর্পিষঃ (সর্পণশীলস্য আজ্যস্য) (যে অবয়বাঃ) সংস্রবন্তি (নদীরূপেণ প্রবহন্তি ইতি সায়ণঃ। যদ্বা পূর্ব্বমন্ত্রাৎ উৎসাস ইত্যনুষজ্য যোজনীয়ম্) ক্ষীরস্য (ক্ষরণশীলস্য পয়সঃ) (ততোঽপি দ্রবণশীলস্য) উদকস্য চ (যে উৎসাঃ অবয়বা বা সংস্রবন্তি) তেভিঃ (তৈঃ) সর্বৈঃ (নিখিলৈঃ) সংস্রাবৈঃ (প্রবাহৈঃ) ধনং মে (মম) সংস্রাবয়ামসি (সংপ্রবাহয়ামঃ।)

বঙ্গানুবাদ। (সর্পণশীল) ঘৃতের যে অবয়বসমূহ প্রবাহিত হইতেছে, (ক্ষরণ-শীল) দুগ্ধের এবং (দ্রবণশীল) জলের যে অবয়বসকল প্রবাহিত হইতেছে, সেই সমস্ত প্রবাহ দ্বারা আমার অভিলষিত ধন প্রাপ্ত হই।

টিপ্পনী। ঘৃত, দুগ্ধ ও জলের উৎস বা প্রবাহদ্বারা যজমান, ধনলাভ প্রার্থনা করিতেছেন। গুপ্তস্থানে উৎসে যেমন জল বিদ্যমান থাকে ও পরে প্রবাহিত হইয়া শস্যাদি বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ ঘৃত-দুগ্ধও গাভীর উধঃস্থানরূপ উৎসে বিদ্যমান থাকে, পরে পশুবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসমৃদ্ধি প্রদান করিয়া (প্রকারান্তরে) যজমানের ধনবৃদ্ধি করে। গোধনের বৃদ্ধি ও ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতির বৃদ্ধিতে যজমানের ধন বৃদ্ধি হয়, ইহা অমোঘ সত্য। ক্ষীর স্রাবিত হইলে বুঝিতে হয়, বৎসবৃদ্ধিও ঘটিয়াছে। গাভী, বৎস প্রসব করিয়াই দুগ্ধ দান করে, সুতরাং দুগ্ধ, বৎসেরও পরিচায়ক। পশুলাভ দুগ্ধ-ঘৃত-লাভ থাকিলে যজমানের সমৃদ্ধিলাভের বিলম্ব কি ?

প্রাচীনকালে গোধন, ধান্যধন প্রভৃতির আদর অধিক ছিল। এ মন্ত্রেও কামনার কথাই আছে।

প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অনুবাক চতুর্থ সূক্ত সমাপ্ত।

শ্রী——ভারতী।

জিজ্ঞাসা।

অই নাকি শরতের সুন্দর গগন ?
শারদ কৌমুদী রাশি,—শান্তি-নিকেতন ?
অই নাকি সন্ধ্যারাণী,
প্রদোষের মুগ্ধা-বাণী,
শ্যামাঙ্গিনী রজনীর নক্ষত্র-ভূষণ!
বিহ্বল মলয়বায়,
দোলাইয়া লতিকায়,
বহি পারিজাত-গন্ধ করে সঞ্চরণ
অই নাকি শরতের সুন্দর গগন!

অই কি গো নিদাঘের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
ক্লান্ত দিগন্তের কোলে নীরবে লুকায়
সায়াহ্নের রক্ত-রবি ?
ধরণীর ম্লান-চ্ছবি ;
সংসার আচ্ছন্ন হয় অন্ধতমসায় !
প্রোজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখা
অনন্তের প্রহেলিকা,
জাগিয়া মানস-মাঝে নিমেষে মিলায়।
নিদারুণ নিদাঘের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়!

অই কি সে প্রেমময়ী প্রকৃতিসুন্দরী!
অকলঙ্ক-নগ্ন-শোভা, দিবস শর্ব্বরী।

আকাশের অতিদূরে
দিব্য বৈজয়ন্তপুরে
অমৃত-সঙ্গীত গায় অপ্সরী কিন্নরী ;
উষার নির্ম্মল শ্বাসে
মরতে ভাসিয়া আসে
অনিন্দ্য নন্দন-বন-কুসুম-মঞ্জরী !
অই কি সে প্রেমময়ী প্রকৃতিসুন্দরী।

মধুমাখা কল্পনার প্রশান্তি উজ্জ্বল,
সরসীর নীলবারি স্থির অচঞ্চল !
কোথাও তটিনী রঙ্গে
বহিয়া বিপুল ভঙ্গে
চুম্বিয়া অচিন্ত্য-সিন্ধু আনন্দে বিহ্বল !
কখন বা বিশ্ব-জুড়ে
নীল শূন্যে যেন উড়ে,
বরষার বিচূর্ণিত জলদ কুন্তল !
মধুময়ী কল্পনার প্রশান্তি উজ্জ্বল !

অই কি সে পূর্ণচন্দ্র সুস্নিগ্ধ মধুর,
সকরুণ মূর্ত্তিখানি বিয়োগ-বিধুর !
অজস্র শান্তির-ধারা
ঝরিছে আপনা-হারা
প্রবাহিত প্রীতিময় পবন মেদুর।
আবেশে আকুল প্রাণ
তুলি কল কল তান,
তটিনী চলিয়া যায় সাগর সুদূর।
জল-তলে হাসে চাঁদ হ'য়ে শতচুর।

কালের করাল চক্র ঘুরিতে ঘুরিতে
চলে'ছে অনন্ত পানে দিবস নিশিতে

তাহার প্রবল ঘায়,
কত রাজপুরী হায়,
ভিখারী হইয়া যায় দেখিতে দেখিতে !
কত দীন-দুঃখী গেহ
(সুধায়, নাহিক কেহ !)
ঐশ্বর্য্য কুড়া'য়ে পায় চলিতে চলিতে !
কাহার বিহারে হেন কুহক মহীতে ?

শৈশবের সুধাময় লীলা মনোহর,
উজল পবিত্র স্নিগ্ধ গোলাপ টগর ;
যৌবনের খরতাপে,
ঝ'রে পড়ে অভিশাপে
বার্দ্ধক্যে ঘুমায়ে পড়ে যৌবন ভাস্কর।
তাই এই পরাভব
চিনিতে না পাবি সব,
গ্রাসিয়াছে সুধাকরে ভীম জলধর।
এ যে সনাতনী রীতি,—যুগযুগান্তর !

কে জানে সে কোন দিন,—অদূর অচিরে
আবার অসীম পথে ; গহন তিমিরে—
অতিক্রমি ধীরে ধীরে
উঠিয়া শিখর-শিরে ;
হেরিব, চরণ-তলে মেঘমালা ফিরে !
সে দিন প্রকৃতি সতী,
হবে পুনঃ মূর্ত্তিমতী ;
হাস্য-ক্রন্দনের ছন্দে একান্তে গম্ভীরে,
নন্দনে মন্দার-কুঞ্জে মন্দাকিনী-তীরে !!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০। দেবগণের ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্তি।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেবগণের যে সকল ত্রুটির আলোচনা করিয়াছি, সে সমুদয়ের অপেক্ষা তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাহ্যতঃ আর একটি ঘোরতর অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়া থাকে। অভিযোগ এই যে—দেবগণ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। এই তথা-কথিত ত্রুটিটুকু অবলম্বন করিয়া আমাদিগের ধর্ম্মদ্বেষীরা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাহ্য আবরণ।

ঐহিক জীবের অপবিত্র দৃষ্টি যাহাতে জীবনের উচ্চতর গুহ্য বিষয়ের প্রতি নিপতিত না হয়, এতদুদ্দেশ্যে পুরাকালীন ঋষিগণ কতিপয় "বাহ্য আবরণ" ব্যবহার করিতেন। সেইগুলি উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াই প্রাগুক্ত ধর্ম্মদ্বেষিগণ প্রতিকুলাচারী হইয়া থাকেন। অনেকগুলি গূঢ় ব্যাপার, ব্যভিচারের আবরণে আবৃত। স্থূলদর্শিগণ ঐগুলি দেখিয়াই এত বীতস্পৃহ হয়েন যে, উহাদের আলোচনা করিতে আর তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আধ্যাত্মিক তথ্যগুলিকে আবৃত করিবার পক্ষে লাম্পট্যই উপযুক্ত পরিচ্ছদ। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা হৃদয়ে পাপাসক্ত, কল্পনায় কামাতুর, কেবল তাহারাই ঐ আবৃত ব্যাপারগুলিতে দোষ দেখিতে পায়। কবিবর মিল্‌টন্ খৃষ্টধর্ম্মের "পিউরিট্যান্" অর্থাৎ 'অতি নৈষ্ঠিক' সম্প্রদায়-ভুক্ত। তিনিও আদম্ ও ইভের শৃঙ্গার-রসাত্মক বিলাস বর্ণনা করিতে দ্বিধা মনে করেন নাই।

ব্রহ্মা ও বাচ্।

আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ লাম্পট্যের উদাহরণ লইয়া আলোচনা করিব। দেখিব, উহাতে কি ব্যাপার আছে। আমরা পুরাণপাঠে অবগত হই যে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন। কথাটী সোজাসুজি বুঝিলে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠে। ব্যাপারটীর ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন। ব্রহ্মার কন্যা বলিতে কি বুঝিতে হইবে? জগতের আদিভূত নির্ম্মল উপাদান এই কন্যা। খৃষ্টানেরা ইহাকেই "কুমারী মেরী" আখ্যা দিয়া থাকেন। এই উপাদানকে ব্রাহ্মার কন্যা বলাই সুসঙ্গত; কেননা, প্রলয়ের সময়ে উহা তাঁহাতে লীন থাকে, পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহা হইতে প্রকট হয়। সৃষ্টিকালে ঐশ আত্মা

কর্ত্তৃক এই উপাদান অন্তরাপত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, মহদ্‌ব্রহ্ম বা মূলা প্রকৃতি গর্ব্ভাশয়স্বরূপ, তথায় "তিনি" "ঐশবীজ" স্থাপন করেন। এইরূপে ব্রহ্মার শক্তিতে শক্তিমতী হওয়ায় প্রকৃতির বিবর্ত্তন ঘটে ও এই বিচিত্র বিশ্বের উদ্ভব হইয়া থাকে। ব্রহ্মা-ঘটিত উপাখ্যানটী সাধারণতঃ লোকে সোঁজাসুজিই বুঝিয়া থাকে। সেরূপক্ষেত্রে ইহা ঘোর ব্যভিচার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য বুঝিলে দেখা যায় যে, ইহা একটী নিগূঢ় সত্যের দৈহিক প্রতিরূপ। এই বিষয়টীর সম্বন্ধে ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কি তদীয় "গূঢ় তথ্য" নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—"ভারতীয় সাধু ও ধার্ম্মিক। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধে বিস্তর কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন। সে কার্য্যটী নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে একটী রূপকাত্মক কাহিনী আছে। কাহিনীটী এই যে মনুষ্যবর্গের আদিপিতা ব্রহ্মা বাচ্ বা সন্ধ্যানাম্নী স্বীয় কন্যার সহিত অগম্যাগমনদোষাক্রান্ত সঙ্গম দ্বারা জননক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার আর একটী নাম—শতরূপা। প্রাগুক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই রূপকটীর উল্লে[illegible]রিয়া সততই ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়া থাকেন যে "তোমাদের ধর্ম্ম ঘৃণিত ও অ[illegible]।" + + + + ভারতীয় রূপকটীর মধ্যে নিশ্চয়ই একটী জাগতিক অর্থ বিদ্যমান আছে। শারীর-স্থান-বিদ্যা-বিষয়ক অর্থ এখানে করিতে গেলে চলিবে না। বাচ্ অদিতি ও মুলপ্রকৃতির বিন্যাস বতীত আর কিছুই নহে। ব্রহ্মাও নারায়ণের পরিবর্ত্ত মাত্র। এই নারায়ণই ভগবৎশক্তি। ইনিই প্রকৃতির অন্তরস্থ হইয়া উহাকে ফলবতী করিয়া থাকেন। এই ত ব্যাপার! অতএব এই ধারণার সহিত আদৌ কোন প্রকার লৈঙ্গিক সংশ্রব নাই। + + +. তিনি (বাচ্) দেবগণ কর্ত্তৃক স্বষ্টা। তিনি দৈবীশক্তি-সম্পন্না, "দেবের রাণী"। প্রজাপতিগণ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত সম্মিলিতা হন। + + + কিন্তু বাচ্ দক্ষ-কন্যা বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকেন। প্রলয়কালে ইনি অন্তর্হিতা হন, তখন অদ্বিতীয় সর্ব্বগ্রাসী জ্যোতিঃপদার্থে লীন হইয়া যান।"

ইন্দ্র ও অহল্যা।

আর একটী উদাহরণ দেখ। আমরা পুরাণে পড়িয়া থাকি যে, ইন্দ্র কামাতুর হইয়া গুরুর শয্যা কলঙ্কিত করতঃ অহল্যার প্রেমপাত্র হইয়াছিলেন। প্রথিতনামা মীমাংসা-লেখক কুমারিল ভট্ট এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই রূপকটীর একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মোক্ষমুলার তদীয় "প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে সেই বিষয়টী উদ্ধৃত করিয়াছেন।—(ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের

৪২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্ধৃত অংশটী এই:—“কুমারিল প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ কখন ২ এরূপ যথাযথভাবে শাস্ত্রার্থ-পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি। দেবগণের চরিত্র নীতি-দুষ্ট, এই কথা বলিয়া যখন প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে বড় বেশী ২ রূপে চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন তিনি উৎকর্ষাপকর্ষ-বিচারক্ষম পুরাণ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীনভাবে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—“ইন্দ্র অহল্যার ধর্ম্ম-নাশক” এই কথাতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে ইন্দ্রদেব ঐরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ইন্দ্র অর্থে—সূর্য্য; অহল্যা শব্দটী ‘অহন্’ ও ‘লী’ শব্দ-সংযোগে উৎপন্ন। এই শব্দের অর্থ—নিশা। সূর্য্য, নিশার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করেন। এই নিমিত্তই ইন্দ্রকে অহল্যার উপপতি বলা হয়।” + + +

একটি তান্ত্রিক নিদর্শন।

প্রাগুক্ত ব্যাখ্যায় লোকের ধারণা যেরূপ হয় হউক্, এ কথাটা কিন্তু খুব ঠিক্ যে শাস্ত্রার্থ সোজাসুজিভাবে বুঝিয়া লইলে চলিবে না। শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়ও তাহা নহে। পুরাণাদি গ্রন্থ আধ্যাত্মিক সত্যের [illegible]দাম ঘর” স্বরূপ। এই সত্যের উদ্ঘাটন করাই ভাষ্যকারগণের কার্য্য। লিঙ্গ[illegible] জরায়ুতে প্রবিষ্ট হইল—এরূপ ব্যাপার আমরা তন্ত্রে পড়িয়া থাকি। এই জরায়ুই কারণ-শরীর। এখান হইতেই ঐশআত্মা ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকট হইতেছেন। “লিঙ্গ” ঐশ আত্মার স্বাতন্ত্র্যভাবের নিদর্শন স্বরূপ। কারণ-শরীরকে “লিঙ্গশরীর”ও বলে, যখন এই কথাটী আমাদের স্মরণ হয়, তখনই প্রাগুক্ত তথ্যটী আমাদিগের নিকটে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই বলিতেছি, মুক্তিলাভ করিতে হইলে স্বাতন্ত্র্য ভাবটী পরিহার করিতে হইবে, ব্যক্তিগত বর্ণটিকে প্রকৃতির সহিত মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। এই ব্যক্তিগত ভাব-নিবন্ধনই মানুষের সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতিই ব্যক্তিগত ভাবের প্রসূতি। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করা আবশ্যক। দুইটীই অভিন্ন—এইরূপ ভাবিতে হইবে। “জীবাত্মা স্থূলদেহে আবদ্ধ আছেন; এই স্থূলদেহ অনাত্ম-বস্তুতে গঠিত” এবম্প্রকার জ্ঞান হইলে ও উহাকে কারণ-শরীরে পুনরায় পরিণত করিতে পারিলেই জীবাত্মার মুক্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, পুরাকালীন শাস্ত্রকারগণ ইচ্ছাপূর্ব্বকই

+ + + এবং সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দ-বাচ্যঃ। সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যা শব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাৎ জীর্যতি অস্মাৎ অনেন বোদিতেন বা ইত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে। ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।

এবম্প্রকার আবরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা ঐ সকল বাহ্য আবরণের ভিতর হইতেও প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। যাহারা অনধিকারী, তাহাদের নিকট উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্য গুলিকে গোপন রাখিবার নিমিত্তই ঐরূপ আবরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পুরাণ জিনিসটী কি ?

আমরা জানি, পুরাণগুলি পৃথিবী-প্রথিত নিগূঢ় সত্য নিচয়ের চিত্রবৎ সুস্পষ্ট মূর্ত্তি। অনধিকারিগণ পুরাণের মহিমা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেও অধিকাংশ পৌরাণিক গল্পেই প্রগাঢ় তথ্য নিহিত রহিয়াছে।

"অধিকাংশ ব্যক্তি পুরাণকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, পুরাণ কখনই তাহা নহে। তাঁহারা মনে করেন "পুরাণ—কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের সমষ্টি; উহার মূলে প্রকৃত তথ্য থাকিতেও পারে, আবার নাও থাকিতে পারে।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণ খুব বেশী পরিমাণে সত্য; কেননা, ইতিহাস মাত্র ছায়া প্রদান করিয়া থাকে, আর পুরাণে সেই ছায়ার বস্তু বিদ্যমান। উচ্চতর জগতে যেমন যেমনটী হইতে থাকে, নিম্নতর জগতেও ঠিক্ তেমন তেমনটী ঘটে। দৃশ্যমান ব্যাপারের সূচনা "প্রথমে" উচ্চতর জগতেই ঘটে, "তৎপরে" উহা নিম্নে প্রকট হয়। কতিপয় মহান্ মৌলিক তথ্যের অনুরূপ করিয়াই আমাদিগের দেহ গঠিত হয়। ঐ তথ্য গুলিকে সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে কতকগুলি নিয়ম আছে। বিস্তর দেবযোনি ঐ তথ্য গুলির সমাবেশে মূর্ত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন। উহাঁদের কার্য্যকারিতাই—প্রাগুক্ত নিয়ম-নিচয়। ঐ দেবযোনিগণের অধীনে আবার বিস্তর নিম্নশ্রেণীর দেবযোনি আছেন। ইঁহারা উপরিতন দেবযোনির কার্য্যকারক-স্বরূপ। উহাঁরা সকলেই সুবিরাট্ জাগতিক নাট্য-প্রাঙ্গ পরিচালিত করিতেছেন। মানবের জীবাত্মাও ঐ পরিচালন-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই ব্যাপারে মানবাত্মারও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। সূক্ষ্ম জগতের এই বহুবিধ কর্ম্মীর ছায়া স্থূলজড়ে নিপতিত হয়। ঐ ছায়াই—"বস্তু।" সেই বস্তুতেই স্থূল জগৎ সংগঠিত। ঐ ছায়ারাশিতে আমরা ছায়াধিকারী জীবের অতি সামান্য পরিচয় পাইয়া থাকি। সাধারণ ভাবে দেখিলেও দেখা যায় যে, কোন একটা জিনিসের বিশিষ্টভাব উহার ছায়াতে কখনই পরিব্যক্ত হয় না। ছায়া মাত্র বাহ্যাকার; শূন্য অন্ধকার। উহাতে বিশেষ পরিচয় কিছুই থাকে না। উহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আছে মাত্র; গভীরতা আদৌ নাই।

ইতিহাস জিনিসটী বড়ই অসম্পূর্ণ। প্রায়শঃই উহার বিবরকিণ-কৃতি ঘটিয়া

থাকে। এই স্থূল জগৎটী একটী ছায়া-জগৎ। ইতিহাস এই ছায়া-জগতের ছায়ার নৃত্য-বিবরণ মাত্র। ছায়া-ক্রীড়ায় একটী পর্দ্দা থাকে। পর্দ্দার উপরে ছায়ার ক্রীড়া সাধারণে দেখিতে পায়, কিন্তু পর্দ্দার অন্তরালে প্রকৃত শিল্পী কাজ করিতে থাকে। যিনি এতদ্ব্যাপারসমূহ মনোযোগ-সহকারে দেখিয়াছেন, তিনিই সুস্পষ্টরূপে প্রণিধান করিতে পারেন যে, ছায়া-কার্য্যের প্রকৃতি বড়ই অসার। ছায়া-ক্রীড়া হইতেই তিনি উহার সহিত জগদ্ব্যাপারের সাদৃশ্য বুঝিয়া লইতে পারেন।

ছায়ার পশ্চাদ্ভাগে যে বাস্তব বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা হইতে ছায়া নিঃসৃত হইয়াছে, সেই প্রকৃত বস্তুর গতিবিধির বিবরণের নামই—পুরাণ। এই বিবরণ যে ভাষায় প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকে "সাংকেতিক ভাষা" কহে। শব্দ, বস্তুর সংকেত ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনে কর, আমরা "টেবিল্" শব্দটী উচ্চারণ করিলাম। উহাতে আমরা একটী পরিচিত দ্রব্য বুঝিতে পারিলাম। অতএব টেবিল্ এই শব্দটী একটী পরিচিত দ্রব্যের সংকেত মাত্র। তদ্রূপ, উচ্চতর স্তরের (সূক্ষ্ম জগতের) দ্রব্যাদির পক্ষেও নির্দ্দিষ্ট সংকেত আছে। এই সংকেত—চিত্রবৎ বর্ণ। যাবতীয় পুরাণকারই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটীর এক একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে। বিভিন্ন শব্দে আমরা যেমন বিভিন্ন দ্রব্য বুঝিয়া থাকি, তদ্রূপ বিভিন্ন সংকেতে আমরা বিভিন্ন পদার্থ বুঝি। পুরাণ-পাঠ করিতে হইলে এই সংকেত-সমূহের জ্ঞান আবশ্যক হইয়া থাকে। মহা-পুরাণ গুলি যাঁহাদের মুখারবিন্দবিগলিত তাঁহারা সিদ্ধ-পুরুষ। সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার করাই তাঁহাদের অভ্যাস। তাঁহারা এই সকল সংকেত গুলিকে উপযুক্ত অর্থে উপযুক্ত স্থলে ব্যবহার করিয়া থাকেন।"—(মিসেস্ অ্যানিবেশান্তের "বাহ্যখৃষ্টান-ধর্ম্ম" নামক পুস্তকের ১৫২–১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

প্রাগুক্ত সংকেত গুলি শুদ্ধভাবে পাঠ করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ পরিগ্রহ করিতে হইলে, আমাদিগের আত্মাববোধ জিনিসটীর পরিপুষ্টি করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে অধিকাংশ পৌরাণিক গল্পের তাৎপর্য্যই আমরা বুঝিতে সমর্থ হইব না। ইতঃপূর্ব্বে যে সমুজ্জ্বল বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সকলেরই ঐ গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমরা সত্যের সাংকেতিক বিবরণের প্রকৃত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারিব। যদি পুরাণকে আমরা এই চক্ষে দেখি, তবে উহার যে সকল গল্পে দেবগণের লাম্পট্যের বিবরণ আছে, তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগকে

ক্ষুব্ধ হইতে হয় না। যে জাতির গার্হস্থ্য জীবন পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি, যাঁহারা উচ্চতর গুণানুশীলনের চিরপক্ষপাতী, তাঁহারাই যখন পুরাণ-পাঠে পরম-প্রীতি অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তখন পুরাণের অর্থ প্রাগুক্ত পবিত্র ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা, সমুন্নত হিন্দুজাতির জাতীয়চরিত্র সম্পূর্ণ ভাবে অব্যাখ্যেয় রহিয়া যাইবে।

গূঢ় তথ্য।

এতদ্বিষয়ে ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কির গুরুতর কথা গুলি আমাদিগের স্মরণ করা আবশ্যক। "ফল দ্বারা যেমন বৃক্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ কার্য্য দ্বারা দেবতার প্রকৃতি জানা যায়। দেবগণের কার্য্য বিচার করিতে হইলেই আমাদিগকে পুরাকালীন কাহিনীর আশ্রয় লইতে হইবে, অথবা ঐ গুলি যে রূপক, তাহা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য।

+ + + হিন্দুগণ সম্বন্ধে লোকে যাহাই ধারণা করুক না কেন, তাঁহাদিগের কোন শত্রুই তাঁহাদিগকে "নির্ব্বোধ" বিবেচনা করিতে পারে না। যে জাতির সাধু মহাত্মারা অত্যুৎকৃষ্ট দর্শন-শাস্ত্র পৃথিবীকে দান করিয়া গিয়াছেন, (যেরূপ দর্শন, মানব-মস্তিষ্ক হইতে আর কখন প্রসূত হয় নাই,) যে জাতি এতটা উন্নত ছিল, সে জাতি অবশ্যই ন্যায়ান্যায়-পার্থক্য-বোধ-বর্জ্জিত নহে। কেহ কেহ বলেন "দেবগণ ধূর্ত্ত প্রতারক ; কেননা, বিষ্ণু, মোহিনী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যগণকে রূপে মুগ্ধ করতঃ তাহাদিগকে ধর্ম্মপথ-স্খলিত করিয়াছিলেন।" ইঁহাদিগের মতে দৈত্যগণ সচ্চরিত্র। বিষ্ণুর মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিবার কথা বিষ্ণু-পুরাণে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারটী রূপক। ইহার অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই গূঢ় অর্থ বিদ্যমান আছে। কোন সমাজেই—কোন জাতির মধ্যেই প্রতারণা ও চাতুরি "ঐশ গুণ" বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।"—("গূঢ়-তথ্য" পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৪৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দেবগণ, ঈশ্বরত্ব দুর্ব্বোধ করিয়া থাকেন।

সাধারণের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি দেবের অস্তিত্ব-বশতঃ একেশ্বর-ধারণাটী দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাঁদের মতে, বহু দেবের কল্পনা, যথার্থ অদ্বৈতবাদের পরিপন্থী। ইহাঁদের এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। আমরাও উহাঁদের মত একটা (অসার) আপত্তি করিতে পারি যে, সঙ্গীতের সময়ে অসংখ্য কড়ি-কোমল-সংযোগ পরিহার করিয়া, মাত্র প্রধান ২ সুরগুলির ঝঙ্কার তুলিয়া একটা একতান সৃষ্টি করা হউক। সসীম বুদ্ধির পক্ষে অসীম

বস্তুর ধারণা করা অসম্ভব। অসীম বস্তু, অসংখ্য প্রকারে অভিব্যক্ত হইতেছেন। মাত্র সেই অভিব্যক্তি দ্বারাই উহাঁর একটা ধারণা হইতে পারে। সেই ভগবদ্বস্তুকে আমাদিগের স্ব ২ ধারণার বিষয়ীভূত করিয়া তোলাই ঈশ্বরে মনুষ্য-রূপাদি আরোপের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। যাঁহার চক্ষুরুন্মীলিত হইয়াছে, মূর্ত্তি-বাহুল্যে একেশ্বরবাদ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা ঘটে না। বরং, ভগবানের অসংখ্য অভিব্যক্তি চিন্তা করিতে ২ আমাদিগের সাকার চিন্তার ঝোঁক্‌টা ক্রমে ২ মন হইতে তিরোহিতই হইয়া থাকে। মূঢ় ও গর্ব্বিত ব্যক্তিগণই ভগবানের অভিব্যক্তির সংকোচ সাধনে সাহসী হয়। কোন্‌টী মিস্ট? প্রধান ২ সুরগুলির একঘেয়ে তান, না নানাবিধ সুরের মিশ্রিত একতান-ঝঙ্কার? "দেবগণ ও ঈশ্বর" নামক শেষ অধ্যায়ে আমরা এতদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥১

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ। হে পার্থ ময়ি আসক্তমনাঃ (আসক্তং অভিনিবিষ্টং মনঃ চিত্তং যস্য সঃ) মদাশ্রয়ঃ (অনন্যশরণঃ) (সন্), যোগং যুঞ্জন্ (অভ্যস্যন্) সমগ্রং (বিভূতি-বলৈশ্বর্য্যাদি-সহিতং) মাং অসংশয়ং (নিঃসংশয়ং) যথা (যেন প্রকারেণ) জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু।১

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন "হে পার্থ, তুমি আমাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত, আমার শরণাপন্ন হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে যে প্রকারে আমার বল-বিভূতি ঐশ্বর্য্যাদির সহিত আমাকে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর।"১

আলোচনা। ভগবান্ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-সন্ন্যাসরূপ সাধনের বিষয় এবং সাধারণ আকারে যোগতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ম্ম ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ অতি দুরূহ, এই শ্রীভগবান্ ষষ্ঠ

অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভক্তি-মার্গের সূচনা করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবেন। তাই বলিতেছেন "হে পার্থ তুমি আমাতেই আসক্তচিত্ত এবং আমারই শরণাপন্ন, অতএব পূর্ব্বে সৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে সাধনা সম্বন্ধে তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহাতে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, অথবা তাহার কোনটীর যথাযথ প্রতিপালনাভাবে সৎ-প্রাপ্তির বাধা হয়, সেই জন্য, যাহাতে তুমি আমার বল-বিভূতি-সহিত আমাকে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পার, তাহাই তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর।১

জ্ঞানং তেঽহং স বিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥২

অন্বয়। অহং তে (তুভ্যং) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানং স্বানুভবযুক্তং জ্ঞানং তৎ-সহিতং) ইদং (মদ্বিষয়ং) জ্ঞানং অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা ইহ (শ্রেয়ো-মার্গে) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্টং ন ভবতি)।২

বঙ্গানুবাদ। যাহা জানিলে শ্রেয়ঃ-পথে গমনকারী ব্যক্তির জানিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, আমি বিজ্ঞান-সহিত সেই জ্ঞান, তোমাকে নিঃশেষরূপে বলিব।২

আলোচনা। শাস্ত্রার্থ-বোধ দ্বারা ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব জানার নাম জ্ঞান; তৎ-শ্রবণ-মনন ও বিচারপূর্ব্বক আত্মাতে তাঁহার সত্তা অনুভব করার নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মবস্তু বুঝিলে এবং বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলে, জীবের জানিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই ভগবান্ বলিলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সহিত সমস্ত জ্ঞাতব্য তোমাকে বলিব।২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥৩

অন্বয়। মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে (সিদ্ধ্যর্থং) যততি (প্রযত্নং করোতি) যততামপি (প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি) সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং (পরমাত্মানং) তত্ত্বত (স্বরূপতঃ) বেত্তি।৩

বঙ্গানুবাদ। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ জ্ঞান লাভের যত্ন করে। তাদৃশ যত্নকারিদিগের মধ্যেও কেহ হয়ত আমার স্বরূপ বিদিত হয়।৩

আলোচনা। অসংখ্য জীবগণের মধ্যে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জীব, শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন করে না। জীব যতদিন শরীর ধারণ করিবে, ততদিন তাহাকে

জরা-ব্যাধি-মরণ-জন্য দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অতএব দুঃখ-ভোগ জীবের স্বভাবসিদ্ধ। জগতে সুখ আদৌ নাই তাহা নহে, যাহা আছে তাহা দুঃখ-সংমিশ্রিত, তাহাও স্থায়ী নয়। সুখভোগ সামান্য, দুঃখাংশ অধিক। এই দুঃখের ঐকান্তিক আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম শ্রেয়ঃ। মনুষ্যদিগের সহস্র সহস্র মধ্যে কদাচিৎ কেহ এই শ্রেয়োলাভের চেষ্টা করেন। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন এই শ্রেয়োলাভ হয় না। তত্ত্ব-জ্ঞান অর্থে তৎ= তিনি —সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্, তৎ এর জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান। তৎ = তিনি = আত্মা, আত্মার জ্ঞান—আত্মজ্ঞান। সকলে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। কর্ম্ম ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞান-লাভ করিতে হয়। তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। আত্মজ্ঞান-লাভে প্রযত্নকারি-দিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন এবং তাহাকে লাভ করিতে পারেন। চরমলক্ষ্যে পৌঁছিতে বহুজন্মের গুরুপদেশ অনুযায়ী দীক্ষা-শিক্ষা ও ভগবচ্চরণে ঐকান্তিক ভক্তি সাধন ভিন্ন হয় না।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

অন্বয়। ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং (আকাশঃ) মনঃ বুদ্ধিঃ ইতি ইয়ং (যথোক্তা) মে অষ্টধা ভিন্না (বিভাগ-প্রাপ্তা) প্রকৃতিঃ। ৪

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহঙ্কার আমার এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি। ৪

আলোচনা। ভগবান্ দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান জানিলে শ্রেয়ঃ কামীর আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য সকল কথা তোমাকে বলিব। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান। তাই বলিতেছেন, ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত এবং মন ও বুদ্ধি ও অহংকার আমার এই অষ্টধা প্রকৃতি। প্রকৃতি অর্থ (প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ) যে উপাদানে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নাম। প্রকৃতি নিত্য এবং অব্যয় আদি-মধ্য-হীন। এই শ্লোকে ক্ষিত্যাদি যে পঞ্চভূতের উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থানে সেই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মভাব বা তন্মাত্রভাব অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ক্রমে গন্ধ তন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, এবং শব্দতন্মাত্র বুঝিতে হইবে। এই পঞ্চতন্মাত্র এবং মন বুদ্ধি ও অহংকার ভগবানের এই অষ্টধা প্রকৃতি অর্থাৎ এই আটটী জগতের উপাদান। এই আটটীর সমন্বয়ে জগৎ সৃষ্ট।

সাংখ্যশাস্ত্রমতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম অব্যক্ত।

এই অব্যক্ত এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ তন্মাত্র ও বুদ্ধি এবং অহংকার এই অষ্ট প্রকৃতি, এবং ষোড়শ বিকার, অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রের বিকার ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) এবং পুরুষ (চেতন) এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব সৃষ্টির মূল কথিত হইয়াছে। ৪

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

উৎসবে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যার প্রতিবাদ এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ আলোচনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার রচয়িতা সংস্কৃত কলেজের যশস্বী দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম এ। গ্রন্থ বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। উৎসবের ব্যাখ্যা আমরা দেখি নাই। মহেন্দ্রনাথও তাহা অবিকল উদ্ধৃত করেন নাই। কাজেই এ গ্রন্থের বিশদ সমালোচনা সম্ভব নহে। তবে এই পুস্তিকায় যে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের আলোচনা আছে, তাহা তত্ত্বতঃ নির্দ্দোষ। পুস্তিকায় ভাষা-সৌষ্ঠবের অভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে নিন্দার কিছু নাই। যাঁহারা বৈষ্ণব-বেদান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, উহা কত উচ্চ। উৎসবের প্রবীণ সম্পাদক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে নিন্দা করেন কেন, জানি না। সাধক সাধু-সমাজে নিন্দা-ব্যাখ্যার স্থান নাই। এই পুস্তিকা-পাঠে বিশুদ্ধ দার্শনিক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। প্রত্যেক তত্ত্বপিপাসুর এই গ্রন্থখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আনন্দোৎসব। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আগামী ২৯শে ফাল্গুন রবিবার বেলুড়মঠে আনন্দোৎসব হইবে। ভক্তগণ প্রস্তুত হউন্।

উপাধি-দান। খুলনা-নকীপুরের হরিচরণ-চতুষ্পাঠীর সুবিখ্যাত অধ্যাপক সুপণ্ডিত সুকবি শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়কে শ্রীভারত-ধর্ম্মমহা-মণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষ 'মহোপদেশক' উপাধি দান করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় এই সম্মান-লাভের যোগ্য পাত্র, সন্দেহ নাই।

—:o:—

অর্থ-দানের প্রতিশ্রুতি। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ, বগুড়ার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু করুণাকান্ত সাহা মহাশয়, বগুড়ার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজীবিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালন করিয়া জ্ঞান-বিস্তারের সহায় হইয়া দাতা ধন্য হউন্।

—:o:—

হিন্দু-সনাতন-ধর্ম্ম-মহাসম্মিলনী। পত্রান্তরে প্রকাশ, আগামী ২২ মার্চ্চ হইতে ২৫ মার্চ্চ পর্য্যন্ত মথুরা নগরে হিন্দু-সনাতন-ধর্ম্ম-মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। সম্মিলনীর উদেশ্য, হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি-বর্দ্ধন, পুরোহিত-সম্প্রদায়, তীর্থ-গুরু-দল ও পূজকগণ যাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ ও অনুষ্ঠান-নিপুণ হইতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা, সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার, এবং অনাথ-হিন্দু-বালকগণের রক্ষার ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি। দ্বারবঙ্গাধিপতি এই সৎ কার্য্যের উৎসাহ-দাতা এবং পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা ইহার ব্যাখ্যাতা ও বক্তা। সদনুষ্ঠান সফল হউক্।

—:o:—

কাশীলাভ। "তনয়ে তার তারিণি" "বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা" প্রভৃতি ভক্তি-ভাব-পূর্ণ সাধন-সঙ্গীতের রচয়িতা খ্যাতনামা রামলাল দত্ত মহাশয়ের সম্প্রতি কাশীলাভ ঘটিয়াছে। মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের অঞ্চলচ্ছায়ায় মহানন্দে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে দুঃখের কথা নহে, সুখের সংবাদ।

—:o:—

সাহিত্য-সম্মিলন। যশোহরের নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগ আয়োজন পূর্ণবেগে চলিতেছে। দেশের নেতৃ-স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত সাহিত্যানুরাগী মহাত্মা এবং বহু প্রথিতযশা সাহিত্য-মহারথী, আগমনের প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। সম্মিলনের সময়েই ম্যালেরিয়া-নিবারণের জন্য একটী কার্য্য-ব্যবস্থাকারী সঙ্ঘ-গঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগ-দান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টরীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড | চৈত্র। | ১৩২২ সাল।
১২শ সংখ্যা। | | ১৮৩৭ শকাব্দ।

আনন্দ-সম্মেলন।

শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয়ের পর সসৈন্যে—অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে মহর্ষির আগ্রহাতিশয্যহেতু তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময় তাঁহার ভরতের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। ভরত, যখন শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস-সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, চতুর্দ্দশ-বর্ষান্তে যদি শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন না করেন, তাহা হইলে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। এই দারুণ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র, প্রিয়সুহৃদ্ বানর-সেনাপতি হনুমান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হনুমন্, তুমি অতি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন করিয়া শ্রীমান্ ভরতকে আমার প্রত্যাগমন-বার্ত্তা জানাও; কারণ অদ্য চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষ হইল, আগামী কল্য শ্রীমান্ ভরত আমাকে না দেখিতে পাইলে অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ-ত্যাগ করিবেন।"

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেনাপতি হনুমান্ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্যদিকে "অদ্য চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, আগামী কল্য শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন না পাইলে ভরত প্রাণত্যাগ করিবেন" ইহা চিন্তা করিয়া নন্দীগ্রামে মন্ত্রী, অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং প্রকৃতিবর্গ সকলেই অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন।

শ্রীমান্ ভরত অযোধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইক্ষ্বাকু-রাজসিংহাসনে কখনও উপবেশন করেন নাই। সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা রাখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ মন্ত্রিবর্গের সাহায্যে ভরত, ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন। তিনি মনোদুঃখে অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার এক ক্রোশ দূরস্থ নন্দীগ্রাম নামক উপনগরে চতুর্দ্দশ-বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। ভরত কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে রাজ-কার্য্য করিতেন। তাঁহার শিরে সমুন্নত জটাভার, পরিধানে বল্কলাজিন। চতুর্দ্দশবর্ষ ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া তিনি অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন তপস্বী অযোধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত-কল্য চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষ হইয়াছে, অদ্য নন্দীগ্রামের রাজসভাগৃহে সভাস্থ সকলের মুখেই—গভীর বিষাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। সভাগৃহ নিস্তব্ধ, বশিষ্ঠাদি মন্ত্রিগণও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেছেন না। অনেকেই মনে মনে ভক্তিভাবে ভগবানের সন্নিধানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময়ে ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া হনুমান্ সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীমান্ ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন; আপনি যাঁহার জন্য নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়াছেন, তিনি এই মুহূর্ত্তেই সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে এইস্থানে আগমন করিবেন"। ভরত হনুমানের মুখে এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া ইষ্টাতিশয্যে মোহ-প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হনুমান্‌কে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিপুল আনন্দাশ্রু দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিলেন। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া হনুমান্‌কে বলিলেন "হে সৌম্য, আমি জানিনা, তুমি দেবতা কি মানুষ! কিন্তু তুমি যেই হও, তুমি কৃপা করিয়া যে শুভ সংবাদ দিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরঋণী রহিলাম এবং আমার আত্মপ্রীতির জন্য লক্ষ গাভী, শত গ্রাম এবং শুভাচারকুলজাতি-সম্পন্না ষোড়শটী সুন্দরী কন্যা তোমায় ভার্য্যা স্বরূপ দান করিলাম।"

শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যাগমন-বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীমান্ ভরত এতই আনন্দিত হইয়াছেন যে, তিনি হৃদয়ের বেগ কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারিতেছেন না। তিনি পুনর্ব্বার হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন "আজ বহুদিন পরে শ্রীরামচন্দ্রের শুভ-সংবাদ শুনিলাম। লৌকিক প্রবাদ আছে যে, মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে শত বর্ষ পরেও আনন্দ লাভ করিতে পারে, আজ সেই প্রবাদ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।"

তখন ভরতের প্রত্যাগমন-কাল হইতে রাবণ-বধ, লঙ্কা-বিজয় এবং সীতা-উদ্ধার-কাল পর্য্যন্তের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত ভরতের কাছে হনুমান্ নিবেদন করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন "শ্রীরামচন্দ্র অদ্য গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজাশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, আগামী কল্য পুষ্যা-নক্ষত্র-যোগে আপনি তাঁহার দর্শন লাভ করিবেন।" তখন ভরত আনন্দগদ্‌গদ হইয়া বলিলেন "চিরস্যপূর্ণঃ খলু মে মনোরথঃ" বহুকাল পরে আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

শ্রীরামচন্দ্রের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ভরত শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন "হে শত্রুঘ্ন, অবিলম্বে পুরবাসিগণ শুচি হইয়া পুষ্প-চন্দন সঙ্গীত ও বাদ্যের দ্বারা আমাদের কুলদেবতা এবং নগরের চৈত্যস্থিত দেবতাগণের অর্চ্চনা আরম্ভ করুক। শ্রীরামচন্দ্র যখন নগরে প্রবেশ করিবেন, তখন যেন বাদ্যকরগণ রামচন্দ্রকে নগরে আনিবার জন্য শোভা-যাত্রা করিয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন করিতে যাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অমাত্যগণ, সসৈন্য সেনাধিপতিগণ এবং রাজ-মাতৃগণেরও যাইতে হইবে।" ভরতের আদেশ শুনিবামাত্র শত্রুঘ্ন সুন্দররূপ সব ব্যবস্থা করিলেন। পথ ঘাট পরিষ্কার করাইলেন। অযোধ্যা হইতে নন্দীগ্রাম পর্য্যন্ত যে সমস্ত স্থান উচ্চ নীচ ছিল তাহা সমান করিয়া দিলেন। সকল রাজপথ জলদ্বারা সিক্ত করাইলেন, তাহাতে লাজ ও কুসুম বর্ষণ করাইলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সমস্ত নগরী রাজপথ এবং প্রাসাদ সকল পতাকার দ্বারা শোভিত হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ধৃষ্টি, জয়ন্ত, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, ধর্ম্মপাল, মন্ত্রপাল এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাম-আগমন-প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে গমন করিলেন। অশ্বারোহিগণ অশ্বে ও রথিগণ রথে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন; হস্ত্যারোহগণ সুবর্ণকক্ষা এবং ঘণ্টা-শোভিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন; পদাতিকগণ, ধ্বজা, পতাকা, শক্তি, রিষ্টি ও পাশ-হস্তে লইয়া বহির্গত হইলেন; কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য ইক্ষ্বাকু-কুল-স্ত্রীগণ শিবিকারোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন; স্বয়ং ভরত, চীর এবং কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়া হেম-দণ্ড-ভূষিত শ্বেতচ্ছত্র এবং শ্বেত মাল্য দ্বারা পরিশোভিত রামচন্দ্রের পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিলেন। মাল্য ও মোদক হস্তে করিয়া মন্ত্রিগণ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সঙ্গে ২ চলিলেন; বন্দিগণ শঙ্খ ও ভেরী-ধ্বনি করিতে ২ রামচন্দ্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন। অযোধ্যা-নগর-বাসিগণ সকলেই নন্দীগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকলেই অনিমেষ নয়নে পথের দিকে তাকাইয়া আছেন,

কিন্তু কৈ রামচন্দ্র ত আসেন না! তখন ভরত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং হনুমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "কৈ আর্য্যকে ত এখনও দেখিতেছি না। তুমি ত আমার নিকট মিথ্যা বল নাই!" তখন হনুমান্ বলিলেন "আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, ঐ দেখুন, রামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন।" হনুমানের কথা শেষ না হইতেই জন-সঙ্ঘ "ঐ রাম" "ঐ রাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া পাদ্য-অর্ঘ দ্বারা রামচন্দ্রকে অর্চ্চনা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বিমানে আরোহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ভরত বিমানে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের পদতলে পতিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে চরণতল হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। ভরত তৎপরে বৈদেহীর নিকট গমন করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, লক্ষ্মণের মস্তকচুম্বন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে যথাক্রমে সুগ্রীব, জাম্বুবান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, সরভ, পনষ, এবং অন্যান্য বানর-সেনাপতিগণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সুগ্রীবকে মধুরবাক্যে বলিলেন "হে সুগ্রীব "ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং বৈভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ, সৌহার্দ্দাজ্ জায়তে মিত্রমপকারো হরিলক্ষণম্"—লোক উপকারের দ্বারা মিত্র এবং অপকারের দ্বারা শত্রু হয়; তুমি আমাদের চারি-ভ্রাতার "পঞ্চম ভ্রাতা" হইলে। তৎপরে বিভীষণকে বলিলেন "হে রাক্ষসরাজ, সৌভাগ্য-ক্রমে শ্রীরামচন্দ্র, আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই এরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে পারিয়াছেন"।

তৎপরে শত্রুঘ্ন, শ্রীরামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষ্মণের পদগ্রহণ-পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া শোকক্লিষ্টা জননীর পদে মস্তক অবনত করিলেন এবং তৎপরে কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া বশিষ্ঠগৃহে গমনের উদ্যোগ করিলেন। যাইবার সময় ভরত রামচন্দ্রকে মস্তকস্থিত পাদুকাযুগল পরিধান করাইয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন "হে আর্য্য

এতৎতে সকলং রাজ্যং ন্যাসং নির্য্যাচিতং ময়া
অদ্য জন্ম কৃতার্থংমে সংবৃত্তশ্চ মনোরথঃ—
যৎত্বাং পশ্যামি রাজানং অযোধ্যাং পুনরাগতং
অবেক্ষ্যতাং ভবান্ কোশং কোষ্টাগারং গৃহং বলং
ভবতস্তেজসা সর্ব্বং কৃতং দশগুণং ময়া।

অর্থাৎ আপনি আমার নিকট যে রাজ্য "ন্যাস স্বরূপ" রাখিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য

আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। আমি যে পুনরায় আপনাকে অযোধ্যার রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, তাহাতেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এবং জন্ম সফল হইল। ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ এবং সৈন্যসকল পর্য্যবেক্ষণ করুন, আপনার তেজোবলেই আমি এই সমস্তকে দশগুণ বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছি।” ভরতের এই কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিবর্গ “স্বাগতং স্বাগতং” বলিয়া রামচন্দ্রকে করযোড়ে প্রণাম করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র তৎ-পরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া—ভরতের আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথা হইতে পদব্রজে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া বশিষ্ঠের পাদোদক-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটস্থিত পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলেন। আনন্দ-সম্মেলন সম্পূর্ণ হইল।



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্॥
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫

অন্বয়। হে মহাবাহো (অষ্টধা যা প্রকৃতিঃ উক্তা) ইয়ং তু অপরা (ন পরা জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা) ইতঃ (যথোক্তায়াঃ) পরাং (প্রকৃষ্টাং) অন্যাং জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি) যয়া (জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া চেতনয়া) ইদং জগৎ ধার্য্যতে। ৫

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি “অপরা” বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো, এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্না চৈতন্যময়ী আমার “পরা” প্রকৃতি সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে, তাহা অবগত হও। ৫

আলোচনা। পূর্ব্বশ্লোকে যে অপরা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অচেতনা বলিয়া নিকৃষ্টা। চেতনা পরা প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠা ও জীবাত্মিকা। এই চেতনা প্রকৃতিই অচেতন জড় জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। এই জীব চৈতন্যকে জানিতে পারিলেই পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়। এই পরা প্রকৃতিই পুরুষ-তত্ত্ব। সাংখ্য-মতে এই প্রকৃতি-পুরুষই সৃষ্টির চরম তত্ত্ব। গীতা বলেন, প্রকৃতি-পুরুষ

চরম তত্ত্ব বা স্বতন্ত্র নহে, ইহারা ঈশ্বর-পরতন্ত্র। ভগবান্‌ই চরম তত্ত্ব। প্রকৃতি-পুরুষ, ভগবানের ভাব—প্রকার বা বিলাস মাত্র। ৫

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

অন্বয়। সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবর জঙ্গমাত্মকানি) এতদ্‌যোনীনি (পরা অপরা চ প্রকৃতিঃ যোনী যেষাং ভূতানাং তানি এতদ্‌যোনীনি) ইতি উপধারয় (জানীহি) অহং কৃৎস্নস্য (সমস্তস্য) জগতঃ প্রভবঃ (উৎপত্তি-হেতুঃ) তথা প্রলয়ঃ (বিনাশ-হেতুঃ) জগদুৎপাদয়িতা জগতঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ। ৬

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত ভূতই এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমি। ৬

আলোচনা। পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে জড়াপ্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়, পরা প্রকৃতি চেতন ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া দেহাদি ধারণ করে। পরা প্রকৃতি জীব ভোক্তা ও অপরা প্রকৃতি জড় ভোগ-ভূমিরূপে জগতে প্রকাশিত। কেবল প্রকৃতির গুণেই যে জগতের উৎপত্তি ও লয় হয় তাহা নহে, ভগবানের সত্তাই তাহার মূল কারণ। তাঁহারই প্রকৃতি-যোগে তিনি জগদুৎপত্তি বিনাশের হেতুভূত হইয়া তাঁহার মায়াময় জগতে মায়ালীলা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দৃষ্ট হয় সমস্তই তদাত্মক। ৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭

অন্বয়। হে ধনঞ্জয় মত্তঃ (পরমেশ্বরাৎ) পরতরং শ্রেষ্ঠং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি। সূত্রে মণিগণাইব ময়ি ইদং সর্ব্বং (জগৎ) প্রোতং (গ্রথিতং অনুবিদ্ধং আশ্রিতং)। ৭

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে জগতে কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ, পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সকল পদার্থই আমাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ৭

আলোচনা। ঈশ্বরের সত্তা ব্যতীত জগতে কোন বস্তুসত্তা নাই। মাকড়শা যেমন নিজ দেহ হইতে সূত্রজাল রচনা করিয়া তাহাতেই অবস্থিতি করে, ভগবান্‌ও তেমনি তাঁহার সৃষ্টবস্তু মাত্রে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান আছেন। গ্রথিত মণিসকল যেমন সূত্র অবলম্বনে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ জাগতিক পদার্থ সকলই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আছে।

ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ ও কার্য্যরূপে সংস্থিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮

অন্বয়। হে কৌন্তেয় অহং অপ্সু রসঃ শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ (ওঁকারঃ) খে (আকাশে) শব্দঃ নৃষু (পুরুষেষু) পৌরুষং (পুরুষস্য ভাবঃ উদ্যমঃ)। ৮

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভা, সর্ব্ববেদে ওঁকার, আকাশে শব্দ এবং পুরুষসকলে তেজঃস্বরূপে বিদ্যমান থাকি। ৮

আলোচনা। এখানে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব বলিতেছেন। ঈশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্ব-বস্তুতে বিদ্যমান আছেন। রসই জলের মূল তত্ত্ব, তন্মাত্র জলের সার; ভগবান্ বলি-লেন "আমিই জলের সার"। প্রভাই চন্দ্র সূর্য্যের সার, ভগবান্ বলিলেন "আমিই চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা"। আকাশই শব্দের আশ্রয়, আকাশের তন্মাত্র শব্দ; ভগবান্ আকাশের সেই শব্দ। সমস্ত বেদের মূল প্রণব—ওঁকার অ+উ+ম=ওঁ।

"ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥"

ওঁকারই বেদসমূহের মূল; ওঁকার ব্যতীত বেদের কোন মন্ত্রের শক্তি থাকে না। বেদ সকলের মধ্যে সেই ওঁকারই ভগবান্। উত্তম তেজই মানবের পৌরুষ। ভগবান্ সেই পৌরুষরূপে মানবে বিদ্যমান আছেন—অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে ভগবানের সত্তার বিকাশ আছে। ৮

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভুতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

অন্বয়। পৃথিব্যাংচ পুণ্যঃ (পুণ্যোঽবিকৃতঃ পবিত্রঃ) গন্ধঃ (গন্ধতন্মাত্রঃ) বিভাবসৌ (অগ্নৌ) চ তেজঃ অস্মি, সর্ব্বভুতেষু জীবনং (যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনং) তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি, বানপ্রস্থাদিষু তপোরূপেণ তিষ্ঠামি। ৯

বঙ্গানুবাদ। আমি পৃথিবীতে বিশুদ্ধ গন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সর্ব্বভুতে জীবন এবং তপস্বিগণে তপঃস্বরূপে অবস্থিতি করি। ৯

আলোচনা। তন্মাত্রই পঞ্চভুতের মূল সার। পৃথিবী-ভুতের গন্ধই তন্মাত্র। ভগবান্ বলিলেন যে, পৃথিবীর সার পবিত্র গন্ধতন্মাত্ররূপে আমিই বিরাজমান। পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে ভগবান্ বিরাজমান, ইহা দ্বারা তিনি অন্য চতুর্ভুতের

তন্মাত্র শব্দ-স্পর্শরূপ-রসের পবিত্রতায় তাঁহার বিদ্যমানতার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি অগ্নিতে তেজঃস্বরূপে আছেন, ইহা দ্বারা তিনি যেমন অগ্নির উত্তাপে দাহ-শক্তিতে প্রকাশকারিতায় তাঁহার বিদ্যমানতা বলিয়াছেন, তেমন উত্তাপের উপশমে দাহশীতলকারা বায়ুতে যে তাঁহার সত্তা, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। আবার স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় বস্তুর তিনিই জীবনীশক্তি, সুতরাং জীবন-রক্ষক অন্নাদিতে তাঁহার সত্তা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন। তপস্বিদিগের তপোযোগ-শক্তি অন্তর্বাহ্যনিগ্রহশক্তিও যে তিনি, তাহাও উল্লেখ করিয়া সর্ব্বভূতে তাঁহার বিরাজমানতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ৯

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধিপার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

অন্বয়। হে পার্থ মাং সর্ব্বভুতানাং বীজং (প্ররোহ-কারণং) সনতনং (চিরন্তনং নিত্যং) বিদ্ধি, অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) তেজস্বিনাং (প্রচণ্ডানাং) তেজঃ চ অস্মি। ১০

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের মূলবীজ এবং নিত্য বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বিদিগের তেজঃ-স্বরূপ। ১০

আলোচনা। ভগবান্ সকল পদার্থেরই বীজস্বরূপ। অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়, ভগবান্ সেরূপ বীজ নহেন। বীজভূত ভগবান্ স্বরূপাবস্থায়ই থাকেন। উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে এই কথা সমস্বরে সমর্থিত হইয়াছে।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ৩। ১ অর্থাৎ যাহা হইতে এই সকল ভুত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাহাতে বিলীন হইবে, তিনি ব্রহ্ম।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি" ছান্দোগ্য ৩। ১৪। ১ অর্থাৎ তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন হয়।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ব্রহ্মসূত্র ১। ১। ২

অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্ব জাত, যাহা দ্বারা পালিত, এবং যাহাতে সংহৃত হয় তিনিই ব্রহ্ম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই শ্লোকোক্ত "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং" এই অংশের "ভগবান্ সর্ব্বভূতের বীজ স্বরূপ" ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন। "এই

'বীজ' শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয়; আবার বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার বীজে বৃক্ষ বিলীন হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে বীজ হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব ও বীজে বৃক্ষের তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে। অতএব ভগবান্ জগতের 'বীজ' এরূপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহা হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাঁহাতে বারবার জগতের তিরোভাব হইতেছে। ইহার নাম সৃষ্টি ও প্রলয়।"

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন "ভগবান্ নিজেই এই সৃষ্টির আধার ও আধেয়"। যখন মহাপ্রলয় হয়—জগতের নাশ হয়, তখন এই সমস্ত সৃষ্টির বীজ ভগবান্ কুড়িয়ে রাখেন অর্থাৎ বীজস্বরূপে এই সৃষ্টির সব রকম ভাব তাঁহাতেই নিহিত থাকে। ইচ্ছা হইলেই আবার সৃষ্টি করেন।" "বাড়ীর গিন্নিদের কাছে যেমন একটী হাড়ী থাকে, তাহাতে লাউ-বিচি শশা-বিচি কুমড়া-বিচি নীলবড়ী সমুদ্রফেণা ইত্যাদি নানারকম জিনিস থাকে, দরকারের সময় বা'র ক'রেন, সেই রকম ঈশ্বরের ভিতর বীজরূপে সবরকম জিনিসই আছে, যখন দরকার বোঝেন তখন বা'র করেন।"

বুদ্ধিমান্‌গণ যে বিবেক-বুদ্ধিবলে সদসদ্‌বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান-লাভ করেন এবং তেজস্বিগণ যে তেজোবলে প্রাধান্য লাভ করেন, সেই বুদ্ধি ও তেজ ভগবানের বিভূতি। ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগ-বিবর্জ্জিতম্।১১
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥

অন্বয়। হে ভরতর্ষভ, অহং কাম-রাগবিবর্জ্জিতং (কামঃ অপ্রাপ্তেষু বস্তুষু অভিলাষঃ, রাগঃ তৎ প্রাপ্তাবপি চিত্তরঞ্জনাত্মকতৃষ্ণা কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ-তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং) বলবতাং বলং অস্মি। ভূতেষু (প্রাণিষু) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মেণ অবিরুদ্ধঃ) কামঃ অস্মি।

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ, বলবান্‌দিগের কামরাগরহিত বল আমি এবং সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্মের অবিরোধী কামও আমি। ১১

আলোচনা। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম এবং প্রাপ্ত বিষয়ে মোহ-বশতঃ অত্যনুরাগের নাম রাগ। বলবান্‌দিগের এবম্বিধ আসক্তি-শূন্য পবিত্র যে বল অর্থাৎ যে বলে মনুষ্য স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য মাত্র সাধন করিয়া আপন শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করে, সেই বলই ভগবানের সত্তা। যে কাম-বৃত্তি ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ভাবে সৃষ্টি-রক্ষার জন্য কেবলমাত্র ধর্ম্মপত্নীতে উপগত করায় এবং যে কাম-চেষ্টা পুত্র দারাদির রক্ষা করে, তাহাও ভগবানের বিভূতি।

যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নচাহং তেষু তে ময়ি ॥১২

অন্বয়। যে চ সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ ভাবাঃ তান্ (সর্ব্বান্) মত্তঃ এব (মদীয় প্রকৃতি-গুণত্রয়-কার্য্যত্বাৎ মজ্জাতানিতি) বিদ্ধি। তেষু অহং ন (ন বর্ত্তে) তে তু ময়ি (বর্ত্তন্তে)।১২

বঙ্গানুবাদ। সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক যত প্রকার পদার্থ তৎ সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি তত্তাবতের অধীন নই, কিন্তু আমাতে সে সকল অবস্থিত আছে।১২

আলোচনা। পূর্ব্বে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে ভগবান্ যে অপরা ও পরা প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন, সেই প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানাদি, রজোগুণ হইতে লোভাদি এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান মোহ প্রমাদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। শম-দমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষ-দর্পাদি রাজসিক ভাব, শোক-মোহাদি তামসিক ভাব। জড়ে জীবে সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক ভাবে এই ত্রিগুণের সমাবেশ আছে। মনুষ্যের মধ্যে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণে, দ্রব্যের মধ্যে ঘৃতাদিতে সাত্ত্বিক-গুণের আধিক্য উক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়াদি জাতি এবং সর্পাদি উগ্রদ্রব্য রাজসিক-গুণ-বিশিষ্ট। ব্যাধ রাক্ষস মদ্য মাংস এই সকল তামসিক-গুণ-প্রধান। এই সকল গুণ ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই সকল গুণ জীব, কর্ম্মফলে লাভ করে। ভগবান্ সকল বস্তুরই আশ্রয় সুতরাং বস্তুর আশ্রিত দোষ গুণ তাঁহাতেই দেখা যায়, কিন্তু ভগবান্ নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত বলিয়া দোষ গুণ কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, আমি তত্তাবতের অধীন নহি, কিন্তু আমাতে সে সকল অবস্থিত আছে।১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

অন্বয়। এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ সর্ব্বং জগৎ মোহিতং এভ্যঃ (ভাবেভ্যঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) অব্যয়ং (অক্ষয়ং) মাং ন অভিজানাতি।১৩

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। এজন্য জগতের জনগণ আমার অক্ষয় নির্ব্বিকার ভাব জানিতে পারে না।১৩

আলোচনা। ভগবান্ মায়াময়। তিনি নিজ মায়ার আবরণে জীবজগৎকে আবৃত রাখিয়াছেন। মানব তাঁহার মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার

স্বরূপদর্শনে অসমর্থ। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥"

ভাগবতম্ ৪।৭।৪৮

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ, আমি গুণময়ী নিজ মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য নিষ্পন্ন করি। তদনুসারে আমার ব্রহ্মাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়।

উপনিষদে বলা হইয়াছে "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

অর্থাৎ যিনি মায়াযুক্ত তিনিই মহেশ্বর।

শাস্ত্রে মায়াকে ভগবানের (ব্রহ্মের) যবনিকাস্বরূপ বলা হইয়াছে। এই মায়া-যবনিকার অন্তরালে থাকা হেতু ভগবানের স্বরূপ স্বতন্ত্র অক্ষর-ভাব দর্শন হয় না। ভগবান্ সাধক ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া যখন তাঁহার মায়া-যবনিকা অপসারিত করেন, তখন জীবের দিব্যজ্ঞান ও ভগবানের স্বরূপ-দর্শন হয়। ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

অন্বয়। এষা গুণময়ী (সত্ত্বাদিত্রিগুণময়ী) দৈবী (অলৌকিকী) মম মায়া দুরত্যয়া (দুস্তরা) যে মামেব (মাং এব) প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তে এতাং তরন্তি (দুস্তরামপি অতিক্রামন্তি ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ) ১৪

বঙ্গানুবাদ। আমার সত্ত্বাদি-ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী মায়া দুরতিক্রম্যা, যাঁহারা আমাকে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই এই সুদুস্তরা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ১৪

আলোচনা। ভগবানের এই দুরতিক্রম্যা মায়া উত্তীর্ণ হইবার উপায় একমাত্র ভগবানের কৃপা। সেই কৃপালাভের উপায় তাঁহাতে ঐকান্তিকী ভক্তি। যে সকল সাধক তাঁহারই শরণাগত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তাঁহারাই দুরতিক্রম্যা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মনুষ্য, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সাধনার দ্বারা এই মায়া এড়াইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত সহস্র চেষ্টায় কোন ফল সম্ভবে না। যিনি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সাধন করিয়াও আপন অভিমান—অহং কর্ত্তা এই ভাব পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ের ন্যায় "তুমিই শরণ, তুমিই গতি" ইত্যাকার ধারণা লইয়া তদাশ্রয়ের কৃপাপ্রার্থী হন, তিনিই

দুরুত্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ভগবানের মায়া কাটাইতে পুরুষকার হারিয়া যায়, নির্ভরশীলতারই জয় হয়। যাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াপাশে জীব আবদ্ধ, তিনি ভিন্ন এ মায়া-গ্রন্থি খুলিবার কৌশল আর কেহ জানে না। ১৪

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

(১৯১৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার যশোহর-নীতিকথা-সমিতিতে শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পঠিত।)

মানব-জীবনের উদেশ্য কি ? প্রশ্নটী বড়ই জটিল। সূক্ষ্মদর্শী ঋদ্ধিসম্পন্ন আর্য্য ঋষিরাও বুঝি এ প্রশ্নের মনঃ-প্রীতিকর মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অথচ বিষয়টী বড়ই আবশ্যকীয়। লীলাময়ের এই বিচিত্র সংসারে দিন কতকের জন্য আসিয়া আমরা আবার কোথায় মিশিয়া যাই! জীবনের এই কয়েকটা দিনে আমাদের কতই না আপদ্, শোক এবং অভাব অতিক্রম করিতে হয়! লক্ষ্যহীন পথে এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে করিতে যখন কালের করাল ছায়া মানবের দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার কি ভয়ানক অবস্থাই উপস্থিত হয়! তখন তাহার মনে এই প্রশ্নই স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়—এই জীবন—যাহা বোধ হয় আর পাইব না—যাহা কত জন্মের পুণ্যফলে পাইয়াছিলাম—তাহা আমি বৃথা-কার্য্যে যাপন করি নাই ত ? সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া আমি কোনও পরম ধন লাভ করিতে পারিয়াছি কি ? আমি কাচ-ভ্রমে কাঞ্চন ত্যাগ করি নাই ত ? আমি মণি ফেলিয়া "আঁচলে গিরো" দিই নাই ত ?

কালের কবলস্থিত সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান মানবের চিত্তে শান্তি কিসে আসিবে ? সে যদি জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকে ও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তবেই সে শান্তিতে দেহ-ত্যাগ করিতে পারে। আর যদি তাহা না বুঝিয়া কেবল সময়োপযোগী কার্য্যই করিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার শান্তি থাকিতে পারে না, মৃত্যুতে তাহার মহাভয়, দেহত্যাগে তাহার অসীম যন্ত্রণা।

তাই বলিতেছিলাম, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভাল করিয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

আগে বুঝিব সে উদ্দেশ্য কি ? সকল লোকে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া যাহার চেষ্টা করে তাহাই এই জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা দেখিতে পাই, ব্যক্তি মাত্রেই স্বকীয় সুখবৃদ্ধি এবং দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টা করে ; সুতরাং ইহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু কথাটার মধ্যে অনেক গোলযোগ আছে। সকলের সুখ ত এক নয়। ঐ দেখুন, সুরচিত হর্ম্ম্যকক্ষে সুখস্পর্শ পর্য্যঙ্কে শুইয়া ধনী, রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। রোগ কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া—স্বাস্থ্যলাভ করা, তাহার স্বর্গ, তাহার এক মাত্র ঈপ্সিত ধন, অর্থাৎ স্বাস্থ্যই তাহার সুখ। আবার দেখুন, ধনীর গৃহদ্বারে অর্থান্বেষী সুস্থকায় মানব দারিদ্র্যের জ্বালায় দ্বারবানের কঠোর বাক্য ও ভৃত্যের শ্লেষ সহ্য করিয়া নিরাহারে প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে। সে অর্থের ভিখারী, অর্থেই তাহার সুখ ; তবেত—সকলের সুখ এক নয়! অসুস্থ ধনী স্বাস্থ্য চায়, সুস্থ ভিখারী ধন চায়।

তবে কি এই দুইয়ের সমন্বয়ে প্রকৃত সুখ ? "অর্থাগমোনিত্যমরোগিতা চ" এই দুইটীই কি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ? হায় হায়! তাহাই যদি হইত, তবে মানব আর পশুতে কোনই প্রভেদ থাকিত না। শীত গ্রীষ্ম হইতে শরীর-রক্ষা, ক্ষুধা-জ্বালানিবৃত্তি, নিরাশ্রয় কাল পর্য্যন্ত শাবকদিগের পরিরক্ষণ ইত্যাদির জন্য যাহার প্রয়োজন, তাহাই পশুদিগের অর্থ। তাহার জন্য ত তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। আহার বিহার অপত্যোৎপাদন অপত্যপালন জীবধর্ম্ম—ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি, বলিয়া যাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, যাহাদের হৃদয় ভগবানের সিংহাসন বলিয়া অবতারগণ ঘোষণা করিয়াছেন, সেই মানবজাতি কি ইতর-জীব-ধর্ম্মকে জীবনের ঈপ্সিত ধন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে ? কখনই নয়। স্বাস্থ্য অর্থ ও বিদ্যালাভ করিয়াও ত আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না, হৃদয়ের অপূর্ণতা ঘুচে না! বৈজ্ঞানিক বাষ্পযান আবিষ্কার করিরা তিন মাসের পথ তিন দিনে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, অদ্ভুত বায়ুযান নির্ম্মাণ করিয়া বায়ু-মণ্ডলে খেচরের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, মেঘমণ্ডলের সৌদামিনী করায়ত্ত করিয়া কক্ষমধ্যে বিজলীর খেলা দেখাইতে পারিয়াছেন, দৃশ্যমান সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া শুধু বায়ুস্তবের মধ্য দিয়া বহু যোজন দূরের সংবাদ আনিতে পারিয়াছেন, দুরবীক্ষণ ও Spectramএর সাহায্যে সৌর-জগতের গ্রহ উপগ্রহ ও তারকামণ্ড-লীর কত কথা ভুবনে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এই সমস্ত অমানুষিক বিদ্যার প্রভাবে মানবের কতটুকু সুখ-বৃদ্ধি হইয়াছে ? দারিদ্র্যের হাহাকার, রোগের

যাতনা, অন্ধের যষ্টিসম এক পুত্রের বিয়োগে শোকাতুরা জননীর হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ, সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, পরধন-প্রাপ্তি-লালসায় উন্মত্ত প্রবল-জাতিকৃত দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখের উপশম, বৈজ্ঞানিক কতটুকু করিতে পারিয়াছেন? বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত মানবের দুঃখ-নিবৃত্তি হয় নাই। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরের পর সেই রণ-ক্ষেত্রের অদূরে দাঁড়াইয়া বিরহবিধুরা কুল-কামিনীগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, আজ ত জর্ম্মণ-সংগ্রামের ফলে পতি-পুত্রহীনা কত রমণী সেই মত আর্ত্তস্বরে করুণ বিলাপ করিতেছেন! তাই বলিতেছি, বিজ্ঞান-চর্চ্চায় যদি মানবের প্রকৃত সুখ-বৃদ্ধি ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে রোগ শোক আর্ত্তনাদ হাহাকার এই জগৎ হইতে অনেক দিন পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়া যাইত।

পার্থিব সুখে মানবের শান্তি সম্ভবে না। ভ্রান্ত মানব ধন-লালসায় জ্ঞান হারাইয়াছে, জঘন্য পাশব-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনলাভ করিতেছে, কিন্তু ধনলাভ করিয়াও তাহার শান্তি নাই। সে আরও ধন চাহে। কি জন্য চাহে, তাহা বোধহয় সে জানে না। তবু তাহার তৃষ্ণা ঘুচে না। এই তৃষ্ণায় সে হয়ত সারা জীবন কষ্ট পাইবে, এক দিনের জন্যও সে সুখ আস্বাদন করিবে না। সুকুমার পুত্র ক্রোড়ে করিয়া প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপা গৃহলক্ষ্মীর সহিত সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিবে মনে করিয়া সাংসারিক জীব কত পরিশ্রম কত ত্যাগ-স্বীকার করিতেছিল, কিন্তু এক দিন কালের করাল-চ্ছায়াপাতে তাহার সাংসারিক সুখের আশা কোথায় দূরীভূত হইয়া গেল। জীবন-পণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রভূত পরিশ্রমে মানস মধ্যে এক নূতন যন্ত্রের কল্পনা করিয়া কত আনন্দ ভোগ করিতেছিল; কিন্তু ঐ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় কোথা হইতে এক অনিশ্চিত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাহার সারা জীবনের পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দিল। আর কত বলিব? সুখের চেষ্টা করিয়া আমরা নূতন নূতন অভাব সৃজন করি, আর সেই সঙ্গে অভিনব দুঃখ-ভোগের কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। পার্থিব সুখে সুখী হওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। উহা মরু-ভূমিতে মরীচিকাবৎ তৃষিত পান্থের আপাত নয়ন-সুখকর হইলেও পরিণামে বিষম নিরাশা উৎপাদন করে।

তবে কি মানবের শান্তির কোনও উপায় নাই? এমন কোন পদার্থ কি নাই যাহাকে উদ্দেশ্য করিলে পরিণামে প্রতারিত হইতে হইবে না! আছে বৈ কি! করুণা-নিদান ভগবান্ শুধু দুঃখ-ভোগের জন্য মানুষকে এখানে প্রেরণ করেন নাই। যে জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ প্রভূত আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহাতেই অসীম সুখ—আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি।

ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন ঃ—

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিদিগের দুঃখ উপস্থিত হইলে মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতে তাঁহাদের স্পৃহা থাকে না। তাঁহারা রাগ ভয় ও ক্রোধের অতীত, তাঁহাদের দুঃখ কোথায় ? কামনাই সকল দুঃখের আকর। তাঁহাদের ত কোন কামনাই নাই।

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

নানাদেশের নদ-নদী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন লীন হইয়া যায়, সেইরূপ বাসনারাশি যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া লীন হয় (অর্থাৎ মন একটু বিক্ষোভিত করিতেও পারে না) সেই যোগী-পুরুষই শান্তিলাভ করেন ; বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে সে শান্তি দুর্ল্লভ।

ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের স্বজন-বিয়োগে মানসিক বিকার হয় না ; কারণ তিনি জানেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা না ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

আত্মা কখনও জন্মেন না, মরেনও না ; ইনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালে বিদ্যমান ; ইনি নিত্য ক্ষয়হীন ও পুরাণ পুরুষ। শরীর-নাশে তাঁহার বিনাশ হয় না।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমরা যেমন নূতন বস্ত্র গ্রহণ করি, জীব সেইরূপ রোগজরাক্লিষ্ট শরীর পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য আবার নূতন শরীর ধারণ করে।

এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, আত্মীয় বিয়োগে তিনি শোক করিবেন কেন?

কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে তিনি নিরাশ হন না, কারণ তিনি জানেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রার্থী বলিয়া কর্ম্মেতে তাঁহার কামনা; কর্ম্মফল সংসার-বন্ধের হেতু, তাই তাহাতে কামনা নাই; কর্ম্ম-ফলের জন্য কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি নহে, কর্ম্ম-ত্যাগেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। আত্ম-জ্ঞান-লাভ করাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য ও জীবন-ধারণ-উপযোগী অর্থ অবশ্য থাকা চাই; কিন্তু এই দুইটী নিমিত্ত মাত্র, (means to the end) উদ্দেশ্য নহে। আত্ম-জ্ঞানে জীবের হৃদয়ের আকাঙ্খা মিটিয়া যায়। আত্ম-জ্ঞান হইলে জীবের আর দুঃখ থাকে না।

এই আত্ম-জ্ঞানকে ব্রহ্ম-জ্ঞানও বলা হইয়া থাকে। ইহা এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। শাস্ত্রাধ্যয়ন, যোগাভ্যাস নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নানা উপায়ে এই জ্ঞান লাভ করা হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞান এ প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয় নহে এবং আমার ন্যায় অজ্ঞ জীবের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলাও সম্ভব নয়, সুতরাং এ প্রবন্ধের এখানেই পরিসমাপ্তি।

দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১। দেবগণের কার্য্য।

এক্ষণে আমরা দেবগণের ক্রিয়াকলাপের আলোচনা করিব। শ্রীমতী অ্যানি-বেশান্ত তদীয় "জীবন ও মূর্ত্তির ক্রমবিকাশ" নামক গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের অতীব সুন্দর বিবৃতি করিয়াছেন। আমরাও মোটামুটি হিসাবে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিব।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, দেবগণ ইন্দ্রিয়-সেবা-তৎপর জীব নহেন। সাধারণের ধারণা এই যে, উহাঁরা স্বর্গে বসিয়া ২ অমৃত পান করেন; এবং সৃষ্টির যাবতীয় যুগগুলি কেবল তন্দ্রাভিভূত ভাবে অতিবাহিত করেন। ব্যাপারটী বাস্তবিক তাহা নহে। উহাঁরা কঠোর পরিশ্রম-সহকারে ব্রহ্মাণ্ড-পরিচালনোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

দেবগণ ক্রম-বিকাশ-ব্যাপারের পরিচালক।

বিবর্ত্তন-ব্যাপারটীকে যথাযথ ভাবে পরিচালন করাই উহাঁদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। "জগদীশ্বরের সজীব ইচ্ছা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, যাহাতে সকল দিকে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, কোন দিকে কোন রূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে, সেই টুকুই উহাঁদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়।" জগদীশ্বর বিবর্ত্তনের একটী পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জগৎকে সেই নিরূপিত পথে আবর্ত্তিত হইতে হইবে। জগৎকে সেই "ঋত-মার্গ" বা সরল পথে চালাইতে হইবে। সরল সোঁজা পথে উহাকে লইয়া যাওয়াই ভগবানের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রভাবে উহার এরূপ চলিবারও কথা। কিন্তু, প্রতিকূল কারণ নিচয় নিবন্ধন কখন কখন উহা বিপথ-গামীও হইয়া থাকে। জগৎ একটী স্বতশ্চল যন্ত্র নহে। ইহা যে শুধু জীবন-শূন্য, ইচ্ছা-শূন্য জড়পিণ্ড তাহা নহে। স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি-সমন্বিত, সচল সজীবপ্রাণি-বৃন্দ ইহার উপরিভাগে বাস করে। এই সকল প্রাণী ইহার গন্তব্য পথে চলিবার পক্ষে অন্তরায় ঘটাইয়া ইহাকে বিপথগামী করিয়া ফেলে। সে সময় দেবগণের কার্য্য আবশ্যক হয়। যেই জগৎ বিপথগামী হয়, অমনি উহাঁরা বিপরীত দিক্ হইতে ধাক্কা দিয়া উহাকে ঠিক পথে চালাইয়া দেন। একটী উদাহরণ দিতেছি। মনে কর, তুমি ধাক্কা দিয়া দিয়া একটী "বল্" সোজা পথে লইয়া যাইতেছ। এমন সময় আর এক ব্যক্তি আসিয়া বিপরীত দিক্ হইতে ধাক্কা দিয়া উহাকে অন্যদিকে লইয়া চলিল। আবার তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ধাক্কা দিয়া উহাকে অন্য এক দিকে লইয়া চলিল। ফলে "বলটী" এইরূপ ধাক্কা খাইয়া ২ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যে-কোন একটা দিকে চলিতে লাগিল। তদ্রূপ মানবগণ স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে পার্থিব বিবর্ত্তনধারাকে যখনই বিপথগামিনী করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই দেবগণ (জগৎ-পরিচালন-ব্যাপারে) হস্তক্ষেপ করিয়া সামঞ্জস্য নিয়মিত করিয়াছেন। তখন জগৎ আবার ঠিক্ পথে চলিয়াছে। কখন কখন উন্নতি-চক্রনিকর পার্থিব কর্দ্দমে এরূপ কঠিন ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে, দেবগণ উহাদিগকে কিছুতেই কর্দ্দম-মুক্ত করিতে পারেন না। তখন ভগবান্চন্দ্র "অবতার" হইয়া ভূমণ্ডলে আগমন করেন। তাঁহার আবির্ভাবে সকল বিঘ্নই বিদূরিত হইয়া যায়। পৃথিবী আবার বিবর্ত্তনের সকল সোঁজা পথে চলিতে থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই ধর্ম্ম-(সামঞ্জস্য)-সংস্থাপন করিবার জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি। (যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥—৪র্থ অঃ)।

অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ।

যখন ভগবান্ চন্দ্র নিজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত দেবগণও সঙ্গে ২ অবতীর্ণ হয়েন। এরূপ সহায়তা করা তাঁহাদের একটী কার্য্য। তাই হিন্দু-শাস্ত্র বলেন—ভগবান্ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়া দেখা দেন। তাই আমরা রামায়ণে পড়িয়া থাকি যে বিষ্ণু রামরূপে অবতীর্ণ হইলে বিস্তর দেব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে স্বীয় ২ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রই ইহাঁদের কেন্দ্রস্থানীয়। আবার যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও বিস্তর দেব তাঁহার অনুচর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মই প্রধান অনুচর। ইনি নির্ভীক যোদ্ধা, সত্যবতী-পুত্র, মুর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। ইনি অষ্টবসুর একজন বসু। বিদুর আর একজন অনুচর। ভাগবত পুরাণ বলেন—স্বয়ং যমই এই বিদুররূপে অবতীর্ণ। ব্যাস আর একজন অনুচর। এই অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি মহাভারত রচনা করেন। ইনিই বেদের সঙ্কলন-কর্ত্তা। ইনিই পুরাণের সম্পাদক। কথিত আছে, ইনিই পুরাকালীন অপন্তরতম (Apantaratama) ঋষি। ইনি ভগবানের সহিত লীন হইয়াছিলেন, পরে ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ও তাঁহার পার্থিবলীলা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবচ্ছরীর হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকার্য্যে পঞ্চপাণ্ডবও প্রধান সহচর। মহাভারত বলেন, এই পঞ্চপাণ্ডব, বিগত পঞ্চকল্পের পঞ্চ ইন্দ্র।

দৃশ্যমান অবগুণ্ঠনের অন্তরালে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, বিশ্বে সাতটী লোক। এক ২ জন ঈশ্বর, এক ২ লোকের অধিপতি। অতএব সপ্তলোকে সাতটী মহান্ ঈশ্বর। ইহাঁদের প্রত্যেকের অধীনে আবার অনেকগুলি দেব আছেন। এই সকল দেব, উহাঁদের মন্ত্রিত্ব করেন ও উহাঁদের ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব প্রতি দৃশ্য ব্যাপারের অন্তরালেই এক ২ জন দেব কার্য্য করিতেছেন। যেখানেই একটু অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, যেখানেই একটী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যেখানেই একটী আলোকরশ্মি অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া চলিতেছে, যেখানেই একটু মারুত-হিল্লোলে ব্যোম-পদার্থ উদ্বেলিত হইতেছে, যেখানেই বজ্র-নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেখানেই দেবের কার্য্য বিদ্যমান, ঐ ঐ দ্রব্য অবগুণ্ঠনস্বরূপ। উহাদের অন্তরালে অবস্থান করিয়া দেবগণ কার্য্য করিতেছেন।

পুরাকালীন ঋষিগণ এই তথ্য অবগত ছিলেন। তাই তাঁহারা অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির স্তোত্র রচনা করিয়া উহাঁদের স্তব করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্তোত্রনিচয় বেদে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই যে বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে, আমরা ইহার অন্তরালে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু ঋষিগণ ইহার অন্তরালে অগ্নি-দেবতাকে দেখিতে পাইতেন। বর্ত্তিকার আলোক, বিদ্যুদালোক বা হুতাশন-এতাবৎসমস্তের অন্তরালে অগ্নিদেব বিরাজ করিয়া কার্য্য করেন। ঋষিগণ সেই অগ্নিদেবকে সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সামীপ্য-লাভার্থ উপযুক্ত যাগ-যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

মানব-গুরু।

মানবের মধ্যে যাঁহারা সমধিক উন্নত, তাঁহাদিগকে সুপথে পরিচালন করা ও সদুপদেশ প্রদান করা, দেবগণের আর একটী প্রয়োজনীয় কার্য্য। একার্য্যও তাঁহারা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকারবলে উন্নতির একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রমে উপনীত হইলেই দেবগণ আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করেন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। তাই আমরা বিষ্ণুপুরাণে পড়িয়া থাকি যে, সপ্তর্ষি (ভাগবতপুরাণের পুরাণের মতে নারদ) বালক ধ্রুবকে তপস্যা-রহস্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদেও আমরা দেখিতে পাই যে, ঋষিপুত্র জাবাল বাল্যকালেই অগ্নিদেবের নিকটে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্রূপ, কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই যে, যম ভক্ত নচিকেতাকে জন্ম-মরণ-বিষয়ক নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এবম্প্রকার ভূরি ২ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। আমার মনে হয়, কবিবর মিল্‌টন এই তথ্য অবগত ছিলেন। তাই তিনি "স্বর্গ-চ্যুতি (Paradise Lost) কাব্যে দেখাইয়াছেন যে, দেবযোনি গেব্রিয়েল্ আদি-মানব আদমকে কিছু সৃষ্টি-রহস্য বুঝাইয়া দিতেছেন। এই আদমই মানব-জাতির আদর্শস্থল। এতদুপাখ্যানে সাধকবৃন্দ বেশ একটু উৎসাহ পাইতে পারেন। কেন না, এতদ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, সাধন-মার্গের প্রত্যেক ক্রমেই তাঁহারা উপযুক্ত গুরুর সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ। এই সকল গুরু তাঁহাদিগকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় পরিচালন করিতে প্রয়াসী।

দেবগণ ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিচালক।

ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যক্ষম করাও দেবগণের আর একটী কর্ত্তব্য। যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যোমকম্পনে সম্বিত্তির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, দেবগণই তাহার মূলীভূত

কারণ। তাই ঈশা-উপনিষদে ইন্দ্রিয়গণকে "দেব" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উহার একস্থলে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ঐ দেবগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ অগ্রগামী বিধাতার সমীপে উপনীত হইতে পারিল না।—(নৈনদ্ দেবাঃ প্রাপ্নুবন্ পূর্ব্ব-মর্ষৎ।) এখানে দেব অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। ঐতরেয় উপনিষদে গূঢ়ার্থক পদাবলি বিদ্যমান আছে। তাহা এইঃ—দেবগণ মানবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া মানবের ইন্দ্রিয়ে পরিণত হইলেন। অগ্নি বাগ্‌রূপী হইয়া মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বায়ু শ্বাসরূপী হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য দৃষ্টিশক্তিরূপী হইয়া চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইলেন। আকাশ শ্রবণশক্তিরূপে কর্ণে প্রবেশ করিলেন। ওষধি-দেবগণ লোমরূপে চর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্র মন-রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। যম নিম্নগামী বায়ু-রূপে নাভিতে প্রবিষ্ট হই-লেন। জল বীজ-রূপে শিশ্নে প্রবেশ করিলেন।—(ঐতরেয় উপনিষদ্, ১ম অঃ, ৪)। "দেবগণ সূক্ষ্ম-জগৎচারী জীব। ইহাঁরা ভৌতিক জগতের দৃশ্যাবলীর অন্তরালে থাকিয়া মানুষের সূক্ষ্ম-দেহ গঠন করিয়া থাকেন। ঐ সূক্ষ্ম-দেহেই ইন্দ্রিয়-কার্য্যের সূত্রপাত ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টি-শক্তি হইতেই চক্ষুরিন্দ্রিয়; শ্রবণ-শক্তি হইতেই কর্ণ-ইন্দ্রিয়; বাক্-শক্তি হইতেই রসনা-ইন্দ্রিয়; স্পর্শ-শক্তি হই-তেই ত্বগিন্দ্রিয় উদ্ভুত হইয়াছে। দেবগণই ঐ সকল আভ্যন্তরীণ শক্তি-কেন্দ্রের জনক। উহাঁরা যাবতীয় অনুভূতির নিয়ামক। উহাঁরাই মানব-শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সম্বিত্তি-শক্তি প্রদান করেন।"—("আত্মার পর্য্যটন" গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জার্ম্মন্ কবি গেটে বলিয়াছেন যে, সূর্য্য চক্ষুর সহিত সংস্থষ্ট আছেন বলিয়াই আলোক-পদার্থে সাড়া দিবার শক্তি চক্ষুতে স্ফুরিত হইতেছে। এই কথায় মনে হয়, কবিবর গেটে উপনিষদের প্রাগুক্ত কথাগুলির সংকেত উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন)। দেবগণই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন-শক্তি ও কি পরিমাণ স্পন্দনে কোন ইন্দ্রিয় সাড়া দিবে, তাহার স্থিরতা করিয়া দিয়াছেন। একটী উজ্জ্বল বস্তু চক্ষুর্গোচর হইলে মস্তিষ্কের সংবিত্তি-কেন্দ্রে (Sensoriam) কতকগুলি স্পন্দন উদ্‌ভূত হইতে থাকে। ঐ স্পন্দনগুলি আলোকানুভূতিতে কিরূপে পরিণত হইয়া থাকে? বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিশেষ বিশেষ দেবের সংস্রব আছে। ঐ দেবের সাহায্যেই তাদৃশী পরিণতি ঘটে। দেবের সংস্রব ব্যতীত ঐ প্রকার একটা বাহ্য ভৌতিক স্পন্দন কখনই একটা আভ্যন্তরীণ মনোরাজ্যের জ্ঞান-চৈতন্যে পরিণত হইতে পারিত না। তাহা হইলে ভৌতিক স্পন্দন চিরকাল "ভৌতিক" হইয়াই থাকিয়া যাইত, কখনই জ্ঞানাবস্থায়

পরিবর্ত্তিত হইত না। আণবিক স্পন্দন ও মানসিক অনুভূতি এ দুয়ের মধ্যে যে একটা সংযোগ রহিয়াছে, তাহা দেবগণেরই কার্য্য। এই সংযোগ-বশতঃই জ্ঞান জিনিসটা মানুষের আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দেবগণ শরীর গঠন করিয়া দেন।

ধাতব, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব জগতের যাবতীয় বস্তুর আকার গঠন করা দেবগণের অন্য একটী কার্য্য। আমরা প্রথমে ধাতব বস্তুর আলোচনা করিব। আমরা শুনিয়াছি যে, দেবগণই আকরিক পদার্থের আকার নিরূপণ করেন। ঐ পদার্থের বুকনি বা দানাগুলি এতদ্রাজ্যে তাঁহাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট কৃতি। খনিজ পদার্থের একটী দানা লইয়া যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে উহার গঠন-সৌন্দর্য্য ও সুক্রমিকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ না হইয়াই থাকিতে পরি না। আমরা যদি স্বভাবতঃ অনুসন্ধিৎসু হই, তবে ঐ ক্ষেত্রে আমাদিগের মনে হইবে যে, এরূপ সুন্দর গঠন কি করিয়াই হইল? অধ্যাপক টীন্‌ড্যাল্ (Professar Tyndal) এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন শুনা যাউক্। অধ্যাপক তদীয় ম্যান্‌চেষ্টার বক্তৃতার ষষ্ঠ ধারায় দানা-গঠন-ব্যাপারে আণবিক-স্থপতির কার্য্য সম্বন্ধে একটু কৌতুক-রসের সহিত এইরূপ বলিয়াছেন:— "অণুর পর অণু, দ্ব্যণুর পর দ্ব্যণু সংযুক্ত হইতে থাকে। পরমাণুর এই সংহতি অদৃষ্ট-ঘটিত নহে, বা এই সংযোগের সময়ে প্রচণ্ড শব্দও উত্থিত হয় না। ইহা নীরবে ও যথাযথ সৌষ্ঠবের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজমিস্ত্রীরা অতি সাবধানে প্রস্তর বা ইষ্টক সজ্জিত করিয়া অট্টালিকাদি গাঁথিয়া থাকে। পরমাণু-সংযোগ ব্যাপারে তদপেক্ষাও সাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়।" দানা-গঠন-কার্য্যের বিস্ময়কর প্রণালীটী বলিতে যাইয়া তিনি ফুলের উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেন, একটী ফুল কেমন আস্তে আস্তে প্রসারিত হয়; মনে কর, ফুলটীর ছয় দল, ছয়টী দলই কেমন সুন্দর ভাবে, এক মাপে বৃদ্ধি পায়! দলগুলির প্রান্তভাগ কেমন কুঞ্চিত। ইহাতে প্রকৃতির কত যত্ন, কত নৈপুণ্য, কত সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্য-বোধ প্রকাশ পায়। একখানি সাধারণ বরফখণ্ডের নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যও ঐ প্রকার বিস্ময়কর।" এখন কথা হইতেছে এই যে, যখন দেবগণই এই জগতের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক জগতের ক্রমোন্নতির নিয়ামক, তখন প্রাগুক্ত শিক্ষা-নৈপুণ্য ও যত্নাদি দেবগণের না হইয়া আর কাহার হইতে পারে?

তাহার পর, উদ্ভিদ্ জগতের কথা ভাবিয়া দেখ। উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে তুমি নানা প্রকার গাছ-গাছড়া, নানা প্রকার বর্ণ, গন্ধ,

বিন্যাস, আকার জানিতে পারিবে। বৃক্ষাদি এতগুলি ব্যাপারের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, উদ্ভিদ্ জগতে যে সমুদয় উদ্ভাবনা, বিস্ময়কর যোজনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার সংঘটন করে কে? উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্গণ যে সমুদয় অদ্ভুত ব্যতিক্রমকে "স্বেচ্ছা-প্রসূত ব্যতিক্রম" বলিয়া অভিহিত করেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহার জন্য দায়ী কে? অন্ধ প্রকৃতি নিজেই কি ঐ সকলের ফলাফল পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে জড়তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছে, সে ব্যক্তি কখনই প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে না।

ক্ষণেক ভাবিয়া দেখ, কি প্রতিভান্বিত কৌশল-বলে বৃক্ষাদির রেণুজ-সঙ্গম ও উৎপত্তি সংঘটিত হয়! কি সুন্দর কৌশলে এমন স্থানটীতে ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চিত থাকে, যেখানে মধুকরকে যাইতে হইলেই পরাগমণ্ডিত হইতে হয়। পরে মধুকর মধুপান করিতে ফুলে ফুলে বেড়াইতে যাওয়ায় ঐ পরাগ অন্য ফুলে নীত হয়। যে পাঠক উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পরিজ্ঞাত নহেন, তিনি যাহাতে বিষয়টী ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তদভিপ্রায়ে আমি উদ্ভিদ্-বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

গ্রাণ্ট্ অ্যালেন্ (Grant Allen) বলিয়াছেন যে, পুষ্পের মধ্যেই স্বামী স্ত্রী আছে। তাহাদের হইতেই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর গাছ গুলিতে কোন প্রকার দাম্পত্য চিহ্ন নাই। কিন্তু বিস্তর উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-নিদর্শন, পশু-পক্ষীর স্ত্রী-পুরুষ চিহ্নের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে পৃথগ্‌ভূত। আবার কতকগুলি বৃক্ষে দেখা যায় যে, একই গাছে স্ত্রী-পুরুষ উভয় চিহ্নই মিশ্রিত। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি হইয়া বৃদ্ধি পায়। জীব জন্তুর পক্ষে উৎপত্তির যে বিধি, উদ্ভিদের পক্ষেও তাই। পুং-কোষ ও স্ত্রী-কোষ সংযুক্ত হইবার আবশ্যক; হইলে, নূতন একটীর জন্ম হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষে আবশ্যকীয় ইন্দ্রিয়গুলি বিদ্যমান আছে। উহাদের পুং-কেশর বা পরাগকেশর আছে, তাহাতে পরাগ উৎপন্ন হয়। গর্ভকেশর আছে, তাহাতে স্ত্রী-কোষ উৎপাদন করে। এই স্ত্রী-কোষে পরাগ প্রবিষ্ট হইলেই স্ত্রী-কোষ গর্ভযুক্ত হইয়া সন্তান উৎপাদন করে। উদ্ভিদ্-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থেও তাই বলিয়াছে যে "বৃক্ষোৎপাদন সংঘটিত হইতে হইলে পুং-কেশরের পরাগাধার হইতে পরাগ-দানা গুলিকে স্খলিত হইয়া গর্ভ-কেশরের সুপক্ক অগ্রভাগে সংযুক্ত হইতে হইবে। এইরূপ সংযোগ ঘটিলে, পরিপক্ক পরাগ-দানাগুলির অঙ্কুরোৎপত্তি

আরম্ভ হয়। তখন উহাদিগের ক্ষীণ শিরা গর্ভ-কেশরের ডিম্বকোষে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। পরাগ-দানার উপাদান গুলি ডিম্বকোষে প্রবেশ করিলেই একটী আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটে। পরাগের সেই ডিম্বাকৃতি জিনিসটী পরিবর্ত্তিত হইয়া তখন একটী বীজের আকার ধারণ করে। এই বীজটীর মধ্যেই একটী ভ্রূণ অর্থাৎ একটী তরু-শিশু অবস্থান করিয়া থাকে। গর্ভাশয় তখন অবিলম্বে পরিপুষ্ট হইয়া "বীজাধার" নাম ধারণ করে। বীজগুলি যথা সময়ে পুষ্ট ও পক্ক হইলেই গর্ভাশয় হইতে স্খলিত হইয়া থাকে।"

প্রাণি-তত্ত্বের একটী সুবিখ্যাত তথ্য এই যে, একই রক্তে পুনঃপুনঃ বিবাহ হইলে তাহার ফলে রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান প্রসূত হইতে থাকে। হিন্দুগণ এই নিমিত্ত সগোত্র-বিবাহের পরিপন্থী। "নবীন রক্তের অন্তর্বিধানে" অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ সন্তান জন্মিয়া থাকে। এই তথ্যটী প্রাণি-জগতে ও উদ্ভিদ্-রাজ্যে তুল্যরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। তাই বলিতেছি, একই গাছে মনে কর, পুংপুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প জন্মিল। উহাদিগের সম্পর্ক ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় হইল। ঠিক ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় না হইলেও উহারা যে খুব নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে উহাদের নিজের পরাগ, নিজের গর্ভ-কেশরে পতিত হওয়ায় গর্ভোৎপত্তি হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। এই কারণেই "রেণুজ সঙ্গম ও উৎপত্তি" ব্যাপারটী আবশ্যক হইয়া উঠে। এক বৃক্ষের পরাগ অন্য বৃক্ষে নীত হওয়া উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয়। উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষে নিজের পরাগ, নিজের গর্ভ-কেশরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভোৎপাদন না করিতে পারে, উহা অন্যের সহিত সঙ্গমে সমর্থ হয়, এরূপ কৌশল উদ্ভাবিত হওয়া আবশ্যক।

প্রকৃতি এরূপ সহবাসের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কীট, পতঙ্গ ও কখন কখন বোল্‌তা দ্বারা এই ব্যাপার ঘটান হয়। ফুলের রঞ্জিত দল গুলিকে পারিভাষিক ভাবে পুষ্প-ভাণ্ড বলে। ঐ গুলিই ভড়ংপূর্ণ ঘোষণা। উহা দ্বারাই পতঙ্গাদিকে প্রলুব্ধ করিয়া আনা হয়। তাহা ছাড়া, উহাদিগকে উৎকোচ দিবারও ব্যবস্থা আছে। এই উৎকোচ সুমিষ্ট মধু। উপযুক্ত স্থানে ইহা সঞ্চিত থাকে। পতঙ্গাদি প্রলুব্ধ হইয়া ফুলে ফুলে বিহার করে, তখন পরাগে তাহাদের মস্তক ও পদগুলি মণ্ডিত হইয়া যায়। যখন উহারা অন্য ফুলে যায়, তখন সেই পরাগ ঐ ফুলের গর্ভকেশরের আটাল অগ্রভাগে যাইয়া সংযুক্ত হয়। গ্রাণ্ট অ্যালেন্ তদীয় "উদ্ভিদ্ কাহিনী" পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, "রেণুজ সহবাস

ও উৎপত্তি ব্যাপারটী হিতকর দেখিয়া বৃক্ষগণ পতঙ্গাদিকে স্ব স্ব ফুলের পাপ্‌ড়ী নামক সমুজ্জ্বল-বর্ণ-বিশিষ্ট মুগ্ধকারী বিজ্ঞাপন দ্বারা যথাসময়ে আকৃষ্ট করিতে ও স্ব স্ব পুংকেশর এবং গর্ভকেশরের সন্নিকটে মধু সঞ্চিত রাখিতে প্রবৃত্ত হয়।" ভূমিচম্পক প্রভৃতি ফুলের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, এই ফুল গাছগুলি কীট-সাহায্যে রেণুজ সহবাস ও উৎপত্তি বিষয়ে এত অধিক কৌশল প্রদর্শন করে যে, উহার সম্যগ্ বিবরণ দেওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। উহাদের বিষয় বলিতে গিয়া তাঁহার জিহ্বা শতমুখী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "এই জাতীয় গাছগুলি অদ্ভুত কৌশল-বলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে।" ভূমিচম্পক গাছের রেণুজ সহবাস, উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে ডারউইন্ অদ্ভুত পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছেন। গ্রাণ্ট অ্যালেন্ পাঠকবর্গকে ঐ পুস্তক পাঠ করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন "উহা পাঠ করিলে ঐ গাছের সুন্দর কৌশলগুলি অতি পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।" অবশ্য তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে "গাছ কৌশল প্রদর্শন করিলেও নিজের কার্য্য নিজে বুঝিতে পারেনা; উহা অসাড় কার্য্যকারক।" কার্য্যকারক অসাড়ভাবে কিরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই।

বৃক্ষগণের মধ্যে সগোত্র-বিবাহ নিবারণ-কল্পে প্রকৃতি আর একটী কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। কৌশলটী এই:—যে বৃক্ষে পুংপুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প দুইই জন্মায়, সেখানে পুংপুষ্পের পরাগ-কেশরগুলি প্রথমে পরিপক্ক হয়, গর্ভকেশরের বিকার্য্য বাহ্যাবরণটী পরে কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে কিম্বা গর্ভকেশরের অগ্রভাগই প্রথমে পুষ্ট হয়, পরে পুংকেশর উপযুক্ত হইয়া উঠে। "কুকুপিণ্ট" (Cuckoopint) নামক বাসন্ত পুষ্পে এই অদ্ভুত ব্যাপারটী ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতি উদ্ভিদ্ রাজ্যে অতীব সুন্দর কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাহাতে আমার পাঠকবর্গ সেইগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, আমি তদুদ্দেশ্যে ঐ ফুলটীর একটু বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ পার্সিভ্যাল ওয়েষ্টেল্ (Mr. Percival Westell) এই ফুল গাছ সম্বন্ধে একখানি সম্বাদপত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই কথা উদ্ধৃত করিব। কথাগুলি এই:—"বসন্ত-কালে এই গাছ একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। ইহার ফুলের মঞ্জরী-ছদটী খুলিলেই সম্ভবতঃ দেখিতে পাইবে যে, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট মঞ্জরীর ঠিক মূলে গর্ভকেশরের অতি নিকটে লুক্কায়িত রহিয়াছে। একটী গাছে শতাধিক ক্ষুদ্র কীট পরিদৃষ্ট হইয়াছে! এই কীটগুলি মঞ্জরীচ্ছদের ভিতরে ধীরে ধীরে

প্রবেশ করিয়া ক্রমেই নিম্নগামী হয়। সূত্রবৎ আদিম পুং-কেশর ও অনুৎপাদক গর্ভকেশরগুলি উহাদিগের গমনে বাধা উৎপাদন করে না; কেন না, ঐ কেশরগুলির অগ্রভাগ অধিকাংশই নিম্নাভিমুখী। এই কারণে নিম্নদিকে যাইবার সময়ে কীটগুলির বাধা হয় না বরং যাইবার পথ একটু সুগমই হইয়া উঠে। মঞ্জরীর মূলদেশে উপনীত হইয়াই উহারা ঊর্দ্ধদিকে আবার উঠিতে থাকে। তখন সেই অনুৎপাদক গর্ভকেশর ও আদিম পুংকেশর উহাদিগকে বাধা প্রদান করে। এই সময়ে কীটগুলি বুঝিতে পারে যে, তাহারা বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। তখন তাহারা আবার নিম্নদেশে গমন করে। করিয়া, সেই পাত্রাকার ক্ষুদ্রস্থানে স্থির হইয়া থাকে। তোমার মনে হইতে পারে, তথায় যাইয়া থাকে কেন? কারণ এই প্রকৃতির ব্যবস্থা এই যে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলিকে ঐ বৃক্ষ-উৎপাদন ব্যাপারে প্রধান কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে পুংকেশরের পরাগাধার পরিপক্ক হইয়া উঠে; পরাগ ঐ কীটগুলির গাত্রোপরি পতিত হয়। যে কেশবৎ পদার্থ উহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঠিক এই সময়েই শুষ্ক ও বিশীর্ণ হওয়ায় ঐ কীটগুলি মঞ্জরীচ্ছদ বা মঞ্জরী বাহিয়া উপরদিকে উঠিয়া থাকে; উঠিয়া মুক্ত হইয়া পড়ে। তাহার পরে উহারা কি করে? উহারা ত্বরায় নিকটবর্ত্তী অন্য একটী "কুকুপিণ্ট" পুষ্পবৃক্ষে যাইয়া উঠে। উহার ফুলের মঞ্জরী-চ্ছদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মূলদেশে যাইয়া উপস্থিত হয়। তত্রত্য গর্ভ-কেশরগুলি মূল্যবান্ পরাগপুঞ্জ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুতই থাকে। যখন কীটগুলি উহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তখন উহাদের গাত্র হইতে পরাগগুলি স্খলিত হইয়া গর্ভকেশরে পতিত হয়; হইবামাত্র, উহা গর্ভ-কেশরের অগ্রভাগে আবদ্ধ হইয়া যায়। তখনই গর্ভোৎপত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে।"

আর একটী উদাহরণ দেখ। "ফিগর্ট" (English Figwort) পুষ্পের বিষয় একটু চিন্তা কর। এই পুষ্প অতীব বিস্ময়কর। ইহার বর্ণ ঈষৎ লাল ও বেগুনে; পাণ্ডুরবর্ণ বলিলেও চলে। ইহার গঠন শিরস্ত্রাণের ন্যায়। ইহার উৎপাদনক্রিয়া, বোল্‌তা দ্বারাই খুব বেশী সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার আকার ও গঠন বোল্‌তার মস্তকপ্রবেশের ঠিক উপযোগী। বৎসরের যে সময়ে খুব বেশী পরিমাণে বোল্‌তা জন্মে, ঠিক্ সেই সময়ে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন যে, বোল্‌তা প্রাণীটী মাংসাশী ও সর্ব্বভুক্। তাই উহাকে লোভাকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত "ফিগর্ট" পুষ্প যতদূর

সম্ভব মাংসপূর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহা হইতে পর্য্যুষিত মেষ-মাংসের ঘ্রাণও বাহির হইতে থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, বিশেষ উদ্দেশ্যেই পুষ্পাভ্যন্তরে মধু সঞ্চিত থাকে। মধুপগণ মধুর লোভে ফুলে ফুলে বিচরণ করে. তাহাতে পুষ্পগণের রেণুজ সঙ্গম ও উৎপত্তি ঘটে। উহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ফুলে আনিবার জন্যই মধুর সঞ্চার। উহাদিগকে আনাই উদ্দেশ্য। উহ'রা ফুল-দলের বর্ণ ও গঠন দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া থাকে। উহারা এক সময়ে একই প্রকারের মধু পান করে; মিশ্রিত মধু পান করে না। তাহা হইলেই পিপীলিকা ও অন্যান্য নিঃশব্দপদসঞ্চারী জীবকে দূরে রাখিবার প্রয়োজন। এই গুপ্ত চোরগণ যাহাতে মূল্যবান্ মধুরত্ন অপহরণ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে পুষ্পবৃক্ষগুলি সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠতর কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। যে সকল গাছে পুষ্প-বৃন্তগুলি দীর্ঘ, তাহাদের ঐ বৃন্তগুলিতে পুষ্প-চ্ছদে শূক্ আছে। তজ্জন্য ঐ রত্নটী অনেকটা নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে। শূকযুক্ত দীর্ঘবৃন্ত অতিক্রম করাও সহজসাধ্য নহে। কিন্তু যেখানে বৃন্তগুলি দীর্ঘ নহে, সেখানে মাত্র শূকে মধু নিরাপদ্ হইতে পারে না। তাই সেখানে পুষ্পটী প্রস্ফুটিত হইলেই পুষ্পচ্ছদটী বিভক্ত হইয়া বৃন্তটীর সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিতে এরূপ-ভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়ে যে, উহাকে তখন বড় "গল্দা চিংড়ী"র মাথার মত দেখায়। সেই স্থানে কোন তস্করকীট প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না।

এখানে আমরা পরিষ্কাররূপে দেবহস্ত দেখিতে পাই। কেন না, এই সব স্থলে দেবগণের কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিলে প্রাগুক্ত কৌশলগুলি একেবারেই অব্যাখ্যেয় হইয়া পড়ে।

প্রাণি-জগতেও ঐরূপ বিস্তর কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানেও আমরা প্রকৃতি-নিয়োজিত "বিপদুদ্ধারক পরিবর্ত্তন" দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। কীটগণ যে গাছের পত্রাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, উহাদের গায়ের বর্ণ ঠিক্ সেই আহার্য্য বস্তুর ন্যায় করিয়া সৃষ্ট। যে সকল পক্ষী উহাদিগকে শীকার করিয়া বেড়ায়, ঐ নিমিত্তই উহাদের উপর তাহাদের নজর পড়ে না। বৃক্ষ-পত্রের যেরূপ বর্ণ, অনেক পক্ষীর পালকের বর্ণও ঠিক্ তদ্রূপ। এই উপায়ে ঐ সকল পক্ষী পত্রাবলীর মধ্যে আশ্রয় পাইয়া থাকে। অনেক সর্পের গায়ের রঙ, বৃক্ষ-শাখা বা ঘাসের বর্ণের ন্যায়। এই কারণে ঐ সব স্থানে অবস্থান করিয়া উহারা শীকার সংগ্রহ করিবার সুবিধা পায়। অনেক মৎস্যের বর্ণ তীরভূমির

বর্ণ-সদৃশ। ইহারা তীরদেশে প্রচ্ছন্ন থাকিবার সুবিধা পায়। কিন্তু যতপ্রকার রক্ষাপ্রদ পরিবর্ত্তন আছে, তন্মধ্যে পক্ষীর অনুকরণই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও বিস্ময়জনক। বিহঙ্গ-বিদ্যা-বিদ্‌গণ বলেন, দুর্ব্বল ও অরক্ষিত পক্ষী, বলবান্ পক্ষীর বর্ণ ধারণ করে। ইহাকেই অনুকরণ বলে। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, কোকিল অনেক সময় বিস্ময়কর অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহাদের কোন ২ জাতির বর্ণ ঠিক্ রাজপক্ষীর বর্ণের ন্যায়; আবার কতকগুলির রং "লড়াইয়ে পাখী"র রঙের মত। এতদ্বিষয়ে ওয়ালেচ্ (Wallace) তদীয় "ডারউইনি মত" পুস্তকের ২৬৩—৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

শাকুন অনুকরণের মধ্যে মালয়দ্বীপপুঞ্জের মেটে রঙের সুবর্ণ-পক্ষীর (Oriole) ও ফকীর পক্ষীর (Friar-Birdএর) অনুকরণ ব্যাপারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই ফকীরের দল খুব বেশী পরিমাণে মধুপান করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত পক্ষী অর্থাৎ ফকীরের দল ভয়ানক কোলাহলকারী। ইহাদের ঝাঁকও ক্ষুদ্র। + + সুবর্ণ পক্ষীগুলি দুর্ব্বল ও ভীরু। ইহারা পলাইয়া ২ শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করে। অষ্ট্রীয়া-অধিকৃত মালয়-প্রদেশস্থ দুইটী বৃহৎ দ্বীপেই ফকীর পক্ষীও সুবর্ণ-পক্ষী আছে। ঐ স্থানের সুবর্ণ-পক্ষীগুলি অবিকল ফকীর গুলির বর্ণ ধারণ করিয়া বিচরণ করে।"

চার্লস্ ডিক্‌সন্ (Charles Dixon) তদীয় "পক্ষি-কাহিনী" পুস্তকের ১৯৯ পৃষ্ঠায় ঠিক্‌ই বলিয়াছেন যে, দূরসম্পর্কীয় পক্ষীর মধ্যে যে বর্ণানুকরণ ব্যাপারটী দৃষ্ট হয়, তাহা যেন অনুকরণকারীর অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার সময়ে পক্ষিগণের বিপদুদ্ধারক বর্ণ ও সাদৃশ্যের বিষয় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। প্রাগুক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন ঃ—"সকল প্রকার ছদ্মবেশেই আমরা দেখিতে পাই যে, পক্ষিগণ নানাপ্রকার রক্ষাপ্রদ পরিবর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। শুধু যে লুক্কায়িত থাকিবার জন্যই উহারা ঐরূপ করে তাহা নহে। অনেক সময়ে উহারা চুপে ২ অতি সহজে শীকার করিবার নিমিত্তও ঐরূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া থাকে।" কতকগুলি পক্ষী মরুভূমিতে বাস করে। উহাদের শরীর পালকে আবৃত। উহাদের পালকের বর্ণ ঠিক্ উহাদের বাসোপযোগী মৃত্তিকার বর্ণের ন্যায়। উহাদের বিদ্যমানতা সেইজন্য হঠাৎ জানিতে পারা যায় না। কাদা-খোঁচা জাতীয় "প্লভার"ও "স্যাণ্ডপর্ পর্" নামক জলকুল-বিহারী পক্ষী সৈকততীরে ও কর্দ্দমাকীর্ণ ভূ-খণ্ডে বিচরণ করে। যে স্থানে উহারা থাকে, সেই স্থানের দ্রব্যাদির বর্ণ ও উহাদের গাত্র-বর্ণ অবিকল

একরূপ। অনেক কচ্ছচারী পক্ষীর গাত্রবর্ণ ঘাস বা ভাল উদ্ভিদের কালি-সদৃশ পত্রের বর্ণের ন্যায়। পাখীটী দেখিলে মনে হয়, ঘাসের পাতা। অতি সুন্দর সাদৃশ্য। কোথাও বা উহাদের পালকগুলি পীত বর্ণ, কোথাও বা পিঙ্গল বর্ণ। এই কারণে আনূপ উদ্ভিদের পীতবর্ণ পত্রের বা পিঙ্গলবর্ণ ডাঁটার মধ্যে উহারা বেশ লুক্কায়িত থাকিতে পারে। তখন উহারা যে সেখানে আছে, তাহা টের পাওয়া যায় না। এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই প্রাগুক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, পক্ষিদিগের ঐরূপ উদ্ভিদাদির সহিত বর্ণ-সাদৃশ্য আছে বলিয়াই উহারা রক্ষা পাইয়া থাকে। শত্রুর নিকট হইতে বাঁচিবার জন্য উহাদের পলাইবার বেশ একটা প্রবৃত্তি দেখা যায়। যেখানে উহাদের বর্ণটা বেশ খাপ্ খায় সেইখানে যাইয়া বসে কিম্বা গুঁটীসুঁটী হইয়া মাটীতে বা গাছের গুঁড়ীতে বা বালুকার উপর বা ঐরূপ কোন বস্তুর নিকটে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মোটেই নড়ে চড়ে না। যখন শত্রু চলিয়া যায়, আর বিপদের আশঙ্কা নাই দেখে, তখনই নড়ে। ঐরূপ ঘটনায় উহারা সাধারণতঃ প্রস্তর, মৃত্তিকাখণ্ড, বৃক্ষত্বক্ গর্ত্ত, পত্রস্তূপ, কিম্বা চতুর্দ্দিকস্থ উদ্ভিদের ডাঁটা ও পত্রপুঞ্জের সহিত এরূপ সুন্দরভাবে মিশিয়া থাকে যে উহা-দিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

স্যর্ জন্ লুবক্ (Sir John Lubock) কীট-পতঙ্গের বুদ্ধি-কৌশল সম্বন্ধে একটী চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একজন পর্য্যটক আমেরিকার জঙ্গলে একটী বৃক্ষশীর্ষে একটী সুন্দর পুষ্প দেখিতে পান। তিনি উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ও চয়ন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফুলটী অন্তর্হিত হইল! কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সেই ফুলটী আদৌ কোন ফুল নহে। গাছটীর অগ্রভাগে অসংখ্য পতঙ্গ সমবেত হইয়া একটী সুন্দর পুষ্পের আকারে সজ্জিত হইয়াছিল। শত্রুকে প্রতারিত করাই উহাদের উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারের মূলে যদি দেব-কার্য্য না থাকে, তবে অসংখ্য ক্ষুদ্র ২ পতঙ্গ পুষ্পাকারে সজ্জিত হইয়া শত্রুকে প্রতারিত করিতে পারে, ঈদৃশী চিন্তা ও বুদ্ধি উহাদের কোথা হইতে আসিল, তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কৌশল, পতঙ্গ জাতিরই বুদ্ধি-প্রসূত, এই কথা বলিয়া পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, ঘটনাটির একটা উপস্থিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু ঈদৃশী ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই নহে। আমাদিগের শাস্ত্রে বলেন, দেবগণ শুধু যে মানব-ক্রমোন্নতির সহায় তাহা নহে, তাঁহারা খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগতেরও বিবর্ত্তন পরিচালন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যিনি অনর্পিতপূর্ব্ব, উন্নতোজ্জ্বলরসা ; স্বীয় ভক্তি-শ্রী প্রদান করিবার জন্য কৃপা করিয়া কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার দেহকান্তি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন। পাঠক মহোদয়গণ, এবিষয় লিখিয়া বুঝাইবার নহে ; ইহা হৃদয়ের ধন, অনুভবের সামগ্রী — "অনুভব নাহি যার বেদ্য নাহি হয় তার"—সে অনুভব অর্থ বর্ত্তমানকালানুমোদিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নহে, পূর্ব্বোক্ত সাধনলব্ধ ধন, সুতরাং ইহা কেহ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতে পারে না, সাধন ভজন করিয়া বুঝাইতে হয় ; কাজেই না বুঝিলে বুঝাইবার কথা নাই। তাই প্রেমসোমাসীমন্তমণি শ্রীমতী রাধিকা এক দিন বড়ই দুঃখে বলিয়াছিলেন ;—

"আমার বঁধূরে যে বলে কাল,　　তার নয়ন নহে নিরমল"

তিনি তাঁহার বঁধুকে যে নয়নে দেখিয়াছেন, সকলে সে নয়নে দেখে না কেন ? এই তাঁর দুঃখ। কিন্তু তিনি যে ভুল দেখা দেখেন নাই, তাহা কি কথা দিয়া লোককে বুঝাইবেন ? কথায় তাহা ব্যক্ত হয় না, তাই বলিলেন, আমি তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছি, যদি তাহা কাহারও দেখিবার সাধ থাকে তবে—

"সে আমার নয়ন নিয়া দেখুক্ গিয়া"
"সে কালো কি ভুবন আলো।"

আমার প্রাণের কথা যদি তোমার প্রাণে না থাকে, তবে তোমাকে তাহা কি দিয়া বুঝাইব ? আর তুমিই বা কি দিয়া বুঝিবে ? তাই বলিতেছিলাম— "অনুভব নাহি যার বেদ্য নাহি হয় তার"—

আমরা মোহান্ধ জীব, আমরা তাঁহার মর্ম্ম কি বুঝিব ! একে ঘোর কলিকাল, তাহাতে আবার স্বধর্ম্মানুকুল সমাজ-শক্তির অভাব, তাহার পর আবার বিজাতীয় শিক্ষা, বিজাতীয় আচার বিজাতীয় বিচার ! না আছে ব্রহ্মচর্য্য, না আছে গুরুগৃহে বাস, না আছে শিক্ষা, না আছে দীক্ষা ! আমরা যদি মহাপ্রভুকে চিনিতে পারিতাম, আমরা যদি তাঁহার মহামিলনের ভাব বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার মহাবাক্য—"ভারত-ভূমিতে জন্ম হইয়াছে যার, জন্ম সার্থক কর করি পর-উপকার"—ইহা গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে কি আ'জ আমাদের এই অধঃপতন—এই দুর্দ্দশা হয় ! যখন মহাপ্রভু প্রকট লীলা করিয়াগিয়াছেন ; তখনকার মত মহাধীশক্তিসম্পন্ন

মনীষী এখন কয়টি মিলে? বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায় অসাধারণধীশক্তি, দীধীতিকার রঘুনাথের ন্যায় অসীম প্রতিভা, স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দনের ন্যায় সুধীর মীমাংসা, বেদপঞ্চানন অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায় একাধারে জ্ঞান-ভক্তির গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন, সন্ন্যাসী গুরু প্রকাশানন্দের ন্যায় অসাধারণ বৈদান্তিক, কেশব কাশ্মীরীর ন্যায় সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতসম্রাট্, গোস্বামীপাদগণের ন্যায় নিখিলশাস্ত্র সার্ব্বভৌম এখন কয়জন আছেন? তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষাও মূর্খ ছিলেন? তাঁহারা কোন্‌গুণে কি মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া একটি অপরিণত-বয়স্ক বালকের পদমূলে মস্তক বিক্রয় করিলেন? তাঁহাদের শ্রীমুখের দুটি একটি সাক্ষ্য-বাদ শুনাইয়াই অদ্য আমি নিবৃত্ত হইব। তৎকালীন ভারত-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম কি বলিতেছেন শুনুন;—

সঙ্কীর্ত্তনারম্ভকৃতে হপি গৌরে।
ধাবন্তি জীবা শ্রবণেগুণানি ॥
অশুদ্ধচিত্তাঃ কিমুশুদ্ধচিত্তাঃ।
শ্রুত্বা প্রমত্তাঃ খলুতে ননর্ত্তুঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌর-হরি কীর্ত্তনারম্ভ করিলে তাঁহার গুণ-শ্রবণে উৎসুক হইয়া কেবল মনুষ্য নহে, নিখিল জীব ধাবিত হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! কি শুদ্ধচিত্ত, কি অশুদ্ধচিত্ত, কি মানব, কি দানব, কি পশু, কি পক্ষী, যে সেই মধুরাদপি মধুর জগদুন্মাদকারী নিখিলতাপহারী হরিনাম শুনিতেছে, সেইই অপূর্ব্ব প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া নাচিতেছে। মনুষ্য নাচিতেছে, স্থাবর জঙ্গম নাচিতেছে, হিংসা দ্বেষ বৈর ভুলিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ মুখোমুখী নাচিয়া নাচিয়া বনের পথে পথে সাথে সাথে ছুটিতেছে! পাঠকগণ, প্রবোধানন্দের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন:—

নযোগো ন ধ্যানং নচ জপতপস্ত্যাগ-নিয়মাঃ।
নবেদানাচারঃ ক্বনুবত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ॥
অকস্মাচ্চৈতন্যেঽহ বত রতিদয়া-সার-হৃদয়ে।
পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদালুণ্ঠতি জনঃ॥

যাঁহারা কখনও যোগাভ্যাস করেন নাই, ধ্যান করেন নাই, জপ করেন নাই, তপ করেন নাই, ত্যাগ করেন নাই, নিয়ম করেন নাই, এমনকি নিষিদ্ধ কার্য্য হইতেও বিরত হন নাই, এরূপ অধম পতিত জীবগণও সেই দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হইলে সকল পুরুষার্থের শিরোরত্ন প্রেমরত্ন লুটিয়া লইলেন। তাই চরিতামৃত বলিতেছেন;—

আপনি করি আস্বাদন,　　শিখাইল ভক্তগণ,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান,　　যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু,　　ব্রহ্মা না পায় বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
হেন দয়াল অবতার,　　হেন দাতা নাহি আর
গুণ কেহ নারে বলিবারে॥

গৌরলীলায় মন না ডুবিলে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া প্রেমময় হওয়া সুকঠিন। ভক্তিরসের সার শ্রীগৌরাঙ্গের দুটি চরণ; সেই ভবসম্পদ্ খাঙা চরণ দুটি হৃদয়ে ধারণ কর, দেখিবে, তোমার হৃদয় নির্ম্মল হইয়া যাইবে। ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন;—

গৌরাঙ্গের দুটিপদ,　　যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুরলীলা,　　যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

আবার ঐ দেখুন, সন্ন্যাসীগুরু প্রবীণ পণ্ডিত প্রকাশানন্দ মান অভিমানে, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যে, জলাঞ্জলি দিয়া কি বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া ঐ নবীন সন্ন্যাসীর পদমূলে লুণ্ঠিত হইতেছেন;—

মহা কর্ম্মস্রোতোনিপতিতমপি স্থৈর্য্যময়তে।
মহাপাষাণেভ্যোপ্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাং॥
নটত্যূর্দ্ধং নিঃ সাধনমপি মহাযোগিমনসাং।
ভুবিশ্রীচৈতন্যেঽবতরতিমনশ্চিত্রবিভবে॥

অহো! শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অবতীর্ণ হওয়ায় কি আশ্চর্য্য বৈভবই প্রকাশিত হইয়াছে! ঐ দেখ, কর্ম্মিগণ মহা কর্ম্মস্রোতে নিপতিত হইয়া নানাপথে ছুটিতেছিল, তাহারা এখন সুস্থির হইয়া প্রেমের পথ আশ্রয় করিয়াছে। আবার ঐ দেখ, পাষাণ অপেক্ষাও যাহারা সুকঠিন, তাহারাও অপূর্ব্ব প্রেমরসে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ স্বচক্ষে এই অবতার-বৈভব প্রত্যক্ষ করিয়া কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শুনুন;—

অতিপুণ্যৈরতিসুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কৈরপিপূর্ব্বৈঃ
এবং কৈরপিনকৃতং যৎপ্রেমাব্ধৌনিমজ্জিতং বিশ্বং ॥

পূর্ব্বে অতিপুণ্যে, অতি সুকৃতি ফলে কেহ কেহ প্রেম-সম্পত্তিলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে যে প্রেমে বিশ্ব নিমজ্জিত এই প্রেমসম্পত্তি কাহাকেও দেন নাই। সে প্রেমসম্পত্তি কি ? তাহাও বলিতেছেন, শুনুন ;—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং।
শ্রীবৈয়াসকিনাদুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপিযৎ ॥
যদ্রাধারতিকেলিনাগর রসাস্বাদৈকতদ্ভাজনং।
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌর-বপুষালোকেঽবতীর্ণোহরিঃ ॥

ব্যাসনন্দন শুকদেব রাসপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের পরম তাৎপর্য্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ়লীলারস সন্দর্ভের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। অনুশীলন দ্বারা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া সেই রসাস্বাদন পাত্রাভাবে বিস্তার করেন নাই। কেননা শ্রীরাধার রতিকেলি-নাগর শ্রীকৃষ্ণই তাহার আস্বাদনের এক মাত্র পাত্র। সেই পরম নিগূঢ় রসতত্ত্ব-বস্তুবিচার জন্য শ্রীগৌরহরি ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কাজেই সত্যাদি-যুগের শক্তিমান্ ব্যক্তিগণও কলিজন্ম কামনা করিয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে নিমি মহারাজকে মহাযোগী করভাজন বলিতেছেন ;—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং।
কলৌকিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥

হে রাজন্! কলিকালের লোক সকল নিশ্চয় হরি-ভক্ত হইবে জানিয়া সত্যাদি-কালোৎপন্ন ব্যক্তিগণও কলিজন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এখন-বুঝিলেন পাঠক মহোদয়গণ, যে গৌরলীলাও কৃষ্ণলীলা পৃথক্ নহে। দ্বাপর যুগের শেষ সময়ে কৃষ্ণলীলার আরম্ভ আর কলিযুগের প্রথমে তাহার পরিসমাপ্তি বা পরিণতি। এই অপূর্ব্ব প্রেম রসময় কৃষ্ণলীলা-তরু মথুরায় অঙ্কুরিত বৃন্দাবনে পুষ্পিত, শ্রীধাম নবদ্বীপে ও পক্ক ফলিত। কৃষ্ণ-ফল পাকিলেই গৌর হয়। মথুরায় আয়োজন, বৃন্দাবনে রন্ধন আর নবদ্বীপে পরিবেশন! তাই লোভী ভক্তের মন নবদ্বীপেই ধাবিত হয়। আয়োজন রন্ধন হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, পরিবেশন চাই ; তাই গৌর-লীলা বাদ দিলে কৃষ্ণলীলা অসম্পূর্ণ, অনুন্নত, অনুজ্জ্বল। তাই আমাদের গৌর-কৃষ্ণ অনর্পিতপূর্ব্ব উন্নতোজ্জ্বল রসস্বরূপ। ইহাই কৃষ্ণলীলাও গৌরলীলার পার্থক্য, ইহাই বিশেষত্ব"।

অবিশ্বাসিগণ! আর বৃথা আত্মাভিমানে আত্মহত্যা করিও না, চিন্তামণির বিনিময়ে কাচ কিনিও না। ঐ দেখ পরমকারুণিক, সাঙ্গোপাঙ্গে তোমার দুয়ারে দণ্ডায়মান। নির্ব্বোধ জীব! তোমার ভাগ্যের সীমা একবার দেখিয়া লও! এ স্বর্ণ-সুযোগ, জীবনের এ মাহেন্দ্রক্ষণ ত্যাগ করিও না; অযাচিত দান ছাড়িলে আর পাইবে না। ঐ দেখ দয়ার সাগর নিতাইচাঁদ—"আপনি মালী, মাথায় ডালি"—হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন আর বলিতেছেন,—"ধর ন্যাওরে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়"—তবু শুনিলে না, তবু গ্রহণ করিলে না? ঐ দেখ, দয়ার সাগর আবার কি করিতেছেন; শুন কি বলিতেছেন;—"নিতাই যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি, আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি"—হায়! হায়! তথাপি শুনিলে না? ইহাতেও মন গলিল না দেখিয়া, দয়াময় আমার কি করিতেছেন দেখ;—"এত বলি নিত্যানন্দ ভূমি গড়ি যায়, রজতভূধর যেন ধরণী লোটায়"! আবার পার্শ্বে ফিরিয়া দেখ, বাসুদেবকল্প বাসুদেব দত্ত তোমাদের জন্য নিজের ইষ্টদেব প্রত্যক্ষ ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরুর নিকট কি বর চাহিতেছেন;—

জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি প্রভু দয়াময়।
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয়।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লয়ে মুঞি কঁরো নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥

আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখ, ক্ষমার অবতার হরিদাস ঠাকুর, হরিনাম করার অপরাধে ধর্ম্মদ্বেষী যবনের হস্তে অযথারূপে নিপীড়িত হইয়া তাহাদেরই কল্যাণার্থে উর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন,—

সবে যে সকল পাপীগণে তারে মারে।
তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥

আবার সম্মুখে তাকাইয়া দেখ, স্বয়ং অখিলের নাথ তোমাদের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। বঞ্চনা করিও না, বিমুখ করিও না, ভিক্ষা দাও, একেবারে

দান নহে ; বিনিময়ে—তোমার একটি কথার বিনিময়ে ঐ যোগি-ধ্যেয়, ভবারাধ্য, ভক্তের বাধ্য, সাধন-সাধ্য, রত্নশ্রেষ্ঠ চিন্তামণিটিকে চিরদিনের তরে কিনিয়া লও। ঐ দেখ ;—

ত্রৈলোক্যনাথোঽপিদীনাতিদীনঃ।
অসীমসত্ত্বোঽপি হীনাতিহীনঃ॥
নির্দ্বন্দ্বভাবোঽপি নরার্ত্তিকাতরঃ।

হায়! হায়! আমরা কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন! যিনি ষোড়শসহস্র গোপ-রমণীর সম্ভোগ-পতি, তিনি আ'জ শ্রীমুখ-দর্শনে বঞ্চিত! যিনি বন-ফুল-ভূষণ, তিনি আ'জ ডোরকৌপীনধারী! যাঁহার করস্থিত মোহন বেণুর মধুর স্বরে যমুনা উজান বহিত, সেই হাতে আ'জ দণ্ড-কমণ্ডলু! যাঁহার সদা হাস্য-বিকাসিত কুটিল-কটাক্ষ-সমন্বিত নয়নবাণে ভুবন মোহিত, তাঁহার নয়ন আ'জ অশ্রুধারায় প্লাবিত! এদৃশ্য দেখিয়াও হৃদয় গলিল না!!

"গৌরাঙ্গের গুণ শুনি, পাষাণ হয়ত পানি
শুক কাঁদে পিঞ্জর ভিতরে।"

হায়! হায়! আমরা তদপেক্ষাও কঠিন! ঐ শুন, এদৃশ্য দেখিয়া নগর-বাসিগণ কি বলিতেছে ;——

গৌরগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ-গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাঁচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া
গোরাবিনু শূন্য হইল সকল নদীয়া॥

আবার ঐ শুন, চতুর্দ্দিক্ হইতে কি এক মর্ম্মন্তুদ করুণোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল!

হাদে রে! নগরবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পশারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥

পাঠক মহোদয়গণ! আমরাও পরমপতিত, পরমদুঃখী ; আসুন এই সময় সময় থাকিতে নগরবাসিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া

কাতর কণ্ঠে "হা নিতাই গৌরাঙ্গ—হা নিতাই গৌরাঙ্গ"—বলিয়া ডাকিয়া ফিরাই। অনাদরে সেই আদরের ধন বিমুখ হইলে আমাদের আর উপায় নাই। তাই বলি আসুন, সকলে মনপ্রাণ খুলিয়া সমস্বরে বলিতে থাকি—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে॥"

ইতি

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

গুরুতত্ত্ব।

জগতের সৃজন, পালন এবং সংহারের কর্ত্তা, নিত্য, নিরঞ্জন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সচ্চিদানন্দ, পরব্রহ্মই জগদ্‌গুরু। গুরুগীতায় লিখিত আছে—

চৈতন্যং শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ।

যিনি চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, শান্ত, আকাশের অতীত ও নিরঞ্জন, যিনি প্রণব-শব্দ ও কলার অতীত, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

যিনি আমার ত্রাণকর্ত্তা, তিনি জগতের ত্রাণকর্ত্তা; যিনি আমার গুরু তিনি জগতের গুরু; যিনি আমার আত্মা, তিনি সকল প্রাণীর আত্মা; অতএব সেই সর্ব্বময় গুরুকে নমস্কার করি।

আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপিণং।
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি প্রণমামি জগদ্‌গুরুং॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমব্যাপী পরমাত্মস্বরূপ জগদ্‌গুরুকে প্রণাম করি।

নারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে—

সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততং।
তদ্‌গুরোঃ প্রতিবিম্বঞ্চ সর্ব্বত্র নররূপকঃ।
গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া॥

হে মুনে! মস্তকে সহস্রদল পদ্ম আছে, তাহাতেই সুক্ষ্মরূপে গুরু অবস্থিত আছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গুরু, নররূপী গুরু তাঁহারই প্রতিবিম্ব; শিষ্যগণের হিতার্থে স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপ ধারণ করিয়াছেন।

গুরুগীতার প্রথমেই লিখিত আছে—

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ! সদাশিব! জগদ্‌গুরো!
প্রাণেশ্বর! মহাদেব! গুরুদীক্ষাং প্রদেহিমে॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেবেশ! হে সদাশিব! হে জগদ্‌গুরো! তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রাণেশ! আমাকে গুরুদীক্ষা প্রদান কর।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণদ্বয়ে সদাশিব মহাদেব এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জগদ্‌গুরুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জগদ্‌গুরুই পরমগুরু, পরাৎপরগুরু, এবং পরমেষ্ঠীগুরু। ইনিই পরমতত্ত্ব, জগন্ময়। সর্ব্বদা ইঁহার ধ্যান, পূজা, অর্চ্চনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য।

পিতা মাতা (গুরু) দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এই চারি প্রকার গুরু আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছেন।

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
নতস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥ ২২৭
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে। ২২৮
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপউচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥ ২২৯
তএবহি ত্রয়োলোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
তএবহি ত্রয়ো বেদাস্তএবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥ ২৩০
পিতাবৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্ম্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥ ২৩১
ত্রিষ্বপ্রমাদ্যন্নেতেষুত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্‌গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে॥ ২৩২
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমম্।
গুরু-শুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥ ২৩৩

সর্ব্বেতস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতেত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩৪
যাবত্ত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ।
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতেরতঃ ॥ ২৩৫
তেষামনুপরোধেন পারত্র্যং যদ্‌যদাচরেৎ।
তত্তন্নিবেদয়েৎ তেভ্যো মনোবচনকর্ম্মভিঃ ॥ ২৩৬
ত্রিষ্বেতেষ্বিতিকৃত্যংহি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে ॥২৩৭

অপত্য-জননে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র, শত শত বর্ষেও তাহার নিষ্কৃতি করিতে সমর্থ হয়না। প্রতিদিন পিতামাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে—আচার্য্যের (দীক্ষাদাতা গুরুর) প্রীতি উৎপাদন করিবে। ইঁহারা তিন জনে তুষ্ট থাকিলে সমুদায় তপস্যা সম্পন্ন হয়। ইঁহাদের তিনজনের শুশ্রূষাকেই পণ্ডিতেরা পরমতপস্যা বলিয়াছেন। ইঁহাদের অনুমোদিত না হইলে অপর কোন ধর্ম্মের আচরণ করিতে নাই। ইঁহারা তিনজনেই ত্রিলোকপ্রাপ্তির হেতু, ইহাঁরা তিনজনেই আশ্রমত্রয়-লাভের কারণ। ইঁহারা তিনজনই ত্রয়ী বা ত্রিবেদ এবং ইহারা তিনজনই তিন অগ্নি। পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি, আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি—এই তিন অগ্নিই পৃথিবী মধ্যে গরীয়ান্। এই তিনজনের উপর প্রমাদ প্রকাশ না করিয়া, যে গৃহী ইহাঁদের প্রতি সর্ব্বদা অবহিত থাকেন, তিনি তাহা দ্বারা ত্রিলোক জয় করেন, তিনি স্বশরীরে দীপ্যমান হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে বিমলানন্দ ভোগ করেন। মাতৃ-ভক্তি দ্বারা ভূলোক, পিতৃ-ভক্তি দ্বারা মধ্যম অর্থাৎ অন্তরীক্ষ-লোক এবং গুরু-ভক্তি দ্বারা ব্রহ্ম-লোক লাভ করা যায়। যিনি এই তিনজনকে আদর করেন, তিনি ধর্ম্মকে আদর করেন, আর যিনি এই তিন জনের অনাদর করেন, তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বৃথা। যতদিন ইহাঁরা জীবিত থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। প্রতিদিন ইহাঁদের প্রিয়কার্য্য-সাধন ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেই হইবে। ইহাঁদের সেবাদির অবিরোধে পরলোক-কামনায় মনোবাক্য-কর্ম্ম দ্বারা যে কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, সে সমুদায়ই ইঁহাদিগকে নিবেদন করিবে। তিন জনকে উক্তরূপে শুশ্রূষাদি করিলে পুরুষের ইতিকর্ত্তব্যতা শেষ হয়, ইহাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম।

বিষ্ণুসংহিতায় একত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরুবো ভবন্তি ॥ ১

মাতাপিতা আচার্য্যশ্চ ॥২ তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যং ॥ ৩ যৎতে ত্রয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ। ৪ তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ ॥ ৫ ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ ॥ ৬।

এতএব ত্রয়ো বেদা এতএব ত্রয়ঃ সুরাঃ।
এতএব ত্রয়োলোকা এতএব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৭
পিতা গার্হপত্যোঽগ্নি র্দক্ষিণাগ্নির্ম্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ ॥ ৮
সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমং
গুরুশুশ্রূষয়াত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥ ১০

মাতা পিতা আচার্য্য—এই তিন জন পুরুষের "মহাগুরু" হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা ইঁহাদিগের সেবা করিবে। ইঁহাদের প্রিয়হিত কার্য্য আচরণ করিবে। ইঁহাদিগের অনুজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিবে না। ইঁহারাই তিন বেদ, ইঁহারাই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই ত্রিদেবতা ; ইঁহারাই ত্রিলোক এবং ইঁহারাই এই তিন অগ্নি। পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি, আচার্য্য আহবনীয় অগ্নি। এই তিন জন যাঁহার নিকট আদৃত, সকল ধর্ম্মই তাঁহার আদৃত ; আর ইঁহারা যাঁহার নিকট অনাদৃত, তাঁহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল। মাতৃভক্তি দ্বারা ইহলোক, পিতৃভক্তিদ্বারা মধ্যম লোক (অর্থাৎ দেবলোক) এবং গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারা যায়।

কেহ ২ বলেন, মনুসংহিতার শেষ শ্লোকে "পুরুষস্য সমাপ্যতে" এবং বিষ্ণুসংহিতার প্রথম শ্লোকে "ত্রয়ঃ পুরুষস্য" (অর্থাৎ পুরুষের তিনগুরু) যদিও লিখিত হইয়াছে ; তথাপি স্ত্রী যখন পুরুষের সহধর্ম্মিণী, তখন স্ত্রীলোকেরও ঐ তিন গুরু হওয়া সঙ্গত।

অপিচ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে আমরা দেখিতে পাই—

ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মোভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥ ১০০
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥ ১০১
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ ॥ ১০২

নারীদিগের পক্ষে তীর্থ-সেবা উপবাসাদি ক্রিয়া বা ব্রতাদি-নিয়ম কিছুই নাই। স্বামীই স্ত্রীলোকের তীর্থ, তপস্যা, দান ও ব্রত। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, অতএব সম্যক্ প্রকারে স্বামিসেবা করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে স্ত্রী বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা সর্ব্বদা প্রিয়ানুষ্ঠান-পূর্ব্বক স্বামীর অনুরাগিণী হন, সেই স্ত্রী ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন।

চাণক্য পণ্ডিতও লিখিয়াছেন—

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।

পতিই স্ত্রীর একমাত্র গুরু।

মনুসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়—

উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ। ১৫৪
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৫৫

পতিকে সাধ্বী স্ত্রী, সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় সেবা করিবেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পৃথক্ যজ্ঞ নাই। স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত ও উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারা স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। ইহার ভাবার্থ, পতিই স্ত্রীর পক্ষে গুরু।

যে ব্যক্তি অপরকে কোন বিদ্যাশিক্ষা দেন, ঐ শিক্ষাদাতাই শিক্ষাগুরু অথবা বিদ্যাগুরু বলিয়া অভিহিত হন।

অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে।

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তিতদ্ দ্রব্যং যদ্দত্বাহ্যনৃণীভবেৎ॥ ৯
একাক্ষরপ্রদাতারং যোগুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনিশতং গত্বা চণ্ডালেষ্বভিজায়তে॥ ১০

যদি গুরু, শিষ্যকে একটী মাত্র অক্ষরও শিখাইয়া থাকেন, তথাপি, পৃথিবীতে এমত কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া শিষ্য ঋণমুক্ত হইতে পারে। একাক্ষর-শিক্ষক গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মানিত না করে, সে শত-বার কুক্কুর-জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

এস্থলে দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু উভয়কে বুঝিতে হইবে।

মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥ ২০৬

শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥ ২০৭

তাৎপর্য্য এই যে বিদ্যাগুরুকে গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। আমাদের কোন ২ শাস্ত্রবিৎ ব্রহ্মাকে 'জগদ্‌গুরু' ও মাতাপিতা এবং দীক্ষাদাতাকে 'মহাগুরু' বলিয়াছেন।

আমরা এই প্রবন্ধে পিতামাতা স্বামী প্রভৃতি গুরু সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। দীক্ষাগুরুর বিষয়ই নিম্নে লিখিতেছি।

গুরুঃ (গৄ + কু যে) যিনি ধর্ম্ম-কর্ম্মের পথ-প্রকাশক। সং, পুং আচার্য্য, মন্ত্রদাতা, দীক্ষাদাতা।

গুরু-শব্দার্থঃ। গুরুগীতা।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।

অন্ধকার-নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে। ১

গুকারঃ প্রথমোবর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।

রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম-মায়াভ্রান্তি-বিমোচকঃ। ২

"গু"শব্দের অর্থ অন্ধকার ও "রু"শব্দের অর্থ তাহার নিবারক। অতএব যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তিনিই গুরু নামে অভিহিত। "গুরু" এই শব্দের প্রথম বর্ণ যে "গু" তদ্‌দ্বারা মায়া প্রভৃতি গুণ প্রকাশিত হয়, এবং দ্বিতীয় বর্ণ যে "রু" তাহার অর্থ যিনি ব্রহ্মেতে মায়ারূপ যে তম তাহা নষ্ট করেন। অতএব "গু"শব্দে সগুণ ও "রু" শব্দে নিগুর্ণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন। গু + রু = 'গুরু' শব্দ নিষ্পন্ন হইল।

শ্রীমদনমোহন গুহ।

দেব-চরিত।

ধনপতি কুবের।

(গুরু-শিষ্য-সংবাদ)

শিষ্য। বেদ-মতে দেবগণ নক্ষত্রে নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার মতে স্বস্ব আবাস-ভূত নক্ষত্রের লাবণ্য ভূষণ বাহন দেবগণে কল্পিত হইয়াছে।

গুরু। আমার এই মত বটে।

শিষ্য। ধনপতি কুবের কোন্ নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছেন? এবং ধনপতির রূপ লাবণ্য ভূষণ বাহন কি রূপে কল্পিত হইল?

গুরু। ধনপতির রূপ লাবণ্য ভূষণ বাহন সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি বল

শিষ্য। ধনপতি কুবের (কুৎসিতদেহ বা পৃথিবী-দেহ), ধনপতি নর-বাহন (মানব-বাহন বা অশ্ব-বাহন)।

ধনপতি একপিঙ্গ (একটী চক্ষু ইহার পিঙ্গলবর্ণ অর্থাৎ কামলগ্রস্ত) এবং ধনপতি যক্ষ ও কিন্নরেশ (১) নাম ধারণ করেন।

উত্তর-কাণ্ড-মতে ধনপতি সতত বর্ণ-পরিবর্ত্তন-শীল কৃকলাস-(২) মূর্ত্তি—ধারণ করেন।

ধনপতি প্রৌষ্ঠপদ দ্বয়ে সুশোভিত। (৩) সভাপর্ব্ব-মতে কুবের-পুরী—অন্তরীক্ষ এবং তথায় নিয়মিত বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ নৃত্য গীত বাদ্য করে।

গুরু। তুমি কুবের-চরিতের শৃঙ্গ-গ্রহণে অতি সমর্থ। তোমার মত বিচক্ষণ শিষ্যের উপদেষ্টা হওয়া আনন্দের ও শ্লাঘার বিষয়।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-মাসের সন্ধ্যার সময়ে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসের দুপর রাত্রে এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে—ভোর রাত্রে মাথার উপর আকাশে দেখিবে যে কৃকলাস-মণ্ডলে স্থিত বসুগণদৈবত মৃদঙ্গাকৃতি ধনিষ্ঠানক্ষত্র উকি ঝুঁকি মারিতেছে। নক্ষত্রের তারাপঞ্চকের একটী তারা পিঙ্গল-বর্ণ। তারাদর্শক ধনিষ্ঠাকে খুজিয়া পান না। যদি দেখা দেয়, তবে তখনি লুকায়।

ধনিষ্ঠার তলে অশ্বতর-মণ্ডলে (৪) কেবল তুরঙ্গমুণ্ড বিরাজ করে। ধনিষ্ঠার অদূরপূর্ব্বে পক্ষিরাজ-মণ্ডলে (৫) ভাদ্রপদ ওরফে প্রৌষ্ঠপদ নক্ষত্রদ্বয় চক্‌মক্‌ করিতেছে।

(১) কিন্নর অর্থে তুরঙ্গবদন। "ইন্দ্র দধীচি মুনিকে বাহ্মণ মধু-বিদ্যা শিক্ষা দেন। দধীচি অশ্বিদ্বয়কে মধু-বিদ্যা দান করিলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দধীচিকে কেহ না চিনিতে পারে এই মতলবে দধীচির মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহার স্কন্ধে অশ্বমুণ্ড বসাইয়া দিলেন।" ঋক্‌। তখন তুরঙ্গবদন দধীচিকে দেখিয়া কেহ বলে 'গন্ধর্ব্ব' কেহ বলে 'কিংনরঃ' কেহ বলে 'কিং পুরুষঃ'। আবার একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সেমেটিক ভাষায় "কিন্নর" অর্থে বীণা। লেখক

(২) কৃকলাসের মুণ্ড নিয়ত সুবর্ণ বর্ণ থাকে। কিন্তু তাহার দেহে পর্য্যায়-ক্রমে নিকটস্থ বস্তুর বর্ণ প্রকাশ পায়। এজন্য দর্শকের ভীতি জন্মে। এজন্য কৃকলাস কুৎসিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

(৩) অশ্বের ওষ্ঠ অতি প্রকৃষ্ট। পক্ষিরাজ- (ঘোটক-) মণ্ডলে যে ভদ্র অশ্ব বা তারা অশ্ব আছে, তাহার ক্ষুরচতুষ্টয়ে ভাদ্রপদ বা প্রৌষ্ঠপদ নক্ষত্রদ্বয় নির্ম্মিত হয়।

(৪) The Dolphin or Delphinos

(৫) Pagusus

ধনিষ্ঠার অদূরপশ্চিমে বীণামণ্ডলে (৬) তারা-মৃদঙ্গের তালে তালে তারা-বীণা বাজিতেছে। আকাশে যাহা আছে বলিলাম। তোমার মত বিচক্ষণ চিন্তাশীল শিষ্যের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে হয় না। তুমি আপনা আপনি মিলাইয়া দেখ যে, আকাশে কুবেরের তারামূর্ত্তি চিত্রিত আছে কিনা।

শিষ্য। ধনপতি একপিঙ্গ কেন?

গুরু। দুই চোখে দেখিলে মানব সমদর্শী হয়। ধন-দানে ধনপতি অসমদর্শী বলিয়া তাহার এক চক্ষু কামলগ্রস্ত (৭) কল্পিত হইয়াছে।

তারাদর্শক।

শ্রীরামগীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রহস্যমেতচ্ছ্রুতিসার-সংগ্রহং
মরা বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়।
যস্ত্বেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ॥৫৯।

হে প্রিয়! লক্ষ্মণ! যদিও শ্রুতি-সমূহের সার হইতে সংগৃহীত এই বিষয় অত্যন্ত গোপনীয়, তথাপি তোমার কল্যাণের নিমিত্ত আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কহিলাম; যে ধীমান্ পুরুষ এই শ্রুতি-সার-সংগ্রহ পর্য্যালোচনা করেন তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন, জ্ঞান-শাস্ত্র আলোচনা করিলে অজ্ঞান-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং জ্ঞানোদয় জন্য অজ্ঞান-কৃত কর্ম্মও ভস্মীভূত হয়।৫৯।

ভ্রাতর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগৎ
মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনা-ভাবিতশুদ্ধমানসঃ
সুখী ভবানন্দময়োনিরাময়ঃ।৬০

হে ভ্রাতঃ! যদিও এই জগৎ স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইয়া সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, তথাপি এই সমস্ত বস্তুকে মায়াময় মিথ্যা জানিয়া মন দ্বারা তৎ সমস্ত পরিত্যাগ

(৬) Lyna
(৭) Jaundiced eye

পূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ-বোধে—আমার চিন্তায় নিমগ্ন ও বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া সুখী হও এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদিরূপ ব্যাধি-বর্জ্জিত হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে বিরাজ কর।৬০।

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎপরং
হৃদা কদাবা যদিবা গুণাত্মকম্।
সোঽহং স্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃ স্পৃশন্
পুনাতি লোকত্রিতয়ং যথারবিঃ॥৬১।

যেমন রবি-কিরণ-জালে ত্রিভুবন পবিত্র ও আলোকিত হয়, সেইরূপ যে ভক্ত ব্যক্তি, নির্ম্মল চিত্তে আমাকে মায়াতীত ও ত্রিগুণ-রহিত জানিয়া আমার সেবা করেন, কিম্বা লীলাদিকালে আমাকে সত্ত্ব-গুণাত্মক জানিয়া আরাধনা করেন, তিনি আমারই স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই; তাদৃশ ভক্তের চরণ-রেণু-স্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়া থাকে।৬১।

বিজ্ঞানমেতদখিল-শ্রুতি-সারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতম্।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্ গুরুভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ॥৬২।

আমার জগদুৎপত্তি-লয়াত্মক কর্ম্ম বেদান্ত-বাক্যদ্বারা জ্ঞাতব্য। আমি সকল শ্রুতির সার হইতে সংগৃহীত এই বিজ্ঞান-জনক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম। যিনি গুরু-ভক্তি-পরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক এই গীতা-শাস্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি আমার বাক্যে ঐকান্তিক ভক্তি-বশতঃ অবশ্যই আমার সারূপ্য লাভ করিবেন॥৬২।

শ্রীরামগীতা সমাপ্তা

শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

ন্যায় ও সাংখ্য।

গৌতমসূত্র—

কর্ম্মাকাশসাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়ঃ।

অনিত্য কর্ম্মের যেরূপ ক্রিয়াশূন্যত্ব আছে, তদ্রূপ নিত্য আকাশেরও নিষ্ক্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় নিষ্ক্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম "সাধারণ ধর্ম্ম" হইল। উক্ত সাধারণ ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয়ত্ব, বুদ্ধিতে বিদ্যমান থাকায় সংশয় জন্মিতে পারে যে, বুদ্ধি নিত্যা কি অনিত্যা? যদ্যপি এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে যে, বুদ্ধির নিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ উচিত

হয় না। কারণ সকলেরই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে যে, "আমি জানিতেছি, আমি জানিয়াছি এবং জানিব" এই প্রকার ত্রৈকালিক জ্ঞান, বুদ্ধির অনিত্যতা হইলে হইতে পারে, কারণ বুদ্ধি নিত্য হইলে "অহং জানামি" আমি জানিতেছি এই প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে; যেহেতু বুদ্ধি সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে; কিন্তু 'আমি জানিব' এই প্রকার ভবিষ্যদ্বুদ্ধি-বিষয়ক জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অথচ যখন উক্ত ত্রৈকালিক জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে তখন নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে বুদ্ধি অনিত্যা; তথাপি নিত্য-বুদ্ধি-স্বীকারকারী সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন যে, "প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞানাৎ পুংসাং মোক্ষঃ" অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বরূপাজ্ঞান-নিবন্ধন পুরুষের সংসারাবস্থা হয়, এবং যে সময়ে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়, সে সময়েই পুরুষ মুক্ত হয়েন। তন্মতে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রধানং বা" সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা অকার্য্যাবস্থা প্রকৃতি-পদবাচ্যা। যৎকালে উক্ত গুণত্রয়ের কোন পরিণামই জন্মে না সেই অবস্থাই 'প্রকৃতি বা প্রধান'। যে প্রকার ঘটাদি মৃন্ময় পদার্থে মৃত্তিকারূপে সকলের সমতা থাকায় উক্ত ঘটাদির প্রতি মৃত্তিকা কারণ, তদ্রূপ এই সংসারে যাহা কিছু বাহ্য বা আন্তরিক পদার্থ আছে, সে সমুদয়ের সুখ দুঃখ এবং মোহাত্মকরূপে সমতা থাকায় সুখ দুঃখ মোহাত্মক বস্তু ইহাদের কারণ এরূপ অনুমান হয় উক্ত বস্তুই প্রকৃতি, সুতরাং প্রকৃতি সমস্ত বস্তুরই আদিকারণ এবং উক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতনা ও ভোগ্যা। তাঁহার উপভোক্তা চেতনপুরুষ। পুরুষ চিতিশক্তিস্বভাব এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বাদি-ধর্ম্ম-রহিত পুষ্করপলাশবন্নির্লেপ দ্রষ্টা মাত্র। উক্ত পুরুষকে প্রকৃতি 'ভোক্তা' এবং 'মুক্ত' করিয়া দেয়। প্রকৃতি নির্ব্বিকার হইলে কখনই পুরুষের ভোগ সম্পাদন করিতে পারে না। এজন্য প্রকৃতি, স্বীয় বিচিত্র স্বভাব-প্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরিণতা হয়। উক্ত প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি। পঙ্গু ও অন্ধবৎ ইহাদের সম্বন্ধ। এক পুরুষ দর্শনশক্তিসম্পন্ন অথচ গতিশক্তিবিহীন পঙ্গু এবং একব্যক্তি গতিশক্তি-যুক্ত কিন্তু দর্শনশক্তি-বিহীন অন্ধ। এতদুভয়ে মিলিত হইলে যেমন শক্তিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রকৃতি স্বয়ং জড়া হইলেও, চেতন পুরুষ-সন্নিধান বশতঃ তাহার পরিণাম জন্মিয়া থাকে। উক্ত প্রকৃতির প্রথম বিকার বা পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিতত্ত্ব।

বুদ্ধিতত্ত্বেই ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য এবং অবৈরাগ্য

বৃত্তি আছে। তৎপরে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব আবির্ভূত হয়, উক্ত অহঙ্কার অভিমান-স্বভাব। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ও পঞ্চতন্মাত্র গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এবং সঙ্কল্পাত্মক অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ জন্মিয়া থাকে। উক্ত গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত জন্মিয়া থাকে যথা—গন্ধ হইতে পৃথিবী, রস হইতে জল, রূপ হইতে তেজঃ, স্পর্শ হইতে বায়ু এবং শব্দ হইতে আকাশ জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, সাংখ্যাচার্য্যেরা কল্পনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রধান বা প্রকৃতি স্বয়ং অবিকৃতি, এবং মহদাদি সপ্ততত্ত্ব প্রকৃতি ও বিকৃতি এবং ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ তত্ত্ব বিকৃতি মাত্র। পুরুষ উদাসীন, প্রকৃতিও নহেন বিকৃতিও নহেন। সুতরাং এতন্মতে বুদ্ধি নিত্যা এবং তাহার জ্ঞানাদি ধর্ম্ম আছে। বুদ্ধির নিত্যত্ব-বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্যেরা আরও যুক্তি দেখাইয়া থাকেন "বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানাৎ" পূর্ব্ব প্রতিসন্ধিমান অর্থবিষয়ক জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে—অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের পুনর্ব্বার জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা। যাহাকে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি; তাহাকে পুনর্ব্বার আমি দেখিতেছি—এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা বিভিন্ন ব্যক্তির সম্ভব হয় না। পূর্ব্বে এক ব্যক্তি দেখিলে অপর ব্যক্তির ঐ প্রকার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক যখন সকলেরই ঐ প্রকার জ্ঞান হইতেছে, তখন অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রতিসন্ধাতা একব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তি নহে। সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন এবং অনিত্য হইলে উক্তপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব বিধায় তাহার নিত্যত্ব স্বীকার্য্য।

উক্ত সাংখ্যমত-খণ্ডন-বিষয়ে মহর্ষি গৌতম বলেন যে, "সাধ্যসমত্বাদহেতুঃ" বস্তুবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির নিত্যত্ব সংস্থাপন করিতে পার না, যেহেতু উক্ত প্রত্যভিজ্ঞান সম্বন্ধেই প্রথমতঃ সন্দেহ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব বস্তুকে দর্শন করিয়া কালান্তরে উক্ত বস্তুকে প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা জানিয়া থাকে, এই প্রকার কর্ত্তৃধর্ম্মের করণে আরোপ হইতে পারে না। বাস্তবিক চেতন পদার্থই বস্তুকে জানিয়া থাকে, দেখিয়া থাকে, উপলব্ধি করিয়া থাকে, প্রত্যয় করিয়া থাকে এবং চেতনেরই এক বস্তুকে দেখিয়া কালান্তরে তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিলে "এইটি পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। এই হেতু চেতন পদার্থের নিত্যত্ব-স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

অচেতন পদার্থের উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না, এবং তাহার নিত্যত্ব-স্বীকার করাও যুক্তিসিদ্ধ হয় না। চেতন-ধর্ম্ম, অচেতন করণীভূত অন্তঃকরণে

স্বীকার করিলে চেতনস্বরূপ কি—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। জ্ঞানাদির আশ্রয়ই চেতন পদার্থ; উক্ত জ্ঞানাদিধর্ম্মের দ্বারাই চেতন পদার্থের অনুমান করিতে হইবে। এইরূপ স্থলে চেতনের ধর্ম্ম জ্ঞানাদি, অচেতন বুদ্ধিতত্ত্বে স্বীকৃত হইলে, চেতনস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে, কারণ চেতন-নির্দ্দেশক ধর্ম্ম জ্ঞানাদি, অচেতনে স্বীকার করায়,, চেতন-নির্দ্দেশক অন্য কোন ধর্ম্ম না থাকায় চেতন অনির্দ্দেশ্য হইয়া উঠে। সুতরাং চেতনধর্ম্ম করণে স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই জন্য জ্ঞানাদি বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু চেতন আত্মার ধর্ম্ম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সাহিত্য-সেবীর সাহায্য ভাণ্ডার।

আট বৎসর পর, একটু আশার অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়াছে। যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্যসাম্মিলনের নবম অধিবেশনে, সাহিত্য-সেবীর সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবার আশা হইয়াছে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বহুদিন হইতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুঝি বা এতদিনে এইবার তাহার ফল ফলিবে। বিগত আট বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে তাঁহার যে প্রস্তাব উড়িয়া গিয়াছিল, এইবার সেই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়া তদনুসারে কার্য্য-ব্যবস্থা হইবার সঙ্কল্প হইয়াছে। নবম 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের' অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম-এ-বি-এল্ মহাশয়, এসম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই পত্র পাঠ করিলে সাফল্যের আশা নিশ্চয়ই হৃদয়ে জাগরূক হইবে। পত্রখানি এই,—

"নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।
অভ্যর্থনা-সমিতি-কার্য্যালয়, যশোহর।
তারিখ ২৫। ২। ১৩।

মাননীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদ,—"সাহিত্য-সংবাদ" পত্রে দেখিলাম, দরিদ্র সাহিত্য-সেবী মহাশয়গণের সাহায্যার্থ যশোহর সম্মিলন উপলক্ষে যদি একটি স্থায়ী ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আপনি আনন্দের সহিত তাহাতে যোগদান করিতে পারেন।

আপনার প্রস্তাব সাধু। আপনি নিজে উপস্থিত হইয়া এ জন্য চেষ্টা করিলে বিশেষ সুখী হইব। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টাবান্ আছি। ঐ সাহায্য-ভাণ্ডারে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা প্রদান করিব। ইহা আপনি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও পারেন। সম্মিলনে যোগদান করিয়া ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিলে, বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যতার আশা করা যায়। আপনি ঐ বিষয়ে উদ্যমশীল ও উৎসাহী, ইহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি। এবার আপনার অভীপ্সিত কার্য্যের শুভ-সুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগে দৃঢ়তার সহিত আসিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। ফল ফলিবে। সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যার্থে আপনি স্বয়ং পুত্রাদি-সহিত এখানে আসিয়া, আমাদিগের সহায়তা করিলে কৃতার্থ হইব।

বিনীত—শ্রীযদুনাথ মজুমদার।
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।

রায় বাহাদুরের পত্র পাঠ করিয়া, কোন্ সহৃদয় সাহিত্যানুরাগীর হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হইবে? যাঁহারা একান্তে মাতৃভাষার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সকলেই এই ধনভাণ্ডার-স্থাপনের উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। বঙ্গভাষা দিন দিন যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হউক্, উহার গতির পথে এক বিষম অন্তরায় আছে। সেই অন্তরায়-বশতঃই মাতৃ-ভাষার অনেক অঙ্গ এখনও অপূর্ণ অপুষ্ট রহিয়াছে। সে অপুষ্টি—অপূর্ণতা দূর করিতে হইলে, সাহিত্যসেবিগণের সাহিত্যসেবা-ব্রতে সহায়তা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক গ্রন্থ যে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে না, তাহার মূল কারণ কি? অর্থাভাব তাহার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক প্রতিভা-কুসুম দারিদ্র্য-কীটে নষ্ট করিতেছে; অর্থানুকূল্য-রূপ ভেষজ-সাহায্যে তাহা রক্ষা পাইতে পারে। সাহিত্য-সেবিগণের অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, মাতৃ-ভাষা অমূল্য রত্নে বিভূষিতা হইতে পারেন। তাই আমরা পুনঃপুনঃ প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, সাহিত্য-সেবিগণের অভাবের সময় এবং তাঁহাদের লোকান্তরে তাঁহাদের পরিবারবর্গের বিপন্ন অবস্থায়, সাহায্যের জন্য যদি সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্যের মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। সে ভাণ্ডারের উপযোগিতা যাঁহারা এখনও অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না, অল্প অভিনিবেশ করিলে, অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত নিশ্চয়ই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। যশোহর সেই উপযোগিতা বুঝিয়াছেন, বড় আনন্দের বিষয়। বঙ্গভাষার যাঁহারা প্রকৃত

হিতাকাঙ্ক্ষী ও অনুরাগী আছেন, প্রার্থনা করি—আসুন, তাঁহারা সকলেই যশোহরের এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া শুভ-সঙ্কল্প-সাধনে সহায় হউন্।

এই সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন সম্বন্ধে যাঁহারা উদ্যোগী হইতে চাহেন এবং যাঁহারা যথাশক্তি সাহায্য-দানে ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহারা যশোহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট এবং আমাদের নিকট অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিবেন।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্ন্যাল।

"সাহিত্য-সংবাদ" সম্পাদক, হাওড়া (কলিকাতা)

—:o:—

সাহিত্য-সম্মিলন। আগামী ৮।৯ বৈশাখ যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশন হইবে। উদ্যোগ আয়োজন বিশেষ তীব্রতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। এবার সম্মিলনে সাহিত্যসেবাপরায়ণা বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা যোগদান করিবেন। সম্মিলনে এবার অনেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা হইবে। বোধ হয় দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণের জন্য সাহায্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এবার কার্য্যে পরিণত হইবে। দেশের ম্যালেরিয়া-নিবারণ কল্পে একটী কার্য্যকারী সংঘ গঠিত হইবে। এই কার্য্যের জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যমহারথগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আশার কথা, যথার্থ সুসংবাদ।

—:o:—

বৈদ্য-সম্মিলন। ময়মনসিংহ আয়ুর্ব্বেদ সভার তত্ত্বাবধানে আগামী ১৭। ১৮ বৈশাখ ময়মনসিংহে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-মণ্ডলীর সম্মিলন হইবে। আগরতলার রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাশ গুপ্ত কবিসাগর মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সদনুষ্ঠান সফল হইলে সুখের কথা।

—:o:—

মূল্যবান্ দান। পত্রান্তরে প্রকাশ—গোয়ালিয়রের মহারাজা বাহাদুর বোম্বাই প্রদেশীয় মারাঠা সম্প্রদায়ের শিক্ষোন্নতি-সাধনার্থে লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন। জ্ঞান-বিস্তারের উদ্দেশ্যে ধনদান শ্রেষ্ঠ দান, তাহার সন্দেহ নাই। 'দাতা শতং জীবতু।'